স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় মানবকল্যাণ

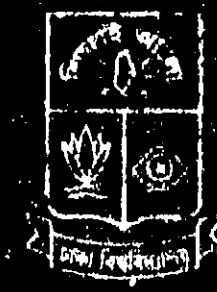

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. এম. মতিউর রহমান
[illegible] বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষক
মোহাম্মদ শফিক উল মজুমদার
[illegible]

শিক্ষাবর্ষ: ২০০৬-২০০৭
রেজিস্ট্রেশন নং: ১২৩
[illegible] বিশ্ববিদ্যালয়

[illegible] ২০১১

স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় মানবকল্যাণ

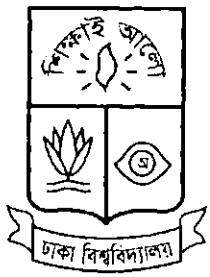

পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
ড. এম. মতিউর রহমান
অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

466249

Dhaka University Library
466249

গবেষক
মোহাম্মদ শাফি-উল্-মজ্‌নবীন
দর্শন বিভাগ
শিক্ষাবর্ষ: ২০০৬-২০০৭
রেজিস্ট্রেশন নং: ১২৩
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মার্চ, ২০১১

Dhaka University Institutional Repository

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী লাভের জন্য উপস্থাপিত **"স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় মানবকল্যাণ"** শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও তত্ত্বাবধায়ক ড. এম. মতিউর রহমান, অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-এর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নির্দেশনায় রচনা করেছি। এটা আমার এক মৌলিক গবেষণা কর্ম। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রী বা ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য অভিসন্দর্ভটির সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশ বিশেষ উপস্থাপন করিনি।

৪.০৪.২০২১

মোহাম্মদ শাফি-উল্-মজ্নবীন
পিএইচ.ডি. গবেষক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

আমি প্রত্যয়ন করছি যে, মোহাম্মদ শাফি-উল্-মজ্নবীন কর্তৃক রচিত "স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় মানবকল্যাণ" শীর্ষক অভিসন্দর্ভ একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। এই অভিসন্দর্ভটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি এবং এটি কোনো ডিপ্লোমা বা ডিগ্রীর জন্য অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করা হয়নি। এমনকি এই রচনার কোনো অংশবিশেষ কোনো পত্রিকা বা জার্নালেও প্রকাশিত হয়নি।

২১.০৬.১১

তত্ত্বাবধায়কের স্বাক্ষর

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

এই অভিসন্দর্ভ একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। বাংলাদেশের গ্রামোন্নয়ন ও বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনে এই গবেষণা কর্মটি নিঃসন্দেহে অবদান রাখবে। মানবকল্যাণ ও দেশ গঠনের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে বহু রকম ধারণা নিয়ে ইতোপূর্বে কাজ হয়েছে। একের পর এক শুধু আইডিয়ারই পরিবর্তন হয়েছে, প্রকৃত মানবকল্যাণ এখনো অনেক দূরে। গবেষক "স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় মানবকল্যাণ" নিয়ে গবেষণা করে মানবকল্যাণ সম্পর্কে অপরাপর গবেষকদের জন্য একটি চমৎকার ধারণা উপস্থাপন করেছেন। এ ধরণের গ্রামোন্নয়ন ও মানবকল্যাণ এ্যাপ্রোচ বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি সঠিক দিক-নির্দেশনা হতে পারে। পুরো গবেষণা কর্মটি আমার নিবিড় তত্ত্বাবধানে সম্পন্ন হয়েছে এবং গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুত হয়েছে।

গবেষণা কাজে ব্যবহৃত তথ্য উপাত্ত যথার্থ বলে আমি মনে করি। বিষয় সংশ্লিষ্ট ধর্ম, বিজ্ঞান, সমাজ, সাহিত্য আলোচনাও প্রাসংগিক হয়েছে। জরিপের মাধ্যমে সংগৃহীত তথ্যাবলী আহরণ ও বিশ্লেষণে গবেষণার নিয়ম-নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিষয়ে তত্ত্বীয় আলোচনা করে গবেষক মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের আওতায় এনেছেন। পুরো অভিসন্দর্ভে আলোচনার ধারাবাহিকতা ও বিষয় সম্পৃক্ততা সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করা হয়েছে। কোনো পর্যায়ে আলোচনা ও বিশ্লেষণের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়নি এবং গবেষক মূল বিষয় থেকেও সরে যাননি।

তারিখঃ
মার্চ, ২০১১
ঢাকা

ড. এম. মতিউর রহমান
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
অধ্যাপক
দর্শন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

পরম করুণাময় আল্লাহ্পাকের অশেষ কৃপায় দীর্ঘ পাঁচ বছর গবেষণার পর "স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তায় মানবকল্যাণ" শীর্ষক পিএইচ.ডি. ডিগ্রীর অভিসন্দর্ভটি উপস্থাপন করেছি। এ জন্য আমি পরম করুণাময়ের অশেষ প্রশংসা করছি। বিধি মোতাবেক যথা সময়ে অভিসন্দর্ভটি লক্ষ্য অর্জনের জন্য উপস্থাপন করতে পেরে আমি মহান আল্লাহ্ পাকের শানে শুকরিয়া আদায় করছি এবং নবী করিম (সাঃ) এর শানে দরূদ ও সালাম পেশ করছি।

আমার একাডেমিক দর্শনচর্চা ও গবেষণার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও এম.ফিল. গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কাজী নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগ, প্রাক্তন অধ্যাপক ও বিভাগীয় চেয়ারম্যান, দর্শন বিভাগ এবং প্রাক্তন পরিচালক, উচ্চতর মানববিদ্যা গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি নানাভাবে আমাকে গবেষণা কর্মে উৎসাহ দিয়েছেন। তাঁর প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও পরামর্শে স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন নিয়ে পিএইচ.ডি. গবেষণার তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচিত করি আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক দর্শনরত্ন অধ্যাপক ড.এম. মতিউর রহমান, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। তাঁর নিরন্তর উৎসাহ, অনুপ্রেরণা ও সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানের ফলেই আমার গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন হয়েছে এবং তাঁর মূল্যবান পরামর্শ ও দিক-নির্দেশনার ফলে অভিসন্দর্ভটি মানসম্পন্ন হয়েছে। আমার এ গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও এর অধ্যায়-উপাধ্যায় বিন্যস্তকরণ এবং এর অবয়ব ও ভাব-সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে তাঁর নিরলস আন্তরিক সহযোগিতায়। তাঁর কোমল শাসন ও আচরণ আমার গবেষণা কর্মকে আরও ত্বরিত করতে সহায়তা করেছে। এজন্য আমি তাঁর প্রতি চিরঋণী ও কৃতজ্ঞ। সেই সাথে আমি তাঁর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

এ সময় আরও গভীরভাবে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি আমার সদ্য প্রয়াত (১ অক্টোবর, ২০০৯) পিতা সুফী সাধক শাহ্ আব্দুল মজিদ আল-কাদেরী-কে। তাঁর শিক্ষানুরাগ, অধ্যাত্মদর্শন ও উচ্চতর মানবকল্যাণমূলক ভাবনা আমাকে শৈশব থেকেই প্রভাবিত করে। পরম শ্রদ্ধেয় পিতার গভীর আন্তরিকতা, উদারতা এবং আমার গবেষণা কর্মে উৎসাহ, সময়-সুযোগ, অর্থ, বিভিন্ন প্রকার তথ্য উপাত্ত, শিক্ষা ও দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন। আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন মাতা মোছাম্মত শরবানু বেগম আমাকে স্নেহ, মমতা, উৎসাহ, উপদেশ, অধ্যাত্মজ্ঞান ও অমূল্য তথ্য শিক্ষা দিয়ে আমার গবেষণা কর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

আমার গবেষণা কর্মের দুটি পটভূমি রয়েছে- প্রথমতঃ আমাদের দেশের দারিদ্র্য, বেকারত্ব, মাদকাসক্তি, ধর্মান্ধতা, সীমাহীন দুর্নীতি, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি আমাকে ভাবিয়ে তোলে। বর্তমান সাম্প্রদায়িক ও যুদ্ধোন্মত্ত ভয়াবহ বিশ্বপরিস্থিতিও আমার মনে গভীর উদ্বেগ সৃষ্টি করে। দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টি রহস্য অনুসন্ধান ও আত্মার মুক্তি লাভের প্রবল আকাঙ্ক্ষা আমাকে শৈশব থেকেই তাড়িত করে। আমি প্রথমে বিজ্ঞান, ভূগোল ও পরে বিশ্বপ্রকৃতি নিয়ে ভাবতে শুরু করি। এমন সময় আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন দাদা অন্যতম সুফী সাধক মরহুম হযরত শাহ্ খোশ-মাহ্মুদ আল-কাদেরী (রহঃ)-এর বৈচিত্র্যময় অধ্যাত্ম জীবনদর্শন আমার মনে সৃষ্টি করে এক পরম বিস্ময়। তাঁর উচ্চতর অধ্যাত্মজ্ঞান, সাধনা ও শক্তি এবং সদ্ব্যবহার প্রেম দয়া, উদারতা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তিনি ছিলেন ইরাকের বিখ্যাত সুফী হযরত শাহ্ সৈয়দ নাছির উদ্দীন বোগদাদী আল-কাদেরী (রহঃ) এর অন্যতম শিষ্য এবং মজলুম জননেতা মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সতীর্থ। দাদা দীর্ঘ চল্লিশ বছর বাংলাদেশ ও ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের সেবায় আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও সত্য প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি বাংলা ১৩৬৫

Dhaka University Institutional Repository

সালে পরলোক গমন করেন। তাঁর সত্য, সংযম, ত্যাগ, কঠোর অধ্যাত্ম সাধনা, সেবা ও মানবকল্যাণের আদর্শ এবং মাওলানা ভাসানীর রাষ্ট্রচিন্তা আমাকে গভীরভাবে অনুপ্রাণীত করে এই গবেষণা কর্মে। তাঁদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি।

আমার গবেষণা কর্মে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান বইপত্র ও তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করেছে- আমি তাদের নিকট চিরকৃতজ্ঞ। বাংলাদেশে তথ্যানুসন্ধানের ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, দর্শন ও বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের সেমিনার, জাতীয় গ্রন্থাগার, ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নিকট আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। এছাড়া ভারতের কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, উদ্বোধন কার্যালয়, স্বামীজীর বাড়ী, শ্রীমা সারদা দেবীর জয়রাম বাটি, শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মস্থান কামার পুকুর ঠাকুর বাটি, শ্রীশ্রী ঠাকুরের বাগান বাটি, দক্ষিণেশ্বর, বেলুড় মঠ এবং হুগলী তারকেশ্বর মন্দির ও ঐতিহাসিক হিন্দু মেলা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ও লাইব্রেরীর নিকটও আমি ব্যক্তিগতভাবে ঋণী। ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের অধ্যক্ষ স্বামী অক্ষরানন্দ, স্বামী স্থিরাত্মানন্দ, স্বামী ভবেশ্বাত্মানন্দ এবং কলকাতা রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার-এর সেক্রেটারী স্বামী সর্বভূতানন্দ, শঙ্করী প্রসাদ বসু, বাগবাজার অদ্বৈতাশ্রম-এর অধ্যক্ষ স্বামী মুমুক্ষানন্দ, এছাড়াও উপরোক্ত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমার গবেষণা কর্মে উৎসাহ দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন। আমি তাদের সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে যাঁদের শিক্ষা ও প্রেরণা আমাকে গবেষণা কর্মে উদ্বুদ্ধ করেছে, গবেষণায় মনোবৃত্তি সৃষ্টি করেছে তাঁদের নিকট আমি চিরঋণী। তাঁরা হলেন দর্শন বিভাগের আমার শ্রদ্ধাভাজন শিক্ষক-শিক্ষিকা।

আমার শ্রদ্ধাভাজন প্রবীণ শিক্ষক ড. আব্দুল মতিন একদা ক্লাশে প্রশ্ন উত্থাপন করেন, "What is practical Philosophy?" দর্শন তত্ত্ব কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ সম্ভব? এ প্রশ্নের উত্তর লিপিবদ্ধ করতে গিয়েই তৈরী হয়েছে আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভ। আমার শিক্ষাচার্যের কথা আমাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর প্রতি আমি চিরকৃতজ্ঞ। দেশের প্রখ্যাত দার্শনিক ড. আমিনুল ইসলাম মানবতাবাদী দর্শন ও দার্শনিক চিন্তাধারা লেখনী, পাঠদান ও জনসভায় বক্তৃতার মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নিকট জনপ্রিয় করে তোলেন। আমি তাঁর সাথে বিভিন্ন সময়ে শ্রেণী কক্ষে, বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে, বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রাতঃভ্রমণ ও সান্ধ্যকালীন ভ্রমণের সময় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রেম, প্রজ্ঞা ও দর্শনের ভূমিকা নিয়ে কথা বলেছি। তিনি অত্যন্ত আগ্রহের সাথে আমার প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন এবং গবেষণা কর্মে উৎসাহিত করেছেন। আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁর দীর্ঘায়ু কামনা করছি। এম. আবুল কাশেম ও ড. এ.কিউ. ফজলুল ওয়াহিদ আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রভুদর্শনে গভীর আধ্যাত্মিক সাধনা এবং মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় মুসলিম দর্শন চর্চার ব্যাপক প্রয়োজনীয়তার বিষয় শিক্ষা দেন। তাঁদের গভীর ও দূরদর্শী দর্শন চিন্তা আমার গবেষণা কর্মে অনুপ্রাণিত করে। আমি তাঁদের আন্তরিকতার সাথে স্মরণ করছি। প্রয়াত ড. আব্দুল জলিল মিয়ার মেটাফিজিক্স শিক্ষা আমাকে দিয়েছে পরমসত্তা অনুসন্ধানের প্রেরণা, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও বিশ্ববৈচিত্র্যের ধারণা। মহান আল্লাহ্ তাঁকে বেহেস্ত দান করুন। ড. নীরুকুমার চাকমার ভাষা বিশেষণী দর্শন ও অস্তিত্ববাদের শিক্ষা আমাকে নতুন জ্ঞান রাজ্যের ধারণা দেয়। তাঁর অস্তিত্ববাদের ক্লাশে প্রবেশ করলেই আমার মন বলতো "আত্মাই অস্তিত্বের ভিত্তি"। প্রতিকূল পরিবেশের কঠিন জীবন সংগ্রামে তাঁর অস্তিত্ববাদের আনন্দদায়ক শিক্ষা মানুষের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, মর্যাদা ও মূল্যবোধ সৃষ্টির ধারণা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর গভীর জ্ঞানানুরাগ, আন্তরিকতা ও বিনম্র আচরণের জন্য শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি।

ড. আনিসুজ্জামানের রাষ্ট্রদর্শন ও একবিংশ শতাব্দীতে মানবকল্যাণ সাধনের জন্য সহনশীল আচরণ ও বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার শিক্ষা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এ কারণে ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে বহুত্ববাদী সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলবে। তাঁকে আমি সশ্রদ্ধ স্মরণ করছি। ড. শাহ্ কাওসার মুস্তাফা আবুলওয়ালী একদা

Dhaka University Institutional Repository

Political philosophy ক্লাশে বলেন, "তোমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাই তো দেশের সমস্যা নিয়ে ভাববে, দেশের উন্নয়ন করবে। তোমরা ছাড়া এদেশ নিয়ে আর কে ভাববে?" তাঁর এই শিক্ষা ও প্রেরণা আমাকে গবেষণা কর্মের মাধ্যমে জাতীয় কল্যাণ ভাবনায় উদ্বুদ্ধ করেছে। তাঁর প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। ড. গালিব আহসানের বিজ্ঞান মনস্কতা এবং ভারতীয় দর্শনের যৌক্তিক, জ্ঞান তাত্ত্বিক, নৈতিক এবং মানবকল্যাণ সাধনের শিক্ষা আমার মনে গভীর রেখাপাত কের। তাঁর "Theory of interpretation" দর্শনের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা আমাকে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। আমি তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। ড. শাহজাহান মিয়ার যুক্তিবিদ্যা ও ম্যুর-এর দর্শন শিক্ষা আমাকে গভীর জ্ঞানতত্ত্বের সন্ধান দেয়। ম্যুর্-এর Sense data ও জ্ঞানতত্ত্ব আমার গবেষণা কর্ম ও বিচার বিশ্লেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ড. হারুনার রশীদ কান্টের জ্ঞানতত্ত্ব, রাষ্ট্রদর্শন, কমিউনিজমের ধারণা এবং মানবকল্যাণ সাধনের শিক্ষা দিয়ে আমাকে গবেষণা কর্মে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি। ড. সালাহ উদ্দীনের রূপতত্ত্ব শিক্ষা একটি জটিল জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা- যা আমার গবেষণা কর্মে সহায়ক হয়েছে। তাঁকে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। ড. প্রদীপকুমার রায় পিটার সিঙ্গারের নীতিবিদ্যা মানুষ ও প্রাণীর প্রতি যথার্থ কর্তব্য পালনের শিক্ষা দিয়ে আমাকে গবেষণা কর্মে উপাত্ত যুগিয়েছেন।

ড. আজিজুন্নাহার ইসলামের প্রাচীন ও মধ্যযুগের পাশ্চাত্য দর্শন শিক্ষা আমাকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। দার্শনিকগণের জীবন, পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং যুক্তি ও দর্শন চিন্তা- এসব শিক্ষা আমার গবেষণা কর্মের পাথেয় হিসেবে কাজ করেছে। এ কারণেই আমার গবেষণা কর্মে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য। অধ্যাপক মিসেস হোসনে আরা আলম Plato-এর দর্শন পড়ানোর সময় আমি প্লেটোর মতো সমস্যা সঙ্কুল বাংলাদেশকে নিয়ে একটি সুন্দর কল্যাণমূলক স্বর্গরাজ্যের কল্পনা করি। তাঁর দর্শন শিক্ষা ও চিন্তা আমার গবেষণা অভিসন্দর্ভে স্থান পেয়েছে। ড. হাসনা বেগমের নীতিবিদ্যা মানবতাবাদ, মানবেতর প্রাণীর মুক্তি ও মানুষের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব ও আচরণের শিক্ষা আমাকে গবেষণা কর্মের মাধ্যম মানবকল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধ করেছে। আমি তাঁর নিকট ঋণী। মিসেস আয়েশা সুলতানা বার্ট্রাণ্ড রাসেলের দর্শন শিক্ষা দিয়ে আমাকে গভীর বিশ্লেষণী চিন্তার ধারণা দেন যা গবেষণা কর্মের পাথেয়। মিসেস রওশন আরা'র শিক্ষাদর্শন 'সুখ ও যেমন আমাদের শিক্ষা দেয়, তেমনি দুঃখও আমাদের শিক্ষা দেয়।' তাঁর সুখ-দুঃখের শিক্ষাদর্শন নিয়েই সদ্য প্রয়াত পিতার বেদনা বক্ষে ধারণ করেই গবেষণা কর্ম চালিয়েছি। তাঁর দর্শন দুঃখের মাঝেও আমাকে প্রেরণা দিয়েছে। রাশিদা আখতার খানম-এর যুক্তিবিদ্যা, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা, নারীবাদ এবং গবেষণার নিয়ম-নীতি শিক্ষা আমার গবেষণা কর্মে মূল্যবান তথ্য দিয়েছে। তাঁর শিক্ষা, কোমল শাসন ও আন্তরিক সহযোগিতা আমার গবেষণায় অগ্রগতি সাধন করেছে। তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। অন্যতম শিক্ষক আবুল খায়ের মোঃ ইউনুস গভীর আন্তরিকতার সাথে আমাকে গবেষণা কর্মে উৎসাহ, তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। এছাড়াও দর্শন বিভাগের অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিভাগীয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ আমাকে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন- আমি সকলকেই কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের প্রধান ড. নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী আমাকে গবেষণা কর্মে উৎসাহ দিয়েছেন। বিশ্বভারতী ইউনিভার্সিটির দর্শন বিভাগের শিক্ষিকা সবুজকলি সেনমিত্র আমাকে বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের দর্শনতত্ত্ব ও দিক-নির্দেশনা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক, আমার বন্ধুবর ড. আব্দুল্লাহ্ আল-ফারুক আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি থেকে শুরু করে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জ্ঞানচর্চ ও গবেষণা কর্মে সহযোগিতা করেছেন। আমাকে গবেষণা কর্মে আরও প্রেরণা দিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহপাঠী বন্ধু-বান্ধব, ছোট-বড় ভাই ও বোনেরা এবং বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ। আমার গবেষণা কর্মে আরও উৎসাহ ও সুযোগ দিয়েছে আমার অত্যন্ত স্নেহের ছোট ভাই ও বোনেরা এবং আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও বন্ধু-বান্ধব। আমি তাদের সকলের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ।

Dhaka University Institutional Repository

মহাজীবন

"ওই মহামানব আসে।
দিকে দিকে রোমাঞ্চলাগে মর্ত্ত ধূলির ঘাসে ঘাসে,
সুরলোকে বেজে ওঠে শঙ্খ, নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক-
এল মহাজন্মের লগ্ন।

* * *

অগ্নি শিখা এসো এসো, আনো আনো আলো।
দুঃখে সুখে ঘরে ঘরে গৃহদীপ জ্বালো।
আনো শক্তি, আনো দীপ্তি, আনো শান্তি, আনো তৃপ্তি,
আনো স্নিগ্ধ ভালোবাসা, আনো নিত্য ভালো।"

* * *

"কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে
তুমি ধরায় আস
সাধক ওগো প্রেমিক ওগো পাগল ওগো
ধরায় আস।"

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Dhaka University Institutional Repository

যোগীর চক্ষু

শ্রীরামকৃষ্ণ (মণি অর্থাৎ মাষ্টার মহাশয়ের প্রতি)- যোগীর মন সর্বদাই ঈশ্বরেতে থাকে,- সর্বদাই ঈশ্বরেতে আত্মস্থ। চক্ষু ফ্যাল্‌ফেলে, দেখলেই বুঝা যায়। যেমন পাখী ডিমে তা দিচ্ছে- সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নামমাত্র চেয়ে রয়েছে। আচ্ছা, আমায় সেই ছবি দেখাতে পার? মণি- যে আজ্ঞা, আমি চেষ্টা করবো যদি কোথাও পাই।

* * *

কি-জান- যিনিই নিরাকার, তিনিই সাকার। ভক্তের চক্ষে তিনি সাকাররূপে দর্শন দেন। যেমন অনন্ত জলরাশি। মহাসমূদ্র। কূল-কিনার নাই, সেই জলের কোন কোন স্থানে বরফ হয়েছে; বেশী ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তিহিমে সাকাররূপ দর্শন হয়।

১৮৮২-২৪ আগষ্ট, দক্ষিণেশ্বর
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

জনসেবা, গণচেতনা, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অধ্যাত্ম শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রণালী রচনার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগস্রষ্টা, চিন্তানায়ক ও সাধক মহাপুরুষ। তিনি জ্ঞানপিপাসু, শান্তিকামী ও মুক্তি সন্ধানী মানুষের নিকট পরম শ্রদ্ধার পাত্র। স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২) ধর্মের পথে সমাজ সংস্কারের মাধ্যমে ব্যাপক মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দর্শন-বিজ্ঞান-ইতিহাস প্রভৃতি বিষয়ে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। বিবেকানন্দ এদেশের অজ্ঞ, দরিদ্র ও পরাধীন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেন আত্ম-মর্যাদাবোধ, স্বাধিকার চেতনা ও জাতীয়তাবোধ। তিনি মানুষের কল্যাণ ও আত্মার মুক্তি লাভের জন্য ধর্মের আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তিতে রচনা করেন তাঁর সকল দর্শন। তিনি বলেন, সকল শিক্ষা, শান্তি, ঐক্য, উন্নতি, প্রগতি ও সভ্যতার মূল হচ্ছে "আধ্যাত্মিক শিক্ষা"। তাহলে এই আধ্যাত্মিক জ্ঞান বা শিক্ষা কি?

দেহ ও আত্মার সমন্বয়েই মানুষ। মানব দেহ কতকগুলো রাসায়নিক পদার্থের সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়। অপরদিকে আত্মা হলো এক প্রকার অদৃশ্য শক্তি, যার উপস্থিতিতে জীবদেহে চলাফেরা, খাদ্য গ্রহণ, বংশ বৃদ্ধি প্রভৃতি কার্য সম্পন্ন হয়। এই অশরীরী আত্মাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না। আর এই আত্মা সম্পর্কে যে জ্ঞান তা-ই হলো আধ্যাত্মিক জ্ঞান। এই আত্মা হলো এক অসীম ব্রহ্মের অংশ, জোতির্ময়, নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ ও মুক্ত। আত্মাকে জানলেই সব জানা যায়। এ কারণে সক্রেটিস বলেন, নিজেকে জান (know thyself)। পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিজ্ঞান প্রভৃতির মত অধ্যাত্ম বিজ্ঞানও একটি বিশাল জ্ঞানরাজ্য। একারণেই বিবেকানন্দ তাঁর *'রাজযোগ'* গ্রন্থকে 'ধর্ম বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করেন। আধ্যাত্মিক বিজ্ঞান বা আধ্যাত্মিক জগতে আত্মার উৎপত্তি, প্রকৃতি, স্বরূপ ও মুক্তি লাভের বৈজ্ঞানিক প্রণালী বর্ণনা করা হয়। সাধক ধ্যানলব্ধ অবস্থায় স্বজ্ঞার মাধ্যমে আধ্যাত্মিক জগতে বিচরণ করে আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শনে অনন্ত জ্ঞান, শাশ্বত আনন্দ ও দুঃখ থেকে চিরমুক্তি লাভ করেন। বিবেকানন্দ বলেন, আত্মার ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করা ও মুক্ত হওয়াই মানব জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য।

আধ্যাত্মিক শিক্ষা বাদ দিয়ে, আত্মাকে অস্বীকার করে কোন প্রকার শান্তি, প্রগতি ও সভ্যতা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বিবেকানন্দ চেয়েছেন, সমাজের অশিক্ষা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা ও অপসংস্কৃতি প্রভৃতি কারণে সৃষ্ট প্রতিকূল পরিবেশের সকল বাধা অতিক্রম করে মানুষ যাতে সঠিক জ্ঞান ও সত্যানুসন্ধান করে আত্মার প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে। এতেই মানুষের মুক্তি। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দার্শনিকগণের মতই বিভিন্ন মতবাদ বিচার-বিশ্লেষণ ও গবেষণা করে রচনা করেছেন তাঁর সমন্বয়ী দর্শন। জগৎ ও জীবনের এমন কোন দিক নেই, যে দিকে তিনি আলোকপাত করেননি। তিনি সার্থক ও সুন্দর জীবনের জন্য ভারতের আধ্যাত্মিকতা ও পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানের সমন্বয় সাধনের কথা বলেন। বিবেকানন্দ সংসার ত্যাগী হয়েও সংসার ধর্মের প্রতি গুরুত্ব দেন এবং চিন্তা ও কর্মের সমন্বয় সাধন করেন, যাকে বলা হয়, "Practical Vedanta". শ্রীগুরু রামকৃষ্ণের বিভিন্ন ধর্ম সমন্বয়ের প্রভাবে তিনি সার্থক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য গড়ে তোলেন মানবতাবাদী দর্শনের সুউচ্চ সৌধ। স্বামীজী আদর্শ জীবনের জন্য এবং জীবনের পরম লক্ষ্য মুক্তি অর্জনের জন্য ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, শিক্ষানীতি প্রভৃতি বিষয়ে সমন্বয় সাধন করেন, যাতে মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধান করে পরম লক্ষ্যে অগ্রসর হতে পারে।

মানবকল্যাণ হলো সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্ত শ্রেণীর মানুষের কল্যাণের জন্য গৃহীত বিভিন্ন রকম প্রচেষ্টা। যেমন– অন্নহীনে অন্নদান, আশ্রয়হীনে আশ্রয়দান প্রভৃতি মানবকল্যাণ নামে আখ্যায়িত হয়। বিবেকানন্দ বৃহৎ জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর মানবকল্যাণ সম্পর্কে অমূল্য আদর্শ হলো, জীবে দয়া নয়, শিব জ্ঞানে জীবসেবা। বিবেকানন্দ দুঃস্থ, অসহায়, নিরন্ন, নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয় ও সান্ত্বনা দেন এবং মুক্তির পথ প্রদর্শন করেন। মানবকল্যাণের উৎস সমাধি। সাধক সাধনায় জ্ঞানাতীত অবস্থায় উপনীত হয়ে যে দৈববাণী বা অধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন, তাই মানবকল্যাণ সাধনের উৎস ও প্রেরণা। এ কারণেই শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, যীশুখ্রীষ্ট, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রমুখ জগতের মহাপুরুষগণ

Dhaka University Institutional Repository

নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সেবা প্রভৃতি মানব কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আত্মার মুক্তি বা ঈশ্বরদর্শন লাভের পথ নির্দেশ করেন। মানবকল্যাণ সাধনে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে নিজেরই কল্যাণ সাধন হয়।

প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দার্শনিক, চিন্তাবিদ মানবকল্যাণের কথা বলে এসেছেন। কিন্তু কিভাবে মানবকল্যাণ সাধন সম্ভব? এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, সংঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হয় না। তাই তিনি বিশ্বব্যাপী মানবকল্যাণ সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন"। বিবেকানন্দের এই বিশ্বজনীন ও সর্বজনীন আধ্যাত্মিক শিক্ষার আলোকেই বাংলাদেশ ও বিশ্বে ঐক্য, প্রগতি, শান্তি ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য গড়ে তোলা প্রয়োজন যুগোপযোগী এক অনন্য প্রতিষ্ঠান "বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউণ্ডেশন (World Divine Philosophy Foundation)"। ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ এই প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের মত যুগ যুগ ধরে মানবকল্যাণে জ্ঞান, সত্য, শান্তি, মৈত্রী এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য অবিরাম কাজ করবে। এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য ও সেবকগণ ঈশ্বরদর্শন বা মুক্তির লক্ষ্যে সুশৃঙ্খলভাবে আন্তরিকতার সাথে মানবকল্যাণ সাধনের ব্রত গ্রহণ করবেন।

জাতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য একটি জাতীয় মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন প্রয়োজন। বাংলাদেশের অবনতির অন্যতম কারণ হলো একটি জাতীয় মহাপরিকল্পনার অভাব এবং নৈতিক অবক্ষয়। জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনার প্রধান দুটি অংশ হলো– ১. দেশের সার্বিক ও স্থায়ী উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একজন স্থায়ী প্রতিনিধি বা রাজা এবং ২. গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। আধুনিক গণতান্ত্রিক বিশ্বেও রাজতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণেই বৃটেন, জার্মান, জাপান, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশের জনগণ গণতন্ত্রের পাশাপাশি রাজতন্ত্রও টিকিয়ে রেখেছে। একজন স্থায়ী রাজ প্রতিনিধি ত্যাগ ও আন্তরিকতার সাথে স্থায়ীভাবে নিজ দেশের উন্নয়ন করেন। এ কারণে সঠিকভাবে দেশ পরিচালনার জন্য প্লেটো *'দি রিপাবলি"* গ্রন্থে দার্শনিক রাজার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক বিপ্লব। এই বিপ্লব মানুষের মনে পরিবর্তন আনবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, ভারতের যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করার চেষ্টা করা হোক, প্রথমতঃ ধর্ম প্রচার আবশ্যক। ভারতে সামাজিক বা রাজনৈতিকভাবের সংস্কার করতে হলে প্রথমে এ দেশের আধ্যাত্মিক ভাবের উন্নয়ন ঘটাতে হবে।

সমাজ সংস্কার একটি বৃহত্তম ও নিরলস দীর্ঘ প্রচেষ্টার কাজ। সমাজ সংস্কার করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন সমাজ সেবক বা সংস্কার কর্মী। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, সমাজ সংস্কার যারা চায়, তারা কোথায়? আগে তাদের প্রস্তুত কর। সংস্কার প্রার্থী লোক কোথায়? সমাজ সংস্কারকগণকে গভীরভাবে সমাজের সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করে সমাধানের পথ তৈরী করতে হবে। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রয়োজন একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, আর এই ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য একটি দল গঠন করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর; বিধান আপনি-আপনি আসবে। প্রথমে যে শক্তি বলে যার অনুমোদনে বিধান গঠিত হবে, তার সৃষ্টি কর। প্রথমে সে লোক শক্তি গঠন কর। আধ্যাত্মিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় স্বনির্ভর দেশ গড়ার প্রজ্বলিত সূর্য সৈনিক। বিবেকানন্দ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ত্যাগী মানুষ গড়তে চেয়েছেন। যাঁদের স্নায়ুগুলো হবে ইস্পাতের মতো মজবুত, পেশীগুলো হবে লোহার মত দৃঢ় এবং যাদের মন হবে যন্ত্রের মত কঠোর। তাঁরা হবেন ত্যাগী, পবিত্র, চরিত্রে উন্নত এবং সংকল্পে অটল। বিবেকানন্দের মতে, তাঁদের থাকবে ইসলামী দেহ ও বৈদান্তিক মস্তিষ্ক। এই আদর্শ মানুষই হবে সমাজের সকল মানুষের সেবক, তাঁরাই হবে সমাজের শান্তি, প্রগতি ও স্বাধীনতার অগ্রনায়ক।

বিবেকানন্দ মানুষের দুঃখে শুধু চোখের জলই ফেলেননি, তিনি বৃহত্তর, জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধনের জন্য, মানবতাবাদী দর্শন ব্যাপক ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য রচনা করেন রাষ্ট্রদর্শন। মানুষ রাষ্ট্র নামক বৃহৎ পরিবারের সদস্য। রাষ্ট্র মানুষের ধর্ম, অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ন্ত্রণ করে। রাষ্ট্রের সু-ব্যবস্থা ও সুশাসন মানুষকে গড়ে তোলে আদর্শবান মানুষ, যারা সুখে-শান্তিতে সমাজে বসবাস করে। বিবেকানন্দ ছিলেন কর্মযোগে বিশ্বাসী একজন প্রগতিশীল সাম্যবাদী দার্শনিক। তাই তিনি ধনী বুর্জোয়া শ্রেণীর জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সামাজিক শোষণ ও নির্যাতনের বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেক মানুষের সুখে থাকার অধিকার রয়েছে, অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা অমার্জনীয় অপরাধ। মানুষের মুক্তির জন্য স্বামীজীর রাষ্ট্রদর্শনের প্রথম ধাপ ছিল যোগ্য নেতৃত্ব ও সংগ্রামের মাধ্যমে পরাধীন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সূর্য ছিনিয়ে আনা। তাঁর রাষ্ট্রদর্শনের দ্বিতীয় ধাপ হলো, শোষিত, নির্যাতিত কৃষক, মজুর

Dhaka University Institutional Repository

প্রভৃতি শূদ্র শ্রেণীর বিপ্লবের মাধ্যমে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা। এতে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সমষ্টির কল্যাণ উভয়ই নিহিত থাকবে। বিবেকানন্দ বলেন, আমি একজন সমাজতন্ত্রী। তাঁর সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য প্রত্যেকের বেঁচে থাকার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সবার জন্য নূন্যতম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা। জাতি-ধর্ম-বর্ণ, বিভেদ-বৈষম্যের কারণে ভারতবর্ষের অধঃপতন ও অবক্ষয় থেকে রক্ষার জন্য তিনি 'দিব্য সমাজ (Divine Society)' গড়তে চেয়েছেন। অনুকূল পরিবেশ ছাড়া আধ্যাত্ম জ্ঞান অনুশীলন কষ্টসাধ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। তাই বিবেকানন্দ চেয়েছেন দিব্য সমাজ হবে সকল অভাবমুক্ত অধ্যাত্ম জ্ঞান অনুশীলনের অনুকূল পরিবেশ, যেখানে মানুষ হয়ে উঠবে দেবতা।

এদেশের গ্রামবাসী সহস্র বছর ধরে ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অভাব-অনটন, দ্বন্দ্ব-সংঘাত প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত হয়ে দুর্বিসহ জীবন-যাপন করছে। তাই আমাদের প্রথম কাজ হলো বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্র দর্শনের ভিত্তিতে অভাবমুক্ত স্বনির্ভর গ্রাম বা দিব্য সমাজ (Divine Society) গড়ে তোলা। বিবেকানন্দ বলেন, গ্রামই জাতীয় জীবনের ভিত্তি। গ্রামের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি। এ কারণেই বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লার স্থায়ী উন্নয়ন। দেশের প্রত্যেকটি গ্রামে "স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়" স্থাপনের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম বা মহল্লার স্থায়ী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ ও শান্তি-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করা হলে সহজেই এদেশের উন্নয়ন সম্ভব হবে। প্রতিটি গ্রামের মানুষ খুব সহজেই নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করে দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর গ্রাম ও স্বনির্ভর দেশ গড়ে তুলতে পারে। স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়ে সেবাকর্মী বা গ্রাম সৈনিকগণ গ্রামের উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। তাঁরা গ্রামবাসীর অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান, নিরাপত্তা, ধর্ম, সংস্কৃতি, মাদকাসক্তি নিরাময় ও বিচারকার্য পরিচালনা করবেন। প্রতিটি গ্রামই হবে একটি স্বনির্ভর ক্ষুদ্র রাষ্ট্র।

অন্তহীন দুঃখের সমুদ্র এই পৃথিবী। তাই তো মহামতী গৌতম বুদ্ধ বলেছেন- এ জগৎ দুঃখময়। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত হলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনে সমাজে এবং দেশের সর্বস্থানে রয়েছে অসংখ্য বিপদগ্রস্ত বেদনাক্লীষ্ট এবং অনাহারী মানুষ। আমাদের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য ছিন্নমূল, গৃহহীন, অসহায়, বিকলাঙ্গ, উন্মাদ, নিঃস্ব, এতিম, অধঃপতিত, অত্যাচারিত, গরীব-দুঃখী সর্বহারা মানুষ। এছাড়াও ভিক্ষুক, নদীভাঙ্গা মানুষ, উদ্বাস্তু, হিজড়া, পতিতা প্রভৃতি নিরাশ্রয় মানুষদের প্রয়োজন একটি শান্তির আশ্রয়। আরও প্রয়োজন আমাদের সমাজে উপেক্ষিত ও অবহেলিত বৃদ্ধ পিতা-মাতার জন্য বৃদ্ধ আশ্রম। এ কারণে এদেশের সভ্য সমাজের মানুষের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠবে দুঃখী মানুষের একটি আশ্রয় "ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্র"। এদেশের অপরাজেয় সেবা সৈনিকগণ পুনর্বাসন কেন্দ্রে দুঃখী মানুষদের আশ্রয় দিবে। তাদের সুন্দর ও কল্যাণমূলক জীবনের জন্য শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, ধর্ম, সংস্কৃতি প্রভৃতির ব্যবস্থা করবে। এ প্রতিষ্ঠান চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, মাদকাসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি প্রভৃতি দমন করে সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করবে। বন্ধু প্রতীম এ প্রতিষ্ঠান আত্মহত্যাসহ বিভিন্ন অনাকাঙ্ক্ষিত ও অসামাজিক কার্যকলাপ, অন্যায়-অবিচার, দুর্নীতি ও যে কোন বিপদের ঝুঁকি থেকে মানুষকে রক্ষা করবে, বাঁচার জন্য বিভিন্নভাবে সাহায্য করবে।

বিবেকানন্দের মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস বিশ্বব্যাপী। তিনি জাতীয়তার বাঁধ ভেঙ্গে ছড়িয়ে পড়েন আন্তর্জাতিক বিশ্বে। তাঁর আন্তর্জাতিক কল্যাণ ভাবনার স্পষ্ট রূপরেখা ফুটে উঠে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর মাধ্যমে। রামকৃষ্ণ মিশনের শাখা রয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে। তিনি বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে ১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে "বিশ্বধর্ম সভায়" আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দিয়ে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই ভাষণে তিনি বলেন, বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মত বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি। তিনি আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার জন্য একটি সর্বজনীন ধর্মের কথা চিন্তা করেন, যে ধর্মের নীতিগুলো সকল সম্প্রদায়ের মানুষ গ্রহণ করবে।

মানব জীবনের একটি অন্যতম জটিল সমস্যা হলো ঈশ্বরদর্শন। ঈশ্বরদর্শন মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। কারণ আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন লাভ হলেই জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ থেকে আত্মা অনন্তকালের জন্য মুক্তি লাভ করে। ঈশ্বর এই জগতের স্রষ্টা, তিনি অনন্ত, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পরম কারুণিক, গুরুর গুরু। তিনি শুদ্ধ নিরাকার সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। তাঁর করুণা সকলের উপর। প্রতিটি আত্মা পরমেশ্বরের অংশ। যেমন সূর্য এক, এর প্রতিবিম্ব সূর্য অসংখ্য। একই আত্মার

Dhaka University Institutional Repository

দুটি দিক রয়েছে, জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবের যে চলা-ফেরা, খাদ্যগ্রহণ ও বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি জৈবিক বৈশিষ্ট্য জীবাত্মার কাজ, আর পরমাত্মা হলেন স্বয়ং ঈশ্বর। যেন একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। সব ধর্ম-কর্ম সত্য-সংযম ও সাধনার উদ্দেশ্য হলো জীবাত্মাকে প্রশিক্ষণ দিয়ে পরমাত্মার সাথে মিলনের মাধ্যমে একাত্ম হওয়া। সাধকের একজন প্রকৃত গুরুর শিক্ষা ও সাধনায় স্বজ্ঞার মাধ্যমে দিব্য জ্ঞানের (Divine Knowledge) উদয় হয়। এ অবস্থায় সাধক বিভিন্ন অলৌকিক বিষয় দর্শন করেন। তিনি এসব অলৌকিক দৃশ্য অতিক্রম করে এবং লোভ-লালসা, ভোগ-বিলাস ও পাশবিক বৃত্তিসমূহ দমন করে ধৈর্যের সাথে পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশের সকল বাধা অতিক্রম করে অবশেষে ঈশ্বরদর্শন লাভ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইসলাম, খ্রীষ্ট, বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম অনুশীলন করে একই পরমেশ্বরের দর্শন লাভ করেন। এ কারণেই সকল ধর্মের প্রতি বিবেকানন্দের গভীর শ্রদ্ধা।

আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন লাভ হলে অজ্ঞানতার আবরণ উন্মোচিত হয়ে সাধক অনন্তকাল শাশ্বত আনন্দ ও অনন্ত প্রেমের রাজ্যে বিচরণ করে। তখন তাঁর ক্ষুদ্র স্বার্থপর প্রেম সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়। তাই সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ছিলেন একজন বিশ্বপ্রেমিক। তাঁর প্রেমের প্রবল স্রোত দেশ-কাল-পাত্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি বাধা অতিক্রম করে উদ্দাম গতিতে বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়ে। গভীর প্রেমের পরিচয় ফুটে উঠেছে তাঁর 'সখার প্রতি' কবিতায়।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর !
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর ॥

বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ ত্যাগ ও সেবার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, মানব সেবা ও কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে। তিনি মানব প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে কলকাতায় প্লেগ রুগীদের সেবার উদ্দেশ্যে বহুকষ্টে কৃত বেলুড় মঠের জায়গা বিক্রি করতে উদ্যত হয়েছিলেন। তবে তাঁর এ সেবা কার্যে জমি বিক্রি করতে হয়নি। তাই তো তিনি কত বড় মহান প্রেমিক। বিবেকানন্দ প্রেমের ব্যাখ্যায় বলেন, যে শক্তি বলে অণু অণুর সাথে, পরমাণু পরমাণুর সাথে মিলিত হয় এবং পুরুষ নারীর দিকে, নারী পুরুষের দিকে আকৃষ্ট হয়, সে শক্তিই হলো প্রেম। স্রষ্টা তাঁর আনন্দরূপ সত্তাকে অভিব্যক্ত করেন সমগ্র সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে। আবার সৃষ্ট মানুষও স্রষ্টার আনন্দ লীলায় অংশগ্রহণ করে তার জ্ঞান-প্রেম-কর্মের মাধ্যমে। এদিক থেকে বিশ্বক্রিয়ার সঙ্গে ঐশীক্রিয়া ঘনিষ্টভাবে যুক্ত। মুসলিম দার্শনিক রুমী প্রেমের মাধ্যমে বিশ্বতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'পরিপূর্ণ ও অনন্ত সৌন্দর্যের মালিক আল্লাহ এবং প্রাতিভাসিক জগতের সব সুন্দর জিনিস আল্লাহর অনন্ত সৌন্দর্যের ক্ষণিক প্রতিফলন। পার্থিব সৌন্দর্যের সঙ্গে ঐশী সৌন্দর্যের পার্থক্য অনেকটা সূর্যের সঙ্গে সূর্যকিরণের পার্থক্যের মতো। এ জন্যই ক্ষণিকের পার্থিব সৌন্দর্যের মধ্যে প্রেমকে সীমাবদ্ধ না রেখে আমাদের উচিত সব সৌন্দর্যের উৎস পারমার্থিক সৌন্দর্যের লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া। প্রেম আবার একত্ব ও উপলব্ধি অর্জনের শক্তিস্বরূপ। এটি এমন এক আকর্ষণ শক্তির অধিকারী, যার ফলে এক বস্তুর প্রতি আরেক বস্তু আকৃষ্ট হয় এবং জীবনের বৃদ্ধি ও বিকাশে সহায়তা করে। বিশ্বতাত্ত্বিক নীতি হিসেবে এটি সব প্রাণের উৎস'। প্রেমের শক্তিতেই মানুষ মানুষের সাথে, জীব-জগৎ ও ঈশ্বরের সাথে একাত্মবোধ করে, উপলব্ধি করে বিশ্বের অখণ্ডতা বোধ।

মহান মানবতাবাদী দার্শনিক বিবেকানন্দ মানুষের ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণ সাধনে সচেষ্ট হয়েছেন। তিনি দুস্থ-দরিদ্র, অসহায়, ছিন্নমূল মানুষের শান্তিপূর্ণ জীবনের কথা ভেবেছেন। তাদের অন্ন-বস্ত্র-শিক্ষা, চিকিৎসা প্রভৃতি মানবিক চাহিদা পূরণের পথ নির্দেশ করেছেন। বিবেকানন্দের স্বপ্ন বিজ্ঞান ও ঐশীজ্ঞানালোকিত যুবসমাজ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে জাতীয় ও আন্ত র্জাতিক কল্যাণ সাধনে এগিয়ে আসবে। মানুষের মাঝে একই সর্বব্যাপী আত্মা, সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান। প্রতিটি জাতির ভাল দিকগুলি আত্মস্থ করে পরিণত হতে হবে বিশ্বমানবে। নতুন পৃথিবীর মানুষ কাজ করবে খাওয়ার জন্য নয়, ভোগের জন্য নয়। তার প্রতিটি কাজই হবে পরের কল্যাণে নিবেদিত। তখন তার নিকট কাজ আর কেবল 'কাজ' নয়। তার কাজ হবে 'উপাসনা' ও চিত্তশুদ্ধির উপায়। তখন মানুষের সমগ্র জীবনই পরিচালিত হবে পরম পুরুষার্থের প্রেরণায়। মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে তার সমগ্র জীবন ও সাধনা। মানব জীবন তখন দেব জীবনে রূপান্তরিত হবে। এই নতুন পৃথিবীর আহ্বানেই বিবেকানন্দের জীবন, বাণী ও ত্যাগ। বিবেকানন্দের এই আশা পূর্ণ হবে তখন, যখন মানুষ তার কামনা-বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাই বিবেকানন্দ চেয়েছেন ধর্মের উদ্বোধন, ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিকতার পথে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যখন দেখা দেবে, তখনই গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবী।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা নং

প্রথম অধ্যায় ঃ মানবকল্যাণ..... ১ – ১২

মানবকল্যাণের উৎস সমাধি...২ শ্রীরামচন্দ্র...৩ শ্রীকৃষ্ণ...৩ তীর্থঙ্কর মহাবীর...৩ গৌতমবুদ্ধ...৩ কফুসিয়াস...৪ যীশুখ্রীষ্ট...৪ জড়থুষ্ট্র...৪ হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)...৫ গুরু নানক...৫ শ্রীচৈতন্য...৬ দুর্গা পূজা...৬ শ্রীরামকৃষ্ণ...৬ শ্রীশ্রীমা সরদা...৭ স্বামী বিবেকানন্দ...৭ মানবকল্যাণের অন্তরায় অজ্ঞানতা ও মায়া...৯

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন..... ১৩–৩৩

নামকরণ...১৩ প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা...১৪ তাত্ত্বিক ভিত্তি...১৪ মহাজাতি সদন...১৭ ঐশীদর্শন বিশ্ববিদ্যালয়...১৮ আধ্যাত্মিক শক্তির বিদ্যুদাধার...১৯ সদস্যগণের শ্রেণীবিভাগ...২০ বিশ্ব সংগঠন...২০ নেতৃত্ব ও সঙ্ঘ পরিচালনা...২১ বাঁচার শিল্প...২২ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশিক্ষণ...২২ সদস্যগণের কর্তব্য ও আচরণ...২৩ বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের নির্দেশাবলী...২৩ ১. প্রধান কার্যালয়...২৪, ঐশী সংসদ...২৪ বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন পরিচালনা পরিষদ...২৫ ২. বিভাগীয় কার্যালয়...২৭ ৩. জেলা কার্যালয়...২৭ ৪. থানা কার্যালয়...৩০ ৫. ইউনিয়ন কার্যালয়...৩১ ৬. স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়...৩১

তৃতীয় অধ্যায়ঃ জাতীয় কল্যাণ ভাবনা..... ৩৪–৪৩

জাতীয় মহাপরিকল্পনা...৩৪ অভিভাবক বা রাজা...৩৪ জাতীয় উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব...৩৫ জাতীয় জীবনের অধঃপতনের কারণ...৩৬ দেশপ্রেম...৩৮ ঐক্য সাংগঠনিক শক্তি ও সংঘ...৩৯ দরিদ্র ও নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা...৩৯ ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা...৪০ জাতীয় পুনরুজ্জীবনের উপায়...৪০

চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রজ্বলিত সূর্য সৈনিক প্রশিক্ষণ..... ৪৪–৬৩

নেতৃত্বের বিকাশ...৪৪ ইচ্ছাশক্তির বিকাশ...৪৫ সদস্য সংগ্রহ...৪৬ প্রশিক্ষণ...৪৬ অধ্যাত্ম প্রতিভা...৪৭ আধ্যাত্মিক বিপ্লব...৪৭ অস্তিত্ববাদ...৪৭ কারিগরি প্রশিক্ষণ...৪৮ কর্মসূচি নির্ধারণ ও মূল্যায়ন...৪৮ মানবতাবাদী দর্শন...৪৯ বিবেকানন্দের আত্মপ্রতিষ্ঠা...৫১ মানবপ্রকৃতি অনুসন্ধান...৫২ পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ...৫২ সামাজিক সমস্যা...৫৩ বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মনুষ্যত্ব...৫৩ মনুষ্যত্ব বিকাশে জ্ঞানার্জন...৫৪ চরিত্র...৫৫ মানবকল্যাণে দর্শন...৫৬ মানবতাবাদী দর্শনে নারীজাগরণ...৫৭
প্রত্যেকেই মহান...৫৭ তেজস্বী কর্মবীর...৫৯

পঞ্চম অধ্যায় ঃ স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শন..... ৬৪–৮২

রাষ্ট্রদর্শনের উৎস...৬৪ পরাধীন ভারবর্ষ...৬৪ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিবেকানন্দের ভূমিকা...৬৬ ভারতীয় ঐতিহ্য প্রচার ও স্বনির্ভরতা অর্জন...৬৭ আমেরিকায় ভাষণের উদ্দেশ্য...৬৭ আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও সংগঠিতকরণ...৬৮ জাতীয়তাবাদের জনক...৭১
বীরসৈনিক প্রস্তুত...৭১ স্বাধীনতা সংগ্রাম...৭২ সমাজতন্ত্র...৭৩ সমাজতন্ত্রের মূলনীতি...৭৫ বিবেকানন্দ ও মার্ক্সের সমাজতন্ত্র...৭৬ ব্যক্তি স্বাধীনতা ভিত্তিক সমাজতন্ত্র...৭৭
শূদ্র বিপ্লব...৭৭ বিবেকানন্দের মতে বিপ্লব...৭৮ দিব্য সমাজ...৭৯

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়..... ৮৩–১২২
পল্লী গ্রামে হাজার বছরের নিভৃত কান্না...৮৩ প্রাচীন উন্নয়ন ধারা...৮৪ গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত...৮৫ স্বপ্নের পরিবার-স্বপ্নের গ্রাম...৮৫ গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ ও কমিটি...৮৬ গ্রামসৈনিক...৮৬ ১. প্রশাসন বিভাগ...৮৮ ২. অর্থ বিভাগ...৮৯ প্রত্যক্ষ সঞ্চয়...৯১ পরোক্ষ সঞ্চয়...৯৩ ৩. শিক্ষা বিভাগ...৯৪ শিক্ষা–৯৫ বাল্য শিক্ষা...৯৫ শিক্ষায় পিতা-মাতার প্রভাব...৯৬ শিক্ষকের কর্তব্য...৯৬ বিদ্যালয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ...৯৭ পাঠ্যসূচি...৯৭ ৪. কর্মসংস্থান বিভাগ...৯৮ ৫. কৃষি ও শিল্প বিভাগ...৯৯ শিল্প...১০০ ৬. চিকিৎসা বিভাগ...১০২ চিকিৎসা...১০৩ যোগব্যায়াম...১০৩ ব্রহ্মচর্য সাধন...১০৪ জল চিকিৎসা...১০৪ স্বরোদয় যোগ...১০৫ ঔষধ...১০৫ পরিবার পরিকল্পনা...১০৫ গর্ভবতী মহিলার পরিচর্যা...১০৬ ৭. ধর্ম বিভাগ...১০৬ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র...১০৬ মনুষ্যত্ব বিকাশ...১০৭ উদারনৈতিক ধর্মশিক্ষা...১০৭ কর্মমূখী শিক্ষা...১০৮ সেবা ও দেশপ্রেম শিক্ষা...১০৮ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান...১০৮ ৮.সংস্কৃতি বিভাগ...১০৯ গ্রন্থাগার...১০৯ কবিতা...১১০ নাট্যমঞ্চ...১১০ সঙ্গীত...১১০ নন্দনতত্ত্ব...১১১ শরীরচর্চা কেন্দ্র...১১২ বিবাহ নিবন্ধন বিভাগ...১১২ আত্মীয়তা সম্বন্ধ...১১৩ অপসংস্কৃতি রোধ...১১৩ নির্মল পরিবেশ...১১৩ ৯. মাদকাসক্তি নিরাময় বিভাগ...১১৩ মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ...১১৪ মাদকাসক্তির কুফল...১১৫ চিকিৎসা...১১৫ প্রতিকার...১১৫ পুনর্বাসন কেন্দ্র...১১৬ ১০. বিচার বিভাগ...১১৬ বিচার প্রক্রিয়া...১১৭

সপ্তম অধ্যায় ঃ ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্র..... ১২৩–১২৮
অপরাজেয় গ্রাম সৈনিক...১২৪ কেন্দ্র স্থাপনের শিক্ষা...১২৫ আত্মহত্যা ও অনাকাঙ্খিত কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ...১২৭ প্রার্থনা...১২৮

অষ্টম অধ্যায় ঃ আন্তর্জাতিক কল্যাণ ভাবনা..... ১২৯–১৪০
আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি...১৩২ বিভক্ত ধর্ম বিশ্বাসী...১৩৫ একটি সর্বজনীন ধর্ম...১৩৭

নবম অধ্যায় ঃ ঈশ্বরদর্শন..... ১৪১–১৭৭
আত্মা...১৪২ জীবাত্মা ও পরমাত্মা...১৪২ ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তর...১৪৩ গুরুদর্শন...১৪৪ মুক্তিতত্ত্ব...১৪৬ ঈশ্বরকে জানার তিনটি স্তর...১৪৬ ঈশ্বরদর্শনের তিনটি মূলনীতি...১৪৭ ১. প্রেম... ১৪৭ (ক) ঈশ্বরের প্রতি প্রেম...১৪৮ (খ) মানুষের প্রতি প্রেম...১৪৯ (গ) জীবের প্রতি প্রেম...১৪৯ প্রেমের লক্ষণ...১৫০ ২. পবিত্রতা...১৫১ সৎ উপার্জন ও খাদ্য গ্রহণ...১৫২ ৩. সাধনা...১৫৪ মন সংযম...১৫৫ ক্রমান্বয়ে মনের একাগ্রতা সাধন প্রক্রিয়া (চিত্র)...১৫৬ সাধনার দুটি স্তর...১৫৭ সাধনার স্থান...১৫৯ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন...১৫৯ মিলনের ভিত্তি...১৬০ শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান...১৬০ জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন (চিত্র)...১৬১ সাধনালব্ধ ঐশীজ্ঞান...১৬২ স্বজ্ঞা...১৬২ অলৌকিক দর্শন...১৬৩ জন্মলব্ধ অধ্যাত্ম প্রতিভা...১৬৫ আধ্যাত্মিক জগৎ (চিত্র)...১৬৪ সাধনালব্ধ অধ্যাত্ম প্রতিভা...১৬৫ ঈশ্বরদর্শনের অদৃশ্য পথঃ এক অগ্নীপরীক্ষা...১৬৫ আত্মার ক্রমিক মিলন...১৬৭ পূর্ণ মিলন...১৬৮ সমাধির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ...১৬৯ ঐশীজ্ঞানের উৎস সমাধি...১৬৯ সর্বজনীন সমাধির মূলে গভীর প্রেম...১৭০ যুক্তির মানদণ্ডে সমাধি...১৭১ মুক্ত আত্মা...১৭২ ঈশ্বরদর্শন (একটি কবিতা)...১৭৩

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায় ঃ বিশ্বপ্রেম..... ১৭৮–১৮৫

ত্যাগ ও সেবা...১৭৮ প্রেম কি?...১৭৯ একই ঈশ্বরের বিচিত্র প্রকাশ...১৮০ পরমাত্মাই প্রেমের উৎস...১৮১ শাশ্বত প্রেমই আনন্দ স্বরূপ...১৮২ ব্রহ্ম হতে সৃষ্টি ব্রহ্মেই লয়...১৮২ ভাল ও মন্দ-একই পরমাত্মার প্রকাশ...১৮৩ সুখ, শান্তি ও প্রেম-একই ঈশ্বরের প্রকাশ...১৮৩

উপসংহার ঃ ১৮৬–১৮৯

গ্রন্থপঞ্জি ঃ ১৯০–১৯৬

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

মানবকল্যাণ

ইংরেজী *'Human Welfare'* শব্দ দু'টির বাংলা অর্থ যথাক্রমে 'মানব' ও 'কল্যাণ'। কল্যাণ প্রত্যয়টি একটি আপেক্ষিক মানসিক অবস্থাকে (*a state of mind*) নির্দেশ করে। মানবকল্যাণ বলতে সমাজের দুঃস্থ, অসহায় ও অসুবিধাগ্রস্থ শ্রেণীর কল্যাণের নিমিত্তে গৃহীত সব ধরণের প্রচেষ্টাকেই বুঝানো হয়। যেমন আর্তের সেবা করা, অন্নহীনে অন্নদান, আশ্রয়হীনে আশ্রয়দান প্রভৃতি মানবকল্যাণ নামে আখ্যায়িত হয়। মানবকল্যাণ সম্পর্কে *W.A. Friedlander*-এর প্রমাণ্য সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেন, মানব বা সমাজ কল্যাণ হলো ব্যক্তি বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমাজ সেবা প্রদানের এমন এক সুসংগঠিত কার্যপদ্ধতি যার লক্ষ্য ব্যক্তি ও দলকে সন্তোষজনক জীবন ও স্বাস্থ্যমান অর্জনে সহায়তা করা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক সম্পর্ক উন্নত করে তাদের অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণ বিকাশ সাধন করা এবং পরিবার ও সমাজের প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কল্যাণের পথকে সহজতর করা।

অপার অসীম এই বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড বিপুল রহস্যপূর্ণ। এখানে ক্ষণস্থায়ী মানব জীবনের উৎপত্তি, জীবনের লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের উপায়, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের অবস্থান প্রভৃতি বিষয় অনুসন্ধান করে মানবকল্যাণের জন্য পথ প্রদর্শন করা একমাত্র দূরদর্শী, গভীর প্রজ্ঞাপ্রেমিক ও বিজ্ঞানমনস্ক সাধক মহাপুরুষের পক্ষেই সম্ভব। এমনই একজন মহাপুরুষ এই বসুন্ধরায় জন্মগ্রহণ করেন যিনি বিশ্বের বিস্ময় স্বামী বিবেকানন্দ (১৮৬৩-১৯০২)। জনসেবা, গণচেতনা, স্বাধীনতা সংগ্রাম ও অধ্যাত্ম শিক্ষার বৈজ্ঞানিক প্রণালী রচনার মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনের প্রয়াসের জন্য স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক যুগস্রষ্টা, চিন্তানায়ক ও সাধক মহাপুরুষ। বিবেকানন্দ এ দেশের অজ্ঞ, দরিদ্র ও পরাধীন মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করেন আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাধীকার চেতনা ও জাতীয়তাবোধ।

স্বামী বিবেকানন্দ এক সর্বজনীন আধ্যাত্মিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন মানবকল্যাণ ও মানবতাবাদী দর্শন। কারণ ইতিহাসে দেখা যায় সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক ভিত্তি ছাড়া কোথাও স্থায়ী মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়নি। 'ঈশ্বরকে একমাত্র লক্ষ্যবস্তুরূপে নির্দেশ করে স্বামীজী বিশ্বজগতের নিয়ন্তারূপে এক অদৃশ্য শক্তির শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করেছেন। কোনও আধ্যাত্মিক ভিত্তি বা আধ্যাত্মিক চরম লক্ষ্য ব্যতিরেকে সামাজিক কল্যাণ বা ব্যক্তির মুক্তি সঠিক পথে চালিত হতে পারে না। এমন অনেক রাজনৈতিক ব্যবস্থাও দেখা গেছে যেখানে লক্ষ্যকে গৌণ করে উপলক্ষ্যকেই প্রধান করে তোলা হয়েছে এবং পরিনামে ঘটেছে পতন ও চরম বিশৃঙ্খলা। এ ব্যাপারটির পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া আমাদের পক্ষে মারাত্মক ভুল হবে। একমাত্র আধ্যাত্মিক সচেতনতাই আমাদের অভিন্নরূপে ধরে রাখতে পারে এবং মানব জাতির অস্তিত্বকে সুনিশ্চিত করতে পারে। বিবেকানন্দ কোনও বিশেষ ঈশ্বরের উপর প্রাধান্য আরোপ করেননি বরং বলেছেন সমগ্র মানব সমাজের ঈশ্বরের কথা– তাঁকে যে নামেই আমরা উল্লেখ করতে ইচ্ছুক হই না কেন। এভাবে তিনি তাঁর আবেদনকে সর্বজনীন করে তুলেছেন।'[১] বিবেকানন্দের মানবকল্যাণমূলক মতবাদ ঐতিহাসিক তথ্য, যুক্তি-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শনের সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বতাত্ত্বিক ব্যাখ্যার মাধ্যমে ঐশ্বরিক বা আধ্যাত্মিক শক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হলে মানুষ সমগ্র বিশ্বের অখন্ডতা উপলব্ধি করতে পারে। তখন মানব চেতনায় ফুটে উঠে সাম্য মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ববোধ এবং মানবকল্যাণ সাধনের অফুরন্ত স্পৃহা। সকল দিব্য জ্ঞানসম্পন্ন মহাপুরুষ সর্বাত্মভাবের মূর্ত প্রতীক। "মানুষকে ঈশ্বরের সমস্তরে স্থাপন করে একত্বের, সর্বোচ্চ বৈদান্তিক আদর্শটির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ এরই মধ্যে নিহিত আছে, সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের প্রকৃত অর্থ। এটি সর্বকালের বৃহত্তর মানব সমাজের জন্য ঋষিদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অদূর অথবা সুদূর ভবিষ্যতে কোনও না কোনও পথ অনুসরণ করে মানুষ তার অন্তরে গুহায়িত 'ঈশ্বর' কে চিনতে পারবে এবং সেই ঈশ্বরত্বকে অভিব্যক্ত করার কৌশল আয়ত্ব করতে শিখবে– যা সকল প্রকার সদ্‌গুণের উৎসমুখ। বস্তুত, হিন্দুধর্ম ঘোষণা করে এবং বিবেকানন্দও এ বিষয়ের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন যে, সকল শিক্ষা, ধর্ম, সংস্কৃতি এমনকি জীবনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দেবত্বকে অভিব্যক্ত করা। আমাদের সমাজে বর্তমানে অনেক অশুভ ব্যাপারের মূলে আছে এই উপলব্ধির অভাব। যে পর্যন্ত না আধ্যাত্মিক সচেতনতা আমাদের সমাজদেহে পুনরায় সন্নিবিষ্ট হবে ততদিন এই

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বের, বিশেষত আমাদের মহান জাতির ভবিষ্যৎ বাস্তবিক অন্ধকার।"[২] আধ্যাত্মিক চেতনার সৃষ্টি হলে দূর হয় অজ্ঞানতা, সংকীর্ণতা এবং স্বার্থপরতা, অশুভ এবং অকল্যাণ ভাবনা। ঐশী জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হৃদয়ই মানবকল্যাণে উদ্বুদ্ধ হয় এমনকি মানবকল্যাণে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে।

স্বামী বিবেকানন্দ ব্যক্তি ও বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন করেন। তিনি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত মানবকল্যাণ সম্পর্কে বলেন, 'সমষ্টির জীবনেই ব্যষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখেই ব্যষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়া ব্যষ্টির অস্তিত্ব অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য, জগতের মূল ভিত্তি।'[৩] বিবেকানন্দের মানবকল্যাণের লক্ষ্য হলো, জীবে দয়া নয়, শিব জ্ঞানে পূজা। তিনি দুঃস্থ, অসহায়, নিরন্ন, নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয় ও সান্ত্বনা দেন এবং পথ প্রদর্শন করেন। আধুনিক মারণাস্ত্র সজ্জিত বর্তমান বিশ্বে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এড়াতে স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকা, শিকাগো বিশ্বধর্ম সভার ঐতিহাসিক ভাষণ বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। তিনি ভাষণে বলেন,

'Help and not fight,
'Assimilation and not destruction.
Harmony and peace and not dissention.'[৪]

বর্তমান উগ্র বস্তুবাদ, ব্যক্তিস্বার্থ এবং যুদ্ধোন্মত্ত পৃথিবীতে বিবেকানন্দের মানবতাবাদী দর্শন ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের দর্শন আরও বিশদভাবে আলোচনা ও পর্যালোচনার প্রয়োজন।

মানবকল্যাণের উৎস "সমাধি"

কেন আমরা স্বেচ্ছায় মানবকল্যাণমূলক কাজ করি? এর ভিত্তি বা সার্থকতা কি? মানবকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আত্মার মুক্তি ঘটে। অর্থাৎ জ্ঞান ভক্তি ও যোগ মানুষকে যে পরম ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায়, কর্মযোগ অনুসারে মাবনকল্যাণমূলক কাজও সেই স্তরে পৌছায়। আমরা জ্ঞাতসারে যে সব কাজ করে থাকি তা অনেক ক্ষেত্রে বিচার বুদ্ধির গণ্ডী অতিক্রম করে অসীম জ্ঞানরাজ্যে চলে যায়, যেখানে বিচারবুদ্ধি যুক্তি চিন্তা এসবের প্রবেশ অসম্ভব। অথচ মানুষ যা অতিশয় মূল্যবান বলে মনে করে, তা যুক্তি বিচারের বাইরে অবস্থিত। যেমন অবিনাশী আত্মা আছে কিনা, এ জগতের নিয়ন্তা পরমচৈতন্য স্বরূপ কেউ আছেন কিনা এ সকল প্রশ্ন যুক্তি এলাকার বাইরে। যুক্তি কখনও এসব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। কিন্তু এসব প্রশ্নের উত্তর আমাদের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন। এসব প্রশ্নের উত্তর না পেলে মানব জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে। 'আমাদের সমুদয় নৈতিক মত, সর্ববিধ মনোভাব, মনুষ্য-স্বভাবে যাহা কিছু মহৎ ও ভাল, সে সবই যুক্তিরাজ্যের বাহির হইতে যে উত্তর আসে, তাহা দ্বারা গঠিত হয়। ...জীবন যদি শুধু একটি নাটিকা হয়, বিশ্বজগৎ যদি কেবল কতকগুলি পরমাণুর আকস্মিক মিলন মাত্র হয়, তাহা হইলে অপরের উপকার কেন করিব? দয়া, ন্যায়পরতা অথবা সহানুভূতির প্রয়োজন কি? ...সর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক লোকের সর্বাধিক সুখের ব্যবস্থা করা– কেন এরূপ করিব? যদি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি অধিকাংশ লোকের অত্যধিক অনিষ্ট সাধন করিব না কেন? হিতবাদিগণ *(utilitarians)* এই প্রশ্নের কি উত্তর দিবেন? ...নীতি, আত্মার অমরত্ব, ঈশ্বর, প্রেম ও সহানুভূতি, সাধুত্ব ও সর্বোপরি নিঃস্বার্থতা– মনুষ্যজীবনের এই সকল ভাব ও মহৎ সত্যগুলি কোথা হইতে অসিল? ...শক্তি ও প্রেরণাই বা কোথায়?'[৫]

মহাপুরুষগণ যে নিঃস্বার্থতা প্রচার করেন এবং মানব জাতিক তা শিক্ষা দেন- এসব তত্ত্ব কোথায় পেলন? এসব প্রশ্নের উত্তর এ পরিদৃশ্যমান জগৎ এক অনন্ত সমুদ্রের একটি ক্ষুদ্র বিন্দু, অনন্ত শৃঙ্খলের একটি ক্ষুদ্র শিকলি। ইতিহাস পাঠে দেখা যায় মহাপুরুষগণকে শিক্ষা দিয়েছেন এক স্বর্গীয় দূত, কাউকে এক জ্যোতির্ময় দেবতা, আবার কাউকে স্বপ্নে পিতৃপুরুষ–বিভিন্নভাবে যুক্তি বিচারের অতীত প্রদেশ হতে তাঁরা জ্ঞান লাভ করেন। প্রকৃত পক্ষে এই জ্ঞান সাধকের নিজের ভিতর হতে আসে। মানব মনের তিনটি অবস্থা রয়েছে। যথা- নির্জ্ঞান, সজ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা। সাধক ধ্যান যোগের মাধ্যমে জ্ঞানাতীত অবস্থায় সত্য লাভ করে। 'যোগীরা বলেন, এই মনেরই এমন এক উচ্চতর অবস্থা আছে, যাহা যুক্তি বিচারের ঊর্ধ্বে– জ্ঞানাতীত অবস্থা। এই উচ্চাবস্থায় পৌঁছিলে মানব তর্কের অতীত এই জ্ঞান লাভ করে- বিষয়জ্ঞানের অতীত পরমার্থ জ্ঞান অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করে।'[৬] মহাপুরুষগণ যুগে যুগে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করেছেন। বিশ্ব প্রকৃতির নিয়মে মহাপুরুষগণ সর্বকালে, সর্বযুগে, সর্বসমাজে, সর্বজাতিতে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। জগতের মহত্তম আচার্যগণ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'প্রত্যেক জাতির আধ্যাত্মিক জীবনে উত্থান পতন হইয়া থাকে। জাতি বিশেষের অধঃপতন হইল, বোধ হইল যেন উহার জীবনী শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গেল,'

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু ঐ অবস্থায় উহা ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে, ক্রমে নববলে বলীয়ান হইয়া আবার প্রবল বেগে জাগিয়া উঠে, তখন এক মহাতরঙ্গের আবির্ভাব হয়। সময়ে সময়ে উহা মহাবন্যার আকার ধারণ করিয়া আসে, আর সর্বদাই দেখা যায় ঐ তরঙ্গের শীর্ষদেশে এক মহাপুরুষ মূর্তি চতুর্দিক স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিয়া বিরাজ করিতেছেন। ইহারাই জগতের মহামনীষীবৃন্দ, ইহারাই জগতের শ্রেষ্ঠ আচার্য-ঋষি-মন্ত্রদ্রষ্টা-শ্রেষ্ঠ ভাবসমূহের বার্তাবহ-ঈশ্বরাবতার।'[৭] এই মহাপুরুষগণ সকলেই সত্য ও মানবকল্যাণের একটি মহান ভাব প্রচার করতে জগতে আসেন। এমন কতিপয় মহাপুরুষের মানবকল্যাণ সাধনের প্রচেষ্টা উল্লেখ করা হলো।

শ্রীরামচন্দ্র

শ্রীরামচন্দ্রের জীবনদর্শন মানবকল্যাণ সাধনের শিক্ষা দেয়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'রামায়ণের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, তাহা ঘরের কথাকেই অত্যন্ত বৃহৎ করিয়া দেখাইয়াছে। পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায়-ভ্রাতায়, স্বামী-স্ত্রীতে যে ধর্মের বন্ধন, যে প্রীতি-ভক্তির সম্বন্ধ, রামায়ণ তাহাকে এত মহৎ করিয়া তুলিয়াছে যে তাহা অতি সহজেই মহাকাব্যের উপযুক্ত হইয়াছে।'[৮] ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধর্মের সঙ্গে অচ্ছেদ্য ভাবে জড়িত। যখন জাতি ধর্মের আদর্শ থেকে একটু সরে এসে বিপথে চলতে শুরু করে, জনগণ এবং জননায়কগণ ভগবান লাভকে এবং অপরের কল্যাণকে বড় করে না দেখে নিজের সুখ সুবিধার দিকে বেশী যত্নশীল হয়, তখন মানুষ হয়ে উঠে অত্যাচারী, নিষ্ঠুর শোষক। সে সময় আবার মহামানব এসে ধর্মের মাধ্যমে জাতীয় উন্নতির জন্য লোককল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেন। যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের উত্থান হয়, তখনই ধর্মাবতার মহাপুরুষ এসে অধর্মের বিনাশ করে ধর্ম ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীকৃষ্ণ

দুঃখময় অশান্ত পৃথিবীতে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার এক মহান অবতার শ্রীকৃষ্ণ। 'শ্রীকৃষ্ণ এরূপ একজন মহামানব অবতার বলে তিনি পূজিত হয়ে আসছেন। তিনি যখন জন্মগ্রহণ করেন, তখন প্রায় সারা ভারতের রাজারা ঘোর অত্যাচারী ও স্বার্থপর হয়ে উঠেছিলেন। ভারতের এই অত্যাচারী রাজশক্তি এতদূর অধঃপতিত হয়েছিল যে, একজন রাজ কূলবধুকে প্রকাশ্য রাজ সভায় টেনে এনে বিবস্ত্রা করার চেষ্টা করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। শ্রীকৃষ্ণ এই সব অত্যাচারীদের বিনাশ করে সিংহাসনে ধার্মিক রাজাদের প্রতিষ্ঠিত করেন; মানুষের মনে ভগবান লাভের ইচ্ছাকে আবার বলবতী করেন। জনগণ, সমাজনেতাগণ, রাজা সকলে আবার জীবনে ধর্মকে আঁকড়ে ধরে চলতে শেখেন। ভারতের শাশ্বত সুর আবার বেজে ওঠে জাতির জীবন-বীণায়।'[৯] শ্রীকৃষ্ণ অধর্মের নাশ এবং ধর্মের উত্থানের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনের পথ নির্দেশ করেন।

তীর্থঙ্কর মহাবীর

জগতে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার এক মূর্ত প্রতীক জৈনধর্মের তীর্থঙ্কর মহাবীর। "মানব জাতির কল্যাণের জন্য তিল তিল দুঃখ বরণ করে মহাবীর নিজের সাধনলব্ধ ঐশ্বর্যের দ্বারা হাজা হাজার আর্ত ও মুমুক্ষ প্রাণে নতুন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন। মহাবীরের জ্বলন্ত বৈরাগ্য ও অমৃতময়ী বাণী সে যুগে সত্যই আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কঠোর তপশ্চর্যার দ্বারা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে, মোক্ষলাভে প্রত্যেক মানুষেরই জন্মগত অধিকার আছে। এরজন্য দরকার জাগতিক ভোগ সুখ বর্জন। এর স্থলে মুমুক্ষ হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে ত্যাগ ও অহিংসার মন্ত্র। জৈনরা বিশ্বাস করে, প্রত্যেক তরুলতারও আত্মা আছে। তাঁহারা জীবের দুঃখ কষ্টের প্রতি এত মমতাশীল ও সদয় যে, একটি গাছের পত্র পল্লব ছিঁড়তেও কষ্টবোধ করেন পাছে তাদের আত্মা কষ্ট পায়। তাঁহাদের একদল শিরে ময়ুরপুচ্ছ লইয়া রাজপথের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব সরাইয়া পথ পর্যটন করেন, পাছে কোন জীব পদপীড়নে বিনষ্ট হয়। তাঁহারা নিজের শরীরের রক্তের দ্বারা মশক ও ছারপোকার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা ধর্মের অঙ্গীয় মনে করেন এবং পিঁপিলিকাকেও কোন কোন জৈন ধর্মাবলম্বী নিত্য শর্করা প্রদান করিয়া 'জীবে দয়া' সূত্রের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন।"[১০] মহাবীরের অন্যতম শিক্ষা আর্তমানবতার সেবা, শুধু তা-ই নয় তিনি ক্ষুদ্র জীবের প্রতিও দায়িত্ব পালনের শিক্ষা দেন।

গৌতমবুদ্ধ

বৌদ্ধ ধর্মের প্রবর্তক মহামতি গৌতম বুদ্ধ মানবকল্যাণের জন্য দুঃখ থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। 'বুদ্ধদেব যে ধর্ম প্রচার করেছেন তা নীতির ধর্ম। ভগবান বিশ্বাস করি বা না করি, শাস্ত্রে বিশ্বাস করি বা না করি, দেবতার

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে পূজা দিই বা না দিই, পুরোহিতকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে সম্মান দেখাই বা না দেখাই-মানুষ যদি দুঃখের হাত থেকে বাঁচতে চায়-তাকে বুঝতে হবে– জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নাশ আছে এবং এই নাশের উপায়ও আছে। দুঃখের কারণ মানুষের তৃষ্ণা, কামনা, বাসনা। এই কারণ নাশের জন্য বুদ্ধদেব বলেন- মানুষ যদি তাঁর নির্দিষ্ট আটটি পথের অনুসরণ করে তবেই মানুষ দুঃখের পারে যাবে। তাকে বুদ্ধ বলেছেন নির্বাণ। এই নির্বাণ লাভ করলে সমস্ত দুঃখের নাশ হয়।'[১১] গৌতমবুদ্ধ একজন মানবতাবাদী দার্শনিক। মানবকল্যাণ সাধনই তাঁর ধর্মের লক্ষ্য।

কনফুসিয়াস

চীনের মহান দার্শনিক কনফুসিয়াস (৫৫১ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ) মানবকল্যাণ প্রচার করেন। 'কনফুসিয়াস বলতেন- মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করবে এটা ঈশ্বরের অভিপ্রায়। রাজা-প্রজা, পতি-পত্নী, পিতা-পুত্র, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ সমাজের সকলেই আপন আপন কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে পালন করলেই সমাজের মঙ্গল। রাজা, পতি, পিতা-প্রজা, পত্নী ও পুত্রের উপর যে কর্তৃত্ব করেন তার মধ্যে থাকবে ন্যায়পরায়ণতা ও দয়া। আর প্রজা, পত্নী ও পুত্রের-রাজা, পতি ও পিতার প্রতি থাকবে শ্রদ্ধা ও ভক্তি। পরস্পরের মধ্যে প্রীতি সৃষ্টি হলেই সমাজের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাবে।... কনফুসিয়াস বলতেন একটি পরিবারই জাতির আদর্শ। পরিবারের পিতা যেমন কর্তা, রাজাও তেমনি জাতির পিতারূপে কর্তৃত্ব করবেন। তবে রাজাকে হতে হবে সৎ ও ন্যায়পরায়ণ।'[১২] মানবতাই কনুফুসিয়াসের দর্শনের মূলকথা। তাঁর মতে মানুষকে ভালবাসাই ধর্ম। মানুষকে জানাই জ্ঞান। তিনি মনে করতেন বিশ্বের সকল মানুষ এক পরিবারভুক্ত। যথার্থ শিক্ষায় যদি এই বোধের জাগরণ ঘটে তাহলে দেশে দেশে, জাতিতে জাতিতে, মানুষে মানুষে বিরোধের অবসান ঘটবে।

যীশুখ্রীষ্ট

সত্যিকার মহাপুরুষগণের কথার শক্তিই ভিন্ন রকম। তাঁরা শিক্ষা ও সত্যকে সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করেন। এতে অবিশ্বাসীর মনেও দারুণ ভাবে প্রভাব বিস্তার করে। যীশুখ্রীষ্ট মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্য-মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও সেবার আদর্শ রেখে যান। 'বাস্তবিক যীশুর সুন্দর চেহারা, সুমিষ্ট উপদেশ ও অমায়িক ব্যবহারে দলে দলে লোক তাঁর দিকে আকৃষ্ট হতে লাগল। তিনিও সবাইকে তার কাছে ডাকলেন। বললেন, ঈশ্বর আমাদের সবার পিতা, আমরা সবাই তাঁর সন্তান। সবার প্রতি তাঁর সমান স্নেহ, সমান দৃষ্টি, সমান ভালবাসা। তাঁর কাছে কেউ ছোট নয়, কেউ বড় নয়। যীশু যে শুধু মুখেই একথা বলতেন, তা নয়। নিজের আচরণ দিয়েও তা প্রমাণ করতেন। তাঁর কাছে নরনারী, শিশুবৃদ্ধ, অন্ধ আতুর, রোগী দুঃখী সবাই সমান সহৃদয় ব্যবহার পেত। তাঁর চোখে সবাই ঈশ্বরের সন্তান, সবাই ভাই বোন। শিশুদের তিনি কি ভালোই না বাসতেন। তাদের কাছ থেকে আদর করতেন। শিষ্যদের বলতেন, এদের কাছে আসতে দাও। পৃথিবীতে এরাই স্বর্গ রাজ্য সৃষ্টি করেছে। তোমাদের যে কেউ শিশুদের ভালবাসে, সে আমাকেই ভালবাসে। যে বড় হতে চায়, তাকে এই শিশুদের মতই নম্র হতে হবে।'[১৩] কি সুন্দর কথা বলতেন যীশুখ্রীষ্ট। তিনি সুন্দর আচরণের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনের শিক্ষা দেন।

জরথুষ্ট্র

ইরানে বারো'শ বছর আগে জরথুষ্ট্র প্রবর্তন করেন মাজদীয় ধর্ম। কঠোর সাধনার ফলে সাবাতন নামক পর্বত শিখার জগৎপতি অহুর মজদাহ্‌র কৃপা ও দিব্য জ্যোতি দর্শন ঘটে। তিনি দিব্যজ্ঞান বলেই সকল প্রকার কুমতি ও অসৎ প্রবৃত্তির প্রতীক পাপাত্মা অহ্রিমনকে পরাস্ত করে অন্তরে সুমতি ও পুণ্যের প্রতীক বোহুমনের প্রতিষ্ঠা করেন। জড়থুষ্ট্র সত্যধর্ম প্রচার দ্বারা মানবকল্যাণ সাধনে ব্রতী হন। সত্য প্রচারে তিনি প্রতি পদক্ষেপেই বাধা প্রাপ্ত হন। শেষ পর্যন্ত সে সময়ের ইরানের রাজা বিশতাস্‌প স্ত্রী-পুত্র সহ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর সৎ চিন্তা, সৎ বাক্য ও সৎকর্ম ভিত্তিক ধর্ম রাজপরিবারকে আকৃষ্ট করে। রাজা তখন এই সত্য ধর্ম প্রচারে নানা প্রকারের সৎকর্মানুষ্ঠান দ্বারা সাহায্য করেন। জরথুষ্ট্রের ধর্মমত রাজা বিশতাস্‌পের সহায়তায় রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে গৃহীত হয়। "মহাত্মা জরথুস্‌ত্রের অমরবাণী লিপিবদ্ধ হয়েছে যে পবিত্র গ্রন্থে তার নাম 'জেন্দ আবস্ত'।...এই গ্রন্থে বহু অমূল্য উপদেশ রয়েছে, পূর্বোল্লিখিত সৎ-চিন্তা, সৎ- বাক্য ও সৎ-কর্মের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এই গ্রন্থে।... এতে বলা হয়েছে, ক্রোধ ও প্রতিহিংসা দ্বারা আত্মার সৌন্দর্য নষ্ট করা অনুচিত। পরের দুঃখ যিনি দূর করেন তিনি প্রকৃত উপাসক। আমরা অন্যের নিকট থেকে যে ব্যবহার পেলে খুশী হই, অন্যের প্রতি আমাদেরও সেই রকম ব্যবহার করা বিধেয়। আমাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা ও প্রতিবেশীদের সুশিক্ষাদান একটি অবশ্য কর্তব্য। যে নিজেকে

Dhaka University Institutional Repository

জয় করতে পারে না, সে কিছুই জয় করতে পারে না। সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি কখনও বিনষ্ট হয় না। জগৎ পিতা অহুর মজদাহ্ আমাদের সর্বপ্রকার কল্যাণবুদ্ধির নিয়ামক।"[১৪] জরথুষ্ট্র প্রতিটি চিন্তা, কথা ও কাজের মাধ্যমে মানুষকে কল্যাণের পথে অগ্রসর হওয়ার শিক্ষা দেন। কথিত আছে জরথুষ্ট্র আধ্যাত্মিক শক্তি বলে অসংখ্য লোকের অসংখ্য কল্যাণ সাধন করেন। তাঁর কৃপায় বহু অন্ধ ব্যক্তি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পায়, রোগক্লিষ্ট বক্তি দীর্ঘ দিনের দুরারোগ্য ব্যাধি হতে মুক্তি পায়। দুর্ভিক্ষ ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে দেশ মুক্ত হয়। তাঁর অপূর্ব চরিত্র ও কল্যাণ কর্মে বহু লোক আকৃষ্ট হয়ে তাঁর ধর্মমত দ্বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করে।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে আরবে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি আল্লাহর প্রেরিত পুরুষ। তাঁর প্রচারিত ইসলাম ধর্মের অনুসারী ১১২ কোটি। এই সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ইসলাম আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণের ধর্ম, কল্যাণ ও মুক্তির ধর্ম। 'মুহাম্মদ (সাঃ) সাম্যবাদের আচার্য; তিনি মানব জাতির ভ্রাতৃভাব– সকল মুসলমানের ভ্রাতৃভাবের প্রচারক, ঈশ্বর-প্রেরিত পুরুষ। সেই অতি প্রাথমিক যুগের প্রত্যাদেশ... সেইসব বাণীতে দেখা যায়, নবীত্বের সূচনায় হযরতের লাভ হয়েছে আল্লাহর একত্ব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা, আর মানুষকে যে তার জীবনের মহৎ দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে আর তার কৃৎকর্মের জন্য জবাবদিহি করতে হবে সে সব কথাও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে; যারা দুঃস্থ ও বঞ্চিত তাদেরও প্রতি যে মানুষের বিশেষ কর্ত্তব্য আছে কোনো কোনো সূরায় তারও স্পষ্ট উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়।...যারা তাঁর বাণী গ্রহণ করল তাদের কাছে হযরতের বার্তা ছিল স্পষ্ট। তিনি বললেন যে তাদের পৌত্তলিকতা ত্যাগ করতে হবে। কারণ আল্লাহ-ই একমাত্র উপাস্য। তিনি ভিন্ন আর দ্বিতীয় কোনো উপাস্য নেই। তিনি সর্বশক্তিমান। অন্যদিকে প্রথম দিন থেকেই তিনি চেষ্টা করেছিলেন তৎকালীন আরব সমাজের সংস্কারের। তিনি তাই বললেন যে প্রার্থনা আর বিশ্বাসই যথেষ্ট নয়। সৎভাবে ব্যবসা পরিচালনা, মহিলাদের প্রতি সম্মান, অনাথদের প্রতিপালন, শিশুহত্যা বর্জন– যে সমস্ত জিনিস তৎকালীন আরব সমাজে প্রচলিত ছিল– সবই হযরতের প্রচারে অঙ্গীভূত হল। এইভাবে হযরত যে শুধু মাত্র ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষ হিসেবে আবির্ভূত হলেন তাই নয়,তিনি তৎকালীন আরব সমাজের সংস্কারক রূপেও আবির্ভূত হলেন।'[১৫] এককথায় ইসলাম দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত অর্থাৎ মানবকল্যাণের সব নির্দেশ দিয়েছে। মানব জীবনের এমন কোন দিকে নেই যে সম্পর্কে ইসলাম কিছু বলেনি।

গুরু নানক

শিখ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ভারতের গুরু নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খ্রিঃ) মানবকল্যাণের এক অন্যন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তৎকালীন সময়ে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের তীব্র বিরোধ, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য তিনি হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম সমন্বয় করে নতুন 'শিখ ধর্ম' প্রবর্তন করেন। 'নানকের কথায় প্রকৃত সাধুর থাকবে অন্তর্দৃষ্টি। প্রকৃত সাধু হবেন বিনয়ী ও দীন দুঃখীর সেবক, হবেন সেই অন্তর-সত্তার পূজারী।'[১৬] গুরু নানকের প্রচলিত উপাসনা পদ্ধতি আড়ম্বরহীন এবং সকলের অধিগম্য। তাঁর মতে উপাসনার প্রধান অঙ্গ হলো জাত্যভিমান পরিত্যাগ করে সকলের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে শ্রদ্ধান্বিত চিত্তে ভগবানের নাম ও গুণকীর্তণ করা। শিখ ধর্মের শিক্ষা হলো, 'সাধারণ মানুষ ধর্মের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ ক'রে গৌনার্থ নিয়ে মারামারি করে বলেই দেশে এত বাদ বিসংবাদ ও সমাজে এত অশান্তি। অনেকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আপনি কোন সম্প্রদায়ভূক্ত? নানক উত্তরে বলেন, অগ্নি ও কাষ্ঠ যে সম্প্রদায়ভূক্ত আমিও তাই। আমি সেই এক ঈশ্বরের পূজারী। তাঁকে আমি দেখি মর্ত্যের ধূলিতে, ঊর্ধ্বে গগনে ও সকল দিকেই। গুরু নানকের প্রধান কথা ছিল অন্তর ও অন্তরের সুন্দর গুণাবলী।...ধর্ম মানুষের নিজস্ব সম্পদ হবে তখন, যখন মানুষ সবার সঙ্গে মিশে থাকতে শিখবে। নানক মানুষকে মানব ভ্রাতৃত্বের শিক্ষা দেন। দরিদ্রদের ও অধঃপতিতের সেবাকে তিনি ধর্মে প্রধান স্থান দিয়েছেন।'[১৭] নানক শিখ ধর্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে হিন্দু ও মুসলিম সমাজের তীব্র বিরোধের অবসান ঘটিয়ে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালান। "নানক কঠোর বাস্তববাদী ছিলেন। নৈতিক আদর্শে দৃঢ় বিশ্বাসীও।...অন্তরের বা আত্মার নৈতিকতাই হল খাঁটি নৈতিকতা। তিনি বিশ্বাস করতেন যে ধর্মাচরণ ফকির ও সাধুর জন্য নির্ধারিত সে ধর্ম একটা সক্রিয় ও কর্মচঞ্চল সমাজের জন্য নয়। সমাজের যে বিরাট অংশ নানবিধ সামাজিক ও জাগতিক কাজে নিযুক্ত আছে সে ধর্ম তাদের জন্য নয়। সে জন্য নানক 'মধ্যপন্থা' গ্রহণ করেছিলেন। ভগবান বুদ্ধের পন্থা অনুসরণ করে তিনি সন্ন্যাসের কৃচ্ছ্রতা পরিহার করতে বলেছেন। চরম বৈরাগ্যকে আমল দেননি। আবার বিপুল ভোগ ও বৈভবের পথকেও বর্জন করতে বলেছেন।"[১৮] তিনি সকলের নিকট মুক্তির বাণী প্রচার করেন। নানক ধর্ম সমন্বয়ের মাধ্যম মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন

Dhaka University Institutional Repository

'ভাব এক, ভাষা পৃথক।'[১৯] ভারতবর্ষ ইসলাম কর্তৃক বিজিত হয়। হিন্দু-মুসলিম দুটি ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘাত চলে দীর্ঘদিন। তারপর আসে মধ্যযুগের ধর্ম সমন্বয়ের বাতাবরণ। নানক, শ্রীচৈতন্য, কবীর, রামানন্দ প্রমুখ ধর্ম সমন্বয়ের বাণী নিয়ে এলেন। হিন্দু-মুসলমান উভয় ধর্মের মানুষের মধ্যে নতুন করে মৈত্রী সূত্র স্থাপনের জন্য নানক নতুন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন, নাম শিখ ধর্ম। গুরু নানকের অধ্যাত্মচিন্তার ফসল শিখ ধর্ম। এটি সর্বধর্ম সমন্বয়বাদী মানব ধর্ম। নানক ছিলেন একজন ধর্ম প্রবর্তক ও বড় মাপের মানুষ। তিনি শান্তি, সমন্বয় ও সৌভ্রাতৃত্বের মহান উদ্‌গাতা। একজন চিন্তানায়ক, ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতামুক্ত একজন উদার মানবপ্রেমিক, একমেবাদ্বিতীয়ম্ ঈশ্বরের উপাসক। 'গুরু নানক হলেন প্রভুর জ্যোতির প্রতীক। সেই জ্যোতি গুরুপরম্পরা প্রতিভাত। জোতরূপ হর আপ গুরু নানক কহঐও। (গুরু গ্রন্থ সাহিব, পৃ.১৪০৮) প্রভুর জ্যোতির শরীরী রূপ হল গুরু নানক।'[২০]

শ্রীচৈতন্য

মানবকল্যাণ সম্পর্কে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য বলেন,

'ভারত– ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার ∫
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার ∫∫' [২১]

শ্রীচৈতন্য পরের কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে মানব জন্ম সার্থক করার শিক্ষা দেন।

দুর্গাপূজা

মানবকল্যাণের জন্যই হিন্দু ধর্মে দুর্গাপূজা করা হয়। এই দুর্গাকে ? তাঁর পূজার সার্থকতাই বা কি ? শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে "'দুর্গ' শব্দের অর্থ দৈত, মহাবিঘ্ন, ভববন্ধ, কুকর্ম, শোক, দুঃখ, নরক, যমদণ্ড, জন্ম, মহাভয়, অতিরোগ, 'আ' শব্দের অর্থ নাশক। অতএব, দুর্গা শব্দের অর্থ এই সকলের নাশিনী।"[২২] শ্রীরামচন্দ্র দুর্গাপূজা করেন। তাঁর পূজা ছিল বিশ্বাস-ভক্তি, ব্যাকুলতা এবং আত্মোৎসর্গে পরিপূর্ণ। এজন্যই রামচন্দ্রের স্বহস্তে গড়া মৃন্ময়ী মূর্তিতে জীবন্ত আবির্ভূতা হয়েছিলেন মা দুর্গা। সেই শক্তিময়ী মায়ের কৃপায় ঘোর ভয়ঙ্কর পরাক্রমশালী অপরাজেয় রাবণ রূপ অশুভকে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত করেছেন। তাই দুর্গাপূজার শিক্ষা হলো অশুভ, অমঙ্গলের প্রতিকারে চাই শুভ শক্তির উদ্বোধন। আর এই ঐশ্বরিক শুভশক্তি জগতে অকল্যাণ বন্ধ করে মানবকল্যাণ সাধনে সক্ষম। "ভক্তি-বিশ্বাস, আত্মোৎসর্গ ও শরণাগতি পূজার মূল উপকরণ। ভক্তি-বিশ্বাসের বলেই তো মৃন্ময়ীর মাঝে চিন্ময়ীর আবির্ভাব হবে। পূজা যদি করতেই হয় শাস্ত্রের মমার্থ গ্রহণ করে প্রকৃত পূজা করা উচিত। তা হলেই তো শক্তিময়ীর আরাধনায় দুর্বল সবল হবে। তেজোময়ীর তেজে মৃতপ্রায় জীবন সঞ্জীবিত হবে। অসুরদলনী দশপ্রহরণধারিণীর প্রভাব দশদিকে অশুভের প্রতিবিধানে শুভের সূচনা হবে। সর্বহারা সর্বজয়ী হবে। এসব না হলে আর পূজার সার্থকতাই বা কোথায় ? প্রকৃত পূজা করলে আপাদমস্তক শিরায় শিরায় জ্ঞানের অগ্নি সঞ্চারিত হবে, যত পাপ ও কলঙ্ক ভস্মীভূত হবে। বাক্যে বজ্রধ্বনি নির্গত হবে। ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মতেজে দেশ ও জাতি নববলে বলীয়ান হয়ে নব জন্ম লাভ করবে। শ্রীশ্রী মায়ের কাছে তাই প্রার্থনা– সর্ব মঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্বার্থসাধিকে। শরণ্যে ত্রাম্বকে গৌরি নারায়ণি নমো' স্তুতে। – হে সকল মঙ্গলের মঙ্গলকারিণী, হে শীবে, হে সকল বাসনার পূর্তকারিণী, হে শরণাগতের আশ্রয়দাত্রী, হে ত্রিনয়ণী, হে গৌরী, হে নারায়ণী, তোমাকে নমস্কার।"[২৩] পূজা ও প্রার্থনায় যখন দেহ মন প্রাণ শান্তি মুক্তি ও কল্যাণ কামনায় ব্যাকুল হয়ে উঠে কেবল তখনই প্রকৃত কল্যাণ সাধনের পথ উন্মুক্ত হয়। তাই তো যুগে যুগে দেশে দেশে সর্বধর্মে পূজা অনুষ্ঠান ও প্রার্থনার মাধ্যমে কল্যাণকামী মানুষ ঈশ্বরের নিকট কল্যাণ কামনা করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ

শ্রীরামকৃষ্ণের জগতে মানবকল্যাণ স্থাপনের এক যুক্তিসিদ্ধ অনন্য দর্শন হলো "ধর্ম সমন্বয়"। "হিন্দু ধর্মের যত শাখা-প্রশাখা সব আয়ত্ত ক'রে এবার শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির করলেন অন্য ধর্ম মতগুলির সাধন করবেন। তাঁর যেমন ইচ্ছা তেমন কাজ। সঙ্গে সঙ্গে কোথা থেকে এক সুফী দরবেশ এসে উপস্থিত হলেন দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর তত্ত্বাবধানে ইস্‌লামের সাধনে মেতে উঠলেন। হিন্দুর আচার-বিচার, পোশাক-পরিচ্ছদ, হিন্দুমতে ধর্মচিন্তা সব একমনে ছেড়ে দিলেন, তখন তিনি নিষ্ঠাবান খাঁটি এক মুসলমান। ইস্‌লাম সাধনাতেও সিদ্ধিলাভ করতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না। নানা রূপ অনুভূতির ভিতর দিয়ে ইস্‌লামের যা পরম লক্ষ্য তা লাভ করলেন। এর পর যীশুখ্রীষ্ট প্রচারিত ধর্ম মতের দিকে তিনি আকৃষ্ট হলেন, এতেও তাঁর প্রয়োজন মত সহায়তা পেতে অসুবিধা হ'ল না এবং

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্ধিলাভও তাঁর অচিরে হল। এইসব বিভিন্ন ধর্মমত সাধনা ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ দেখে অবাক্ হলেন যে, আপাত দৃষ্টিতে এদের মধ্যে যতই বিভিন্নতা বা বিরোধ থাকুক শেষ পর্যন্ত কিন্তু এরা একই লক্ষ্যে মানুষকে পৌঁছে দেয়। তার এই সিদ্ধান্ত খুবই তাৎপর্যপূর্ণ কারণ তখন কলকাতার তথা সমস্ত ভারতবর্ষে ধর্ম নিয়ে খুব তর্ক বিতর্ক চলছিল। খৃষ্টান মিশনারীরা খ্রিষ্টান ধর্মের মহিমা প্রচার করেছিলেন, আর সঙ্গে হিন্দু বা ইসলাম ধর্মের মুণ্ডপাত করেছিলেন। অপর দিকে হিন্দু সমাজের মধ্যেও নানারূপ দল মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। সবার মুখেই এক কথা- স্বর্গ চাও তো আমাকে অনুসরণ কর, নচেৎ তোমার ভাগ্যে অনন্ত নরক। এর মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষণা করলেন সব ধর্মরই লক্ষ্য এক, 'যত মত, তত পথ', বললেন যার পেটে যা সয়' অর্থাৎ যার যেরূপ রুচি বা সাধ, সেইরূপ ধর্মমত নিয়ে চলবে।"[২৪] শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "ঈশ্বর আছেন ব'লে ব'সে থাকলে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে যেতে হবে। নির্জনে তাঁকে ডাক, প্রার্থনা কর। 'দেখা দাও' বলে ব্যাকুল হয়ে কাঁদ। ঈশ্বরকে দেখা যায় আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কচ্ছি। তিনি সকলেরই ভিতর আছেন, যে খোঁজে সে পায়।"[২৫] শ্রীরামকৃষ্ণ মানব জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মানুষকে নানা বিভ্রান্তি ও দ্বন্দ্ব-সংঘাত থেকে মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। '...রামকৃষ্ণের মানব-প্রীতি ঊনিশ শতকের বাঙলায় অতুল্য ও অমূল্য। তাঁর স্ব-কালে তিনি ছিলেন মানবতার ও মানব সেবার একনিষ্ঠ ও অনন্য প্রচারক। তিনি ছিলেন ভক্ত ও ভক্তির প্রতিভূ। পার্থিব ও অধ্যাত্ম জীবনকে তিনি অদ্বয় সত্তায় অনুভব ও প্রতীয়মান করতে চেয়েছিলেন। ভূমি ও ভূমার আপাতঃ বিরোধ ঘুচানোই যেন ব্রত ও সাধনা ছিল তাঁর। রামকৃষ্ণদেব জাত-জন্ম-ধর্ম বর্ণ-বৃত্তি-প্রবৃত্তি নির্বিশেষে মানুষকে শ্রদ্ধা ও সেবা করার প্রবর্তনা দিয়েছেন বাঙালীকে।'[২৬] তিনি বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধনের এক মহান পুরুষ।

শ্রীশ্রীমা সারদা

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের শিক্ষা ও উপদেশ কিভাবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করতে হয় শ্রীমা নিজের জীবন দিয়ে তা দেখিয়ে দেন। 'শ্রীমাকে সংসারের সকল প্রকার কাজকর্ম করতে হ'ত, নিশিদিন ব্যস্ত থাকতে হ'ত। তাঁর সংসারে রোগ, শোক, অভাব-অনটন এমনকি তাঁর স্বজন পরিজনদের মধ্যে বিবাদ, অহরহ, মরামারি পর্যন্ত হত। যাদের নিয়ে শ্রীমাকে চলতে হত, তাদের মধ্য কেউ শান্ত, কেউ দুষ্ট, কেউ এক গুঁয়ে, কেউ সৎ স্বভাব, কেউ পাপ স্বভাব ছিল। কিন্তু শ্রীমা সকলকে নারায়ণ ভাবে সঙ্গে সঙ্গে নিজের সন্তান ভাবে দেখতেন, আদর-যত্ন-সেবা করতেন; কখনও কারও দোষ দেখতেন না। সকলেই বুঝত যে মা তাঁকে বিশেষভাবে স্নেহ করে থাকেন। শ্রীমা তাঁর এই অহেতুক স্নেহের স্পর্শে কত কুপথগামী নর-নারীর জীবন যে সুপথে পরিচালিত করেছেন তার হিসেব নেই। তিনি ইচ্ছা করলে সংসারের জ্বালা, যন্ত্রণা, ঝঞ্ঝাট থেকে দূরে কোন তীর্থ ক্ষেত্রে বা দেবালয়ের শান্ত পরিবেশে সাধু ও ভক্তদের নিয়ে সর্বদা বাস করতে পারতেন। কিন্তু তাহলে সংসারের নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকে তীব্র কর্মব্যস্ততাময় দুঃখ-দৈন্য-হতাশাক্লিষ্ট পরিবারের মধ্যে বাস করে কিভাবে মনটি সর্বদা ঈশ্বরমুখী করে রাখা যায় তা সাধারণ লোকে শিখতে পেত না।...জয়রাম বাটিতে শ্রীমার নাম শুনে সম্পূর্ণ নূতন লোক হয়ত তাঁর কাছে গেছেন- শ্রীমা হাসিমুখে তাঁদের জন্য বাড়ী বাড়ী ঘুরে দুধ সংগ্রহ করছেন, তরকারী কাটছেন, রান্না করছেন, পরিবেশন করছেন, তাদের উচ্ছিন্ন পাতা নিজ হাতে পরিষ্কার করছেন। এতো গেল দেহের সেবা। তাঁদের মনের খোরাক মেটাবার জন্য তিনি অমৃতময়ী কথা শোনাচ্ছেন, দীক্ষা দিচ্ছেন এবং অমানুষিক দেবী-শক্তি বলে তাঁদের পূর্ব পূর্ব দুষ্কৃতির ভার নিজের স্কন্ধে তুলে নিচ্ছেন।'[২৭] শ্রীমা সন্তানদের জন্য আকুলভাবে পরমেশ্বরের শ্রীচরণে সর্বদা প্রার্থনা করেন- 'হে ঠাকুর, আমার ছেলেদের সকলের নাম আমার মনে পড়ছে না, তারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। দয়াময়, তুমি তাদের ইহকাল পরকাল দেখিও।'[২৮] স্বামী বিবেকানন্দ বলেন, 'শ্রীমা ভারতে মহাশক্তি জাগাতে আবির্ভূতা হয়েছেন। তাঁকে অবলম্বন ক'রে আবার ভারতে গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতির ন্যায় ব্রহ্মবাদিনী মহিলার অভ্যুদয় হবে।'[২৯] শ্রীমা বিচিত্র মানব সমাজে কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় এক অনন্য বাণী দিয়েছেন, 'যদি শান্তি চাও কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎকে আপনার করে নিতে শিখো। কেউ পর নয়, জগৎ তোমার।'[৩০] শ্রীশ্রীমা নারীদের উপদেশ দিয়ে বলেন, 'পিতৃগৃহ, পতিগৃহ বা যেখানেই থাক না কেন, সেবাই মেয়ে মানুষের প্রধান কাজ, কন্যারূপে, পত্নীরূপে, মাতৃরূপে, সকল রূপে সেবা করাই নারীর ধর্ম।'[৩১] শ্রীমা সারদা মানবকল্যাণ সাধনের জন্য বিশ্বের নারী সমাজকে দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দিয়েছেন।

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ আজীবন মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তাঁর মানবকল্যাণের দৈহিক ও আত্মিক- দুটি দিক রয়েছে। একটির কল্যাণ অপরটির কল্যাণের সাথে জড়িত। দৈহিক ও আত্মিক কল্যাণ পরস্পর নির্ভরশীল।

Dhaka University Institutional Repository

১. **দৈহিক কল্যাণ:** এটি ঐহিক বা জাগতিক কল্যাণ। মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান, শিক্ষা, নিরাপত্তা প্রভৃতি ঐহিক কল্যাণ সাধন করে। মানব জীবনের পার্থিব চাহিদা পূরণের মাধ্যমে মানুষের ঐহিক কল্যাণ সাধিত হয়। দৈহিক কল্যাণের জন্য প্রথম প্রয়োজন খাদ্য এবং পরে আত্মিক কল্যাণের জন্য প্রয়োজন ধর্ম। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'First bread and then religion.'[৩২]

২. **আত্মিক কল্যাণ:** এটি পারত্রিক বা অতিজাগতিক কল্যাণ-যা মন ও আত্মার উৎকর্ষ সাধন করে। যেমন জ্ঞান চর্চা, ধর্মীয় ও নৈতিক অনুশীলন, পরোপকার, জনসেবা, প্রার্থনা ও আধ্যাত্মিক সাধনা। এসব কাজ মানব মন ও আত্মার শান্তি, তৃপ্তি ও কল্যাণ বয়ে আনে। আর শুধু তাই না আধ্যাত্মিক অনুশীলনে মানবাত্মা ঈশ্বরদর্শন লাভ করে জাগতিক দুঃখ বেদনা থেকে অনন্তকালের জন্য মুক্তি লাভ করে। এটাই সর্বোচ্চ আত্মিক কল্যাণ।

বিবেকানন্দ ঐহিক ও আধ্যাত্মিক কল্যাণ সম্পর্কে বলেন, '...আমরা মানব জীবনের সমস্যা পরিপূরণের দু'টি বিপরীত প্রয়াস সমাজে লক্ষ্য করি- তার একটি ঐহিক উন্নতির প্রয়াস, অপরটি আধ্যাত্মিক উন্নতির। একবার জড়বাদী প্রয়াস প্রাধান্য অর্জন করে, আবার অধ্যাত্মবাদী। এই তরঙ্গাকারে ক্রমবিকাশ, ক্রমসঙ্কোচন– বা উত্থান-পতনের পদ্ধতিই বিবেকানন্দের মতে সমাজ-জীবনের বিবর্তনের লজিক্যাল (তর্কশাস্ত্র-সম্মত) বিধি।'[৩৩] আর্থিক শক্তিই মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার একমাত্র মৌল উপাদান এ ভ্রান্ত তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। মানুষ আর্থিক শক্তির হাতে অন্ধ ক্রীড়নক নয়। কারণ সে শূন্য হাতে পৃথিবীতে আসে, আবার শূন্য হাতে চলে যায়। মানুষ কষ্ট করেই একদিকে পার্থিব অর্থ-সম্পদ উপার্জন করে ঐহিক কল্যাণ সাধন করে, অপর দিকে জ্ঞান সত্য সংযম ও সাধনার বলে আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ করে। আর এভাবেই এগিয়ে চলে মানব জীবন।

গুরু ভাইদের উদ্দেশ্যে শ্রীরামকৃষ্ণের আধ্যাত্মিক শক্তির ব্যপকতা ও মানবকল্যাণে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'তোমরা কি রামকৃষ্ণকে তোমাদের নিজের সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিতে চাও? ...রামকৃষ্ণ যতো বড় ছিলেন বলিয়া রামকৃষ্ণের শিষ্যরা বুঝিয়াছেন, তাহার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন? তিনি অসীম আধ্যাত্মিক ভাবধারার মূর্ত প্রকাশ– সে ভাবধারাগুলি অসংখ্যভাবে বিকাশ লাভ করিতে পারে। তাহার মধুর আশিস্‌ভরা চক্ষের একটি দৃষ্টিপাতেই একটি মুহূর্তেই এমন লক্ষ বিবেকানন্দ জন্মিতে পারিত। আমি তাহার চিন্তাকে সমগ্র পৃথিবীময় ব্যাপ্ত করিতে চাই।'[৩৪] বিবেকানন্দ সত্যিই সমগ্র পৃথিবীময় শ্রীরামকৃষ্ণের মানবকল্যাণ ভাবনা ব্যাপ্ত করেছেন। তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থার চেয়ে মানবকল্যাণ সাধনের প্রতি বেশী আগ্রহী ছিলেন। তাঁর একটি প্রার্থনা ছিল, 'আমি যদি একটি মাত্র মানুষেরও কাজে আসি, তবে যেন আমি বারে বারে জন্মি। কুকুর হইয়া জন্মিলেও ক্ষতি নাই...।'[৩৫] বিবেকানন্দ প্রাকৃতিক নিয়মে মানবকল্যাণ সাধন সম্পর্কে স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বাণী উল্লেখ করেন। 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখনই আমি অবতীর্ণ হই। বার বার আমি আসি। অতএব যখনই দেখিবে কোনও মহাত্মা মানব জাতির উদ্ধারের জন্য সচেষ্ট, জানিবে আমার আবির্ভাব হইয়াছে এবং তাহার পূজা করিবে।'[৩৬] বিশ্ব প্রভুর অপার লীলা, তিনি নিরাকার, তিনিই সাকার, তিনি এক আবার তিনিই বহু। তাই বহুরূপী প্রেমময় ঈশ্বর মানুষের দুঃখ দূর করে কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্নরূপে বিভিন্ন নামে পৃথিবীতে আসেন। তিনি কখনও বুদ্ধ আবার কখনও যীশুরূপে অবতীর্ণ হন। তাহলে ধর্মে ধর্মে এত মতভেদ কেন? বিবেকানন্দ উল্লেখ করেন, 'স্বয়ং ঈশ্বর কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খ্রীষ্ট এবং অন্যান্য আচার্য (লোক গুরু) রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। হিন্দু দার্শনিকগণ বলেন, ইঁহারা মহাপুরুষ এবং নিত্যমুক্ত। সমস্ত জগৎ কষ্ট পাইতেছে বলিয়া ইঁহারা মুক্ত হইয়াও নিজেদের মুক্তি গ্রহণ করেন না। বার বার তাঁহাদের আগের, নর শরীর ধারণ করেন এবং মানব জাতির হিতসাধন করেন, আশৈশব জানেন– তাঁহারা কেন এবং কি উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন...। আমাদের মতো বন্ধনের মধ্য দিয়া তাঁহাদিগকে দেহ ধারণ করিতে হয় না।...নিজেদের স্বাধীন ইচ্ছাতেই তাঁহারা আসেন। বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি স্বতই তাঁহাদিগের ভিতর সঞ্চিত থাকে। আমরা ঐ শক্তির প্রতিরোধ করিতে পারি না। সেই আধ্যাত্মিকতার ঘূর্ণাবর্ত অগণিত নর-নারীকে টানিয়া আনে এবং ইহার গতি চলিতেই থাকে, কেননা এই মহাপুরুষদেরই একজন না একজন পিছন হইতে শক্তি সঞ্চার করিতেছেন। তাই যতদিন সমগ্র মানব জাতির মুক্তি না হয় এবং এই পৃথিবীর খেলা পরিসমাপ্ত না হয়, ততদিন ইহা চলিতে থাকে।'[৩৭] মহান ঈশ্বর বিচিত্রভাবে, বিচিত্রশক্তির মাধ্যমে জীবকে মুক্তির দিকে ধাবিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

মানবকল্যাণ সাধনে প্রয়োজন "স্বরূপ জ্ঞান"

দীর্ঘ ও স্থায়ী মানবকল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজন জগৎ ও জীবনের যথার্থ স্বরূপ জানা ও উপলব্ধি করা। বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সকল রহস্যের কেন্দ্রবিন্দু হলো ঈশ্বর। বিবেকানন্দ জগৎ ও জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বলেন, 'যদি ঈশ্বর থাকে, তাহাকে দর্শন করিতে হইবে; যদি আত্মা বলিয়া কিছু থাকে, তাহা উপলব্ধি করিতে হইবে। নতুবা বিশ্বাস না করাই ভাল। ভণ্ড অপেক্ষা স্পষ্টবাদী নাস্তিক ভাল।'[৩৮] বিবেকানন্দ ঈশ্বরের অবস্থান সম্পর্কে বলেন, 'ঈশ্বরের অন্বেষণে কোথায় যাইতেছ? দরিদ্র, দুঃখী, দুর্বল- সকলেই কি তোমার ঈশ্বর নয়? তাহাদের উপাসনা কর না কেন? গঙ্গাতীরে বাস করিয়া কূপ খনন করিতেছ কেন?'[৩৯] মানুষের মাঝেই ঈশ্বর রয়েছেন, তাঁকে দূরে খুঁজতে হবে না। মানুষের সেবা ও কল্যাণ সাধনের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'সকল উপাসনার সার-শুদ্ধচিত্ত হওয়া ও অপরের কল্যাণ সাধন করা। দরিদ্র, দুর্বল, রোগী- সকলেরই মধ্যে যিনি শিব দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ শিবের উপাসনা করেন।'[৪০] প্রত্যেক প্রাণীর মাঝেই আত্মারূপে রয়েছেন ঈশ্বর। আত্মবিশ্লেষণে ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'কেবল আত্মতত্ত্বের বিশ্লেষণেই ঈশ্বরকে জানতে পারি। প্রত্যেক মানবে, প্রত্যেক প্রাণীতে- সে যতই দুর্বল বা মন্দ হোক, সে বড় বা ছোট হোক- সেই সর্বব্যাপী সর্বজ্ঞ আত্মা রয়েছেন। আত্মা হিসেবে কোন প্রভেদ নেই। প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে।'[৪১] অতএব জীব সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরের সেবা করা হয়। মানবকল্যাণ বা সেবার মানসিকতা ও প্রেরণা কিভাবে সৃষ্টি হয়? মুক্তিলাভের ধারণা থেকে মানবকল্যাণ সাধনের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। মানবকল্যাণ সাধনের মাধ্যমে জন্ম-জন্মান্তরের দুঃখ-কষ্ট থেকে আত্মা চিরমুক্তি লাভ করে। বিবেকানন্দ বলেন, 'বাল্যকাল হইতেই তাহাদের মস্তিষ্কে এমন সকল চিন্তা প্রবেশ করুক, যাহা তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, যাহা তাহাদিগকে সবল করিবে, যাহাতে তাহাদের যথার্থ কল্যাণ হইবে। দুর্বলতা ও কর্মশক্তি লোপকারী চিন্তা যেন তাহাদের মস্তিষ্কে প্রবেশ না করে।'[৪২] বিবেকানন্দ বৃহৎ কল্যাণমূলক কাজের সফলতা অর্জন সম্পর্কে বলেন, 'কর্ম খুব ভাল বটে, কিন্তু তাহাও চিন্তা হইতে প্রসূত।...মস্তিষ্ককে উচ্চ উচ্চ চিন্তায়- উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, দিবারাত্র মনের সম্মুখে ঐগুলি স্থাপন কর, তাহা হইলেই বড় বড় কার্য হইবে।'[৪৩] অবিরত মহৎ চিন্তা ক্রমেই বাস্তবায়িত হয়।

মানবকল্যাণের অন্তরায় অজ্ঞানতা ও মায়া

অজ্ঞানতাই দুঃখ ও বন্ধনের কারণ। জগৎ ও জীবনের যথার্থ জ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতা দূর হয় ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ বিশ্বসংসারে মানুষ মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে প্রতিনিয়ত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছে। মায়ার বন্ধন সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'জননী সন্তানকে সযত্নে লালন করিতেছেন। তাঁহার সমস্ত মন, সমস্ত জীবন ঐ সন্তানের প্রতি আসক্ত। বালক বয়ঃ প্রাপ্ত হইল এবং হয়তো কুচরিত্র ও পশুবৎ হইয়া প্রত্যহ মাতাকে পদাঘাত ও তাড়না করিতে লাগিল। জননী তথাপি পুত্রের প্রতি আসক্ত। যখন তাঁহার বিচারশক্তি জাগরিত হয়, তখন তিনি সে শক্তিকে স্নেহের আবরণে আবৃত করিয়া রাখেন। তিনি মোটেই জানেন না, ইহা স্নেহ নহে- এক অজ্ঞেয় শক্তি তাঁহার স্নায়ুমন্ডলী অধিকার করিয়াছে। তিনি ইহা পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তিনি যতই চেষ্টা করুন, এ বন্ধন ছিন্ন করিতে পারেন না। ইহাই মায়া।'[৪৪] জগৎ অনিত্য ও ক্ষণস্থায়ী। এ কারণে অজ্ঞতা বশে সাময়িক ভাবাবেগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করা ঠিক নয়। প্রকৃত কল্যাণের জন্য অনাসক্তভাবে নিষ্কাম কর্ম সম্পাদন করতে হয়।

বিবেকানন্দ সৃষ্টি রহস্যের বিভীষিকাময় লীলার মাঝে মঙ্গল বা কল্যাণ লাভের উপায় সম্পর্কে প্রশ্ন করে বলেন, 'পৈশাচিক রীতি ব্যতীত শুধু মঙ্গলের মধ্য দিয়া কি মঙ্গল সাধিত হয় না? মানবজাতির ভবিষ্যৎ বংশধরগণ সুখী হইবে, কিন্তু এখন কেন এই ভয়ানক দুঃখ-যন্ত্রণা! ইহার মীমাংসা নাই। ইহাই মায়া।'[৪৫] আমাদের মৃত্যু অবধারিত। তবুও আমরা জীবনের প্রতি, ভোগ বিলাসের প্রতি আসক্ত হয়ে অমঙ্গল সাধন করি। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'মৃত্যু জীবনের লক্ষ্য, সৌন্দর্যের লক্ষ্য, ঐশ্বর্যের লক্ষ্য, শক্তির লক্ষ্য, এমন কি ধর্মেরও লক্ষ্য। সাধু ও পাপী মরিতেছে, রাজা ও ভিক্ষুক মরিতেছে- সকলেই মৃত্যুর পথে ধাবমান। তথাপি জীবনের প্রতি এই বিষম আসক্তি! জানি না, কেন আমরা এ জীবনের প্রতি আসক্ত, কেন ইহা পরিত্যাগ করিতে পারি না! ইহাই মায়া।'[৪৬] বিবেকানন্দ বলেন, অজ্ঞানতা ও মায়া মরীচিকার ঊর্ধ্বে উঠে জীবনকে অর্থবহ ও কল্যাণকর করতে হবে। কারণ আমরা ভুলের জগতে, মায়ামোহে দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করছি। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমি একবার ভারতের মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতেছিলাম; এক মাসের উপর ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আর প্রত্যহই আমার সম্মুখে অতিশয় মনোরম দৃশ্যসমূহ- অতি সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ-হ্রদাদি দেখিতে পাইলাম। একদিন অতিশয় পিপাসার্ত হইয়া একটি হ্রদে জলপান করিব, ইচ্ছা করিলাম। কিন্তু যেমন হ্রদের দিকে অগ্রসর হইয়াছি, অমনি উহা অন্তর্হিত হইল।...পরদিন প্রভাতে আমি আবার চলিতে লাগিলাম- সেই হ্রদ ও সেই-সব দৃশ্য আবার দেখা গেল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার এই জ্ঞানও আসিল যে, উহা মরীচিকা মাত্র। একবার

Dhaka University Institutional Repository

জানতে পারায় উহার ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এইরূপেই এই জগদ্‌ভ্রান্তি একদিন ঘুচিয়া যাইবে। এই-সকল ব্রহ্মাণ্ড একদিন আমাদের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিত হইবে। ইহারই নাম প্রত্যাক্ষানুভূতি।'[৪৭] অতএব, কল্যাণ ও মুক্তির জন্য সত্যের প্রত্যাক্ষানুভূতি প্রয়োজন। আত্মা সংসারে আবদ্ধ হয়ে দুঃখকষ্ট ভোগ করছে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'এই আত্মা কিরূপে সংসারে বদ্ধ হইলেন?...অজ্ঞানই বন্ধনের কারণ। আমরা অজ্ঞানেই বদ্ধ হইয়াছি- জ্ঞানোদয়েই অজ্ঞানের নাশ হইবে, জ্ঞান আমাদিগকে এই অজ্ঞানের পারে লইয়া যাইবে। এই জ্ঞান লাভের উপায় কি? ভক্তিপূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা এবং ভগবানের মন্দির জ্ঞানে সর্বভূতে প্রেম দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ হয়। ঈশ্বরের পরানুরক্তি বলে জ্ঞানের উদয় হইবে, অজ্ঞান দূরীভূত হইবে, সকল বন্ধন টুটিয়া যাইবে এবং আত্মা মুক্তি লাভ করিবেন।'[৪৮] ঈশ্বরের উপাসনায় অজ্ঞানতা দূর হয়ে কল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে আত্মার মুক্তি লাভ হয়।

মানুষ প্রতি মুহূর্তে প্রতিটি কল্যাণমূলক কর্মের মাধ্যমে তার দেবত্ব বিকাশ করবে– এটাই জীবনের লক্ষ্য। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'My ideal can be expressed in a few words' to preach into men their Infinity and how to make if manifest in every movement to life.'[৪৯] ধর্ম মতবাদে নয়, সৎ ও কল্যাণমূলক কর্মের মধ্যেই রয়েছে ধর্ম। 'The secret of religion lies not in theories but in practice. To be good and to do good– that is the whole of religion.'[৫০] পার্থিব প্রতিকূল পরিবেশই মুক্তি লাভের শ্রেষ্ঠ স্থান। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, '...বেদান্ত দর্শনের মতে মানুষই জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাণী আর এই পৃথিবীই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান, কারণ এই খানেই মুক্ত হইবার সম্ভাবনা। দেবতা প্রভৃতিকেও মুক্ত হইতে হইলে মানব জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে। এই মানব জন্মেই মুক্তির সর্বাপেক্ষা অধিক সুবিধা।'[৫১] মুক্তিলাভের জন্য মানুষ ও দেবতাদের এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে জ্ঞানচর্চা মানবকল্যাণ সাধন ও ঈশ্বর উপাসনার মাধ্যমে অগ্রসর হতে হয়। মানুষ মানুষের সেবা করবে, প্রতিটি জীবের সেবা করবে। জীব ভিন্ন পৃথক কোন ঈশ্বর নেই। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'After so much austerity, I have understood this as the real truth- God is present in every *jiva*; there is no other God besides that. 'Who serves *jiva;* serves God indeed.'[৫২] আর এই জীব সেবা বা কল্যাণ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ মুক্তি লাভ করে। বিবেকানন্দ পৃথিবীর মায়া-মোহ অজ্ঞানতা দূর করে যথার্থ ধারণা লাভের উদ্দেশ্যে বলেন, ''দর্শন' কেবল কথার কথা বা তামাশা নয়; ইহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে। এই শরীর যাইবে, এই পৃথিবী এবং আর যাহা কিছু, সবই যাইবে- আমি দেহ বা আমি মন, এই বোধ কিছুক্ষণের জন্য চলিয়া যাইবে,...সবই আবার আসিবে, যেমন পরদিনেও মরীচিকা দেখা গিয়াছিল। কিন্তু পূর্বের ন্যায় উহারা শক্তি বিস্তার করিতে পারিবে না, কারণ সঙ্গে সঙ্গে এই জ্ঞানও আসিবে যে, আমি এগুলির স্বরূপ জানিয়াছি। তখন ঐগুলি আর আমাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না, কোনরূপ দুঃখ কষ্ট শোক আর আসিতে পারিবে না। যখন কোন দুঃখকর বিষয় আসিবে, মন তাহাকে বলিতে পারিবে– আমি জানি, তুমি ভ্রমমাত্র। যখন মানুষ এই অবস্থা লাভ করে, তখন তাহাকে 'জীবন্মুক্ত' বলে। জীবন্মুক্ত-অর্থে জীবিত অবস্থাতেই মুক্ত। জ্ঞানযোগীর জীবনের উদ্দেশ্য- এই জীবন্মুক্ত হওয়া। তিনিই জীবন্মুক্ত, যিনি এই জগতে অনাসক্ত হইয়া বাস করিতে পারেন। তিনি জলস্থ পদ্মপত্রের ন্যায় থাকেন- উহা যেমন জলের মধ্যে থাকিলেও জল উহাকে কখনই ভিজাইতে পারে না, সেরূপ তিনি জগতে নির্লিপ্তভাবে থাকেন।'[৫৩] একমাত্র প্রকৃত মুক্তিকামী সাধক মানবকল্যাণ সাধন করতে পারেন। তিনি জ্ঞানচর্চা, জীব সেবা ও সাধনার মাধ্যমে মুক্তির লক্ষ্যে অগ্রসর হন।

বিপুল আধ্যাত্মিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষগণ মানব সমাজে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে অগণিত মানুষের কল্যাণ সাধন করেন। তাঁরা স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিভিন্ন পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্নভাবে মানবকল্যাণ সাধানের পথ নির্দেশ করেন। মহাপুরুষগণের মানবতাবাদী ও কল্যাণমূলক দর্শন উদার দৃষ্টিতে বিচার-বিশ্লেষণ করা হলে মতভেদ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ঘুচে গিয়ে সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবে ঐক্য, প্রগতি, শান্তি ও কল্যাণ।

তথ্যনির্দেশ

১। এম লক্ষ্মী কুমারী, "স্বামী বিবেকানন্দ ও সেবা ধর্মের অভিনব দৃষ্টিভঙ্গি", প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা সম্পাদিত, *মহিমা তব উদ্ভাসিত*, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা (প্রথম সংস্করণ), ডিসেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ২৭৮।

২। ঐ, পৃ. ২৭৮-৭৯।

৩। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনুদিত ও সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খন্ড, কামিনী সংস্করণ, কামিনী প্রকাশালয়: ১১৫ অখিল মিস্ত্রী লেন, কলকাতা-৯, এপ্রিল ১৯৯৪, পৃ. ১২৯।

Dhaka University Institutional Repository

৪। Swami Vivekananda, *Chicago Address*: (Thirty fourth impression), Advaita Ashrama (Publication Department), 5 Dehi Entally Road. Kolkata 700014, January, 2005, page: 60.

৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগ বাজার, কলকাতা (প্রথম সংস্করণ), ২১ মার্চ, ১৯৬৪ (ত্রয়োবিংশতি পুনর্মুদ্রণ), জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, পৃ. ২১৪।

৬। ঐ, পৃ. ২১৫।

৭। *জগতের ধর্মগুরু*; রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, পৃ. শিরোনাম, জগতের মহত্তম আচার্যগণ সম্বন্ধে।

৮। ঐ, পৃ. ৬।

৯। ঐ, পৃ. ৭।

১০। ঐ, পৃ. ২০।

১১। ঐ, পৃ. ৩৪।

১২। ঐ, পৃ. ৩৮।

১৩। ঐ, পৃ. ৪৪-৪৫।

১৪। ঐ, পৃ. ৫৭।

১৫। ঐ, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৬। ঐ, পৃ. ৮৭।

১৭। ঐ, পৃ. ৮৬-৮৭।

১৮। আশা দাশ, *শিখ ধর্মের ইতিহাস*, সদেশ, ১০১/সি, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৫ নভেম্বর, ২০০৬, পৃ. ২০।

১৯। ঐ, পৃ. ২১।

২০। ঐ, পৃ. ২৭।

২১। কৃষ্ণকৃপাশ্রী মূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, *'The Science of Self Realization'*, শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী অনুদিত, *আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, বোম্বাই, নিউইয়র্ক, লসএঞ্জেলস্, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম। একাদশ সংস্করণ ২০০৫, পৃ. ২৫৫ (শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদি ৯/৪১)।

২২। স্বামী উত্তমানন্দ, "দুর্গাতত্ত্ব", শ্রী বিজয় কৃষ্ণ দে প্রধান পৃষ্ঠপোষক, 'সারথী' জন্মাষ্টমী স্মরণিকা, *ধর্মরক্ষিণী সভা*, বরিশাল। প্রকাশকাল প্রপঞ্চমী তিথি, ২৭ মাঘ, ১৪১৪ (১১ ফেব্রুয়ারী ২০০৮), পৃ. ৪৬।

২৩। ঐ, পৃ. ৪৭।

২৪। *জগতের ধর্ম গুরু*, ঐ, পৃ: ১০৫।

২৫। ঐ, পৃ. ১০৭-৮।

২৬। দেওয়ান গোলাম মুর্তাজা, "গণমানুষের জ্ঞান গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ", স্বামী পরদেবানন্দ সম্পাদিত, *অর্ঘ্য*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট-বাংলাদেশ, প্রকাশ কাল ১৯ কার্তিক, বুধবার, ১৪১০, ৫ নভেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৮৬।

২৭। *জগতের ধর্ম গুরু*; ঐ, পৃ. ১১৪-১৫।

২৮। ঐ, ১১৫।

২৯। ঐ, ১১৫।

৩০। ঐ, ১১৫।

৩১। ঐ, ১১৬।

৩২। Swami Vivekananda, *MY LIFE AND MISSION*. ADVAITA ASHRAMA, 5 DEHI ENTALLY ROAD, KOLKATA, Nineteenth Impression, August 2008, P- 45.

৩৩। অধ্যাপিকা সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, *বিবেকানন্দের সমাজদর্শন*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা। প্রথম উদ্বোধন সংস্করণ, ২৩ ডিসেম্বর ২০০৫, পৃ. ৪২।

৩৪। রোমাঁ রোলাঁ, *বিবেকানন্দের জীবন*, ঋষি দাস অনুদিত, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানী, সি ২৯-৩১ ও ৪৮, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা, পরিমার্জিত সপ্তম সংস্করণ: মাঘ, ১৪১২, পৃ. ৯১-৯২।

৩৫। ঐ, পৃ. ৯২।

৩৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১৪, পৃ. ২০১।

৩৭। ঐ, পৃ. ২০১।

৩৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, উনবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ২৫।

Dhaka University Institutional Repository

৩৯। ঐ. পৃ. ২০।

৪০। ঐ. পৃ. ১৬।

৪১। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ০৪ অক্টোবর, ২০০৭, পৃ. ১৪।

৪২। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ. পৃ. ৪।

৪৩। ঐ. পৃ. ৩-৪।

৪৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ঊনবিংশ পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ৫।

৪৫। ঐ. পৃ. ৭।

৪৬। ঐ. পৃ. ৫।

৪৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, তৃতীয় খণ্ড, ঐ, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৪, পৃ. ৪০।

৪৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, পঞ্চম খণ্ড, ঐ. পৃ. ১৮।

৪৯। Swami Vivekananda, *MY LFIE AND MISSION*. op.cit, page-44.

৫০। *VIVEKANANDA HIS CALL TO THE NATION*. Advaita Ashrama (ed), 5 Dehi Entally Road, Kolkata, 40th Impression, February 2009. P. 82.

৫১। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঐ. পৃ. ৩৬।

৫২। *VIVEKANANDA HIS CALL TO THE NATION*. , op.cit, P. 71.

৫৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, তৃতীয় খণ্ড, ঐ. পৃ. ৪০-৪১।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন

বিশ্ব ইতিহাসে রচিত হচ্ছে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার এক অভিনব ও ব্যতিক্রমধর্মী প্রতিষ্ঠান বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন। লেখক, সাহিত্যিক,সমাজ বিজ্ঞানী, দার্শনিক, রাজনীতিবিদ, ধর্ম প্রচারক বিভিন্ন শ্রেণীর কল্যাণকামী মনীষী মানব সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন শান্তি, প্রগতি ও কল্যাণ। এলোমেলো ভাবে যদি কল্যাণমূলক বাণী প্রচার করা হয়, তাহলে কল্যাণ প্রতিষ্ঠা হয় আংশিক বা অনিশ্চিত। তাই দূরদর্শী স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ব মানবতার কল্যাণ সাধনের জন্য প্রতিষ্ঠা করেন "শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন"। মানবপ্রেমিক বিবেকানন্দ অনেক ভাবনার পরেই প্রতিষ্ঠা করেন সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন এক অভিনব পথে মানবকল্যাণ সাধনের এই প্রতিষ্ঠান। বিবেকানন্দের এই শিক্ষার আলোকেই প্রয়োজন বর্তমান বাংলাদেশ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার এক ভিন্নরূপ প্রতিষ্ঠান "বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন (World Divine Philosophy Foundation)"। এই প্রতিষ্ঠান স্থায়ীভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের মত আধ্যাত্মিক শিক্ষা অনুসরণ করে যুগ যুগ ধরে মানবকল্যাণে জ্ঞান, সত্য, শান্তি, মৈত্রী এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবে। আর এই দূরদর্শী ও স্থায়ী কাজের জন্য প্রয়োজন একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। ঐতিহাসিক তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যায় মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার সমন্বয়ী প্রচেষ্টার উৎস হলো সর্বজনীন আদর্শ এবং বিশ্বতত্ত্ব অনুশীলনের এক বৃহৎ প্রতিষ্ঠান।

নামকরণ

মহামতি বিবেকানন্দের দর্শন স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভিন্ন নয়, তা হলো বিশ্বের সকল সমাজের, সকল সময়ের এবং সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। কারণ ত্রিকালদর্শী, দূরদর্শী ও নৃবিজ্ঞানী বিবেকানন্দ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্লেষণ করে সৃষ্টি করেন এক বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ। 'ঈশ্বর লাভই মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য।'[১] আর ঈশ্বর লাভের জন্য বিবেকানন্দ "শিব জ্ঞানে জীব সেবা", এই মূলমন্ত্র গ্রহণ করেন। সেবা ও আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে ঐশ্বরিক বা ঐশীশক্তি লাভ হয়, ফলে আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন লাভ হয় এবং আত্মার মুক্তি ঘটে। তাই তো মানুষ মুক্তির জন্য বিভিন্ন ধর্মপথে এক ঈশ্বরকে বিভিন্ন নামে ডাকে। এ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'যে ধর্মই হোক, যে মতই হোক, সকলেই সেই এক ঈশ্বরকে ডাকছে; তাই কোনও ধর্ম, কোনও মতকে অশ্রদ্ধা বা ঘৃণা করতে নাই।'[২] শ্রীগুরু রামকৃষ্ণের শিক্ষায় বিবেকানন্দ এক সর্বজনীন কল্যাণ ও বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য সমন্বয়ী পথ নির্দেশ করেন। আর বিশ্বশান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির জন্য প্রতিকূল পরিবেশের অসংখ্য জটিলতা ও দুঃখরাশি অতিক্রম করতে আমাদের অসাধারণ ঐশীশক্তির প্রয়োজন। ঐশীশক্তির সাধনায় হৃদয়ের সুপ্ত ব্রহ্ম বিকশিত হয়। তাই বিবেকানন্দ অসাধারণ ঐশী শক্তি অর্জনের ব্যাপক প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন, '...আমাদের অসাধারণ ঐশী শক্তির প্রয়োজন। সাধারণ অলৌকিক ক্ষমতা যথেষ্ট নয়, অসাধারণ ঐশী শক্তিই একমাত্র উপায়– মুক্তির একমাত্র পথ। একমাত্র ইহারই সাহায্যে আমরা সব জটিলতা অতিক্রম করিতে পারি– অক্ষত দেহে অজস্র দুঃখরাশি উত্তীর্ণ হইতে পারি। আমরা খন্ড-বিখন্ড হইতে পারি, শতধা বিচ্ছিন্ন হইতে পারি; তথাপি এই শক্তির সহায়তায় আমাদের হৃদয়বৃত্তি সর্বদাই মহৎ হইতে মহত্তর হইয়া উঠিবে।'[৩] ঐশী শক্তিই দুর্বলকে করে বলবান, মানবকে পরিণত করে মহামানব। ঐশী শক্তির অনুশীলনে মানুষ হয়ে উঠে দেবতা। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আত্মার এই অনন্ত শক্তি যখন জড়বস্তুর উপর পড়ে, তখন জাগতিক উন্নতি হয়; যখন আত্মার আলো চিন্তার উপর নিক্ষিপ্ত হয়, তখন চিন্তাশক্তি বিকশিত হয়; আর মানুষ যখন ঐ-শক্তিকে নিজের উপর প্রয়োগ করে, তখন মানুষ হইয়া যায় দেবতা।... অতএব, তোমার ঐশী শক্তি ও দিব্যসত্তাকে তুমি প্রকাশ কর। তাহা হইলেই দেখিতে পাইবে সঙ্গে সঙ্গে সবকিছুই সামঞ্জস্যপূর্ণ হইয়া উঠিবে।'[৪] আর বিবেকানন্দের এই মৌলিক ও বিশ্বজনীন অধ্যাত্মদর্শন বা ঐশীদর্শন ও শিক্ষার ভিত্তিতেই নব্য প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হলো "বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন"। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য– এক বৈজ্ঞানিক পথে জ্ঞানচর্চা ও সেবার মাধ্যমে ঈশ্বরদর্শন বা আত্মার মুক্তি লাভ করা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রাতিষ্ঠানিক ভাবনা

মানবকল্যাণ সম্পর্কে কথা বলা ও মতবাদ সৃষ্টি করা সহজ। কিন্তু বাস্তবে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা অনেক কঠিন। প্রাচীন কাল থেকে বিভিন্ন দার্শনিক মানবকল্যাণ সম্পর্কে বিভিন্ন দর্শনতত্ত্ব দিয়েছেন এবং জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা করে এসেছেন। অনেকে সততা, নৈতিকতা ও ধর্মের কথা বলেছেন। কিন্তু মানবকল্যাণের এই দর্শনতত্ত্ব কিভাবে বাস্তবে প্রয়োগ সম্ভব? What is Practical Philosophy? কার্লমার্ক্স বলেন, দার্শনিকগণ জগতের অনেক দর্শন তত্ত্ব দিয়েছেন। এখন প্রয়োজন জগৎ পরিবর্তন করা। তাই আমাদের এখন প্রয়োজন, "Realization of Philosophy'- 'দর্শনকে বাস্তবে রূপ দাও।"[৫] আর এই কল্যাণমূলক দর্শনতত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য প্রয়োজন কর্মবীবের প্রবল ইচ্ছাশক্তি, অক্লান্ত প্রচেষ্টা, সফল উদ্যোগ এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান বা সংঘ। সংঘের ভিত্তি যত মজবুত হবে কাজও তত সফল হবে। এ কারণেই বিবেকানন্দ বলেন, সংঘ ছাড়া কোন বড় কাজ সম্ভব নয়।

বিবেকানন্দের দর্শন সর্বজনীন বিজ্ঞান ভিত্তিক। তিনি ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন কোন কথা বলেননি। তাঁর দর্শন, ব্যক্তি সমাজ, রাষ্ট্র, সাহিত্য, অর্থ, কৃষি প্রভৃতি আধ্যাত্মিকতার রঙে রঞ্জিত। কারণ বিবেকানন্দের মানবকল্যাণের ধারণা বিশ্বজনীন, তাঁর চিন্তা সর্বজনীন এবং আধ্যাত্মিক বা ঐশী দর্শন হলো তাঁর চিন্তার মূলমন্ত্র। তাঁর সর্বজনীন আধ্যাত্মিক শিক্ষা, গবেষণা ও মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের মত একটি একাডেমীক প্রতিষ্ঠান "বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন" স্থাপন প্রয়োজন। এটি হবে বাংলাদেশ ও বিশ্বের সার্বিক উন্নয়নের একটি অন্যতম প্রতিষ্ঠান। উচ্চ দর্শন তত্ত্ব বাস্তবে প্রয়োগ করে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠা-এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। এ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য স্বাস্থ্য, অর্থনীতি, সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করা। বেকারত্ব অভাব ও জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করবে এ প্রতিষ্ঠান। বিশ্বের সকল জ্ঞান ভান্ডার হতে জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার উপকরণ সংগ্রহ করে জীবন ও সময়োপযোগী বিশাল জ্ঞান ভান্ডার হবে এ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণ জ্ঞান ও সত্যানুশীলন করে গড়ে তুলবে দারিদ্রমুক্ত আদর্শ জীবন ও সুখী সমাজ। বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ের ভিত্তিতেই সমস্যাসঙ্কুল বিশ্বের শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব। এ প্রতিষ্ঠানের অন্যতম চারটি লক্ষ্য ১. ঈশ্বরের প্রতি প্রেম ২. মানুষের প্রতি প্রেম ৩. দারিদ্র্যমুক্ত বিশ্ব, বিশেষ করে দারিদ্র্যমুক্ত স্বনির্ভর বাংলাদেশ ৪. বিশ্ব ভাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা বা শান্তিপূর্ণ বিশ্ব।

এ প্রতিষ্ঠানের বহুমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে। তা হলো- সহজ সরল মানুষের শান্তিপূর্ণ কাজ, ধর্মহীনদের ধর্ম পথ, আশ্রয়হীনদের আশ্রয়স্থল, কর্মহীনদের কর্মসংস্থান, অন্নহীনদের অন্নসংস্থান, শিক্ষা বঞ্চিতদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অজ্ঞানীদের জ্ঞানের রাজ্য। এ পৃথিবীর কঠিন প্রতিকুল পরিবেশে বন্ধুহীনদের বন্ধুর পথ, নৈরাশ্যবাদীদের আশার পথ, পাপীদের পূণ্যের পথ এবং সর্বোপরি বন্দীদের মুক্তির পথ। এক কথায় এ প্রতিষ্ঠান হলো জ্ঞান বিজ্ঞান ও দর্শন চর্চা এবং সেবার মাধ্যমে প্রগতিশীল সমাজ প্রতিষ্ঠার এক দূরদর্শী ও শক্তিশীল প্রতিষ্ঠান।

তাত্ত্বিক ভিত্তি

বিশ্ব ঐশীদর্শন-এ প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি বিশ্ব-ইতিহাসে নতুন নয়। ইতিহাস গবেষণায় দেখা যায় পূণ্যাত্মা মহাপুরুষগণ মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য অসংখ্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। এই বহুমুখী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য হলো এরিষ্টটলের লাইসিয়াম (জ্ঞানগৃহ), বৃটেনের গ্রীনিচ মানমন্দির, পিথাগোরীয় সমাজ, রাজা রামমোহন রায়ের ব্রাহ্ম সমাজ, ইরাকের পবিত্র ভ্রাতৃসংঘ, নেতাজী সুভাষ বসুর মহাজাতি সদন, খ্রীষ্ট মিশন, বৌদ্ধ সংঘ, রামকৃষ্ণ মিশন ও লোকশিক্ষা পরিষদের বিভিন্ন ধরার জ্ঞানের সমন্বিত বৈশিষ্ট্য। বিশ্বের বিভিন্ন জ্ঞান ভান্ডার হতে তথ্য ও উপাত্ত সংগ্রহ করে সমৃদ্ধ হবে এ প্রতিষ্ঠানের বৃহৎ জ্ঞান ভান্ডার। হাদিসে রয়েছে- 'তুমি জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা কর এবং যেখান হতেই তুমি তা গ্রহণ কর না কেন তাতে তোমার কোন ক্ষতি নাই'।

দার্শনিক পিথাগোরাসের মত বিবেকানন্দ ঐক্য, শৃঙ্খলা, বন্ধুত্বস্থাপন এবং আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচার করেন। গ্রীক দার্শনিক পিথাগোরাস (খৃঃ পূঃ ৫৭২-৪৯৯) ফিনিসিয়া, মিশর ও ব্যাবিলন পরিভ্রমণ করে প্রাচ্যের ধর্ম শাস্ত্র ও জ্যামিতি অধ্যয়ন করেন। খৃষ্টপূর্ব ৫৩০ অব্দে তিনি দক্ষিণ ইটালির ক্রোটন নামক স্থানে বসতি স্থাপন করেন এবং সেখানেই পিথাগোরীয় সম্প্রদায় (Brotherhood) প্রতিষ্ঠা করেন। এটি ছিল নিরামিষ ভোজী সন্ন্যাসী সঙ্ঘ। তারা জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী ছিল। যাবতীয় সম্পদ তারা যৌথভাবে ভোগ করতো। 'পারস্পরিক বন্ধুত্ব

Dhaka University Institutional Repository

সাম্প্রদায়িক শৃঙ্খলা এবং ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধি ছিল এই সম্প্রদায়ের মূল লক্ষ্য। এজন্য এ সম্প্রদায়ের প্রত্যেক সদস্যকে কতকগুলো গোপন দীক্ষা অনুষ্ঠানে যোগদান এবং কঠিন শপথ গ্রহণ করতে হতো।...পিথাগোরীয় মতে, আত্মার বিশুদ্ধি লাভের মাধ্যমে জন্ম-মৃত্যু চক্র থেকে মুক্তি লাভ করে ঈশ্বরের সাথে মিলিত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য।...মানুষের আত্মাকে তারা দেহের চেয়ে উৎকৃষ্টতর ও উচ্চতর বলে মনে করতো এবং বিশ্বাস করতো যে, মানুষের স্বরূপ তার আত্মায় নিহিত। দেহ ক্ষণস্থায়ী ভাবাবেগের অধিষ্ঠান এবং মৃত্যুতে বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আত্মা অমর ও অবিনশ্বর। ধর্মের লক্ষ্য আত্মাকে একটি পরিপূর্ণ শুভ সত্তায় রূপান্তরিত ও প্রতিষ্ঠিত করা। পাপাচার পরিণামে জয়ী হতে পারে না। কেননা, তা এক ধরণের পীড়া। পরিপূর্ণ ধর্মীয় উৎকর্ষ লাভের জন্য এক দীর্ঘ নৈতিক বিশুদ্ধি প্রক্রিয়ার অনুশীলন আবশ্যক।'[৬] বিশ্ব ইতিহাসে পিথাগোরীয় সম্প্রদায় আত্মশুদ্ধি, নৈতিক শৃঙ্খলা, মানবিক গুণাবলী এবং গোপন আধ্যাত্মিক শিক্ষা অনুশীলনের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। তেমনি বিবেকানন্দের দর্শনচিন্তা পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

বিশ্ব ঐশীদর্শন প্রতিষ্ঠার চিন্তা চেতনায় এক অনন্য প্রভাব রাখে 'পবিত্র ভাতৃসঙ্ঘ'। ইসমাঈলীয় সম্প্রদায়ের একটি শাখা ৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইরাকের বসরায় "ইখওয়ানুস সাফা" বা পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ (Brethren of purity) প্রতিষ্ঠা করে। এ সংঘের সদস্যরা ৪টি স্তরে বিভক্ত হয়ে আল্লাহর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। **প্রথম পর্যায়:** 'প্রথমটি গঠিত ছিল ১৫ থেকে ৩০ বছরের এমন সব যুবকের সমবায়ে, যাদের শিক্ষকদের প্রতি পূর্ণ বাধ্যতা ও আনুগত্য জ্ঞাপনের শিক্ষা দেয়া হতো।'[৭] **দ্বিতীয় পর্যায়:** 'দ্বিতীয় পর্যায়ে ছিল ৩০ থেকে ৪০ বছরের এমন সব ব্যক্তি, যাদের পার্থিব শিক্ষা এবং বস্তুর সাদৃশ্যানুমানিক (analogical) জ্ঞান দেয়া হতো।'[৮] **তৃতীয় পর্যায়:** 'তৃতীয় পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত ছিল ৪০ থেকে ৫০ বছরের ব্যক্তিরা। জগতে দৈব নিয়মের কার্যকারণ সম্পর্কে এসব লোকের জ্ঞান ছিল অপেক্ষাকৃত পর্যাপ্ত।'[৯] **চতুর্থ পর্যায়:** 'চতুর্থ ও শেষ পর্যায় গঠিত ছিল পঞ্চাশোত্তর বয়সী সেইসব ব্যক্তির সমবায়ে, যারা বস্তুর বাস্তবতা সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি লাভে সক্ষম। এই উচ্চতম পর্যায়ে তারা প্রকৃতি, ধর্ম ও আইনের ঊর্ধ্বে উত্তরণ লাভ করে থাকে।'[১০] পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ ৫১ খণ্ডে সমাপ্ত এক বিশ্বকোষে জ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজ অবদান লিপিবদ্ধ রেখে যায়। ডি. বোয়ার বলেন, 'এসব গ্রন্থে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন প্রসঙ্গ সম্পর্কে এক ধরনের মিশ্র অধ্যাত্ম তত্ত্ব (gnosticim) উপস্থাপিত করা হয়।'[১১] ভ্রাতৃসঙ্ঘ জগৎ ও জীবনের এক সামগ্রিক ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা করে।

এ সম্প্রদায়টি পিথাগোরীয় এরিষ্টটলীয় ও নব্য প্লেটোবাদী দর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়। 'আত্মাকে তারা দেহের অপরিহার্য অংশ বলে মনে করতো। আত্মা এমন একটি মৌল বাস্তব সত্তা, যা বিকাশের উচ্চতম পর্যায়ে আল্লাহর প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম। অবশ্য এর জন্য আত্মাকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উপযুক্ত করে তুলতে হয়। এ সম্প্রদায়ের ইতিহাস দুঃখকষ্ট ও সংগ্রামের ইতিহাস। তাদের দর্শন ছিল এক ধরণের সর্বেশ্বরবাদী অধ্যাত্মবাদ।...অপরকে সাহায্য করাই ছিল তাদের জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য।...তারা যাপন করে এক শান্ত ও বিনম্র জীবন, আর নিজদের দর্শনকে পুষ্ট ও বিকশিত করে বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত দার্শনিক প্রভাবে। তারা প্রয়াশী ছিল সব কাল, জাতি ও ধর্মের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সংগ্রহ ও সমন্বয় বিধানে। প্রতিটি বিভাগের জ্ঞানের প্রতি ছিল তাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। এবং জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সব মহল থেকে জ্ঞান আহরণ করাই ছিল তাদের অভীষ্ঠ লক্ষ্য।'[১২] তারা ধর্মকে এক নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেন এবং এক নতুন ব্যাখ্যা দেন। তাদের মতে তত্ত্বের মর্ম উপলব্ধি করা শুধু সুফী সাধকদের পক্ষেই সম্ভব। 'মৃত্যুতে দেহের অবশ্যই অবসান ঘটবে। তবে যারা সত্য ও বাস্তব সত্তার চিন্তার উপযোগী দার্শনিক মনোবৃত্তি গড়ে তুলতে পেরেছেন, মৃত্যু তাদের জন্য পুনর্জীবন লাভ স্বরূপ।'[১৩]

পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ ধর্ম বিশ্বাসের মূলে এক অধ্যাত্মিক দর্শন গড়ে তোলেন, সেখানে সমকালীন জগতের সব জাতি ও ধর্মের জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। মানুষের পক্ষে আল্লাহর সঙ্গে যতটুকু একাত্ম হওয়া সম্ভব ততটুকু একাত্ম হওয়ার প্রয়াসই ছিল তাদের দার্শনিক লক্ষ্য। দেহ নয় আত্মাই মানুষের সারধর্ম। 'নিজেকে জান'– এই ছিল তাদের লক্ষ্য। তাদের মতে, সাধারণ জ্ঞান থেকে শুরু করে মানুষ সৎচরিত্রের অনুশীলন ও লোভ লালসা পরিত্যাগের মাধ্যমে উচ্চতর জ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হতে পারে। ডি. বোয়ার বলেন, 'ভ্রাতৃসঙ্ঘ এমন এক আদর্শ সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করেছিল, যা সম্মিলিত করেছিল বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম থেকে প্রাপ্ত অসংখ্য বৈশিষ্ট্যকে। একজন আদর্শ ব্যক্তির পক্ষে উৎপত্তির দিক থেকে হওয়া উচিত পূর্ব পারস্যদেশীয়, বিশ্বাসে আরব, শিক্ষায় গ্রীক, তীক্ষ্ম বুদ্ধিতে হিব্রু, আচরণে খ্রীষ্টের শিষ্য ধার্মিকতায় সিরীয় সন্ন্যাসীর ন্যায়, সবরকম রহস্যের ব্যাখ্যায় ভারতীয় এবং

Dhaka University Institutional Repository

সর্বোপরি ধর্মীয় জীবনে একজন সুফী।'[১৪] এ সম্প্রদায়ের শিক্ষাবলী শিক্ষিত মানুষের মনে এমন বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, যা আজও নানাভাবে বিদ্যমান। তাদের দার্শনিক শিক্ষা আজও অম্লান ও ভাস্বর হয়ে আছে। পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ, জ্ঞানচর্চা, সততা, সহনশীলতা, ভ্রাতৃত্ববোধ ও আল্লাহর দর্শন লাভের এক অনুসরণযোগ্য আদর্শ প্রতিষ্ঠান।

রাজা রামমোহন রায়ের দর্শনচিন্তার সাথে সাদৃশ্য রয়েছে বিবেকানন্দের চিন্তাধারা। রাজা রামমোহন রায় ঐক্য, শৃঙ্খলা, ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা, রাষ্ট্র, সাহিত্য সমাজ সংস্কার প্রভৃতি বিষয় সমন্বয়ের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনে প্রয়াসী হন। তাঁর এ প্রতিষ্ঠানের নাম "বিশ্ব ধর্মসভা"। ইতিহাসে দেখা যায় এমনি কল্যাণ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক প্রতিষ্ঠান। দূরদর্শী রাজা রামমোহন রায়ের দর্শন বিশ্লেষণ করে, সত্য কার্যকারিতা ও প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এক বাস্তব পরিকল্পনা হচ্ছে "বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন"। রাজা রাম মোহন (১৭৭২-১৮৩৩) জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে ব্রহ্মোপাসনার জন্য 'ব্রাহ্মসমাজ' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বৃহৎ ধর্মীয় মিলন ক্ষেত্র তৈরী করতে চেয়েছেন। তিনি ১৮২৮ খ্রিষ্টাব্দে ভারতের কলকাতায় জোড়াসাঁকোতে রামকমল বসুর বাড়ীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহন সতীদাহ প্রথা, গঙ্গাসাগরে সন্তান বিসর্জন, জগন্নাথের চাকার নীচে মৃত্যুবরণ এবং আরও নানাবিধ কুসংস্কার চিরতরে নির্মূল করেন এবং বাহ্যিক আচার ধর্মের পরিবর্তে ধর্মের অন্তর্নিহিত শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেন। রামমোহন তাঁর ধর্ম সমীক্ষায় ব্রাহ্মসমাজে হিন্দু, মুসলিম, খ্রিষ্টান একমনে বসে উপাসনা করে। এমনি উপাসনার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর ইতিহাসে এর আগে দেখা যায়নি। এ সমাজের মূল কথা "ভাব সেই একে"। মানিবাগচি রামমোহন সম্পর্কে বলেন, 'ভারতে দার্শনিক ও ধর্মগুরু আমরা অনেক পাইয়াছি। পাই নাই শুধু এমন একটি মণীষা, যা ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্র, সাহিত্য সবকিছুকে মিলাইয়া বিভিন্ন ধর্মের, বিভিন্ন ভাষার বিচিত্র জনশক্তি লইয়া এক সর্বভারতীয় মন্ত্রে উদ্বোধিত করিবে। রামমোহনের সেই মণীষা ছিল। জাতি মানব ও রাষ্ট্রের স্বার্থকতার উদ্দেশ্যেই তাঁহার ধর্মানুশীলন।'[১৫] জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে মানবকল্যাণের লক্ষ্যে ব্রাহ্মসমাজের এক নতুন রূপ ও নতুন সংস্করণ হলো বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন। যুদ্ধোন্মত্ত অশান্ত পৃথিবীতে শান্তভাবে রামকৃষ্ণ মিশনের মত আধ্যাত্মিক শিক্ষার উজ্জ্বল জ্যোতি বিকিরণ করে মানবকল্যাণ সাধনের নিরন্তর প্রয়াস চালাবে ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন। এ প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ঐক্য, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি, শিল্প-সাহিত্যের উন্নতি, অধ্যাত্মদর্শন প্রচার ও জনসেবা।

রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে খ্রীষ্ট মিশন ও বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রভাব অপরিসীম। ১৯১০ সালে প্রকাশিত নিবেদিতার The master as I saw him গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়- 'তিনি (স্বামীজী) নিজে আশৈশব সাধুদিগের মঠাদি পরিচালনা বিষয়ে জানিতে উৎসুক ছিলেন। এক সময়ে তিনি একখানি ইশা-অনুসরণ (Imitation of Christ) পুস্তক পাইয়াছিলেন। তাহার মুখবন্ধে উক্ত গ্রন্থের আনুমানিক রচয়িতা জাঁ-দ্য-জেসঁ (Jean de Gerson) যে-মঠভুক্ত ছিলেন তাহার এবং তদনুসৃত নিয়মাবলীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ ছিল। এই মুখবন্ধটি স্বামীজীর কল্পনায় পুস্তকখানি রত্নস্বরূপ ছিল। উহা পুনঃ পুনঃ পাঠ করিয়াও তাহার তৃপ্তি হইল না। ক্রমে উহা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়া গেল এবং তাঁহার বাল্যের স্বপ্নের সহিত বিশেষভাবে জড়িত হইয়া গেল। অবশেষে মধ্য বয়সে তিনি দেখিয়া বিস্মিত হইলেন যে, তিনি নিজেই ভাগীরথীতটে অপর এক সন্ন্যাসী-সঙ্ঘের স্থাপনা করিতেছেন এবং বুঝিলেন যে, তাঁহার শৈশবের ঐ বিষয়ে ঐকান্তিক অনুরাগ ভবিষ্যতেরই পূর্ব-ছায়া পাত মাত্র।'[১৬]

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম মহাসম্মেলনে সভাপতি স্বামী শিবানন্দের ভাষণে রামকৃষ্ণ মিশন গঠনে বৌদ্ধ প্রভাবের সঙ্গে পাশ্চাত্য প্রভাবের বিষয়ে স্বীকৃতি ছিলঃ 'প্রাচীন ভারতের বৌদ্ধ সঙ্ঘ, সেইসঙ্গে আধুনিক প্রগতিশীল পাশ্চাত্যের সুশৃঙ্খল সংগঠিত প্রয়াসাদি, হয়ত স্বামীজীর মনে এমন একটি সঙ্ঘ স্থাপনের ইচ্ছার উদ্রেক করেছিল, যা উপযুক্ত নিয়ম-শৃঙ্খলার অধীনে থেকে তাঁর আচার্যদেবের শিক্ষাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে সমর্থ হবে।'[১৭] ১৮৯৭ সালে, ১লা মে বিবেকানন্দ 'রামকৃষ্ণ মিশন অ্যাসোসিয়েশন' স্থাপনের প্রস্তাব করে বলেন, 'নানা দেশ ঘুরে আমার ধারণা হয়েছে, সঙ্ঘ ব্যতীত কোন বড় কাজ হতে পারে না।'[১৮] শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হলো সর্ব ধর্মের মিলন ও সমন্বয় ভূমি। তাঁর অক্লান্ত ও সুদক্ষ সাধনায় ভারতের যে সুপ্ত অধ্যাত্ম চেতনা প্রবুদ্ধ হয়েছিল তাই রামকৃষ্ণ সঙ্ঘাকারে রূপায়িত হয়ে উঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ যে সত্যের দ্রষ্টা ও প্রতিপাদয়িতা, বিবেকানন্দ তার প্রবক্তা ও প্রচারক, আর শ্রীশ্রী সারদাদেবীর জীবন সেই সত্যের আদর্শ রূপায়ণ। সঙ্ঘের বীজ বপন করেন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ, এটির

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন জননী সারদামণি। আর নরেন্দ্রের উপর অর্পিত হয় পরিবর্ধনের গুরুদায়িত্ব। সমগ্র মানব জাতির বিশেষ প্রয়োজন সংসিদ্ধির জন্য এই একই মহাশক্তির ত্রিধা প্রকাশ।

'১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৬ই আগষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাসংবরণ করিলে সন্ন্যাসীসঙ্ঘ সম্যকভাবে গড়িয়া তুলিবার গুরুদায়িত্ব নরেন্দ্রনাথের উপর অর্পিত হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোধানের অত্যল্পকালের মধ্যে বরাহনগরে এক জীর্ণ ভাড়াটিয়া গৃহে উক্ত ব্যৎসরই অনাড়ম্বরভাবে রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের প্রথম মঠ স্থাপিত হইল এবং নরেন্দ্রনাথ তাঁহার অপরিসীম ধৈর্য, উৎসাহ, বিরাট ব্যক্তিত্ব ও প্রবল আকর্ষণীয় শক্তি দ্বারা শ্রীরামকৃষ্ণের কৌমারবৈরাগ্যবান্ শিষ্যবৃন্দের প্রায় সকলকেই এই নব প্রতিষ্ঠিত মঠে সঙ্ঘ জীবন যাপনোদ্দেশ্যে একত্র করিলেন। অতঃপর বরাহনগর মঠেই কোন এক সময় ত্যাগী যুবকগণ আনুষ্ঠানিকভাবে আচার্য শঙ্কর-প্রবর্তিত সন্ন্যাসী সম্প্রদায়োচিত নামে ও গৈরিক বস্ত্র ধারণ করিলেন এবং তীব্র বৈরাগ্য, কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, পূজা, ধ্যান, জপ ও স্বাধ্যায়াদির সহায়ে সকলে স্ব স্ব আধ্যাত্মিক জীবন গড়িয়া তুলিতে যত্নপর হইলেন।'[১৯] '১৮৯২ সালে বরাহনগর হইতে মঠ আলম বাজারে স্থানান্তরিত হয়। প্রতীচ্যখণ্ডে বেদান্তধর্মের বীজ বপন করিয়া ১৮৯৭ সালের ১৫ই জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং অচিরে নূতন মঠে গুরুভ্রাতৃবর্গের সঙ্গে পুনর্মিলিত হইলেন। তিনি ঐ বৎসরই ১লা মে রামকৃষ্ণদেবের সন্ন্যাসী ও গৃহী শিষ্যগণকে একত্র করিয়া তাঁহাদের সমবেত সাহায্যে 'রামকৃষ্ণ মিশন' নাম দিয়া একটি প্রসারসমিতি গঠন করিলেন- যাহার প্রধান উদ্দেশ্য– (১) সকল ধর্মকে একই সনাতন ধর্মের বিকাশ মনে করিয়া বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণের মধ্যে ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা; (২) উন্নত চরিত্র কর্মী তৈরি করা, যাহারা বিজ্ঞান ও অন্যান্য বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ করিয়া জনসাধারণের জাগতিক ও অধ্যাত্মিক উন্নতি বিধানকল্পে আত্মোৎসর্গ করিবে; (৩) ভারতের শিল্প, সাহিত্য, ললিত কলাদির উন্নতি ও বিস্তার সাধন করা; (৪) শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সর্বজনীন শিক্ষার আলোকে জনসাধারণের মধ্যে বেদান্ত ও অন্যান্য ধর্মের প্রকৃত আদর্শ প্রচার করা; এবং (৫) জাতি-ধর্ম নির্বিচারে নর নারায়ণ জ্ঞানে আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁহার বহুকালপোষিত এই পরিকল্পনা গুরুভ্রাতৃগণের সহায়তায় রূপায়িত করিয়া তুলিতে পারিয়া বিশেষ স্বস্তিবোধ করিলেন এবং সঙ্ঘের সন্ন্যাসীবৃন্দ ও স্বামীজীর ইচ্ছাকে শ্রীরামকৃষ্ণেরই আদেশ মনে করিয়া উৎসাহের সহিত বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।'[২০] রামকৃষ্ণ মিশনের শিক্ষা ও আদর্শের মত ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন ক্রমেই বিশ্ববাসীকে মানবকল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধ করবে। সাম্প্রতিক কালের মুসলিম চিন্তাবিদ খানবাহাদুর আহ্ছান উল্লাহ (১৮৭৩-১৯৬৫) রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেরণায় মানবকল্যাণ সাধনের জন্য আহ্ছানিয়া মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। পিথাগোরীয় সম্প্রদায়, পবিত্র ভ্রাতৃসঙ্ঘ, ব্রাহ্মসমাজ রামকৃষ্ণ মিশন ও আহ্ছানিয়া মিশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ঐতিহাসিক, তাত্ত্বিক ও দার্শনিক ভিত্তি এবং মানবকল্যাণ সাধনের সমন্বিত বৈশিষ্ট্য হলো ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন।

মহাজাতি সদন

একবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সভ্যতার এই পৃথিবীতে বহু জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও মতের মানুষের বসবাস। প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার, জ্ঞান অর্জন করার, কথা বলার ও কর্ম করার অধিকার রয়েছে। নিজের যেমন সকল কাজের অধিকার রয়েছে তেমনি অপরের কাজ করার অধিকার রয়েছে। তাই কেউ কারও অধিকার খর্ব করে, অস্বীকার করে কারও কাজে হস্তক্ষেপ করা, বাধা দেওয়া উচিত নয়। তাহলেই সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব সংঘাত, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ। তাই আমাদের শান্তিপূর্ণ সমাজ দেশ ও বিশ্ব গড়ে তোলার জন্য প্রথম প্রয়োজন একটি মহাজাতি সদন প্রতিষ্ঠা করা। এখানে প্রত্যেকেই সম্মিলিত ভাবে একই মঞ্চে স্বধর্মের কথা, নিজ মতবাদের কথা, দুঃখ-বেদনা, অভাব অভিযোগ, সঙ্কট, সমস্যা ও সমাধান, আশা, কল্যাণ ও মুক্তির কথা বলতে পারবে। প্রত্যেকের কথা মনোযোগ দিয়ে বুঝে উপলব্ধি করে সাড়া দিয়ে তা যথাযথ বাস্তবায়ন করতে হবে। আর এভাবেই সকল ধর্ম-বর্ণ সম্প্রদায় ও মতের মানুষের ঐক্য, সমন্বয় ও শান্তির এক মহাজাতি সদন হলো "বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউণ্ডেশন"।

দূরদর্শী সমাজ সংস্কারক বিবেকানন্দের মত বিশ্বকবি ও সমাজ বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাংলাদেশের অতীত গৌরব এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠনের পথ নির্দেশ করেন তাঁর "মহাজাতি-সদন" প্রবন্ধে। 'আমার বিশ্বাস, য়ুরোপীয় সংস্কৃতি ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম বাংলাদেশের অন্তঃকরণ গভীরভাবে স্পর্শ করেছিল, নানা দিক থেকে বিচলিত করেছিল তার মন। মুক্তির বেগ লাগল তাঁর জীবনে, তাঁর মননশক্তি জাগরিত হয়ে উঠল পূর্বযুগের অজগর নিদ্রা থেকে। বুদ্ধির সর্বজনীনতা, দৃষ্টির সর্বব্যাপকতা, সর্বমানবের পরিপ্রেক্ষণিকায় মানবত্বের উপলব্ধি বাংলাদেশেই রামমোহন রায়ের মতো মহামনীষীদের চিত্তে অপূর্ব প্রভাবে অকস্মাৎ আবির্ভূত হল। আচার ধর্ম ও রাষ্ট্রীয়-বন্ধনের

Dhaka University Institutional Repository

মুক্তি বাংলাদেশেই সর্ব প্রথমে উদ্যত হয়ে উঠেছিল। অতি অল্পকালের মধ্যে চলৎশক্তিমতী হয়ে উঠল বাংলা ভাষা, তাঁর আড়ষ্টতা ঘুচে গেল নবযৌবন সঞ্চারে, সাহিত্য দেখা দিতে লাগল অভূতপূর্ব সফলতার আশা বহন করে, পৃথিবীর আদিযুগে যেমন করে দ্বীপ উঠেছিল সমুদ্রগর্ভ থেকে নব নব প্রাণের অন্নদায়িনী আশ্রয় ভূমি হয়ে। চিত্রকলা বাংলাদেশে সর্বপ্রথমে অনুকরণের জাল ছিন্ন করে ভারতীয় স্বরূপের বিশিষ্টতালাভের সন্ধানে বিদেশীয় চরণচারণ চক্রবর্তীদের তীব্র বিদ্রূপের বিরুদ্ধে জয়ী হল। গীতকলা আজ এই বাংলাদেশেই গতানুগতিকতা প্রভুত্ব কাটিয়ে, কুলত্যাগের কলঙ্ক স্বীকার ক'রে, নূতন প্রকাশের অভিসারে চলেছে- তার আশু ফলের বিচার করার সময় হয়নি, কিন্তু পণ্ডিতেরা যাই বলুন, নবনবোন্মেষের পথে প্রতিভার মুক্তি কামনা এর মধ্যে যা দেখা যাচ্ছে তার থেকেই বাংলাদেশের যথার্থ প্রকৃতির নিরূপণ হতে পারে।

প্রাণের স্পর্শশক্তি যেখানে প্রবল সেখানে প্রাণের সাড়া পেতে দেরি হয় না। যতদূর থেকেই আহ্বান আসুক, নবযুগের সাড়া দিতে বাংলাদেশ প্রথম হতেই জড়তা দেখায়নি- বাংলাদেশের এই গৌরব এবং এই সত্য পরিচয়। এ কথা কারো অগোচর নেই যে, একদা রাষ্ট্রমুক্তি সাধনার সর্বপ্রথম কেন্দ্রস্থল ছিল এই বাংলাদেশ এবং যে দুর্যোগের দিনে এই প্রদেশের নেতারা কারা প্রাচীরের নেপথ্যে ছিলেন তখন তরুণের দল দেশের অপমান দূর করবার জন্যে বধবন্ধনের মুখে যেমন নির্বিচারে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের অন্য কোনো প্রদেশে কখনোই এরকম ঘটেনি। এ ঘটনাকেও ফলের দ্বারা বা শান্ত সুবুদ্ধির আদর্শে বিচার করব না, বিচার করব মুক্তির জন্যে দুঃসহ বেদনার মূল্য-অনুসারে। বাংলাদেশের সহস্রাধিক তরুণ প্রাণ সুদীর্ঘকাল কারা নির্বাসনে আপন দীপ্তি নির্বাপিত করেছে– জানি, সেইজন্যে আজ বাংলাদেশের আকাশ অনুজ্জ্বল; কিন্তু সেইসঙ্গে এও জানি, যে মাটিতে এদের জন্ম সেই মাটিতে দুঃখজয়ী বীর সন্তান আবার জন্মাবে, তারা পূর্ব অভিজ্ঞতার শিক্ষায় সমাহিত হয়ে ভাঙনের ব্যর্থ কাজে আপন শ্রেষ্ঠ শক্তির অপব্যয় না করে গড়নের কাজে প্রবৃত্ত হবে।

আজ এই মহাজাতি-সদনে আমরা বাংলাজাতির যে শক্তির প্রতিষ্ঠা করবার সংকল্প করেছি তা সেই রাষ্ট্রশক্তি নয়, যে শক্তি শত্রু-মিত্র সকলের প্রতি সংশয়কন্টকিত। জাগ্রত চিত্তকে আহ্বান করি, যার সংস্কারমুক্ত উদার আতিথ্যে মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীণ মুক্তি অকৃত্রিম সত্যতা লাভ করে। বীর্য এবং সৌন্দর্য, কর্মসিদ্ধিমতী সাধনা এবং সৃষ্টিশক্তিমতী কল্পনা, জ্ঞানের তপস্যা এবং জনসেবার আত্মনিবেদন– এখানে নিয়ে আসুক আপন আপন বিচিত্র দান। অতীতের মহৎ স্মৃতি এবং ভবিষ্যতের বিপুল প্রত্যাশা এখানে আমাদের প্রত্যক্ষ হোক। বাংলাদেশে যে আত্মিক মহিমা নিয়ত পরিণতির পথে নবযুগের নবপ্রভাতের দিকে চলেছে, অনুকূল ভাগ্য যাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং প্রতিকূলতা যার নির্ভীক স্পর্ধাকে দুর্গম পথে সম্মুখের দিকে অগ্রসর করছে সেই তার অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্ব এই মহাজাতি-সদনের কক্ষে কক্ষে বিচিত্র মূর্তরূপ গ্রহণ করে বাঙালিকে আত্মোপলব্ধির সহায়তা করুক। বাংলার যে জাগ্রত হৃদয় মন আপন বুদ্ধি ও বিদ্যার সমস্ত সম্পদ ভারতবর্ষের মহাদেবী তলে উৎসর্গ করবে বলেই ইতিহাসবিধাতার কাছে দীক্ষিত হয়েছে, তার সেই মনীষিতাকে এখানে আমরা অভ্যর্থনা করি। আত্মগৌরবে সমস্ত ভারতের সঙ্গে বাংলার সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য থাকুক, আত্মাভিমানের সর্বনাশা ভেদবুদ্ধি তাকে পৃথক না করুক– এই কল্যাণ ইচ্ছা এখানে সংকীর্ণচিত্ততার ঊর্ধ্বে আপন জয়ধ্বজা যেন উড্ডীন রাখে। এখান থেকে এই প্রার্থনামন্ত্র যুগে যুগে উচ্ছ্বসিত হতে থাক্–

বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা,
সত্য হউক–সত্য হউক–সত্য হউক হে ভগবান!
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন
বাঙালির ঘরে যত ভাইবোন,
এক হউক–এক হউক–এক হউক হে ভগবান!'[২১]

মানবকল্যাণ সাধনের জন্য বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-জাতির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসের মিলনস্থল হলো ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন।

ঐশীদর্শন বিশ্ববিদ্যালয় (University of Divine Philosophy)

জীবন ও সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্যে এক বিশ্বজনীন ঐশীজ্ঞান সৃজন, আহরণ ও বিতরণের জন্য ঐশীদর্শন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। এটি হবে মানবতাবাদী দেশপ্রেমিক সমাজসেবী ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কল্যাণমূলক শিক্ষায় আলোকিত হবে সমগ্র পৃথিবী। স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং

Dhaka University Institutional Repository

এমন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। 'এক সময়ে স্বামীজীর পরিকল্পনা ছিল এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে একদিকে যেমন প্রাচ্যের বেদ-বেদান্তের শিক্ষা প্রসারিত হবে, অন্যদিকে তেমনি পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সহায়তায় উন্নত স্তরের শিক্ষা ও গবেষণার কাজ চলবে। ...আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও বেলুড় মঠকে কেন্দ্র করে সারা দেশে এক ভাবগত বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। লোকশিক্ষা পরিষদও এই ভাবনার অংশীদার হয়ে এক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় (ওপেন ইউনিভার্সিটি)-এর কল্পনা করছে। (বর্তমানে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে)। নরেন্দ্রপুর তার মূল্য কেন্দ্র, কিন্তু আসল কাজ চলছে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে থাকা বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে। লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণার কাজ নরেন্দ্রপুরে অনুষ্ঠিত হবে।...বিভিন্ন উচ্চ পর্যায়ের দেশের এবং বিদেশের, সরকারী ও বেসরকারী সংগঠনের কর্মীদের এখানে প্রশিক্ষণ হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচী ছাড়াও গত কয়েক বৎসর ধরে নরেন্দ্রপুরে বেশ কয়েকটি গবেষণা এবং মূল্যায়নের কাজও হাতে নেওয়া হয়েছে। এই সব গবেষণালব্ধ অভিজ্ঞতা একদিকে যেমন আমাদের নিজস্ব সংগঠনগুলো কাজে লাগাচ্ছে তেমনি অন্যদিকে বাইরের সরকারী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোও এ সবের দ্বারা উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে একটা কথা আমি জোর দিয়ে বলতে চাই-তা হচ্ছে, এক উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা ও গবেষণা গ্রাম পর্যায়ের সংগঠনগুলো থেকে বিচ্ছিন্নভাবে কাজ করছে না। এসবগুলোই আমাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সংগঠনগুলির কর্মসূচীর সঙ্গে একান্তভাবে জড়িত।'[২২] বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয় ও আধ্যাত্মিক শক্তির ভিত্তি রচনা করতে চেয়েছেন।

বিবেকানন্দের বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের মত এক অভিনব পরিকল্পনা করেন পরিবেশ বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কলকাতার কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের দ্বারা গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। এ সম্পর্কে তিনি "পল্লী প্রকৃতি" প্রবন্ধে লিখেন, 'আমার প্রস্তাব এই যে, বাংলাদেশের যেখানে হোক একটি গ্রাম আমরা হাতে নিয়ে তাকে আত্মশাসনের শক্তিতে সম্পূর্ণ উদ্‌বোধিত করে তুলি। সে গ্রামের রাস্তা ঘাট, তার ঘর বাড়ির পরিপাট্য, তার পাঠশালা, তার সাহিত্যচর্চা ও আমোদ প্রমোদ, তার রোগী পরিচর্যা ও চিকিৎসা, তার বিবাদনিষ্পত্তি প্রভৃতি সমস্ত কার্যভার সুবিহিত নিয়মে গ্রামবাসীদের দ্বারা সাধন করাবার উদ্যোগ আমরা করি। যাঁরা এ কাজে প্রবৃত্ত হবেন তাঁদের প্রস্তুত করবার জন্যে আপাতত কলকাতায় একটা নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করা আবশ্যক। এই বিদ্যালয়ে স্বেচ্ছাব্রতী শিক্ষকদের দ্বারা প্রজাস্বত্বসম্বন্ধীয় আইন, জমি-জরিপ ও রাস্তাঘাট ড্রেন পুকুর ঘরবাড়ি তৈরি, হঠাৎ কোনো সাংঘাতিক আঘাত প্রভৃতির উপস্থিতমত চিকিৎসা ও কৃষিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে মোটামুটি শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা থাকা কর্তব্য। পাশ্চাত্য দেশে গ্রাম প্রভৃতির আর্থিক ও অন্যান্য উন্নতি সম্বন্ধে আজকাল যে-সব চেষ্টার উদয় হয়েছে সে সম্বন্ধে সকল প্রকার সংবাদ এই বিদ্যালয়ে সংগ্রহ করা দরকার হবে। পল্লী গ্রামে নানা স্থানেই দাবত্য চিকিৎসালয় এবং মাইনর ও এনট্রেন্স্ স্কুল আছে। যাঁরা পল্লী গঠনের ভার গ্রহণ করবেন তাঁরা যদি এইরকম একটা কাজ নিয়ে পল্লীর চিত্ত ক্রমে উদ্‌বোধিত করার চেষ্টা করেন তবে তাঁরা সহজেই ফললাভ করতে পারবেন এই আমার বিশ্বাস। অকস্মাৎ অকারণে পল্লীর হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশলাভ করা দুঃসাধ্য। ডাক্তার এবং শিক্ষকের পক্ষে গ্রামের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে ঘনিষ্ঠতা করা সহজ। তাঁরা যদি ব্যবসায়ের সঙ্গে লোকহিতকে মিলিত করতে পারেন, তবে পল্লী সম্বন্ধে যে-সমস্ত সমস্যা আছে তার সহজ মীমাংসা হয়ে যাবে। এই মহৎ উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে একদল যুবক প্রস্তুত হতে থাকুন, তাঁদের প্রতি এই আমার অনুরোধ।'[২৩] বর্তমান সামাজিক সঙ্কট নিরসন করে মানবকল্যাণ সাধনের জন্য বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের অব্যর্থ সমাজশিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরী।

আধ্যাত্মিক শক্তির বিদ্যুদাধার

বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের মত বিশ্ব ঐশীদর্শন প্রতিষ্ঠানটি হলো এক মহাআধ্যাত্মিক শক্তির বিদ্যুদাধার। বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক সূর্যালোকই অশান্ত পৃথিবীর অন্ধকার দূর করে শান্তি ও কল্যাণের আলোক প্রজ্জ্বলিত করবে। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজস্ব প্রবণতা অনুসারে নিজস্ব পথে উন্নতির দিকে অগ্রসর হয়। বিবেকানন্দ বলেন, সনাতন ধর্ম মতে, 'অনন্ত পূর্ব জন্মের কর্মফলে মানুষের জীবন একটি বিশেষ নির্দিষ্ট পথে চলিয়া থাকে; কারণ অনন্ত অতীতকালের কর্ম সমষ্টিই বর্তমান আকারে প্রকাশ পায়; আর আমরা বর্তমানের যেরূপ ব্যবহার করি, তদনুসারেই আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন গঠিত হইয়া থাকে। এই কারণেই দেখা যায়, এসংসারে জাত প্রত্যেক ব্যক্তিরই একদিকে না একদিকে বিশেষ ঝোঁক থাকে; সেই পথে তাহাকে যেন চলিতেই হইবে; সেই ভাব অবলম্বন না করিলে সে বাঁচিতে পারিবে না। ব্যক্তি সম্বন্ধে যেমন, ব্যক্তির সমষ্টি জাতি সম্বন্ধেও ঠিক তাই। প্রত্যেক জাতির

Dhaka University Institutional Repository

যেন একটি বিশেষ ঝোঁক থাকে। প্রত্যেক জাতিরই জীবনের যেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে।'[২৪] বাংলাদেশ বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ ও জাতির আবাস ভূমি সত্ত্বেও- প্রত্যেক জাতি একই আধ্যাত্মিক ঐক্য সূত্রে গাঁথা। ভারতের মত বাংলাদেশও মুসলিম সুফী সাধক, পীর-মুর্শিদ,বাউল, সাধক দরবেশ, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্ট বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের মানুষের অধ্যাত্মিক লীলাভূমি। বাঙালী জাতির মূল শক্তি হলো সেই এক অনন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি। সমগ্র মানব জাতির জীবন সর্বাঙ্গ সুন্দর করার জন্য প্রত্যেক জাতিকে একটি বিশেষ ব্রত পালন করতে হয়। তা হলো নিজ নিজ আত্মার মুক্তির পথে চালিত হয়েই প্রত্যেক জাতিকে সেই জাতীয় জীবন গঠনের ব্রত পালন করতে হয়। বিবেকানন্দ বলেন, 'রাজনীতি বা সামরিক শ্রেষ্ঠতা কোন কালে আমাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য নহে-কখন ছিলও না, আর জানিয়া রাখুন, কখন হইবেও না। তবে আমাদের জাতীয় জীবনের অন্য উদ্দেশ্য আছে, তাহা এইঃ সমগ্র জাতির আধ্যাত্মিক শক্তি সংহত করিয়া যেন এক বিদ্যুদাধারে রক্ষা করা এবং যখনই সুযোগ উপস্থিত হয়, তখনই এই সমষ্টীভূত শক্তির বন্যায় সমগ্র পৃথিবী প্লাবিত করা। যখনই পারসীক, গ্রীক, রোমক, আরব বা ইংরেজরা তাহাদের অজেয় বাহিনীসহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া বিভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছে, তখনই ভারতের দর্শন ও অধ্যাত্ম বিদ্যা- এই সকল নূতন পথের মধ্য দিয়া জগতে বিভিন্ন জাতির শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে।'[২৫] সমগ্র মনুষ্য জাতির উন্নতিকল্পে শান্তিপ্রিয় বাঙালি জাতিরও কিছু দিবার আছে- বাংলাদেশের আধ্যাত্মিক শক্তির উজ্জ্বল জ্যোতিই দান করবে বিশ্ববাসীর কল্যাণে।

সদস্যগণের শ্রেণী বিভাগ

বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন মানবকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সদস্য আহ্বান করবে। বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণের মানুষ নির্ধারিত ভর্তি ফরম পূরণ করে সদস্যপদ লাভ করবেন। সদস্যগণ বেদান্তদর্শনের অনুরূপ ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ্য এবং সন্ন্যাস-এর মত চারটি স্তরে বিভক্ত হয়ে সেবামূলক কাজ করবেন। প্রত্যেক স্তরের সদস্যগণের পৃথক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মানুশীলনের ব্যবস্থা থাকবে। সদস্যগণ ইচ্ছা, আগ্রহ, আন্তরিকতা, কর্মদক্ষতা ও অধ্যবসায় অনুযায়ী পর্যায়ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ স্তরে উন্নীত হবেন। তাঁরা মুক্তির জন্য জ্ঞানচর্চা, সেবা ও আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে ক্রমোন্নতি লাভ করবেন।

প্রথম স্তরঃ এ স্তরের সদস্যগণ "লৌকিক জ্ঞান" এর অধিকারী। তারা প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও মানুষের "বন্ধু" নামে অভিহিত হবেন। সদস্যগণ আন্তরিকতার সাথে সমাজ সেবার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে সচেষ্ট হবেন। এ স্তরে সাধারণ লৌকিক জ্ঞানের অধিকারী সদস্যগণ পার্থিব জড়বাদী চিন্তাধারার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চান। তাদের সৃষ্টি রহস্য জানার প্রতি আগ্রহ খুব কম।

দ্বিতীয় স্তরঃ এ স্তরের সদস্যগণ "বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে"-এর অধিকারী। তাঁরা গভীর আন্তরিকতা ও সেবার মাধ্যমে মানুষের আপন "ভাই" বলে অভিহিত হবেন। সদস্যগণ মানবকল্যাণের পাশাপাশি ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, প্রকৃতি, সৃষ্টিরহস্য এবং জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করবেন। তাঁরা অধ্যাত্মদর্শন অনুশীলনের এই প্রাথমিক স্তরে ঈশ্বরদর্শন লাভের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন।

তৃতীয় স্তরঃ এ স্তরের সদস্যগণ "দার্শনিক জ্ঞান"-এর অধিকারী। তাঁরা জ্ঞানচর্চা, সেবা ও আধ্যাত্মিক সাধন-প্রণালী অনুশীলনের মাধ্যমে ঈশ্বরদর্শন লাভে অধিকতর মনোযোগী হবেন। এই অধ্যাত্মদর্শন অনুশীলনের মাধ্যমিক স্তরের সদস্যগণ "Super man" বা "সৎলোক" বলে পরিচিত হবেন।

চতুর্থ স্তরঃ এ স্তরের সদস্যগণ উচ্চতর "আধ্যাত্মিক জ্ঞান"-এর অধিকারী হবেন। তাঁরা গুরুর সান্নিধ্যে ঈশ্বরদর্শন লাভের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করবেন। তাঁরা কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনা ও মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করবেন। তাঁরা প্রতিটি চিন্তা, কথা ও কাজে হবেন প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিক। এ স্তরের উচ্চতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন সদস্যগণ একটি কাল্পনিক (Autopia) আদর্শ প্রতিষ্ঠান "Bangladesh Great Power Research Institute"-এর সদস্যপদ লাভ করবেন। কারণ তাঁরা সর্বদা এক মহাশক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী প্রভুর প্রত্যক্ষ উপলব্ধি অর্জন করবেন। এ স্তরের সদস্যগণ "সালেক" নামে পরিচিত হবেন।

বিশ্ব সংগঠন

রামকৃষ্ণমিশন ও লোকশিক্ষা পরিষদের মত বিশ্ব ঐশীদর্শন প্রতিষ্ঠানটিও একটি বিশ্ব সংগঠন। প্রতিষ্ঠানটি মানবকল্যাণ সাধনের জন্য স্বদেশ ও বিদেশে সত্য প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ দর্শন আন্দোলনের প্রভাব যেমন সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে, তেমনি এ প্রতিষ্ঠানের অধ্যাত্মদর্শনও সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে। এ ক্ষেত্রে লোকশিক্ষা পরিষদের প্রভাব উল্লেখ করা যায়। "...সমাজশিক্ষা' নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন

Dhaka University Institutional Repository

লোকশিক্ষা পরিষদের মাসিক মুখপাত্র এবং লোকশিক্ষা পরিষদের বিরাট কর্মকাণ্ডের অংশীদার তথা বার্তাবহ শ্রীরামকৃষ্ণ আন্দোলনে গ্রাম, সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক মুখপাত্র হয়ে নিশ্চয়ই সমাজ শিক্ষা গৌরবান্বিত এবং বিগত ৫০ বছর ধরে সে সাধ্যমত চেষ্টা করেছে শুধু গ্রাম গ্রামান্তরে নয়, দেশ-দেশান্তরে ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে, বাংলাদেশ, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, কানাডা, এমন কি রাশিয়াতেও সংখ্যায় সামান্য হলেও পাঠক সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছে এবং এইভাবে লোকশিক্ষা পরিষদের কর্মকাণ্ডের কথা পৌঁছে দিচ্ছে।"[২৬] বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের তিনটি প্রধান বিভাগ থাকবে।

১. প্রচার বিভাগ
২. শিক্ষা বিভাগ
৩. সেবা বিভাগ

ত্রাণ পুনর্বাসন ও বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্যাবলী।

নেতৃত্ব ও সঙ্ঘ পরিচালনা

সমাজ সংস্কার দীর্ঘ ও নিরলস প্রচেষ্টার কাজ। সমাজ সংস্কারের জন্য প্রথমে সংস্কারকর্মী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। সমাজ কর্মীগণ বিভিন্ন শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ সাধন করতে পারেন। মানবকল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজন যোগ্য নেতৃত্ব ও সঠিকভাবে সঙ্ঘ পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা। নেতৃত্বের গুণাবলী সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'সংগঠনের প্রথম কথাই হইল আনুগত্য। Organization- এর প্রথম আবশ্যক এই যে Obedience (আজ্ঞাবহতা)। যখন ইচ্ছা হলো একটু কিছু করলাম, তারপর ঘোড়ার ডিম, তাতে কাজ হয় না। Plodding industry এবং perseverance (ধীরস্থির ভাবে পরিশ্রম ও অধ্যবসায়) চাই।'[২৭] সাংগঠনিক কাজের জন্য প্রয়োজন সাহস। যার মনে দুর্বলতা নেই, স্বার্থপরতা নেই, তার কিসের ভয়? বিবেকানন্দের আশ্বাসবাণী ও সাবধান বাণী হলো, 'এইটি জেনে রেখো, যখনই তুমি সাহস হারাও তখনি তুমি শুধু নিজের অনিষ্ট করছ তা নয়, কাজেরও ক্ষতি করছ। অসীম বিশ্বাস ও ধৈর্য্যই সফলতা লাভের একমাত্র উপায়।'[২৮] বিবেকানন্দ অন্যত্র বলেন, 'যতদিন তোমাদের ঈশ্বর ও গুরুর ওপর অনুরাগ থাকবে, আর সত্যের ওপর বিশ্বাস থাকবে, ততদিন হে বৎস, কিছুতেই তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। কিন্তু এর মধ্যে একটি গেলেই বিপদ।...আমার সন্তানগণের মধ্যে কেউ যেন কাপুরুষ না থাকে।... আমি লৌহবৎ দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি ও হৃদয় চাই, যা কিছুতেই কম্পিত হয় না।'[২৯] রামকৃষ্ণ মিশনের একশত বৎসরের ইতিহাসে বহুবার প্রমাণিত হয়েছে যে, সাহসী বক্তিগণ হৃদয়ে বিবেকানন্দের আশীর্বাদী প্রেরণা লাভ করে থাকে। তিনি সঙ্ঘ পরিচালনার জন্য শক্তির কেন্দ্রীকরণ সম্পর্কে বলেন- 'সকল বিষয়ে আজ্ঞাবহতা শিক্ষা কর। গুরু জনের অধীন হইয়া চলা ব্যতীত কখনোই শক্তির কেন্দ্রীকরণ হইতে পারে না। আর এইরূপ বিচ্ছন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত না করিলে কোন বড় কাজ হইতে পারে না।...ঈর্ষা ও অহংভাব তাড়াইয়া দাও। সঙ্ঘবদ্ধভাবে অপরের জন্য কাজ করিতে শিখ।'[৩০] এ কারণে বৃহৎ মানবকল্যাণ সাধনের জন্য ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের সদস্য ও সংস্কার কর্মীগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাঁদের বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলিকে কেন্দ্রীভূত করবেন।

ঈর্ষা এবং অহংকার সংগঠনের বিনাশের মূল কারণ। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন- 'ঈর্ষা সর্পিণী যদি না আসে তো কোন ভয় নাই। মাভৈঃ।...নাম-যশ-কর্তৃত্বের বাসনা জন্মের মতো ত্যাগ করিবে।...চালাকির দ্বারা মহৎ কার্য হয় না। প্রেম, সত্যানুসন্ধান, মহাবীর্যের সহায়তায় সকল কার্য সম্পন্ন হয়। সুতরাং পৌরুষ প্রকাশ কর।'[৩১] বিবেকানন্দ সংগঠনকে ভালবাসিতে শিখিয়েছেন। তিনি চেয়েছেন সংগঠনে যেন কোন কৃত্রিমতা না থাকে। তাই তিনি গুরু ভ্রাতাদের উদ্দেশ্যে লিখেন, "কারুর উৎসাহ ভঙ্গ করতে নাই। Criticism একেবারে ত্যাগ করবে। যতদূর ভাল বোধ হয় সকলকে সাহায্য করবে। যেখানটা ভাল বোধ না হয়, ধীরে ধীরে বুঝিয়ে দেবে। পরস্পরকে Criticise করাই সকল সর্বনাশের মূল। দল ভাঙাবার ঐটি মূলমন্ত্র। 'ও কি জানে?' 'সে কি জানে?' তুই আবার কি করবি?' আর তার সঙ্গে ঐ একটু মুচকে হাসি। ঐগুলো হচ্ছে ঝগড়া বিবাদের মূলসুত্র।...সকলকে তুমি যদি নিঃস্বার্থভাবে ভালবাস, সকলেই ধীরে ধীরে পরস্পরকে ভালবাসিবে।...দশজনে মিলিয়া একটা কার্য করা আমাদের জাতীয় চরিত্রের মধ্যেই নাই। এজন্য ঐ ভাব আনিতে অনেক যত্ন, চেষ্টা ও বিলম্ব সহ্য করিতে হইবে।"[৩২] বিবেকানন্দের ভাষায় কখনও কখনও আগুন ঝরে পড়ত। তীব্র তিরস্কার এবং একই সঙ্গে মহান আশার বাণী ও অনন্ত প্রেমাধার নিয়ে তাঁর অসাধারণ উপলব্ধি যেমন একদিকে এক মোহনীয় সংগঠন গড়ে তোলার মহাপ্রেরণাস্বরূপ হয়ে উঠত, অন্যদিকে সৃষ্টি করত বাংলা ভাষা সাহিত্যের নব নব অনবদ্য সম্পদ।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকানন্দ দূরদৃষ্টির সাহায্যে এখনকার সাংগঠনিক সমস্যাগুলি দেখেছেন। তাই তিনি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা হতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে লিখেন- 'সাধারণ মানুষের ঈর্ষা, হিংসা, গুঁতোগুঁতি দেখে তোমাদের মনে কোন ভাব হওয়া উচিত নয়। দাদা, আজ ছমাস থেকে বলছি যে, পর্দা হচ্ছে, সূর্যোদয় হচ্ছে।...দাদা এসব লিখিবার নহে, বলিবার নহে। আমার পত্র অন্য কেউ যেন না পড়ে, তোমারা ছাড়া। হাল ছেড়ো না।...দাদা leader (নেতা) কি বানাতে পারা যায়? Leader জন্মায়। বুঝতে পারলে কিনা? লিডারি করা আবার বড় শক্ত- দাসস্য দাসঃ, হাজারো লোকের মন যোগানো। Jealousy (ঈর্ষা), selfishness (স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না- তবে leader। প্রথম by birth (জন্মগত), দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ), তবে leader।...Love conquires in the long run, দিক হলে চলবে না- wait, wait। (প্রেমই আখেরে জয়লাভ করে। বিভ্রান্ত হয়ো না, অপেক্ষা কর, অপেক্ষা কর।)...যদি প্রভুর ইচ্ছা [যাহা আমরা সর্বদা বলিয়া থাকি!] তবে তোমরা দলাদলি jealousy পরিত্যাগ করে united action (সমবেত ভাবে) কার্য কর। Shameful (লজ্জার কথা)! আমরা Universal religion (সর্বজনীন ধর্ম) করছি দলাদলি করে!...কারণ, we are the most worthless and superstitious and the most cowardly and lustful of all Hindus (কারণ আমরাই সকল হিন্দুর মধ্যে চরম অপদার্থ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, কাপুরুষ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ জাতি)। পাঁচটা দেখলে ঐটি বেশ করে বুঝতে পারবে। আমাদের সমাত্মা [সমগোত্রীয়] এই গুণে এদের (আমেরিকায়) স্বাধীনতাপ্রাপ্ত কাফ্রিরা- যদি তাদের মধ্যে একজনও বড় হয়, এমনি সবগুলো পড়ে তার পিছুলাগে- white (শ্বেতাঙ্গ)-দের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে পেড়ে ফেলবার চেষ্টা করে। আমরাও ঠিক ঐরকম। গোলাম কীটগুলো, এক পা নড়বার ক্ষমতা নেই-স্ত্রীর আঁচল ধরে তাস খেলে গুড়ুক ফুঁকে জীবনযাপন করে, আর যদি কেউ ঐগুলোর মধ্যে এক পা এগোয়, সবগুলো কেঁউ কেঁউ করে তার পিছু লাগে-হরে হরে।'[৩৩] হীন প্রবৃত্তির মানুষ নিজের উন্নতির পরিবর্তে অপরের উন্নতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে ক্ষতি করে। অথচ হীন প্রবৃত্তির মানুষ অপরের ক্ষতির জন্য যে সময়, মেধা ও শ্রম ব্যয় করে তার চেয়ে সে নিজের উন্নতির জন্য যদি অনেক কম সময় মেধা ও শ্রম ব্যয় করে তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বীর চেয়ে অনেক বেশী উন্নতি করতে পরবে। এ কারণে সততা, সহিষ্ণুতা, ত্যাগ, মেধা ও অধ্যবসায়ের অনুশীলনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নেতা-নেত্রীরা মানবকল্যাণ সাধনের উদ্দেশ্যে সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠানের কর্ম-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন।

বাঁচার শিল্প (Art of living)

বহুত্ববাদী সমাজে রয়েছে 'নানা মুনির নানা মত'। যে কোন প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখার জন্য নিয়ম শৃঙ্খলা প্রয়োজন। যে কোন সংগঠন বিনাশের কারণ হলো অসহিষ্ণুতা, ঈর্ষা, পরস্পরের নামে কর্তৃপক্ষকে নালিশ করা। সংগঠনের সুনাম ও জনগণের অবস্থাকে মূলধন করে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ সিদ্ধির প্রচেষ্টাতে সেই সংগঠন নষ্ট হয়। আমরা যে পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে আছি, সেটিকেই যদি বার বার ক্ষতিগ্রস্থ করার চেষ্টা করি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের দাঁড়ানোর জায়গা থাকবে না। বিবেকানন্দের শিক্ষা হলো, যখন কোন বিষয় মনের মত না হয়, তখনই তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ভদ্রোচিত ভাষায় জানানো প্রয়োজন। প্রত্যেক সদস্য এমন উদার হবেন যে অকুণ্ঠ চিত্তে নির্দ্বিধায় নিজের দোষ স্বীকার করবে। কেউ নিজের দোষ উল্লেখ করলে তা ধৈর্য সহকারে শুনবে। 'আমি যাহা করিয়াছি তাহাই ঠিক, যাহা বুঝিয়াছি তাহাই ঠিক, অপরে যাহা করিয়াছে কিংবা বুঝিয়াছে তাহা ঠিক নহে।'[৩৪] এমন ধৃষ্টতা সংগঠনের জন্য ক্ষতিকারক এবং সকলের জন্য অসম্মান জনক। ভুল করা মানসিক স্বভাব। এমন হতে পারে না- মানুষ কখনও ভুল করবে না। অহঙ্কার বিবর্জিত পারস্পরিক প্রেমের সম্পর্ক থাকলে সে ভুল ব্যক্তিগত বা দলগত যে স্তরেই হউক, তা সহজে সংশোধন ও নির্মূল করা সম্ভব হয়। এই শিক্ষা এক ধরনের art of living বা বাঁচার শিল্প। 'শ্রীশ্রী মায়ের জীবনের অপূর্ব সহিষ্ণুতা, সর্বগ্রাহিতা, অপরকে প্রাপ্য মর্যাদা প্রদানের সামর্থ্য, সকল আশ্রিতের আহার ও থাকার যথাযথ ব্যবস্থাদি করা এবং ঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত লইবার ক্ষমতা দেখিয়া আমরা বুঝতে পারি, অশান্তির নিলয় এই জগৎ-সংসারে যথার্থ art of living কাহাকে বলে।'[৩৫] আর এই art of living- এর শিক্ষার মাধ্যমে টিকে থাকার জন্যই ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রশিক্ষণ

নবীন প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই প্রবীণের মানব সেবার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। "Let nature be thy teacher'- প্রকৃতি আমাদের শিক্ষা প্রদান করুন। পৃথিবীতে মনুষ্য জাতির প্রবাহ চলিতেছে সহস্র সহস্র বৎসর ধরিয়া। এই

Dhaka University Institutional Repository

প্রবাহ কেন স্তব্ধ হইতেছে না? ইহার কারণ কি? গানের ছলে কবি বলিতেছেনঃ 'মরণ কি ভয় দেখাও মোরে/মৃত্যুঞ্জয় জ্ঞানরূপী শিব আছেন আমার এ অন্তরে... শিশু ছিলাম যুবা হয়েছি, বৃদ্ধ হব দুদিন পরে/তেমনি আবার শিশু হব, দেহের নাশে দেহান্তরে ॥'...শৈশব, কৈশোর, যৌবন, পৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য সবই পর পর অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তনশীল অবস্থামাত্র। প্রকৃতিতে 'Old order changeth yielding place to the new' নূতন পৃথিবীর অবির্ভাবের প্রত্যাশায় প্রবীণ নবীনকে স্থান ছাড়িয়া দেয়, নিজেরই বাঁচিবার তাগিদে। যে-কোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনও এইরূপ একটি প্রবাহ স্বরূপ। যেখানে একটি প্রাণরস বিদ্যমান থাকে। ঐ প্রাণশক্তি এক প্রজন্ম হইতে পরবর্তী প্রজন্মে অনুসঞ্চারিত হয়। তাই সংগঠনকে সজীব রাখিতে গেলে নূতন প্রজন্মের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। এইরূপ একটি সুনির্দিষ্ট ধারায় স্বামীজী রামকৃষ্ণ মিশনকে বাঁধিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই সেই পরম্পরা আজও পর্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।'[৩৬] বিবেকানন্দ কর্তৃক রামকৃষ্ণ মিশনের প্রশিক্ষণের মত ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের নবীন সদস্য সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বৃহত্তর মানবকল্যাণ সাধনের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

সদস্যগণের কর্তব্য ও আচরণ: ১. সদস্যগণের চরিত্রগুণ হলো– (ক) ঈশ্বরের প্রতি আনুগত্য এবং (খ) প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্য। ২. সংগ্রাম শীলতায় এই আনুগত্যের প্রকাশ। সদস্যগণকে আগ্রহী ও সচেতন হতে হবে। প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে ভিত্তিহীন ও অসত্য নিন্দার বিরুদ্ধে সদস্যগণকে সরব ও প্রতিবাদী হতে হবে। ত্যাগী সদস্য প্রয়োজন। পরিবার পিছু অন্তত একজন সন্তানকেও ত্যাগের পথে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। সদস্যগণকে 'Assertive' বা রোখালো হতে হবে। দুষ্ট ব্যক্তি চোখ রাঙালে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে, আমরাও চোখ রাঙাতে পারি। 'সংবাদপত্রের মিথ্যা সমালোচনার উত্তরে তথ্যনির্ভর হইয়া সংবাদপত্রেই লিখিতে হইবে।'[৩৭] ৩. নিজ জীবনে ঐশীদর্শনের সত্য ও আদর্শকে প্রতিফলিত করতে হবে। সে জন্য সত্য, ত্যাগ, সেবা, সহানুভূতি, পবিত্রতা, ভালবাসা ও নিঃস্বার্থপরতার আদর্শকে অনুসরণ করতে হবে। ৪. প্রতিষ্ঠানের আদর্শ সাধ্যমত প্রচার করতে হবে। ৫. 'বর্ণবৈষম্য, জাতিবৈষম্য, অর্থনৈতিক বৈষম্য, ধর্মবৈষম্য ও অন্যান্য সকল প্রকার বৈষম্য দূর করিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।'[৩৮] ৬. পণপ্রথা, সকল সমাজিক কুসংস্কার ও ক্ষতিকারক রীতির বিরোধিতা করবে।

বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের নির্দেশাবলী: সংগঠন পরিচালনা করতে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। কিছু সমস্যা তাৎক্ষণিক এবং কিছু দীর্ঘস্থায়ী। জমিজমা-সম্পত্তি কিংবা বাহ্য প্রতিরোধমূলক বা অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি যেন বৃত্তের উপরিস্থিত সমস্যা। কিন্তু আদর্শহীনতা, অহঙ্কার, বিদ্বেষ, চরিত্রহীনতা ইত্যাদি বৃত্তের কেন্দ্রস্থ সমস্যা। কেন্দ্র মজবুত থাকলে ক্রমে ক্রমে সব কিছু নিয়ন্ত্রণে আসবে। তবু বাহ্য নিয়ম-শৃঙ্খলাও বিশেষ জরুরী। এই কারণে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অনুরূপ বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের নিয়মাবলী উল্লেখ করা হলো।

(১) প্রধান কার্যালয়কে 'Religious Trust'-রূপে এবং 'Societies Registration Act'-অনুসারে রেজিষ্ট্রিকৃত হওয়া চাই। প্রতিটি শাখা বা আঞ্চলিক কার্যালয় আধ্যাত্মিক ও নৈতিক আদর্শ অনুসরণ করবে। প্রধান কার্যালয়ের ধারা অনুযায়ী আঞ্চলিক কার্যালয় কার্যক্রম পরিচালনা করবে।

(২) প্রতিটি আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানকে প্রধান কার্যালয়ের সহিত ঘনিষ্ঠ ও বন্ধুত্বপূর্ণ আনুগত্যের সম্পর্ক বজায় রেখে চলতে হবে।

(৩) এসব প্রতিষ্ঠান কোন রাজনীতি বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কোন রকম সংস্রব রাখবে না।

(৪) কোন অসৎ চরিত্র, দোষী বা রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠানের সদস্য করা বা তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখা যাবে না।

(৫) 'প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান টাকা-পয়সার সঠিক হিসাব রাখিবে এবং প্রতি বছরে চার্টার্ড হিসাব পরীক্ষক দ্বারা হিসাব পরীক্ষা করাইবে।'[৩৯]

(৬) 'যে-গ্রাম বা শহরে পরিষদের উৎসব হইবে, সেখানে উৎসবের একদিন প্রাতে ভক্তবৃন্দ ও স্থানীয় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের শোভাযাত্রা সেই গ্রাম বা শহরের প্রধান পথসমূহ পরিক্রমা করিবে এবং শোভাযাত্রার শেষে একটি স্বল্পকালীন জনসভা আয়োজিত হইবে।"[৪০]

(৭) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান গ্রামোন্নয়নমুলক সেবাকাজ করবে।

(৮) প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক পাঠচক্র, প্রবন্ধ রচনা, আবৃত্তি, সঙ্গীত, ভাষণ ইত্যাদি বিষয়ে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবে।

Dhaka University Institutional Repository

(৯) 'প্রতিটি প্রতিষ্ঠান প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও অন্যান্য কারণে ক্ষতিগ্রস্ত বিপন্ন মানুষকে সাহায্যের জন্য ত্রাণকার্যের কর্মসূচী গ্রহণ করিবে।'[৪১]

(১০) প্রতিটি প্রতিষ্ঠান ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতির ক্লাশ ছাড়াও বিভিন্ন পুস্তক বিক্রয়ের ব্যবস্থা করবে। এসব প্রতিষ্ঠান কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের পরিচালনায় সম্মিলিতভাবে বার্ষিক উৎসব পালন করবে। অনুষ্ঠানে আবৃত্তি, ভাষণ, সঙ্গীত ইত্যাদি প্রতিযোগিতা হবে।

বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন এর শাখা কার্যালয়

১. প্রধান কার্যালয় (Head Office): জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রধান কার্যালয় মূল পরিকল্পনা গ্রহণ, প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এসব কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির ১০০ জন সদস্যের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী ঐশী সংসদ গঠিত হবে।

ঐশী সংসদ (Divine Parliament)

একটি ছোট্ট রাষ্ট্র, আমাদের বাংলাদেশ। এই ছোট্ট দেশের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন সহজেই হতে পারে। কারণ বড় বড় রাষ্ট্রগুলোর তুলনায় ছোট রাষ্ট্রে যোগাযোগ, প্রশাসন, পরিকল্পনা প্রণয়ণ সহজেই হতে পারে। রাশিয়া, আমেরিকা, চীন প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন যদি অনেক সুন্দর সুশৃঙ্খল ও কার্যকরী হয়, সে তুলনায় দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তি দেশের উন্নয়নের ভার গ্রহণ করলে সহজেই শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সম্ভব হবে। চাই ত্যাগী ও সাহসী কর্মবীর সৈনিক। এজন্য বিবেকানন্দ বলেছেন, দেশের কাজে বলি দিতে প্রস্তুত এমন অকপট নির্ভীক একশটি তরুণ প্রাণ তাজা যুবক চাই। বিবেকানন্দ যুব সমাজের কল্যাণমূলক কাজের এক অপরিসীম সাহস ও অফুরন্ত আত্মবিশ্বাসের উৎস। তাঁর দিব্য প্রেরণায় মুষ্ঠিমেয় সংগঠিত যুবকই পারে এই বিশ্বকে হাতের মুঠোয় নিতে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের অবিস্মরণীয় বৈপ্লবিক বাণী হল, 'পৃথিবীর ইতিহাস হল আত্মবিশ্বাসী কয়েকজন মাত্র মানুষের ইতিহাস। সে বিশ্বাস ভিতরের দিব্য শক্তিকে বাইরে ডেকে আনে। তখন তুমি সবকিছুই করতে পার। কেবল তখনই পার না, যখন সে অসীম শক্তিকে প্রকাশ করার চেষ্টা কর না। যখনই কোন মানুষ বা কোন জাতি আত্মবিশ্বাস হারায়, তখনই তার মৃত্যু ঘটে। প্রথমে নিজেকে বিশ্বাস কর, তার পারে ভগবানে বিশ্বাস কর। মুষ্টিমেয় কয়েকজন বলিষ্ট মানুষই পৃথিবীকে আন্দোলিত করবে'। তাই বিবেকানন্দের ইচ্ছা, তাঁর স্বপ্ন ও তাঁর দর্শন বাংলাদেশে প্রয়োগ করার জন্য চাই সেই একশজন দেশপ্রেমিক বীর সৈনিক। এ কাজের জন্য বাংলাদেশের রাজধানী, বিভাগ ও জেলা থেকে বাছাই করে আগ্রহী নিঃস্বার্থ ত্যাগী দৃঢ়চিত্ত অপরাজেয় মনোভাবাপন্ন এমন একশজন সৈনিক সংগ্রহ করা হবে। এই ১০০ জন যুবক সংগঠিত হয়ে গঠন করবে শক্তিশালী কার্যক্ষম ঐশী সংসদ (Divine Parliament)। রাজধানী শহরে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের জন্য ১২ জন, ৬টি বিভাগের জন্য ২৪ জন এবং ৬৪ জেলার জন্য ১ জন করে ৬৪ জন্য, মোট ১০০ জন অপরাজেয় দেশ গড়ার সৈনিক কাজ করবে। একজন দক্ষ ও যোগ্য ব্যক্তিই পারেন তার জেলায় শিক্ষা ও উন্নয়নের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে। এসব সৈনিকের অস্ত্র হলো- জ্ঞান, বিবেক, সততা, নৈতিকতা দেশপ্রেম ও আধ্যাত্মিকতা- এক কথায় মনুষ্যত্ববোধ। একজন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান প্রধান সভাপতির নেতৃত্বে এই ১০০ জন সৈনিক সদস্য মাঝে মাঝে একত্রে বসে দেশের সার্বিক উন্নয়ন নিয়ে আলোচনা করে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবেন। তাঁদের এই ঐতিহাসিক সভা আয়োজন করা হবে 'ঐশী সংসদ' ভবনে। বিশ্ব ঐশীদর্শন কেন্দ্রীয় কার্যালয় সচিবালয়ের মত অফিসিয়াল কার্যক্রম পরিচালনা করবে। আর 'ঐশী সংসদ' ভবন জাতীয় সংসদ ভবনের মত আলোচনা সভার সর্বোচ্চ কেন্দ্রস্থল হিসেবে কাজ করবে। এ প্রতিষ্ঠান দেশের প্রতিটি গ্রামে "স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়" স্থাপনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তরিকতার সাথে নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন

পরিচালনা পরিষদ

প্রধান কার্যালয়

১. সভাপতি
২. সহ-সভাপতি
৩. ব্যবস্থাপনা পরিচালক
৪. পরিচালক- প্রশাসন
৫. পরিচালক- অর্থ ও কর্মসংস্থান
৬. পরিচালক- শিক্ষা ও সংস্কৃতি
৭. পরিচালক- কৃষি ও বিজ্ঞান
৮. পরিচালক- শিল্প ও বাণিজ্য
৯. পরিচালক- স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
১০. পরিচালক- ধর্ম ও মাদকাসক্তি নিরাময়
১১. পরিচালক- স্বরাষ্ট্র
১২. পরিচালক- পররাষ্ট্র

↓

বিভাগীয় কার্যালয়

বিভাগীয় গভর্ণর
↓
বিভাগীয় সহকারী গভর্ণর
↓
বিভাগীয় পরিদর্শক
↓
বিভাগীয় সহকারী পরিদর্শক

↓

জেলা কার্যালয়

জেলা সমন্বয়কারী
↓
জেলা সহ-সমন্বয়কারী

↓

থানা কার্যালয়

থানা কর্মকর্তা
↓
থানা সহকারী কর্মকর্তা

↓

ইউনিয়ন কার্যালয়

ইউনিয়ন উন্নয়ন কর্মী
↓
ইউনিয়ন সহকারী উন্নয়নকর্মী

↓

স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়

স্বনির্ভর গ্রাম উন্নয়ন অবকাঠামো
↓
অধিনায়ক বা সভাপতি
মন্ত্রী
কর্মকর্তা
সেবক

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের শাখা কার্যালয়: স্বনির্ভর গ্রাম সংগঠন পদ্ধতিতে উন্নয়ন কার্যক্রমে যুবকগণ আকৃষ্ট হলে কর্মী ও সদস্য সংখ্যা ক্রমান্বয়ে অনেক বৃদ্ধি পাবে। প্রয়োজন হবে কেন্দ্রীয় কার্যালয়, আঞ্চলিক কার্যালয় ও স্বনির্ভর গ্রাম কর্যালয়। আঞ্চলিক কার্যালয়ের চারটি স্তর থাকবে। যথা- বিভাগ, জেলা, থানা ও ইউনিয়ন কার্যালয় শাখা। আঞ্চলিক শাখা কেন্দ্রীয় কার্যালয় ও গ্রাম কার্যালয়ের মধ্যবর্তী সংগঠন। গ্রাম সংগঠনগুলির সমন্বয়কারী সংস্থা হিসেবেই আঞ্চলিক কার্যালয়ের প্রধান ভূমিকা। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যগণ প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ে থাকবেন। তাঁরা থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সংগঠনের ডেস্ক-ইন-চার্জ হিসেবে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করবেন।

আঞ্চলিক কার্যালয় এর কার্যক্রম

১. সঠিক বিকাশে সহায়তা করবে।
২. প্রধান কার্যালয় এবং স্থানীয় গ্রাম সংগঠনের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা।
৩. আঞ্চলিক কার্যালয় বিভিন্ন গ্রাম সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করা।
৪. সকল সংগঠনের কর্মসূচী তদারকি করবে এবং অসুবিধা দূরীকরণে সহায়তা করা।
৫. প্রশাসনিক দায় ও দায়িত্ব পালন করা এবং যৌথ নেতৃত্বের মাধ্যমে এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচি সম্পন্ন করা।

প্রধান কার্যালয়– আঞ্চলিক কার্যালয় ও শাখাসমূহের অনুমোদন দেবে। প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করেই আঞ্চলিক কার্যালয় গ্রাম সংগঠনের অনুমোদন দেবে ও কর্মসূচী গ্রহণ করবে। বিশ্ব ঐশীদর্শন কার্যালয়ের সাফল্যের আভাস দেয় লোকশিক্ষা পরিষদ। 'যারা লোকশিক্ষা পরিষদের প্রথম যুগের কাজের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা জানেন, পরিষদ একই সঙ্গে চেষ্টা করছে একটি কেন্দ্রীয় সংগঠন নরেন্দ্রপুরে গড়ে তুলতে এবং সঙ্গে সঙ্গে হাত দিয়েছে গ্রামভিত্তিক সংগঠন গড়ে তুলতে। প্রথমে যখন ২০টি গ্রাম নিয়ে কাজ শুরু হয়েছিল তখন প্রতিটি গ্রামেই একটি করে সংগঠন তৈরীর চেষ্টা হয়েছিল। অর্থাৎ একই সঙ্গে কেন্দ্রীয়করণ এবং বিকেন্দ্রীকরণ– দুটো কাজই হাতে নেওয়া হয়েছিল। ধীরে ধীরে কাজের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আমরা সাংগঠনিক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটা নেট ওয়ার্ক অফ অর্গানাইজেশন গড়ে তুলেছি গ্রাম থেকে নরেন্দ্রপুর পর্যন্ত।'[৪২] প্রথমে গ্রাম পর্যায়ে পরে ক্রমান্বয়ে আঞ্চলিক এবং শেষে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যৌথ উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করবে। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানই একই আধ্যাত্মিক ভাবসূত্রে পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হবে। বিবেকানন্দ উন্নয়ন কর্মবীরগণের আত্মবিশ্বাস ও স্বশাসনের উপর জোর দেন। তিনি বলেন, দায়িত্ব না দিলে মানুষ দায়িত্বশীল হয় না। তাঁর সাংগঠনিক নীতিগুলো অনুসরণ করেই সদস্যগণ পারস্পরিক নির্ভরশীলতা এবং সংগঠনের স্বাধীনতা অর্জন করবে। 'প্রথমতঃ, আমরা যারা এই সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে রয়েছি সকলেই সেবক, কেউই প্রভু নই-এই ভাবনা থাকা প্রয়োজন।...দ্বিতীয়তঃ, সংঘ পরিচালনার ক্ষেত্রে আমরা যত বেশি খোলামেলা হতে পারবো ততই সাধারণ মানুষের বিশ্বাস অর্জন করতে পারবো।...তৃতীয়তঃ, সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সঙ্গে সব সময় যোগাযোগ রাখা অবশ্যকরণীয়। স্বামীজী পায়ে হেঁটে সারা ভারতবর্ষ ভ্রমণ করেছিলেন সে সময় আর্থিক দৈন্যের জন্য নয়, দেশের মানুষকে জানবার ও বুঝবার জন্য।'[৪৩] আমাদের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সঙ্গে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সঙ্গেও নিবিড় সম্পর্ক থাকবে। চতুর্থতঃ, গ্রাম সংগঠন খোলামেলা ভাবে আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে, তেমনি ওপরের স্তরের সংগঠনগুলি তার অঞ্চলের সংগঠনগুলির সাথে খোলামেলা আলোচনা করবে। কোন প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে গোপনীয়তার ভাব থাকবে না। পঞ্চমতঃ, বিবেকানন্দের দর্শন অনুসারে যুবকেরাই সংগঠনের নেতৃত্ব দিবে আর বয়স্ক ব্যক্তিগণ পরামর্শ দাতার ভূমিকা পালন করবেন। সাধারণত কেউ দু'বারের বেশী গ্রাম সংগঠনের প্রধান হিসেবে কাজ করবেন না। 'আমেরিকার মতো দেশে কোনও প্রেসিডেন্ট, তা তিনি যত শক্তিশালীই হোন না কেন, দু'বারের বেশী প্রেসিডেন্ট থাকতে পারবেন না। সেখানকার গণতন্ত্রের গতিশীলতার অনেক কারণগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম।'[৪৪] ষষ্ঠতঃ, বিশ্ব ঐশীদর্শন কার্যালয়ের অন্যতম লক্ষ্য হলো গণশিক্ষার প্রসার। ছিন্নমূল, দরিদ্র শিক্ষা বঞ্চিত ঝড়ে পড়া শিশুদের পাঠশালা এবং বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র চালু করার মাধ্যমে জনশিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেওয়া হবে। এই শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার প্রসার ঘটানো হবে। 'প্রথম লোকশিক্ষা পরিষদের মূল কেন্দ্রে এই ব্যবহারিক শিক্ষার প্রশিক্ষণ কর্মসূচী গ্রহণ করে ধীরে ধীরে এই কর্মসূচী জেলা, অঞ্চল এবং অনেক সময় গ্রাম পর্যন্ত ছাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অনেক জেলাতেই জেলা স্তরের অথবা জেলার মধ্যে কোনও অঞ্চলে অথবা গ্রাম পর্যায়ে সুসংহত প্রশিক্ষণ

Dhaka University Institutional Repository

কর্মসূচী রূপায়িত হচ্ছে।'[৪৫] আমাদের লক্ষ্য হলো, প্রতিটি গ্রাম সংগঠনই মানুষের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবে উন্নীত হবে, সেখানে গ্রামের বিভিন্ন স্তরের মানুষ বিভিন্ন বিষয়ে হাতে-কলমে শিক্ষার সুযোগ পাবে এবং তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটবে।

২. বিভাগীয় কার্যালয় (Divisional Office): বিশ্ব ঐশীদর্শনের কার্যক্রম ভালভাবে গ্রাম পর্যায়ে পরিচালনার জন্য বাংলাদেশের ৬টি বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির ৪ জন করে সদস্য বিভাগীয় কর্মকর্তা নিযুক্ত হবেন। বিভাগীয় কর্মকর্তা, গভর্ণর ও পরিদর্শকগণ নিজ বিভাগের অন্তর্গত প্রত্যেকটি আঞ্চলিক কার্যালয় ও গ্রাম কার্যালয় তত্ত্বাবধান করবেন। কর্মকর্তাগণ আন্তরিকতা ও দক্ষতার সাথে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সহায়তায় জেলা কমিটি গঠন করবেন। কমিটি বা সংগঠন হলো কর্ম পরিচালনার মূল শক্তি। তাই বিবেকানন্দ বলেন, 'তোমাদের জাতির মধ্যে অর্গানাইজেশন (সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার) শক্তির একে বারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে কাজ করিতে একেবারেই নারাজ। অর্গানাইজেশন-এর (সংঘজীবনের) প্রথম আবশ্যক এই যে, অবিডিয়েন্স (আজ্ঞাবহতা)।'[৪৬] প্রতিষ্ঠানের আজ্ঞাবহ হয়েই সকল সমাজকর্মী কাজ করবে। তাদের কার্যক্রম হলো-

১. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কার্যক্রম
২. যুগোপযোগী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং Spoken English
৩. স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা
৪. বিয়ে ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বিভাগীয় কমিটির প্রতিটি জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম কার্যালয়ের সাথে নেটওয়ার্ক এর মতো ছড়িয়ে পড়ে কাজ করবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ আলাসিঙ্গা পেরুমলকে লিখেন, 'একটি কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় স্থাপন করে সাধারণ লোকের উন্নতি বিধানের চেষ্টা করতে হবে। এই বিদ্যালয়ের শিক্ষিত প্রচারকদের সাহায্যে গরীবদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বিদ্যা ও ধর্মের প্রচার করতে হবে।'[৪৭]

৩. জেলা কার্যালয় (Zonal Office): বাংলাদেশের ৬৪ জেলার স্থায়ী উন্নয়নের জন্য একটি করে জেলা কার্যালয় স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় কমিটির ১০০ জন অবিসংবাদিত জাতীয় কর্মবীরগণের একজন করে প্রতি জেলা কার্যালয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তিনি জেলা কমিটি গঠন করে ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে থানা, ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায়ে কাজ করবেন। বিবেকানন্দ এমন অপরাজেয় কর্মবীরের নিশ্চিত সাফল্য লাভের পথ নির্দেশ করে বলেন, "সাফল্য লাভ করতে হলে প্রবল অধ্যবসায়, প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি থাকা চাই। অধ্যবসায়শীল সাধক বলেন, 'আমি গণ্ডুষে সমুদ্র পান করব। আমার ইচ্ছামাত্রে পর্বত চূর্ণ হয়ে যাবে।' এমন তেজ, এমন সংকল্প আশ্রয় করে খুব দৃঢ়ভাবে সাধন কর। নিশ্চয়ই লক্ষ্যে উপনীত হবে।"[৪৮] জেলা কমিটি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে প্রেমের বন্ধনে সকলের সাথে কাজ করবে। বিবেকানন্দ প্রেমিক সেবকগণের উদ্দেশ্যে বলেন, 'প্রেমে মানুষে মানুষে, আর্যে-ম্লেচ্ছে, ব্রাহ্মণে-চণ্ডালে এমন কি পুরুষ-নারী পর্যন্ত ভেদ করে না।...যে সকল যুবক ভারতের নিম্নশ্রেণীর উন্নয়নরূপ একমাত্র কর্তব্যে মন প্রাণ নিয়োগ করিতে পারে, তাদের মধ্যে কাজ কর, তাদের জাগাও, সংঘবদ্ধ কর এবং ত্যাগ মন্ত্রে দীক্ষিত কর। একাজ ভারতের যুবকদেরই উপর নির্ভর করছে।'[৪৯] বিবেকানন্দ সংঘবদ্ধ ভাবে যুবকদের কাজ করার উপর বেশী গরুত্ব দেন। দেশের ১৫ থেকে ৩০ বৎসর বয়সের বিরাট সংখ্যক (২৭ ভাগ) যুবক-যুবতীর পক্ষে দেশের উন্নয়ন কাজে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। এই যুব সম্প্রদায়ের কাজ করার একটি বিশেষ সত্তা আছে। যা ধনী-দরিদ্র এবং জাত-পাতের ঊর্ধ্বে। যুব সম্প্রদায়ের হাতে রয়েছে সময় এবং আবেগ ও অনুভূতির শক্তি। এই যুব সমাজকে সঠিক ভাবে পরিচালনা করতে পারলে তারা গোটা সমাজটাই পাল্টে দিতে পারবে। আজ চীন দেশ সুসংগঠিত। সেখানে রয়েছে অহিংস ছাত্র আন্দোলনের রূপ। একারণেই বিবেকানন্দ যুব শক্তির উপর নির্ভর করতে চেয়েছেন।

বিবেকানন্দের যুব সমাজের প্রতি অর্পণ করা একটি দায়িত্ব পালনের প্রতিষ্ঠান হলো "বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন"। তিনি মানবকল্যাণ সাধনের জন্য দায়িত্ব অর্পণ সম্পর্কে বলেন, 'দুঃখীদের ব্যথা অনুভব কর, আর ভগবানের নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর– সাহায্য আসিবেই আসিবে। আমি দ্বাদশ বৎসর হৃদয়ে এই ভাব লইয়া ও মাথায় এই চিন্তা লইয়া বেড়াইয়াছি।... আমি এই দেশে অনাহারে বা শীতে মরিতে পারি; কিন্তু আমি তোমাদের নিকট এই গরিব, অজ্ঞ,

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচার পীড়িতদের জন্য এই সহানুভূতি, এই প্রাণপণ চেষ্টা- দায়স্বরূপ অর্পণ করিতেছি' ।[৫০] প্রাচীন আচার্যগণের সেবার কার্যপ্রণালী সামান্য পরিবর্তন করে প্রয়োগ করতে হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'সেই মহাপুরুষগণ সমাজদেহ সংগঠন করিয়াছিলেন, তাঁহারা উহাতে বিশেষভাবে বল, পবিত্রতা ও জীবনী শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাহারা অতি বিস্ময়কর কাজ করিয়াছিলেন। আমাদিগকে ঐরূপ কার্য করিতেই হইবে। এখন অবস্থাচক্রে কিছু পরিবর্তন হইয়াছে, সে জন্য কার্যপ্রণালী সামান্য পরিবর্তন করিতে হইবে, আর কিছু নয়।'[৫১] সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করতেই হবে, অন্যথা সমাজ অচল হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, '...সত্য প্রাচীন বা আধুনিক কোন সমাজকে সম্মান করে না, সমাজকেই সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে হইবে; নতুবা সমাজ ধ্বংস হউক। সত্যের উপরই সকল সমাজ গঠিত হইবে; সত্য কখনও সমাজের সহিত আপস করিবে না।'[৫২] সমাজে সত্য প্রতিষ্ঠা করা বা সিদ্ধি লাভের উপায় সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, Unfortunately, in this life, the vast majority of persons are groping through this dark life without any ideal at all. If a man with an ideal makes a thousand mistakes, I am sure that the man without an ideal makes fifty thousand. Therefore, it is better to have an ideal.'[৫৩] সমাজে সত্য ও মাবনকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য আদর্শ প্রতিষ্ঠান হলো- ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন।

'একটি ভাব লইয়া উহাকে জীবনের একমাত্র ব্রত কর, শয়নে স্বপনে জাগরণে সর্বদা উহাই চিন্তা করিতে থাক। ঐ ভাব অনুযায়ী জীবনযাপন কর। তোমার মস্তিষ্ক, স্নায়ু পেশী, শরীরের প্রতিটি অঙ্গ এই ভাবে পূর্ণ হইয়া যাক। অন্য সমুদয় চিন্তা দূরে থাকুক। ইহাই সিদ্ধি লাভের উপায়; এই উপায়েই বড় বড় ধর্মবীরের উদ্ভব হইয়াছে।'[৫৪] সর্বদা সৎ চিন্তা দেহ-মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে কার্যে পরিণত করে। 'Faith, faith, faith is ourselves, faith in God- this is the secret of greatness. If you have faith in the three hundred and thirty millions of your mythological Gods, ...and still have no faith in yourselves, there is no salvation for you. Have faith in themselves and stand upon faith and be strong.'[৫৫] বিবেকানন্দ যুবকগণকে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমার মতো শত শত যুবক চাই, যারা সমাজের উপর গিয়ে মহাবেগে পড়বে এবং যেখানে যাবে সেখানেই নবজীবন ও আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করবে।'[৫৬] সফলতার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। যে কাজ যত বড় সে কাজে সফল হতে সময়ও তত বেশী প্রয়োজন। বিবেকানন্দ বলেন, 'বৎস, কাজ করে যাও, রোম একদিনে নির্মিত হয়নি। আমি প্রভুর দ্বারা পরিচালিত হচ্ছি। সুতরাং শেষে সব ভালই দাঁড়াবে।'[৫৭] '...stand up, be hold, be strong. Take the whole responsibility on your own shoulders, and know that you are the creator of you own destiny. All the strength and success you want is within yourselves.'[৫৮] বিবেকানন্দ যুবকগণকে সেবা কাজের প্রেরণা দিয়ে বলেন, 'শক্তিমান হও, ওঠ এবং বীর্যবান হও। ক্রমাগত কাজ করে যাও, বাধা-বিপত্তির সঙ্গে যুদ্ধ করে অগ্রসর হও।'[৫৯] কর্মবীর সৈনিকগণ হবেন অফুরন্ত প্রাণশক্তির অধিকারী। কারণ তারা শুধু ব্রহ্মের অংশ নয়, স্বয়ং ব্রহ্ম। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'উচ্চতম বস্তুগুলি তোমাদের পায়ের তলায়। কারণ, তোমরা দিব্য নক্ষত্র। ...ইচ্ছা করলে তোমরা নক্ষত্রগুলো মুঠিতে ধরে গিলে ফেলতে পার, তোমার যথার্থ স্বরূপের এমনই শক্তি। বলীয়ান হও, সব কুসংস্কারের ঊর্ধ্বে ওঠ এবং মুক্ত হও।'[৬০]

ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের সত্য কর্ম প্রচেষ্টা কালে বাস্তবায়ন হবেই। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ সেবকগণকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, 'এগিয়ে যাও। শত শত যুগের কঠোর চেষ্টার ফলে একটা চরিত্র গঠিত হয়। দুঃখিত হয়ো না; সত্যে প্রতিষ্ঠিত একটি কথা পর্যন্ত নষ্ট হবে না– হয়তো শত শত যুগ ধরে আবর্জনা স্তুপে পড়ে লোক লোচনের অগোচরে থাকতে পারে, কিন্তু শীঘ্র হোক, বিলম্বে হোক তা আত্মপ্রকাশ করবেই করবে।'[৬১] এ সেবা কাজে সফলতা লাভের জন্য অর্থের চেয়ে মনোবল বেশি প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'হে বীরহৃদয় বালকেরা, কাজে অগ্রসর হও। টাকা থাক বা না থাক, মানুষের সহায়তা পাও আর নাই পাও, তোমার তো প্রেম আছে? ভগবান তোমার সহায় আছেন; অগ্রসর হও, তোমার গতি কেউ রোধ করতে পারবে না।'[৬২] 'To succeed, you must have tremendous perseverance, tremendous will. "I will drink the ocean", says the persevering soul; "at my will mountains will crumble up." Have that sort of energy, that sort of will; work hard, and you will reach the goal.'[৬৩] বিবেকানন্দের শিক্ষা হলো পুরুষ মহিলা ঐক্যবদ্ধ হয়ে মানবকল্যাণ সাধনের জন্য দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়বে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'মেয়ে-মদ্দ দুইই চাই, আত্মাতে মেয়ে পুরুষদের

Dhaka University Institutional Repository

ভেদ নেই। তাঁকে অবতার বললেই হয় না- শক্তির বিকাশ চাই। হাজার হাজার পুরুষ চাই, স্ত্রী চাই- যারা আগুনের মতো হিমাচল থেকে কন্যাকুমারী- উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু, দুনিয়াময় ছড়িয়ে পড়বে। ছেলে খেলার কাজ নেই- ছেলে খেলার সময় নেই যারা ছেলে খেলা করতে চায়, তফাত হও এই বেলা; নইলে মহা আপদ তাদের। Organization (সংঘ) চাই-কুড়েমি দূর করে দাও, ছড়াও, ছড়াও; আগুনের মতো যাও সব জায়গায়। আমার উপর ভরসা রেখো না, আমি মরি বাঁচি, তোমরা ছড়াও, ছড়াও।'[৬৪] বিবেকানন্দের অধ্যাত্মদর্শন অনুসারে যুগোপযোগী সংঘ 'বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন' এর মাধ্যমে যুবকগণ মানব সেবার উদ্দেশ্যে ছড়িয়ে পড়বে। ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত মানবকল্যাণ সাধনের পরিকল্পনা, সহস্র বিরোধ অতিক্রম করে অবশেষে বাস্তবায়ন হবেই। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'প্রত্যেক কাজকেই তিনটি অবস্থানের ভেতর দিয়ে যেতে হয়- উপহাস, বিরোধ ও পরিশেষে গ্রহণ। যে কোন ব্যক্তি তার সময়ে প্রচলিত ভাবরাশি ছাড়িয়ে আরও উচ্চতর তত্ত্ব প্রকাশ করে, তাকে নিশ্চয়ই লোকে ভুল বুঝবে। সুতরাং বাধা ও অত্যাচার আসুক, স্বাগতম্। কেবল আমাকে দৃঢ় ও পবিত্র হতে হবে এবং ভগবানে গভীর বিশ্বাস রাখতে হবে। তবেই এসব উড়ে যাবে।'[৬৫] জেলা কার্যালয়ের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম হলো-

১. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কার্যক্রম
২. কর্ম বা কারিগরী প্রশিক্ষণ
৩. শিক্ষা ও Spoken English
৪. স্বাস্থ্য সেবা ও পরিবার পরিকল্পনা
৫. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিবাহ অনুষ্ঠান, খেলাধুলা ও মেলা আয়োজন করা

জেলা কার্যালয়ের সাংস্কৃতিক বিভাগের অন্যতম আকর্ষণ এক বিস্মৃত পল্লী সংস্কৃতি গ্রাম্য মেলার পুনরুদ্ধার ও যুগোপযোগী করে আয়োজন করা। এই মেলার মাধ্যমেই জেলাবাসীর হবে ঐক্য ও উন্নয়ন। জেলা কর্মকর্তা প্রতি বছর জেলার উপযুক্ত স্থানে জনকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য সুস্থ সাংস্কৃতিক ধারার মেলা আয়োজন করবেন। বিবেকানন্দের নিকট ঐতিহাসিক "হিন্দু মেলা" খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এই মেলায় বিবেকানন্দের "সঙ্গীত কল্পতরু" গ্রন্থ থেকে সঙ্গীত পরিবেশন করে জনগণের মধ্যে জাতীয় চেতনা সৃষ্টি করে এবং বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করে। মহামতি বিবেকানন্দের মতো সমাজ দার্শনিক বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও পল্লী উন্নয়ন, সংস্কৃতির উন্নয়ন ও দরিদ্র মানুষের উন্নয়ন নিয়ে ভেবেছেন : এখানে রবীন্দ্রনাথের "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে মেলা আয়োজনের মাধ্যমে দেশের উন্নয়নের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা হলো।

'আমাদের দেশ প্রধানত পল্লীবাসী। এই পল্লী মাঝে মাঝে যখন আপনার নাড়ীর মধ্যে বাহিরের বৃহৎ জগতের রক্তচলাচল অনুভব করিবার জন্য উৎসুক হইয়া উঠে, তখন মেলাই তাহার প্রধান উপায়। এই মেলাই আমাদের দেশে বাহিরকে ঘরের মধ্যে আহ্বান। এই উৎসবে পল্লী আপনার সমস্ত সংকীর্ণতা বিস্মৃত হয়, তাহার হৃদয় খুলিয়া দান করিবার ও গ্রহণ করিবার এই প্রধান উপলক্ষ। যেমন আকাশের জলে পূর্ণ করিবার সময় বর্ষাগম, তেমনি বিশ্বের ভাবে পল্লীর হৃদয়কে ভরিয়া দিবার উপযুক্ত অবসর-মেলা। এই মেলা আমাদের দেশে অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটা সভা উপলক্ষে যদি দেশের লোককে ডাক দাও তবে তাহারা সংশয় লইয়া আসিবে, তাহাদের মন খুলিতে অনেক দেরি হইবে– কিন্তু মেলা উপলক্ষে যাহারা একত্র হয় তাহারা সহজেই হৃদয় খুলিয়াই আসে, সুতরাং এখানেই দেশের মন পাইবার প্রকৃত অবকাশ ঘটে। পল্লীগুলি যেদিন হাল-লাঙল বন্ধ করিয়া ছুটি লইয়াছে সেই দিনই তাহাদের কাছে আসিয়া বসিবার দিন। বাংলাদেশে এমন জেলা নাই যেখানে নানা স্থানে বৎসরের নানা সময়ে মেলা না হইয়া থাকে- প্রথমত এই মেলাগুলির তালিকা ও বিবরণ সংগ্রহ করা আমাদের কর্তব্য। তাহার পরে এই সমস্ত মেলাগুলির সূত্রে দেশের লোকের সঙ্গে যথার্থভাবে পরিচিত হইবার উপলক্ষ আমরা যেন অবলম্বন করি। প্রত্যেক জেলার ভদ্র শিক্ষিত-সম্প্রদায় তাঁহাদের জেলার মেলাগুলিকে যদি নব ভাবে জাগ্রত, নব প্রাণে সজীব করিয়া তুলিতে পারেন, ইহার মধ্যে দেশের শিক্ষিতগণ যদি তাহাদের হৃদয় সঞ্চার করিয়া দেন, এই সকল মেলায় যদি তাঁহারা হিন্দু-মুসলমানের মধ্য সদভাব স্থাপন করেন কোনো প্রকার নিষ্ফল পলিটেক্সের সংশ্রব না রাখিয়া, বিদ্যালয় পথঘাট জলাশয় গোচর জমি প্রভৃতি সমন্ধে জেলায় যে-সমস্ত অভাব আছে, তাহার প্রতিকারের পরামর্শ করেন, তবে অতি অল্পকালের মধ্যে স্বদেশকে যথার্থই সচেষ্ট করিয়া তুলিতে পারেন। আমার বিশ্বাস, যদি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বাংলাদেশের নানা স্থানে মেলা করিবার জন্য একদল লোক প্রস্তুত হন- তাঁহারা নূতন নূতন যাত্রা কীর্তন কথকতা রচনা করিয়া, সঙ্গে বায়স্কোপ ম্যাজিক-লণ্ঠন ব্যায়াম ও ভোজবাজির আয়োজন লইয়া ফিরিতে থাকেন- তবে ব্যয় নির্বাহের জন্য তাঁহাদিগকে কিছু মাত্র ভাবিতে হয় না। তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেকে

Dhaka University Institutional Repository

মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারদের নিকট হইতে যথা নিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন- তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা-দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভজনক করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদ্‌বৃত্ত হইবে তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে- ইঁহারা সমস্ত দেশকে তন্ন তন্ন করিয়া জানিবেন এবং ইঁহাদের দ্বারা যে কত কাজ হইতে পারিবে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।

আমাদের দেশে চিরকাল আনন্দ উৎসবের সূত্রে লোককে সাহিত্যরস ও ধর্ম শিক্ষা দান করা হইয়াছে। সম্প্রতি নানা কারণ-বশতই অধিকাংশ জমিদার শহরে আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁদের পুত্রকন্যার বিবাহাদি-ব্যাপারে যাহা কিছু আমোদ-আহ্লাদ সমস্তই কেবল শহরের ধনী বন্ধুদিগকে থিয়েটার ও নাচগান দেখাইয়া সম্পন্ন হয়। অনেক জমিদার ক্রিয়াকর্মে প্রজাদের নিকট হইতে চাঁদা আদায় করিতে কুণ্ঠিত হন না-সে স্থলে 'ইতরে জনাঃ' মিষ্টান্নের উপায় জোগাইতেই থাকে, কিন্তু "মিষ্ঠান্নম্" 'ইতরে জনাঃ' কল্যাণ মাত্র ভোগ করিতে পারে না- ভোগ করেন 'বান্ধবাঃ' এবং 'সাহেবাঃ'। ইহাতে বাংলার গ্রাম সকল দিনে দিনে নিরানন্দ হইয়া পড়িতেছে এবং যে- সাহিত্যে দেশের আবাল বৃদ্ধবণিতার মনকে সরস ও শোভন করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা প্রত্যহই সাধারণ লোকের আয়ত্তাতীত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের এই কল্পিত মেলা সম্প্রদায় যদি সাহিত্যের ধারা, আনন্দের স্রোত, বাংলার পল্লী দ্বারে আর-একবার প্রবাহিত করিতে পারেন, তবে এই শস্যশ্যামলা বাংলার অন্তঃকরণ দিনে দিনে শুষ্ক মরুভূমি হইয়া যাইবে না। আমাদিগকে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, যে সকল বড়ো বড়ো জলাশয় আমাদিগকে জলদান স্বাস্থ্যদান করিত, তাহা দুষিত হইয়া কেবল যে আমাদের জলকষ্ট ঘটাইয়াছে তাহা নহে, তাহারা আমাদিগকে রোগ ও মৃত্যু বিতরণ করিতেছে- তেমনি আমাদের দেশে যে সকল মেলা ধর্মের নামে প্রচলিত আছে, তাহাদেরও অধিকাংশ আজকাল ক্রমশ দুষিত হইয়া কেবল যে লোক শিক্ষার অযোগ্য হইয়াছে তাহা নহে, কুশিক্ষারও আকর হইয়া উঠিয়াছে। উপেক্ষিত শস্যক্ষেত্রে শস্যও হইতেছে না, কাঁটা গাছও জন্মিতেছে। এমন অবস্থায় কুৎসিত আমাদের উপলক্ষে এই মেলাগুলিকে যদি আমরা উদ্ধার না করি, তবে স্বদেশের কাছে, ধর্মের কাছে, অপরাধী হইব।...আমাদের দিশি লোকের সঙ্গে দিশি ধারায় মিলিবার যে কী উপলক্ষ হইতে পারে আমি তাহারই একটি দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র এবং এই উপলক্ষটিকে নিয়মে বাঁধিয়া আয়ত্তে আনিয়া কী করিয়া যে একটা দেশব্যাপী মঙ্গল ব্যাপারে পরিণত করা যাইতে পারে তাহারই আভাস দেওয়া গেল।'[৫০] জাতীয় উন্নয়নের জন্য দেশীয় ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ প্রয়োজন। আমাদের পল্লী সংস্কৃতির অন্যতম আকর্ষণীয় বিষয় গ্রাম্য মেলা। এই মেলায় উন্নয়নমূলক আলোচনা সভা, বিভিন্ন রকম গান-বাজনা, পুতুল নাচ, লাঠি খেলা, ঘোড়াদৌড়, শিশুদের খেলনাসহ নানা আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী প্রভৃতি শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকল শ্রেণীর মানুষের মনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ সংস্কার করতে হলে মেলা ও পল্লী সংস্কৃতির উন্নয়ন অপরিহার্য। এ কারণেই ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের জেলা কর্মকর্তাগণ বিবেকানন্দও রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শন ও সংস্কৃতির পথ অবলম্বন করে জেলাবাসীর সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবেন।

৪. থানা কার্যালয় (Area Office): বিশ্ব ঐশীদর্শনের জেলা কর্মকর্তা তার জেলাধীন প্রতিটি থানায়-"থানা কার্যালয়" স্থাপন করবেন এবং একজন করে থানা কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। থানা কর্মকর্তা থানার সার্বিক উন্নয়নের জন্য তরুণ স্বেচ্ছাসেবকগণকে নিয়ে একটি থানা কমিটি গঠন করবেন। তারা প্রত্যেকে নিজ দায়িত্ব পালন করবে এবং অপরকে সৎকাজে সাহায্য করবে। থানা কার্যালয়ের কার্যক্রম হলো নিম্নরূপ-

১. কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কার্যক্রম
২. শিক্ষা ও Spoken English
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা
৪. বিবাহ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

প্রতিটি থানা উন্নয়নের জন্য এক বিশেষ ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ও আদর্শ প্রচার করা প্রয়োজন। দরিদ্র মানুষকে শিক্ষা দিয়ে, সাহায্য করে সমাজে রাজনৈতিক পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। দেশের মানুষকে একটি রাজনৈতিক দলের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নয়। এই প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করা। কোন দলের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি করা নয়। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমাদের নিম্ন শ্রেণীর জন্য

Dhaka University Institutional Repository

কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা। ...তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে- জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেই সাধন করিবে। প্রত্যেক জাতি প্রত্যেক নরনারী নিজের উদ্ধার নিজেই সাধন করিয়া থাকে। তাহাদের এইটুকু সাহায্য করিতে হইবে– তাহাদিগকে কতগুলি উচ্চ ভাব দিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা উহার ফল স্বরূপ আপনিই আসিবে। আমাদের কর্তব্য কেবল রাসায়নিক উপাদানগুলিকে একত্র করা- অতঃপর প্রাকৃতিক নিয়মেই উহা দানা বাঁধিবে। সুতরাং আমাদের কর্তব্য কেবল তাহাদের মাথায় কতগুলি ভাব প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়া, বাকি যাহা কিছু তাহারা নিজেরাই করিয়া লইবে।'[৫১] এমন বিষয় পাঠচক্রের মাধ্যমে সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে আমাদের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন হতে হবে।

৫. ইউনিয়ন কার্যালয় (Branch office): প্রতিটি ইউনিয়নের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ইউনিয়ন কর্মকর্তা একটি উন্নয়ন কমিটি গঠন করবেন এবং তিনি প্রতিটি গ্রামে গ্রাম উন্নয়ন কর্মকর্তা নিয়োগ করবেন। ইউনিয়ন কার্যালয়- প্রতিটি স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়ের উন্নয়ন কার্যক্রমে সহায়তা করবে, সকল স্তরের কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবে এবং উন্নয়ন রিপোর্ট দাখিল করবে। এ স্তরে উন্নয়নকর্মীগণ বিবেকানন্দের দৃষ্টিকোণ থেকে সামগ্রিক উন্নয়ন বিপ্লব অভিযান পরিচালনা করবেন। এ বিপ্লব ঐক্যবদ্ধভাবে সমবায়িক আন্দোলনের রূপ নিবে। ইউনিয়ন ভিত্তিক উন্নয়নের জন্য আমরা লোকশিক্ষা পরিষদের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করতে পারি। 'একথা মনে ভেবেই আমরা গ্রাম থেকে অঞ্চল, অঞ্চল থেকে জেলা এবং জেলা থেকে রাজ্য ভিত্তিক সাংগঠনিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি। আজকে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে– লোকশিক্ষা পরিষদ গতানুগতিক কতগুলি কর্মসূচীর রূপায়ন করবে না, কর্মসূচীর মাধ্যমে সামাজিক এক পরিস্থিতি থেকে অন্যতম বৈষয়িক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হওয়ার চেষ্টা করবে, তা সকলের অনুধাবন করা প্রয়োজন। এই উত্তরণের জন্য যতটা না প্রয়োজন অর্থের তার চাইতে বেশী প্রয়োজন ভাবগত সংহতির।'[৫২] আধ্যাত্মিক বিপ্লবই সৃষ্টি করতে পারে সামাজিক উন্নয়ন বিপ্লব। সারা পৃথিবীতে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ নামে যে সব সংগঠন গড়ে উঠেছে সেগুলো সরকারী বা বেসরকারী আর্থিক অনুদানে গড়ে ওঠেনি। এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে কিছু মানুষের মনের তাগিদে। বিশ্ব ঐশীদর্শন কার্যালয়ের সেবা কার্যে যারা অংশগ্রহণ করতে আসবে, তারা পাওয়ার চেয়ে দেওয়ার উদ্দেশেই মিলিত হবেন। এই দেওয়ার ভাবটি দৃঢ়তার সঙ্গে রক্ষা করলে পৃথিবীর কোন শক্তি বিশ্ব ঐশীদর্শন আন্দোলন প্রতিহত করতে পারবে না। যে কোনও আন্দোলন সৃষ্টি করার জন্য দরকার কর্মসূচি, যা আর্থিক সাহায্যের চাইতেও যুবকদের প্রচেষ্টার প্রয়োজন বেশী। কর্মসূচি হলো নিম্নরূপ-

১. বয়স্ক শিক্ষা প্রকল্প।
২. পরিবেশ সংরক্ষণ।
৩. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ শিক্ষার প্রসার।
৪. বাল্য বিবাহ, যৌতুকপ্রথা, মাদকাসক্তি প্রভৃতি সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে জনগণকে সংগঠিত করা।
৫. গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের আন্দোলন সৃষ্টি।
৬. দরিদ্র ছাত্রদের কোচিং ক্লাস-এর ব্যবস্থা।
৭. দেশীয় ঐতিহ্যের ও মূল্যবোধের উপর ভিত্তি করে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন।
৮. বিভিন্ন জাতীয় উন্নয়ন প্রকল্প সম্বন্ধে মানুষকে অবহিত করা।
৯. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিয়ে প্রদর্শনী ও বিজ্ঞান প্রদর্শনীর আয়োজন।
১০. শ্রমদানের মাধ্যমে গ্রামের সকলকে উন্নয়নে শরিক করা।
১১. সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ।

৬. স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয় বা (Center): বিশ্ব ঐশীদর্শন-এর ষষ্ঠ স্তর স্বনির্ভর গ্রাম 'কার্যালয়'। প্রধান কার্যালয় মনোনীত কর্মকর্তা সার্বিক গ্রামোন্নয়নের জন্য একটি গ্রামোন্নয়ন কমিটি ও স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয় গঠন করবেন। গ্রামই হলো দেশ উন্নয়নের কেন্দ্র বিন্দু। স্বনির্ভর দেশ গড়ার ভাবনা শুধু বিশ্ব ঐশীদর্শন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের নয়, এ ভাবনা আমার আপনার সকলের। আসুন- বিবেকানন্দের কর্মবীর সৈনিকের মত দেশ গড়ার কাজে সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়ি। এ কার্যালয় প্রত্যেক সদস্যের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান প্রভৃতির ব্যবস্থার করবে।

Dhaka University Institutional Repository

মহাকালের দুর্নিবার প্রবাহের টানে জীব জগৎ সবই ভেসে চলছে মুক্তির লক্ষ্যে। তবু বার বার বলতে ইচ্ছে হয় 'জুড়াইতে চাই, কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে যাই।'[৬৯] সহসা সেই অনন্ত মহাকাল প্রবাহের মধ্যে দ্বীপবৎ এক আশার আলো দেখা যাচ্ছে। জুড়াবার একটি স্থান দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। যেখানে দাঁড়ালে নব সূর্যোদয় প্রত্যক্ষ করা যাবে; দেখা যাবে কেমন করে রাত্রির অন্ধকার ধীরে ধীরে অপসারিত হয়ে চিরকালের পূতি গন্ধযুক্ত এই দুঃসহ সংসার জ্বালায় কে যেন দিব্যগন্ধের প্রলেপ দিচ্ছে। 'কৃত্যং করোতি কলুষং কুহকান্তকারী।'[৭০] কোন এক অদ্ভুত শক্তি অচিন্তনীয় উপায়ে সমূহ পাপরাশিকে পুণ্যে রূপান্তরিত করে দিচ্ছে। জগৎসংসারে সদ্য আরব্ধ এক মহাপুণ্যযজ্ঞে সকল ভক্ত, সদস্য এবং গৃহী চারদিক হতে ছুটে আসছে অংশগ্রহণ করার জন্য। আমরাও সকলে ছুটে এসেছি শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের 'বিশ্ব ঐশীদর্শন' আন্দোলন নামক সেই মহাযজ্ঞে সেবাদান করে কৃতকৃতার্থ হয়ে মানব জন্ম সার্থক করার জন্য।

তথ্যনির্দেশ

১। শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ, *অমৃতবাণী*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, চতুর্বিংশতি পুনর্মুদ্রণ: জুলাই ২০০৮, পৃ. ১।
২। ঐ, পৃ. ৭।
৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ত্রয়োবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, পৃ. ১২২।
৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *ব্যক্তিত্বের বিকাশ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ২৭।
৫। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ: জুলাই ২০০৪, পৃ. ৩২৫।
৬। ড. আমিনুল ইসলাম, *পাশ্চাত্য দর্শন, প্রাচীন ও মধ্যযুগ*: লাকী বুক হাউজ, ১১৯/১২০ ইসলামিয়া মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫, নতুন সংস্করণ ১৯৯১, পৃ. ২৬-২৭-২৮।
৭। ড. আমিনুল ইসলাম, *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ৫ বাংলা বাজার, ঢাকা- ১১০০, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯১, পৃ. ৯২।
৮। ঐ, পৃ. ৯২।
৯। ঐ, পৃ. ৯২।
১০। ঐ, পৃ. ৯২।
১১। ঐ, পৃ. ৯২।
১২। ঐ, পৃ. ৯৩।
১৩। ঐ, পৃ. ৯২-৯৩।
১৪। ঐ, পৃ. ৯৯।
১৫। মোঃ মতিউর রহমান, "রামমোহনের ধর্মচিন্তা", এম. আবুল কাসেম সম্পাদিত, *দর্শন ও প্রগতি*, (১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৫), গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ কাল: ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ১১৬।
১৬। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *রামকৃষ্ণ মিশনের নীতি ও কর্মরীতি*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ-আশ্বিন ১৪১৩, অক্টোবর ২০০৬, পৃ. ৪০-৪১।
১৭। ঐ, পৃ. ৪১।
১৮। ঐ, পৃ. ৪১।
১৯। স্বামী তেজসানন্দ, *রামকৃষ্ণ - সঙ্ঘ আদর্শ ও ইতিহাস*, রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ, বেলুড় মঠ, অষ্টম সংস্করণ- ২০০৫, পৃ. ১৩।
২০। ঐ, পৃ. ১৭।
২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *কালান্তর*, সালাহ উদ্দিন বই ঘর, ৩৬, বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল, ২০০০, পৃ. ৯০।
২২। শিখ শঙ্কর চক্রবর্তী, "লোকশিক্ষা পরিষদ কি ও কেন?" স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, রামকৃষ্ণ মিশন লোক শিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৭, পৃ. ২৩১-৩২।
২৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পল্লীপ্রকৃতি*, প্রকাশক শ্রীজগদিন্দ্র ভৌমিক, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ আশ্বিন ১৩৯৩ : ১৯০৮ শক, পৃ. ৩৪-৩৫।
২৪। স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা (৫২ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা), নভেম্বর ২০০৮, পৃ. ৭।
২৫। ঐ, পৃ. ৭।
২৬। স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, (সুবর্ণ জয়ন্তী, ৫০ বর্ষ), সংকলন, ২০০৭, ঐ, পৃ. ঝ-ঞ।
২৭। স্বামী সর্বগানন্দ, *ভাবপ্রচার ও সংগঠন*, ঐ, পৃ. ২৯।
২৮। ঐ, পৃ. ৩০-৩১।
২৯। ঐ, পৃ. ৩১।
৩০। ঐ, পৃ. ৩১-৩২।
৩১। ঐ, পৃ. ৩২।
৩২। ঐ, পৃ. ৩২।

Dhaka University Institutional Repository

৩৩। ঐ, পৃ. ৩৪-৩৫।
৩৪। ঐ, পৃ. ৩৭।
৩৫। ঐ, পৃ. ৩৭।
৩৬। স্বামী সর্বগানন্দ, *ভাবপ্রচার ও সংগঠন*, ঐ, পৃ. ৫৬।
৩৭। ঐ, পৃ. ৫৮-৫৯।
৩৮। ঐ, পৃ. ৫৯।
৩৯। ঐ, পৃ. ৬০।
৪০। ঐ, পৃ. ৬১।
৪১। ঐ, পৃ. ৬০-৬১।
৪২। স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, ঐ, পৃ. ২২৯।
৪৩। ঐ, পৃ. ২২৯-৩০।
৪৪। ঐ, পৃ. ২৩০।
৪৫। ঐ, পৃ. ২৩১।
৪৬। ঐ, পৃ. ২২৭।
৪৭। ঐ, পৃ. ২২৮।
৪৮। ঐ, পৃ. ৪১১।
৪৯। ঐ, পৃ. ২২৮।
৫০। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ঊনবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ১৮-১৯।
৫১। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৩, পৃ. ২৫।
৫২। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ঊনবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ২৭।
৫৩। *VIVEKANANDA HIS CALL TO THE NATION*, Advaita Ashrama (cd), 5 Dehi Entally Road, Kolkata, 40th Impression, February 2009. P- 50.
৫৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ. পৃ. ২৬।
৫৫। Swami Vivekananda, *Thoughts of Power*, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Kolkata, Twenty Eighth impression, August 2006. P- 6.
৫৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ০৪ অক্টোবর, ২০০৭, পৃ. ৬৭।
৫৭। ঐ. পৃ. ৮৩।
৫৮। *VIVEKANANDA, HIS CALL TO THE NATION*, op.cit, P- 49.
৫৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, ঐ. পৃ. ২৫।
৬০। ঐ. পৃ. ৫৯।
৬১। ঐ. পৃ. ৬৩-৬৪।
৬২। ঐ. পৃ. ৩৪।
৬৩। Swami Vivekananda, *Thoughts of Power*, op.cit, P- 6.
৬৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, ঐ. পৃ. ৩।
৬৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, ঐ. পৃ. ৫৬।
৬৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ", সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, *সমাজচিন্তা* (রবীন্দ্র রচনা সংকলন), গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিঃ, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, প্রথম প্রকাশঃ ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৯২, পৃঃ ১০৩-১০৪।
৬৭। স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, ঐ, পৃঃ ২৩২।
৬৮। ঐ, পৃ. ২৩৩।
৬৯। স্বামী সর্বগানন্দ, *ভাবপ্রচার ও সংগঠন*, ঐ, পৃ. ৬১।
৭০। ঐ, পৃ. ৬১।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

জাতীয় কল্যাণ ভাবনা

ছোট্ট একটি দেশ আমাদের জন্মভূমি, মাতৃভূমি বাংলাদেশ। আয়তন মাত্র ১৪৭৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। লোক সংখ্যা ১৫ কোটি। ৮৫ হাজার গ্রাম মিলিয়ে আমাদের এই বাংলাদেশ। গ্রামের উন্নয়নই দেশের উন্নয়ন। গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়নের জন্যই বহুকাল পূর্বে নির্দিষ্ট ভৌগলিক অবস্থানে ও নির্দিষ্ট আয়তনে বিভিন্ন নামে গ্রামগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে। এভাবেই যোগাযোগ ও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে গড়ে ওঠে থানা, জেলা, বিভাগ, দেশ, মহাদেশ প্রভৃতি। আমরা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সাফল্য নিয়ে অগ্রসর হই তবে দেশ গড়ার কাজ অনেকটা সহজ ও সফল হবে। আর তাই আমাদের গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের জন্য প্রতিটি গ্রামের কেন্দ্রে থাকবে একটি করে স্থায়ী 'স্বনিভর গ্রাম কার্যালয়'। এ প্রতিষ্ঠান গ্রামের মানুষের কাছে থেকে স্থায়ী উন্নয়নের জন্য ধৈর্যের সাথে অবিরাম কাজ করবে। সমাজ সেবক, সমাজ হিতৈষী ব্যক্তি এবং সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় গড়ে উঠবে 'স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়'। ভাল বা মন্দ সব কাজ গ্রাম, মহল্লা বা নির্দিষ্ট স্থানে সম্পন্ন হয়, আর তাই গ্রাম ও মহল্লার উন্নয়ন শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে দেশের উন্নয়ন কার্যক্রম গতিশীল হবে।

জাতীয় মহাপরিকল্পনা

একটি জাতি, একটি দেশ কিভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা করবে? কিভাবে স্বনির্ভর হবে? বাংলাদেশের অবনতির অন্যতম কারণ হলো-জাতীয় মহাপরিকল্পনার অভাব। কোন সরকার বা দল যদি বহু অর্থ ব্যয় করে একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা করে, তবে তা অন্য দল পরিহার করে, বানচাল করে অগ্রগতি ব্যাহত করে। যে দেশে রেষারেষি, হিংসা-বিদ্বেষ, দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও নেতৃত্বের মোহ রয়েছে, সে দেশে মহৎ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন হতে পারে না। প্রমাণ স্বরূপ দেশের শিক্ষা, অর্থ, কৃষি, দারিদ্র্য বিমোচন ও দুর্নীতি দমন কোন পরিকল্পনা পূর্ণভাবে সফল হতে পারেনি। এ ধারায় কখনও জাতীয় উন্নয়নের মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন হতে পারে না। জাতীয় মহাপরিকল্পনার প্রধান দুটি অংশ হলো- ১. দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন একজন স্থায়ী অভিবাক বা প্রতিনিধি ও ২. গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন পরিকল্পনা। আর তাই বিবেকানন্দের সমাজদর্শন অনুসারে তরুণ নিঃস্বার্থ উদ্যোগী দেশপ্রেমিক যুবকদের নিয়ে গঠিত 'বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন' জাতীয় মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। এ পরিকল্পনায় থাকবে সুশিক্ষা, দেশপ্রেম, পরিবার পরিকল্পনা ও গ্রাম ভিত্তিক উন্নয়নের সকল ব্যবস্থা।

অভিভাবক বা রাজা

বাংলাদেশ স্থায়ী অভিভাবকহীন একটি রাষ্ট্র। একটি পরিবারের অভিভাবক না থাকলে যেমন পরিবারে বিশৃঙ্খলা ও অশান্তি সৃষ্টি হয়ে পরিবারের অবনতি হয়। তেমনি বৃহৎ রাষ্ট্র পরিবারের স্থায়ী অভিভাবক বা রাজা না থাকলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়, এ পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের অপূরণীয় ক্ষতি হয়। কারণ অভিভাবকহীন রাষ্ট্রে জনগণ হয় স্বেচ্ছাচারী স্বার্থপর, লুটেরা ও ভোগবাদী। তারা কাউকে ভয় পায় না। কারণ এ অবস্থায় সবাই সমান। যদিও নির্বাচিত প্রতিনিধি ও সরকারি কর্মকর্তা বিভিন্ন দায়িত্বে থাকে, তাদেরকে অনেকেই পরোয়া করে না। কারণ অনেক ক্ষেত্রে প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ দুর্নীতি ও অন্যায় পথে ক্ষমতায় আসে। ফলে দুর্নীতি পরায়ণ, ঘুষখোর, স্বার্থপর, লুটেরা, অসৎ ও অনৈতিক ব্যক্তিদের কেউ শ্রদ্ধা ও মান্য করে না। কারণ দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যক্তিরা ক্ষমতা অপব্যবহার করে স্বার্থ সিদ্ধি করে। জাতীয় অর্থ-সম্পদ লুট করে টাকার পাহাড় গড়ে তোলে। তাই এ শ্রেণীর সর্বোচ্চ রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষমতা ব্যর্থ হয়। এ পরিস্থিতিতে দেশের স্থায়ী শান্তি উন্নতি ও প্রগতির জন্য প্রয়োজন একজন স্থায়ী রাজ-প্রতিনিধি বা রাজা। বর্তমান গণতান্ত্রিক বিশ্বেও রাজতন্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। এ কারণেই বৃটেন, জার্মান, জাপান প্রভৃতি উন্নত রাষ্ট্রও রাজতন্ত্রের সুফল বিবেচনা করে রাজতন্ত্র টিকিয়ে রেখেছে। কারণ রাজা একটি দেশের স্থায়ী শান্তি উন্নতি ও কল্যাণ রক্ষার অধিপতি। নির্বাচন যুদ্ধ এবং যে কোন দুর্যোগ মুহূর্তে রাজা রাষ্ট্রের সব নিরাপত্তা বিধান করেন। এজন্য বৃটেনে রাজা আছেন বলেই বৃটিশ নাগরিকগণ নিশ্চিন্তে ও নিরাপদে ঘুমায়। তারা রাজকার্য পরিচালনার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে সৎ ও যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে। বাংলাদেশের জন্য একজন স্থায়ী অভিভাবক বা প্রতিনিধি প্রয়োজন। যিনি রাজার মতো দেশ পরিচালনা করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'প্রাচীনকালে মহাপুরুষেরা উন্নতির নূতন নূতন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করতেন, আর রাজারা আইন করে সেগুলি চালিয়ে দিতেন। প্রাচীনকালে ভারতে এই রকম করেই সমাজের উন্নতি হয়। বর্তমানকালে এইভাবে সামাজিক উন্নতি করতে হলে এমন একটি শক্তি চাই, যার কথা লোকে নেবে।'[১] দার্শনিক Plato-এর দার্শনিক রাজা হবেন অত্যন্ত সৎ, নিঃস্বার্থ জ্ঞানী ও বিচক্ষণ এবং তিনি সহজ সরল জীবন যাপন করবেন। Honesty is the best policy. সৎ ব্যক্তি বা প্রতিনিধিকে সবাই মান্য করবে, ফলে রাষ্ট্রের উন্নতি হবে। আর এ লক্ষ্যেই বাংলাদেশের স্থায়ী উন্নয়নের জন্য অবিরাম গতিতে কাজ করে চলবে 'বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন'-এর কর্মকর্তাগণ।

জাতীয় উন্নয়ন ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব

'প্রত্যক জাতির নিজস্ব একটি ভাবধারা বিদ্যমান। ভাবধারা জাতিকে পুষ্ট করে সামগ্রিক কল্যাণ বিধান করে। ভারতবর্ষের প্রাণধারা অধ্যাত্মিকতা, দীর্ঘকালের অযত্নে ও অবহেলায় প্রাণস্রোতস্বিনী লোকচক্ষুর অন্তরাল হয়েছে। কিন্তু ফল্গুধারার মত প্রাণস্রোত জাতির ধমনীতে প্রবাহিত হচ্ছে এই প্রাণস্রোতকে সবল করতে হবে, জাতির দেহের সর্বাঙ্গে প্রাণস্রোতকে পৌঁছে দিতে হবে, তবেই জাতীয় জীবন ফলে ফুলে ভরে উঠবে, প্রকৃত ধর্মপথের অনুসরণই ভারতের কল্যাণ ও উন্নতির একমাত্র উপায়।'[২] নানা ঐতিহাসিক ভাষণে ভারতীয় ঋষি আবিষ্কৃত তত্ত্ব মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে। আচার্য বিবেকানন্দ সেই জাতীয় সম্পদ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার শিক্ষা দেন। অধ্যাত্ম মহাপুরুষগণের প্রদর্শিত পথে জাতিকে পরিচালনা করতে হলে সর্ব প্রথম দরিদ্র ও নিপীড়িত দেশবাসীর খাওয়া পরার অভাব দূর করতে হবে, প্রয়োজনীয় ঐহিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা নিয়োগ করতে হবে, দরকার মত বিদেশী অর্থ ও বিদেশী বিশেষজ্ঞের সাহায্য গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু বিদেশ হতে আমদানি করা সব কিছু জাতির প্রাণ রসে জারিয়ে স্বদেশীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

স্বদেশের ঐতিহ্যে গর্বিত বিবেকানন্দ বন্ধুভাবে বিদেশের সঙ্গে লেনদেন করার শিক্ষা দিয়েছেন। বিদেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান, বিশেষজ্ঞ ও অর্থের বিনিময়ে বাংলাদেশ দেবে পাশ্চাত্যের একান্ত প্রয়োজনীয় প্রকৃত কল্যাণের জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষা। বিবেকানন্দের ভারত উন্নয়নের শিক্ষা গ্রহণ করে আমারা বাংলাদেশের উন্নয়ন সাধন করতে পারি। বিবেকানন্দ বলেন, 'ভারতে যে কোন প্রকার সংস্কার বা উন্নতি করিবার চেষ্টা করা হউক, প্রথমতঃ ধর্ম প্রচার আবশ্যক। ভারতকে সামাজিক বা রাজনৈতিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে গেলে, প্রথমে এ দেশকে আধ্যাত্মিক ভাবের বন্যায় ভাসাইতে হইবে।'[৩] প্রথমে আমাদের দেশের কোরআন-হাদীস, গীতা, উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, বাইবেল, ত্রিপিটক, গ্রন্থসাহিব এবং অধ্যাত্ম মহাপুরুষগণের যে সব গ্রন্থ আছে, সেগুলো সংগ্রহ করে অধ্যাত্ম শাস্ত্রের মহাকাব্যের ধ্বনি বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া এবং সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে। 'সকলকেই এই সকল শাস্ত্রনিহিত উপদেশ শুনাইতে হইবে; কারণ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে–প্রথমে শ্রবণ, পরে মনন, তৎপরে নিদিধ্যাসন করা কর্তব্য।'[৪] জাতীয় উন্নয়নের জন্য আমাদের ধর্মগ্রন্থ ও শাস্ত্র পাঠ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রথম প্রয়োজন জনসাধারণকে অবহেলা না করে তাদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে উন্নতি করা। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্বসাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাইতে পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না। ঐ-সকল জাতি আমাদের শিক্ষার জন্য-রাজকর-রূপে পয়সা দিয়াছে। আমাদের ধর্ম লাভের জন্য- শারীরিক পরিশ্রমে বড় বড় মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এই–সকলের বিনিময়ে তাহারা চিরকাল লাথিই খাইয়া আসিয়াছে। তাহারা প্রকৃতপক্ষে আমাদের ক্রীতদাস হইয়া আছে। ভারতের পুনরুদ্ধারের জন্য আমাদিগকে অবশ্যই কাজ করিতে হইবে। আমি যুবকগণকে ধর্ম–প্রচারকরূপে শিক্ষিত করিবার জন্য প্রথমে দুইটি কেন্দ্রীয় শিক্ষালয় বা মঠ স্থাপন করিতে চাই-একটি মাদ্রাজে ও অপরটি কলিকাতায়।...এখানে সর্বসাধারণকে অধ্যাত্ম ও লৌকিক বিদ্যা–দুই-ই শেখানো হইবে। শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রচারকগণ এক কেন্দ্র হইতে অন্য কেন্দ্রে ছড়াইয়া পড়িবে–এইরূপে ক্রমে আমরা সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়িব। আমাদের সর্বাপেক্ষা গুরুতর প্রয়োজন–নিজের উপর বিশ্বাসী হওয়া; এমন কি–ভগবানে বিশ্বাস

Dhaka University Institutional Repository

করিবারও পূর্বে সকলকে আত্মবিশ্বাস-সম্পন্ন হইতে হইবে।'[৫] শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। জাতীয় উন্নয়নের জন্য শিক্ষা অপরিহার্য।

যুব সম্প্রদায়ই দেশ গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে। বিবেকানন্দ দেশ গড়ার কাজে সফল না হলেও পরবর্তী প্রজন্মের কেউ তার স্বপ্ন বাস্তবায়ন করবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'উদীয়মান যুবকসম্প্রদায়ের উপরেই আমার বিশ্বাস। তাহাদের ভিতর হইতেই আমি কর্মী পাইব। তাহারাই সিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতিকল্পে সমুদয় সমস্যা পূরণ করিবে। বর্তমানে অনুষ্ঠেয় আদর্শটিকে আমি একটি সুনির্দিষ্ট আকারে ব্যক্ত করিয়াছি। এবং উহা কার্যতঃ সফল করিবার জন্য আমার জীবন সমর্পণ করিয়াছি। যদি আমি ঐ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ না করি, তাহা হইলে আমার পরে আমা অপেক্ষা কোন মহত্তর ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করিয়া উহা কার্যে পরিণত করিবেন। আমি উহার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিব। আমার মতে দেশের সর্বসাধারণকে তাহাদের অধিকার প্রদান করিলেই বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলির সমাধান হইবে।'[৬] পৃথিবীতে ঐশীদর্শন সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অথচ দেশের সর্বসাধারণ মানুষকে কতকগুলো ভূয়া জিনিস দিয়ে আমরা চিরকাল তাদের ভুলিয়ে রেখেছি। সামনে অফুরন্ত প্রস্রবণ প্রবাহিত হলেও আমরা তাদের নালার জল পান করতে দিয়েছি।

জাতিভেদ, ধর্মভেদ, বর্ণভেদ প্রভৃতি জাতীয় কল্যাণের অন্তরায়। জাতির অবান্তর বিভাগ, ধর্ম, ভাষা, শাসন প্রণালী-এই সব নিয়ে একটি জাতি গঠিত হয়। "কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য– আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইওরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐ ঐক্যের মুল। অতএব ভাবী ভারত গঠনে ধর্মের ঐক্যসাধন অনিবার্যরূপে প্রয়োজন। এই ভারত ভূমি পূর্ব হইতে পশ্চিম, উত্তর হইতে দক্ষিণ–সর্বত্র সকলকে এক ধর্ম স্বীকার করিতে হইবে। এক ধর্ম– এ কথা আমি কি অর্থে ব্যবহার করিতেছি? খ্রীষ্টান, মুসলমান বা বৌদ্ধগণের ভিতর যে-হিসাবে এক ধর্ম বিদ্যমান, আমি সে-হিসাবে 'এক ধর্ম' কথাটি ব্যবহার করিতেছি না। আমরা জানি, আমাদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্ত সমূহ যতই বিভিন্ন হউক, উহাদের যতই বিভিন্ন দাবি থাকুক, তথাপি কতকগুলি সিদ্ধান্ত এমন আছে– যেগুলি সম্বন্ধে সকল সম্প্রদায়ই একমত। অতএব আমাদের সম্প্রদায়সমূহের এইরূপ কতকগুলি সাধারণ সিদ্ধান্ত আছে, আর ঐগুলি স্বীকার করিবার পর আমাদের ধর্ম সকল সম্প্রদায় ও সকল ব্যক্তিকে বিভিন্ন ভাব পোষণ করিবার, ইচ্ছামত চিন্তা ও কাজ করিবার পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়া থাকে।...আমাদের ধর্মের এই জীবনপ্রদ সাধারণ তত্ত্বসমূহ সকলের নিকট, এই দেশের আবাল বৃদ্ধ-বণিতা সকলের নিকট প্রচারিত হউক।...সুতরাং ইহা আমাদের প্রথম কর্তব্য।...ভারতীয় বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয় সাধনই ভবিষ্যৎ ভারত-গঠনের প্রথম কর্মসূচী, যুগযুগান্তর ধরিয়া অবস্থিত কালজয়ী ঐ মহাচল হইতেই এই প্রথম সোপান প্রস্তুত করিতে হইবে। আমাদিগকে জানিতে হইবে যে–দ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, অদ্বৈতবাদী, শৈব, বৈষ্ণব, পাশুপত প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুর মধ্যেই কতকগুলি সাধারণ ভাব আছে; আর নিজেদের কল্যাণের জন্য, জাতির কল্যাণের জন্য আমাদের পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া বিবাদ ও পরস্পর ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করিবার সময় আসিয়াছে। নিশ্চয় জানিও, এই-সকল বিবাদ সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক, আমাদের শাস্ত্র ইহার তীব্র নিন্দা করিয়া থাকেন...।"[৭] আমাদের জাতীয় উন্নয়নের জন্য ভেদবুদ্ধি পরিত্যাগ করে ঐক্যবদ্ধ কর্ম-প্রচেষ্টা চালানো প্রয়োজন।

জাতীয় জীবনের অধঃপতনের কারণ

আমাদের জাতীয় জীবনের অধঃপতনের প্রধান দুটি কারণ হলো: ১. জাতীয় মহাপরিকল্পনার অভাব ও ২. নৈতিক অবক্ষয়। এছাড়াও জাতীয় জীবনের অধঃপতনের কারণগুলো হলো– সুশিক্ষার অভাব, অপসংস্কৃতি, দেশপ্রেমের অভাব, সংঘ শক্তির অভাব প্রভৃতি। বিবেকানন্দের দর্শনমতে আমাদের জাতির অধঃপতনের কারণগুলো হলো: '(১) অনভিজ্ঞ সমাজ সংস্কারক, (২) অপর জাতি হইতে বিছিন্ন থাকা, (৩) ঈর্ষা, ঘৃণা ও সন্দিগ্ধচিত্ততা, (৪) দরিদ্র জনসাধারণকে অবজ্ঞা, (৫) ধর্ম শিক্ষার অনুসরণ না করা, (৬) পরানুকরণ ও দুর্বল আশা আকাঙ্খা, (৭) বাল্য বিবাহ, (৮) বিষয়বুদ্ধির অভাব, (৯) ব্যক্তিত্ব নষ্ট, (১০) ভালবাসা ও সহানুভূতির অভাব, (১১) শিক্ষার অভাব, (১২) সংঘবদ্ধ জাতি নহে, (১৩) সংকীর্ণতা, (২৪) সামাজিক অত্যাচার, (১৫) স্ত্রীজাতির অসম্মান, (১৬) স্বাধীন চিন্তার অভাব।'[৮] জাতীয় অনতির অন্যতম কারণ জনগণের নৈতিক অবক্ষয়। এর প্রমাণ Transparancy International Report-এ বাংলাদেশ দুর্নীতিতে একাধিকবার প্রথম হয়েছে। যেখানে সভ্য মানুষ সত্যের জন্য সুনীতির জন্য ধর্ম ও কল্যাণের জন্য সংগ্রাম করে প্রশংসা অর্জন করে, যেখানে বাঙালি জাতি সীমাহীন দুর্নীতির

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিযোগিতায় নেমেছে। অন্যায়-অবিচার, শোষণ-বঞ্চনা, চুরি-ডাকাতি, অসৎ ব্যবসা, দ্রব্য মূল্যের ঊর্ধ্বগতি, লুট, ছিনতাই, পাচার, মাদকাসক্তি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি জাতীয় জীবনকে দ্রুত পঙ্গু করছে। এ অবস্থা থেকে দেশকে মুক্ত করতে হলে নৈতিক শিক্ষা ও সদাচার অনুশীলনের মাধ্যমে দেশ গড়ার নির্ভীক সৈনিক গড়ে তুলতে হবে। জাতীয় অবনতির প্রধান কারণ সুশিক্ষার অভাব। প্রাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের কোমলমতি ছেলে মেয়েদের পাঠ্যসূচি তৈরী করা হয়। এসব শিক্ষায় নেই প্রকৃত ধর্ম, নৈতিকতা, দেশপ্রেম, বাস্তব জীবন ও কর্মমুখী শিক্ষা। বৃটিশ শাসকেরা শোষণ করার ও বাঙালি জাতিকে অধঃপতন করার যে ধারা ও মানসিকতা সৃষ্টি করেছে, আজও বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সেই ধারা প্রবাহমান। এখানে নেই স্বনির্ভরতা অর্জনের শিক্ষা। বরং বর্তমান শিক্ষায় রয়েছে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, কেরানিগিরি চাকরির মানসিকতা, যান্ত্রিক জীবন ও কৃত্রিম সভ্যতা। এ বিদেশী পরানুকরণ শিক্ষায় কখনও একটি দেশ স্বানির্ভর হতে পারে না। তাই আমাদের প্রয়োজন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে এদেশের মানুষ, মাটি, পরিবেশ, ধর্ম, সাহিত্য, কৃষি, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই স্বদেশীয় বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষাই বাংলাদেশকে স্বনির্ভর করতে পারে।

আমাদের দেশের কুটির শিল্প, যা পৃথিবী বিখ্যাত ছিল সেগুলো ধ্বংস করা হয়েছিল, ব্যবহারিক শিক্ষার প্রয়োগ কমে এসেছিল। এসবের ফলশ্রুতি হিসেবে আমাদের বিদেশী অর্থনীতির উপরে ক্রমেই নির্ভরতা বেড়ে যাচ্ছিল। এ অবস্থা স্বাধীনতার পরে কিছুটা কাটিয়ে উঠতে পারলেও সামগ্রিকভাবে আমাদের দেশের অর্থনীতি এখনও পুরোপুরি নিজস্ব শক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু আমাদের দেশের প্রাকৃতিক ও মানসিক সম্পদ, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সামগ্রিকভাবে দেশের দারিদ্র্য দূর করতে সক্ষম। প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'মানুষের ভিতর যে পূর্ণত্ব প্রথম হইতে বর্তমান তাহারই প্রকাশ সাধনকে বলে শিক্ষা। যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহ সাহসিকতা এনে দেয় না সে কি আবার শিক্ষা? যে শিক্ষায় জীবনে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াতে পারা যায়, সেই হচ্ছে শিক্ষা।'[৯] নারী শিক্ষায় দেশ জেগে উঠবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'মেয়েদের জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠশালা খুলে তাদের মানুষ করতে বলি। মেয়েরা মানুষ হলে তবে তো কালে তাদের সন্তান-সন্ততির দ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে- বিদ্যা, জ্ঞান, শক্তি, ভক্তি দেশে জেগে উঠবে।'[১০] শিক্ষা, কৃষ্টি, ধর্ম, জীবে প্রেম প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ছিলেন নব যুগের পথ প্রদর্শক। বিবেকানন্দের মতে প্রকৃত শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মানুষ গড়া। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষা কখনই তথ্যাধিক্য ভিত্তিক হতে পারে না। কারণ, এ শিক্ষা তোতা পাখিরাই সৃষ্টি করে, এ শিক্ষা কেরানি সৃষ্টির কাজে সহায়ক হতে পারে, কিন্তু কোন মহৎ বা কল্যাণকর কিছু সৃষ্টি করতে সমর্থ নয়। সুতরাং সে শিক্ষা আমাদের প্রয়োজন যা মানুষ গঠনকারী, চরিত্র গঠনকারী ধ্যান ধারণার সমন্বয় সাধন করতে পারে। অধ্যাত্মিক সম্প্রসারণই বিবেকানন্দ কল্পিত শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য। বলহীনের পক্ষে যখন আত্মার উপলব্ধি সম্ভব পর নয় তখন বস্তুগত উন্নয়ন প্রচেষ্টার প্রয়োজন আছে। বুভুক্ষ মানুষকে ধর্ম দর্শন শিক্ষা দেওয়া মানে তাদের অপমান করার শামিল। তাই বিবেকানন্দের শিক্ষা দর্শন হলো বুভুক্ষ জনগণের অন্ন সংস্থানের প্রয়োজনীয় জ্ঞান বিতরণ করা। এক বাস্তবধর্মী জ্ঞান বা শিক্ষার মধ্যে থাকবে মনের বলিষ্ঠতা গঠন ও আত্মার উদ্বোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান। এ শিক্ষাই হল মানুষ গড়ার শিক্ষা। মানুষ এভাবে গড়ে উঠলে তার মধ্যে সমাজ সচেতনতা দানা বাঁধতে বাধ্য। প্রশ্নাকারে বিবেকানন্দের একটি উক্তি হল 'যে বিদ্যার উন্মেষে ইতর সাধারণকে জীবন সংগ্রামে সমর্থ করতে পারা যায় না, যাতে মানুষের চরিত্র বল, পরার্থতৎপরতা, সিংহ-সাহসিকতা এনে দেয় না, সে কি আবার শিক্ষা?'[১১] আমাদের ব্যক্তি ও জাতীয় উন্নয়নের জন্য স্বনির্ভরতা অর্জনের প্রকৃত কর্মমূখী শিক্ষা প্রয়োজন।

জাতীয় উন্নয়ন কর্মের মহাযজ্ঞ সাধনের জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত কর্মী। উপনিষদের অভীঃ মন্ত্রে বিবেকানন্দ ব্যক্তি জীবনে আত্মবিশ্বাস এবং সমাজ মানসে প্রকৃত মূল্যবোধ ও শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠার শিক্ষা দেন। তিনি দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'যদি জগতে কিছু পাপ থাকে, দুর্বলতাই সেই পাপ।'[১২] সকল প্রকার দুর্বলতা ঝেরে ফেলে এগিয়ে আসতে হবে ত্যাগী যুবকদের, যারা জন্ম থেকে মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত, দুঃখ যন্ত্রণা থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করতে ব্রতী যুবকদের আশীর্বাদ করে বিবেকানন্দ বলেন, 'সেই পরম জননী মাতৃভূমি যেন তোমাদের আরাধ্যা দেবী হন।'[১৩] বিবেকানন্দ দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন, 'স্বার্থ ত্যাগ ও সেবাই আমাদের জাতীয় আদর্শ। এই আদর্শ অনুযায়ী ভারতের সাধনা তীব্রতর কর, তাহলেই বাকী যা কিছু আপনা হ'তে আসবে। অপরের কল্যাণ আকাঙ্খায় নিঃস্বার্থভাবে আত্মনিয়োগ করলে নিজেরই অশেষ কল্যাণ।'[১৪] বিবেকানন্দ সেবার মন্ত্রে জাতীয় যুব সমাজকে

Dhaka University Institutional Repository

উদ্বুদ্ধ করে বলেন, 'জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'[১৫] নিঃস্বার্থভাবে মানুষকে নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করলে চিত্তের মালিন্য দূর হয়, ক্রমে আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভ হয়। বিবেকানন্দের অসীম প্রেরণায় যুব সমাজ জাতীয় মহাজাগরণের সৃষ্টি করবে।

দেশপ্রেম

জনগণের গভীর দেশ প্রেমই একটি দেশকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে। সেদিন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই বৃটিশ ও পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয় লাভ করেছিল তরুণ বাঙালি যুব সমাজ। আবাল, বৃদ্ধ, বণিতা সকলেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিল মুক্তি যুদ্ধে। অবশেষে ৩০ লক্ষ্য জীবন ও ২ লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় আজ আমরা সেই দেশপ্রেম ভুলে গিয়েছি। আমারা দেশকে অভিশাপ দিচ্ছি। অনেকে ক্ষমতায় গিয়ে অথবা যে যেখান থেকেই হোক যেভাবে সম্ভব দেশের অর্থ-সম্পদ লুট করছে। জাতীয় মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিচ্ছে। রাষ্ট্র ও সংবিধানের প্রতি অবমাননা, দেশী-বিদেশী ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে আঁতাত, সন্ত্রাস, বোমাবাজী, রাজনৈতিক কোন্দল ও দলীয় সংঘাত-সংঘর্ষ প্রভৃতি দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। তাই আমাদের প্রয়োজন প্রকৃত দেশপ্রেম শিক্ষা। এদেশ আমার মা, এদেশের মানুষ সকলে ভাই ভাই। এদেশের আলো বাতাস মাটি পানি খাদ্য আমার জীবন বাঁচিয়েছে। দেশ মাতৃকার নিকট আমি ঋণী। একদিনে দেশের উন্নতি হয় না। কোন জাতীয় মহৎ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য বহু মনীষীর বহু ত্যাগ, সংযম, সাধনা, যুদ্ধ, সংগ্রাম ও জীবন বিসর্জন প্রয়োজন, তবে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় বৃহৎ রাষ্ট্র সাফল্য ও কল্যাণের পথে। দেশপ্রেম ও আত্মোৎসর্গ ছাড়া থেমে যায় জাতীয় উন্নতি অগ্রতি ও কল্যাণ।

বিবেকানন্দ জাতীয় উন্নয়ন ও প্রকৃত দেশপ্রেম সম্পর্কে বলেন, "হে ভাবী সংস্কারকগণ, ভাবী স্বদেশহিতৈষিগণ! তোমরা হৃদয়বাণ হও, প্রেমিক হও। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশু প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ– কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ– অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত গগণ আচ্ছন্ন করিয়াছে? তোমরা কি এই সকল ভাবিয়া অস্থির হইয়াছ? এই ভাবনায় নিদ্রা কি তোমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদের রক্তের সহিত মিশিয়া তোমাদের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়াছে-তোমাদের হৃদয়ের প্রতি স্পন্দনের সহিত কি এই ভাবনা মিশিয়া গিয়াছে? এই ভাবনা কি তোমাদিগকে পাগল করিয়া তুলিয়াছে? ...যদি হইয়া থাকে, তবে বুঝিও তোমরা প্রথম সোপানে-স্বদেশহিতৈষী হইবার প্রথম সোপানে মাত্র পদার্পণ করিয়াছ।...মানিলাম, তোমরা দেশের দুর্দশার কথা প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ; কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এই দুর্দশা প্রতিকার করিবার কোন উপায় স্থির করিয়াছ কি?...দেশবাসীকে গালি না দিয়া তাহাদের যথার্থ কোন সাহায্য করিতে পারো কি? স্বদেশবাসীর এই জীবন্মৃত অবস্থা দূর করিবার জন্য তাহাদের এই ঘোর দুঃখে কিছু সান্ত্বনাবাক্য শুনাইতে পারো কি?- কিন্তু ইহাতেও হইল না। তোমরা কি পর্বত প্রায় বাধাবিঘ্ন তুচ্ছ করিয়া কাজ করিতে প্রস্তুত আছ? যদি সমগ্র জগৎ তরবারি হস্তে তোমাদের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হয়, তথাপি তোমরা যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছ, তাহাই করিয়া যাইতে পারো কি? যদি তোমাদের স্ত্রী-পুত্র তোমাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, যদি তোমাদের ধন-মান সব যায়, তথাপি কি তোমরা উহা ধরিয়া থাকিতে পারো? রাজা ভর্তৃহরি যেমন বলিয়াছেন, নীতিনিপুণ ব্যক্তিগণ নিন্দাই করুন বা প্রশংসাই করুন, লক্ষ্মীদেবী গৃহে আসুন বা যথা ইচ্ছা চলিয়া যান, মৃত্যু-আজই হউক বা যুগান্তরে হউক, তিনিই ধীর, যিনি সত্য হইতে একবিন্দু বিচলিত হন না। সেইরূপ নিজ পথ হইতে বিচলিত না হইয়া তোমরা কি তোমাদের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইতে পারো? তোমাদের কি এইরূপ দৃঢ়তা আছে? যদি এই তিনটি জিনিস তোমাদের থাকে, তবে তোমরা প্রত্যেকেই অলৌকিক কার্য সাধন করিত পার।"[১৬] জাতীয় উন্নয়নের জন্য কর্মীগণের প্রয়োজন দৃঢ় সংকল্প, অবিচল ধৈর্য ও অধ্যবসায়।

স্বদেশ প্রেমের অগ্নিমন্ত্র শিক্ষা দিয়ে যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছেন দেশপ্রেমিক বিবেকানন্দ। "হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসূলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা-এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতাসহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না– তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী; ভুলিও না– তোমার উপাস্য উমানাথ সর্বত্যাগী সঙ্কর; ভুলিও না– তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের– নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্য নহে, ভুলিও না– তুমি জন্ম হইতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত; ভুলিও না– তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়া মাত্র;

Dhaka University Institutional Repository

ভুলিও না– নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর, সাহস অবলম্বন কর; সদর্পে বল– আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। বল-মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই; তুমিও কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া, সদর্পে ডাকিয়া বল– ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী; বল ভাই- ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"[১৭] জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে সঠিক কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ঈশ্বরের অনুগ্রহ প্রার্থনা করা প্রয়োজন। প্রার্থনালব্ধ আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী ব্যক্তিকে কোন বাধা-বিঘ্ন দমিয়ে রাখতে পারে না।

বিবেকানন্দ দারিদ্রতার কারণে সারা ভারত পায়ে হেঁটে বেড়াননি। তিনি দেশের মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখার জন্য পায়ে হেঁটে সারা ভারত ভ্রমণ করেন। 'In journey 1891, learning the company of his brother monks, he wandered from place to place, alone with God. At first he travelled in the north and later he went to the south, all the while studying closely the life of the people in every class of society. He was deeply moved by this experience. He wept to see the stagnant life of the Indian masses crushed down by ignorance and poverty, and was disturbed by the spell of materialistic ideas he noticed among the educated, who blindly imitated the glamour of the west.'[১৮] বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের মানুষের দুঃখ-কষ্ট দেখে, উপলব্ধি করে জাতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা করেন।

ঐক্য সাংগঠনিক শক্তি ও সংঘ

বাঙালি জাতির জাতীয় জীবনের চূড়ান্ত সাফল্যে পৌঁছার জন্য প্রয়োজন অধিক ঐক্য ও সাংগঠনিক শক্তি। এদেশের মানুষ ব্যক্তিগত স্বার্থ ও সুবিধার জন্য যার যার মত দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়। কেউ মরে খাদ্যাভাবে, কেউ বিনা চিকিৎসায় মরে। কেউ মরে রাস্তা-ঘাটে ভিক্ষা করে। দেশবাসী ঐক্য শক্তির কথা যেন একেবারে ভুলে গেছে। প্রমাণ স্বরূপ বর্তমান সময়ে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণে জনগণের কোন ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস নেই। তাই বিবেকানন্দ বলেন, আমাদের যুবকদের সাংগঠনিক শক্তির একেবারেই অভাব। তিনি আরও বলেন, সংঘ ছাড়া কোন বড় কাজ হয় না। বিবেকানন্দ সংঘশক্তি সম্পর্কে বলেন, 'তোমাদের জাতির মধ্যে Organization (সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিবার) শক্তির একেবারেই অভাব। ঐ এক অভাবই সকল অনর্থের কারণ। পাঁচজনে মিলে একটা কাজ করিতে একেবারেই নারাজ। Organization-এর প্রথম আবশ্যক এই যে, Obedience (অজ্ঞাবহতা)।'[১৯] বিবেকানন্দ দেশ গড়ার জন্য ডাক দিয়েছেন কৃষক, জেলে, মালা মুচিদের। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'নূতন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনা ওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপ-জঙ্গল, পাহাড় পর্বত থেকে।'[২০] জাতীয় উন্নয়নের জন্য সর্বস্তরের জনগণের ঐক্যবদ্ধভাবে মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করা প্রয়োজন।

দরিদ্র ও নারী জাতির প্রতি শ্রদ্ধা

দরিদ্র ও নারী জাতির প্রতি অবজ্ঞা আমাদের জাতীয় অবনতির অন্যতম কারণ। যে-দিন থেকে আমরা দেশের দরিদ্র সাধারণ মানুষকে অচ্ছুৎ করে রেখে তাদের শিক্ষা-দীক্ষা-সুযোগ-সুবিধা সব কিছু থেকে বঞ্চিত করে মুষ্টিমেয় ধনী শিক্ষিত ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত করে রেখেছি, সেদিন থেকেই আমাদের অধঃপতন শুরু হয়েছে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ দরিদ্র মানুষদের নিয়ে দুঃখ করে বলেন, 'আহা, দেশের গরীব দুঃখীদের জন্য কেউ ভাবে নারে। যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে– তাদের সহানুভূতি করে, তাদের সুখে দুঃখে সান্ত্বনা দেয় দেশে এমন কেউ নেই রে।...এরা না উঠলে মা জাগবেন না।'[২১] সাধারণ মানুষের পরেই, এদেশের নারী জাতি সবচেয়ে অত্যাচারিত। দেশের অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ এখন নূন্যতম শিক্ষার আলো পায়নি। এখন দেশের বিভিন্ন স্থানে নারীজাতির স্বাক্ষরতার হার শতকরা ৫ থেকে ১০ ভাগ। 'ভারতের সমুদয় দুর্দশার মূল- জনসাধারণের দারিদ্র্য। ...আমাদের নিম্নশ্রেণীর জন্য কর্তব্য এই, কেবল তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া এবং তাহাদের বিনষ্টপ্রায় ব্যক্তিত্ববোধ জাগাইয়া তোলা।...তাহাদিগকে ভাল ভাল ভাব দিতে হইবে। তাহাদের চক্ষু

Dhaka University Institutional Repository

খুলিয়া দিতে হইবে, যাহাতে তাহারা জানিতে পারে- জগতে কোথায় কি হইতেছে। তাহা হইলে তাহারা নিজেদের উদ্ধার নিজেরাই সাধন করিবে।'[২২] বিবেকানন্দের মতে জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তাদের উন্নতি করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহধর্মীনী শ্রীশ্রীমা সারদামণিদেবী (১৮৫৩-১৯২০) রামকৃষ্ণজীবন ধারা পূর্ণ করতেই তার জন্ম। জগতের কল্যাণ সাধনের জন্যই তাঁর আর্বিভাব হয়েছিল। শ্রীশ্রীমা জগতের কল্যাণ সাধন সম্পর্কে বলেন, 'মা ঠাকুরুন কি বস্তু বুঝতে পারনি, এখনও কেহই পার না, ক্রমে পারবে। ভায়া, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন? শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে। দেখছ কি ভায়া, ক্রমে সব বুঝবে।'[২৩] 'শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হইবে না। আমাদের দেশ সকল দেশের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?-- এখানে শক্তির অবমাননা বলিয়া। শক্তির কৃপা না হইলে কিছুই হইবে না। আমেরিকা, ইওরোপে কি দেখিয়াছি? শক্তির পূজা, শক্তির পূজা! তবু ইহারা না জানিয়া পূজা করে, কামের দ্বারা করে। আর যাহারা বিশুদ্ধভাবে, সাত্ত্বিকভাবে, মাতৃভাবে পূজা করিবে, তাহাদের কি কল্যাণ না হইবে!'[২৪] জাতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য স্ত্রী জাতির শিক্ষা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, ভারতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হলে সম্ভাবনা নেই, যেমন এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নয়। সে জন্যই রামকৃষ্ণাবতারে স্ত্রী গুরু গ্রহণ, সে জন্যই নারীভাব সাধন, সে জন্যই মাতৃভাব প্রচার। সে জন্যই আমার স্ত্রী মঠ স্থাপনের জন্য প্রথম উদ্যোগ। উক্ত মঠ গার্গী, মৈত্রেয়ী এবং তদপেক্ষা আরও উচ্চতর ভাবাপন্না নারী কুলের আকর স্বরূপ হবে।

ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা

আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষায় প্রভাবিত ব্যক্তিরা নিজ ধর্ম ও দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি অবজ্ঞা করে, এটি জাতীয় জীবনে অবনতির অন্যতম কারণ। বিবেকানন্দের মতে প্রতিটি দেশই তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উন্নতি করতে পারে। আমরা দু'পাতা ইংরেজী পড়ে দেশীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ভুলে যাই। অনেকে নিজ সংস্কৃতিকে বিদেশী লোকদের কাছে তুচ্ছ করে বলাকে নিজেদের প্রগতিবাদী বলে মনে করে। অথচ বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে বলেন, 'ইউরোপের বহু নগর পর্যটন করিয়া তাহাদের দরিদ্রদেরও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা-জবাব পাইলাম।'[২৫] বিবেকানন্দ বলেন, বিদেশে ভ্রমণ করে আমি আমাদের স্বদেশকে আরও যে গভীর ভাবে চিনতে পেরেছি। আমাদের জাতির অবনতির আর একটি প্রধান কারণ দেশের সংহতির ভাবনাকে অবজ্ঞা করা। আমাদের অখণ্ড ভারতবর্ষ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতির কৃষ্টির মিলন হয়েছে। কালক্রমে বিজেতারা এদেশের জলবায়ু ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে একাকার হয়েছে। কিন্তু বৃটিশ শাসকেরা সুকৌশলে আমাদের মধ্যে বিভিন্ন রকম ধর্মীয় ও ভাষাগত বিভেদ সৃষ্টি করে এই অখণ্ড ভারতাত্মাকে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা করে। দুঃখের বিষয় পরাধীন জাতি হিসেবে আমাদের অনেকেই ব্রিটিশ শাসনের ছলাকৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে দেশের সর্বত্র নাশ করতে ইতস্তত করেনি। আজও আমাদের দুঃখের বিষয় স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও জাতিতে জাতিতে, ধর্মে ধর্মে, রাজনৈতিক দলে দলে বিচ্ছিন্নতা বোধ তো কমেইনি, বরং উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে। এর ভয়াবহ পরিণাম আমরা এখনও উপলব্ধি করতে পারছি না। ধর্ম ও অধ্যাত্মিকতা বাংলাদেশের জাতীয় জীবনের ভিত্তি। এই অধ্যাত্মিক ভিত্তির উপরই প্রতিষ্ঠিত হবে জাতির সার্বিক উন্নয়ন ও কল্যাণ। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'কেবল আমাদের জাতির পবিত্র ঐতিহ্য- আমাদের ধর্মই আমাদের সম্মিলনভূমি, ঐ ভিত্তিতেই আমাদিগকে জাতীয় জীবন গঠন করিতে হইবে। ইওরোপে রাজনীতিই জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি। এশিয়ায় কিন্তু ধর্মই ঐক্যের মূল।...আমরা জানি, ভারতবাসীর ধারণা-আধ্যাত্মিক আদর্শ হইতে উচ্চতর আদর্শ আর কিছু নাই; ইহাই ভারতীয় জীবনের মূলমন্ত্র, আর ইহাও জানি- আমরা স্বল্পতম বাধার পথেই কার্য করিতে পারি।'[২৬] বিবেকানন্দ জাতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় ধর্মের অপরিসীম কর্মক্ষমতা সম্পর্কে বলেন, ...এদেশের প্রাণ ধর্ম, ভাষা ধর্ম, ভাব ধর্ম, আর তোমার রাজনীতি, সমাজনীতি,...দুর্ভিক্ষগ্রস্তকে অন্নদান, এসব চিরকাল এদেশে যাহা হয়েছে তাই হবে, অর্থাৎ ধর্মের মধ্য দিয়ে হয় তো হবে,...নইলে তোমার চেঁচামেচিই সার...।'[২৭] ধর্মের শক্তিতেই উজ্জীবিত হবে জাতীয় উন্নয়ন।

জাতীয় পুনরুজ্জীবনের উপায়

দূরদর্শী বিবেকানন্দ জাতীয় জীবনের পুনরুদ্ধার সম্পর্কে কতকগুলো বিষয় চিহ্নিত করেন। সেগুলো হলো: '(১) অহংকার, ঈর্ষা, ভয় ও শৈথিল্য ত্যাগ, (২) চিন্তা ও কার্যে স্বাধীনতা, (৩) ত্যাগ, সেবা ও অজ্ঞাবহতা, (৪) দরিদ্র সাধারণের উন্নতি বিধান, (৫) ধর্মোপদেশ জীবনে পালন ও প্রচার করা, (৬) পবিত্রতা, সহিষ্ণুতা, অধ্যবসায় ও

Dhaka University Institutional Repository

দৃঢ় বিশ্বাস, (৭) পরোপকার স্পৃহা ও সহযোগীতা, (৮) বর্হিভারতের সাহায্য আবশ্যক, (৯) বাহ্য সভ্যতা আবশ্যক, (১০) বিদেশ ভ্রমণ ও অপর জাতির সঙ্গে সংস্রব রাখা, (১১) ব্যক্তিত্ব বোধ জাগরিত করা, (১২) ভগবানের সাহায্য প্রার্থনা ও ব্রত গ্রহণ, (১৩) শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষার অনুসরণ, (১৪) শিক্ষা বিস্তার, (১৫) সংঘবদ্ধ হওয়া, (১৬) সত্য, প্রেম ও অকপটতা, (১৭) সমাজ ব্যবস্থার উন্নতি সাধন, (১৮) সাহসী, উৎসাহী, চরিত্রবান ও শ্রদ্ধা সম্পন্ন কর্মীর প্রয়োজন, (১৯) স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী জাতিকে সম্মান, (২০) বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার।'[২৮] এসব বিষয়ে যত্নপর হলে সহজেই জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব হবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধের শিক্ষা থেকে আমরা অতীত গৌরবোজ্জ্বল সমাজ পুনরুদ্ধার করতে পারি। 'আমাদের দেশে যুদ্ধ বিগ্রহ রাজ্য রক্ষা এবং বিচারকার্য রাজা করিয়াছেন, কিন্তু বিদ্যাদান হইতে জলদান পর্যন্ত সমস্তই সমাজ এমন সহজভাবে সম্পন্ন করিয়াছে যে, এত নব নব শতাব্দীতে এত নব নব রাজার রাজত্ব আমাদের দেশের উপর দিয়া বন্যার মতো বহিয়া গেল, তবু আমাদের ধর্ম নষ্ট করিয়া আমাদিগকে পশুর মতো করিতে পারে নাই, সমাজ নষ্ট করিয়া আমাদিগকে একবারে লক্ষ্মীছাড়া করিয়া দেয় নাই। রাজায় রাজায় লাড়াইয়ের অন্ত নাই, কিন্তু আমাদের মর্মরায়মাণ বেণুকুঞ্জে-আমাদের আম কাঁঠালের বনচ্ছায়ায় দেবারভন উঠিতেছে, অতিথিশালা স্থাপিত হইতেছে, পুষ্করিণী খনন চলিতেছে, গুরুমহাশয় শুভঙ্করী কষাইতেছেন, টোলে শাস্ত্র- অধ্যাপনা বন্ধ নাই, চন্ডীমন্ডপে রামায়ণ পাঠ হইতেছে এবং কীর্তণের আরাবে পল্লীর প্রাঙ্গণ মুখরিত। সমাজ বাহিরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে নাই, এবং বাহিরের উপদ্রবে শ্রীভ্রষ্ট হয় নাই। আজ আমাদের দেশে জল নাই বলিয়া যে আমরা আক্ষেপ করিতেছি, সেটা সামান্য কথা। সকলের চেয়ে গুরুতর শোকের বিষয় হইয়াছে-তাহার মূল কারণটা। আজ সমাজের মনটা সমাজের মধ্যে নাই। আমাদের সমস্ত মনোযোগ বাহিরের দিকে গিয়াছে। কোনো নদী যে গ্রামের পার্শ্বদিয়া বরাবর বহিয়া আসিয়াছে সে যদি একদিন সে গ্রাম ছাড়িয়া অন্যত্র তাহার স্রোতের পথ লইয়া যায়, তবে সে গ্রামের জল নষ্ট হয়, ফল নষ্ট হয়, স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, বাণিজ্য নষ্ট হয়, তাহার বাগান জঙ্গল হইয়া পড়ে, তাহার পূর্ব সমৃদ্ধির ভগ্নাবশেষ আপন দীর্ণভিত্তির ফাটলে ফাটলে বট-অশ্বথকে প্রশ্রয় দিয়া পেচক-বাদুরের বিহারস্থল হইয়া উঠে। মানুষের চিত্তস্রোত নদীর চেয়ে সামান্য জিনিস নহে। সেই চিত্ত প্রবাহ চিরকাল বাংলার ছায়াশীতল গ্রামগুলিকে অনাময় ও আনন্দিত করিয়া রাখিয়াছিল এখন বাংলার সেই পল্লীক্রোড় হইতে বাঙালির চিত্তধারা বিক্ষিপ্ত হইয়া গেছে। তাই তাহার দেবালয় জীর্ণপ্রায়, সংস্কার করিয়া দিবার কেহ নাই; তাহার জলাশয়গুলি দুষিত, পঙ্কোদ্ধার করিবার কেহ নাই; সমৃদ্ধ ঘরের অট্টালিকাগুলি পরিত্যক্ত, সেখানে উৎসবের আনন্দ ধ্বনি উঠে না, কাজেই এখন জল দানের কর্তা সরকার-বাহাদুর, স্বাস্থ্যদানের কর্তা সরকার-বাহাদুর, বিদ্যা দানের ব্যবস্থাও সরকার বাহাদুরের দ্বারে গলবস্ত্র হইয়া ফিরিতে হয়। যে গাছ আপনার ফুল আপনি ফুটাইত সে আকাশ হইতে পুষ্পবৃষ্টির জন্য তাহার সমস্ত শীর্ণ শাখা-প্রশাখা উপরে তুলিয়া দরখাস্ত জারি করিতেছে। না হয় তাহার দরখাস্ত মঞ্জুর হইল, কিন্তু এই-সমস্ত আকাশ কুসুম লইয়া তাঁহার স্বার্থকতা কী? আমাদের দেশে সরকার-বাহাদুর সমাজের কেহই নন; সমাজের বাহিরে। অতএব যে- কোনো বিষয় তাঁহার কাছ হইতে প্রত্যাশা করিব, তাহা স্বাধীনতার মূল্য দিয়া লাভ করিতে হইবে। যে কর্ম সমাজ সরকারের দ্বারা করাইয়া লইবে, সেই কর্ম সম্বন্ধে সমাজ নিজেকে অকর্মণ্য করিয়া তুলিবে। অথচ এই অকর্মণ্যতা আমাদের দেশে স্বভাব সিদ্ধ ছিল না। আমরা নানা জাতির, নানা রাজার অধীনতা পাশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি, কিন্তু সমাজ চিরদিন আপনার সমস্ত কাজ আপনি নির্বাহ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুদ্র বৃহৎ কোনো বিষয়েই বাহিরের অন্য কাহাকেও হস্তক্ষেপ করিতে দেয় নাই। সেই জন্য রাজশ্রী যখন দেশ হইতে নির্বাসিত, সমাজলক্ষ্মী তখনো বিদায় গ্রহণ করেন নাই।'[২৯] বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে যে সমাজদর্শন রচনা করেছেন তাতে পরনির্ভরশীল সমাজকে পুনরায় স্বনির্ভর করা সম্ভব। এ কাজে সকলকেই দৃষ্টি ফিরিয়ে সমাজের উন্নয়নের দিকে চালিত করতে হবে। রবীন্দ্রদর্শন অনুসারে সমাজকর্মীগণ 'স্বনির্ভর গ্রাম' কর্মসূচির মাধ্যমে জাতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করতে পারেন।

রাষ্ট্র বিজ্ঞানী বিবেকানন্দ রাষ্ট্র উন্নয়নের জন্য প্রথমে জাতি গঠনের উপর গুরুত্ব দেন। তিনি একটি সুশৃঙ্খল জাতি গঠনের জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে, বিভিন্ন রাষ্ট্র ও জাতি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে, সেসব গবেষণা করে একটি সুশৃঙ্খল ঐক্যবদ্ধ জাতি গঠনের উপায় নির্দেশ করেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, '...আমাদিগকে ভ্রমণ করিতেই হইবে, আমাদিগকে বিদেশে যাইতেই হইবে। আমাদিগকে দেখিতে হইবে, অন্যান্য দেশে সমাজ-যন্ত্র কিরূপে পরিচালিত হইতেছে। আর যদি আমাদিগকে যথার্থই পুনরায় একটি জাতিরূপে গঠিত হইতে হয়, তবে অপর জাতির চিন্তার সহিত আমাদের অবাধ সংস্রব রাখিতে হইবে। সর্বোপরি আমাদিগকে দরিদ্রদের উপর

Dhaka University Institutional Repository

অত্যাচার বন্ধ করিতে হইবে।'[৩০] যখন বাংলাদেশের ১৫ কোটি মানুষ মিলে আরো সুন্দর এবং সুশৃঙ্খল জাতি গঠন করবে, তখন থেকেই স্বনির্ভর ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস সফল হতে শুরু করবে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ গোত্রের মধ্যে প্রেম, আন্তরিকতা, সহানুভূতি ও ঐক্যবদ্ধ অসাম্প্রদায়িক চেতনা। বিভিন্ন ব্যক্তি, জাতি, ধর্ম-বর্ণ একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। একজন ছাড়া অপর জন চলতে পারে না। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Hinduism cannot live without Buddhism, nor Buddhism without Hinduism. They realize what the separation has shown to us that the Buddhist cannot stand without the brain and philosophy of the Brahmins, nor the Brahmin without the heart of the Buddhist. This separation between the Buddhists and the Brahmins is the cause of the downfall of India.'[৩১] সুতরাং জাতীয় উন্নয়নের জন্য আমাদের বিভিন্ন জাতি ধর্ম-বর্ণের মাঝে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বজায় রাখা প্রয়োজন।

তথ্যনির্দেশ

১। *জীবন গঠনে স্বামীজীর বাণী*, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা। দ্বিতীয় সংস্করণ ৩০ ডিসেম্বর ২০০৭, পৃ. ২২।

২। *জগতের ধর্মগুরু*, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ সম্পাদিত, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, পৃ. ১২৪।

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বিবেক-বাণী*, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলকাতা, ষষ্ঠবিংশ সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৪০৮, পৃ. ৫২।

৪। ঐ, পৃ. ৫২।

৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৩০৬-৭।

৬। ঐ, পৃ. ৩০৭।

৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, পঞ্চম খণ্ড, ঐ, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ ভাদ্র ১৪১৪, পৃ. ১৪০-৪১।

৮। *জগতের ধর্ম গুরু*, ঐ, পৃ. ১২৭।

৯। *জগতের ধর্মগুরু*, ঐ, পৃ. ১২৭।

১০। স্বামী বিবেকানন্দ, *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, বিংশ পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, পৃ. ১০৪।

১১। ঐ, পৃ. ৫১।

১২। *জগতের ধর্মগুরু*, ঐ, পৃ. ১২৫।

১৩। ঐ, পৃ. ১২৫।

১৪। ঐ, পৃ. ১২৫।

১৫। ঐ, পৃ. ১২৫।

১৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন, ১৪১৩, পৃ. ২৫-২৬।

১৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১১, পৃ. ৩৯।

১৮। Swami Vivekananda, *Chicago Addresses*, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Kolkata, Twenty-nineth Impression, December 2001, P. 8.

১৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *ওঠো জাগো এগিয়ে চলো*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ- মাঘ ১৪১৪, ঐ, পৃ. ৩৯।

২০। *জগতের ধর্ম গুরু*, ঐ, পৃ. ১২৭-২৮।

২১। শিবশঙ্কর চক্রবর্তী, "লোকশিক্ষা পরিষদ কি ও কেন?", স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৭, পৃ. ২২৩।

২২। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, ঐ, পৃ. ২৪।

২৩। ঐ, পৃ. ৩।

Dhaka University Institutional Repository

২৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *ভারতীয় নারী*, ১ উদ্বোধন কার্যালয়, উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ত্রয়োবিংশৎ পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ- ১৪১৪, পৃ. ১৯।

২৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *ওঠো জাগো এগিয়ে চল*, ঐ, পৃ. ১৮।

২৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *জাগো, যুবশক্তি*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ- কার্ত্তিক ১৪১০, পৃ. ১০৯।

২৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *ওঠো জাগো এগিয়ে চল*, ঐ, পৃ. ৩৯।

২৮। *জগতের ধর্মগুরু*, ঐ, পৃ. ১২৭।

২৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বদেশী সমাজ* [বঙ্গ দর্শন, ভাদ্র ১৩১১ (১৯৪০)], সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, *সমাজচিন্তা*, গ্রন্থালয়, প্রাইভেট লিঃ, ১১ এ, বাঙ্কি চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৯২, পৃ. ৯৯-১০০।

৩০। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৪, ঐ, পৃ. ২৬৯।

৩১। Swami Vivekananda, *Chicago Addresses*, op.cit. P. 57.

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ অধ্যায়

প্রজ্বলিত সূর্য সৈনিক : প্রশিক্ষণ

সমাজ সংস্কার একটি বৃহত্তম ও নিরলস দীর্ঘ প্রচেষ্টার কাজ। সমাজ সংস্কারকগণকে ধৈর্যসহকারে সমাজের সকল সমস্যা অনুধাবন করে সংশোধনের চেষ্টা করতে হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'সামাজিক ব্যাধির প্রতিকার বাহিরের চেষ্টা দ্বারা হইবে না, মনের উপর কার্য করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। আমরা যতই লম্বা লম্বা কথা আওড়াই না কেন, বুঝিতে হইবে সমাজের দোষ সংশোধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষভাবে উহার চেষ্টা না করিয়া শিক্ষাদানের দ্বারা পরোক্ষভাবে উহার চেষ্টা করিতে হইবে। সমাজের দোষ সংশোধন সম্বন্ধে প্রথমে এই তত্ত্বটি বুঝিতে হইবে; এই তত্ত্ব বুঝিয়া আমাদের মনকে শান্ত করিতে হইবে, ইহা বুঝিয়া আমাদের রক্ত গরম হইতে দেওয়া হইবে না, আমাদিগকে উত্তেজনাশূন্য হইতে হইবে।'[১] সমাজ সংস্কার করতে হলে প্রথম প্রয়োজন সমাজ সেবক বা সংস্কারকর্মী। তারাই সমাজ পরিবর্তনের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করে প্রস্তুত হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'সমাজ-সংস্কার যাহারা চায়, তাহারা কোথায়? আগে তাহাদিগকে প্রস্তুত কর। সংস্কার-প্রার্থী লোক কই? অল্প সংখ্যক কয়েকটি লোকের কোন বিষয় দোষ বলিয়া বোধ হইয়াছে, অধিকাংশ ব্যক্তি তাহা বুঝে নাই। এখন এই অল্প সংখ্যক ব্যক্তি যে জোর করিয়া অপর সকলের উপর নিজেদের মনমত সংস্কার চালাইবার চেষ্টা করেন, ইহার ন্যায় প্রবল অত্যাচার জগতে আর নাই। অল্প কয়েক জন লোকের কতকগুলি বিষয় দোষবোধ হইলেই তাহাতে সমগ্র জাতির হৃদয়কে স্পর্শ করে না। সমগ্র জাতি নড়ে চড়ে না কেন?'[২] সমাজ সংস্কারকগণকে গভীর ভাবে সমাজের সমস্যাগুলি পর্যবেক্ষণ করে সমাধানের পথ তৈরী করতে হয়।

সমাজ সংস্কারের জন্য প্রয়োজন একটি সুন্দর সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা, আর এই ব্যবস্থা প্রণয়নের জন্য একটি দল গঠন করা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'প্রথমে সমগ্র জাতিকে শিক্ষা দাও, ব্যবস্থা প্রণয়নে সমর্থ একটি দল গঠন কর; বিধান আপনি-আপনি আসিবে। প্রথমে যে শক্তিবলে যাহার অনুমোদনে বিধান গঠিত হইবে, তাহার সৃষ্টি কর। এখন রাজারা নাই যে নূতন শক্তিতে যে নূতন সম্প্রদায়ের সম্মতিতে নূতন ব্যবস্থা প্রণীত হইবে, সেই লোক শক্তি কোথায়? প্রথমে সেই লোকশক্তি গঠন কর। সুতরাং সমাজসংস্কারের জন্য প্রথম কর্তব্য লোক শিক্ষা। এই শিক্ষা সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে।'[৩] শিক্ষণের মাধ্যমে পর্যায় ক্রমে গড়ে উঠবে সমাজ সংস্কারক নেতা বা Leader। এই Leader সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "Leader (নেতা) কি তৈরী করতে পারা যায়? লিডার জন্মায় বুঝতে পারলে কি না? লিডারি করা আবার বড় শক্ত– 'দাসস্য দাসঃ'-হাজার লোকের মন যোগান। Jealousy, selfishness (ঈর্ষা, স্বার্থপরতা) আদপে থাকবে না তবে লিডার। প্রথম, by birth (জন্মের দ্বারা); দ্বিতীয় unselfish (নিঃস্বার্থ) হওয়া-তবে লিডার;"[৪] সততা, সহিষ্ণুতা, উদারতা, পর-দুঃখকাতরতা প্রভৃতি হলো নেতার গুণ। এসব গুণ সাধারণত জন্মগত, সহজাত প্রবৃত্তি। যখন অন্তঃপ্রকৃতি ও বাহ্যপ্রকৃতির বিকাশ হয় তখন মহাত্মা সমাজ সংস্কারক জন্ম নেয়। বাইরের গুণ আরোপ করে লিডার তৈরী করা যায় না। নেতাদের প্রকৃতি সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'ভারতে সবাই নেতা হতে চায়, হুকুম তামিল করবার কেউ নেই। সকলেরই উচিত, হুকুম করবার আগে হুকুম তামিল করতে শেখা। আমাদের ঈর্ষার অন্ত নেই। আর যতই আমরা হীনশক্তি, ততই আমরা ঈর্ষাপরায়ণ। যতদিন না এই ঈর্ষা-দ্বেষ যায় এবং নেতার আজ্ঞাবহতা হিন্দুরা শিক্ষা করে, ততদিন একটা সমাজসংহতি হতেই পারে না– ততদিন আমরা এই রকম ছোড়ভঙ্গ হয়ে থাকব, কিছুই করতে পারব না। ইউরোপের কাছ থেকে ভারতের শিখতে হবে বহিঃপ্রকৃতি-জয়, আর ভারতের কাছ থেকে ইউরোপের শিখতে হবে অন্তঃপ্রকৃতি জয়। তাহলে আর হিন্দু-ইউরোপীয় বলে কিছু থাকবে না, উভয় প্রকৃতি জয়ী এক আদর্শ মানুষ্য সমাজ গঠিত হবে। আমরা মনুষ্যত্বের একদিক, ওরা আর একদিক বিকাশ করছে। এই দুইটির মিলনই দরকার। মুক্তি, যা আমাদের ধর্মের মূলমন্ত্র, তার প্রকৃত অর্থই দৈহিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক সকল রকম স্বাধীনতা।'[৫] জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের পূর্ব শর্ত হলো ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্জন।

নেতৃত্ব বিকাশের শিক্ষা

Halpin এবং Winter নেতৃত্ব সম্পর্কে গবেষণা চালিয়ে সিদ্ধান্ত করেন যে, 'অনুগামীদের সঙ্গে নেতার সম্পর্ক ও তাদের দুর্বলতা সম্পর্কে সহানুভূতিমূলক বিচার-বিবেচনা, নিজের মনোভাব ও ধারণাকে জোরালো ও

Dhaka University Institutional Repository

সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করার ক্ষমতা, সৃজনশীলতা, মানসিক চাপ সহ্য করার মতো ধৈর্য, আবেগ নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা, আত্ম-বিশ্বাস, দায়িত্ববোধ এর তাড়না ও আন্তঃযোগাযোগ প্রক্রিয়ার দক্ষতা নেতৃত্ব অর্জনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'[৬] পরিস্থিতি অনুযায়ী কখনও গণতান্ত্রিক নেতৃত্ব আবার কখনও বা কর্তৃত্বব্যঞ্জক নেতৃত্বের প্রয়োজন হয়। সবচেয়ে উপযুক্ত নেতৃত্ব হচ্ছে পরিস্থিতি অনুযায়ী অনুগামীদের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যমে নেতৃত্ব নির্বাচনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। নেতা ও সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কে প্রথম শর্ত হলো নেতার আত্মসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। নেতার দোষগুণ, কর্ম দক্ষতা ও দুর্বলতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। যে কোনো সংগঠনের বা প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বদানকারীদের অবশ্যই সর্বদা নিজের দোষ-গুণের আত্ম-মূল্যায়ন করা উচিত। কারণ তাদের আদর্শ ও দিক-নির্দেশনার ওপর নির্ভর করে সংগঠনের সদস্যদের আচার-আচরণ ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া। নেতৃত্বের কারণেই সংগঠনের উন্নতি বা অবনতি হয়ে থাকে। নেতৃত্ব সম্পর্কে John Tilloton বলেন, 'They who are in the highest places and have the most power have the least liberty, because they are most observe.'[৭] বাস্তব ক্ষেত্রে দেশে নেতৃত্বের নামে যে যথেচ্ছাচার ও ক্ষমতার অপব্যবহার করা হয় তা যুব সমাজের বিপথগামীতার জন্য বহুলাংশে দায়ি।

নেতৃত্ব বিকাশের প্রথম ধারণাই হলো আত্ম-বিশ্লেষণ। সুদুর অতীতে দার্শনিক সক্রেটিস গ্রিসের তরুণ সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তার মহামন্ত্র "Know theyself" দিয়ে। অর্থাৎ 'নিজেকে জানো'। যে নেতা নিজেকে জানেনা তার পক্ষে অপরকে জানাও সম্ভব নয়। এ কারণে যুব নেতৃত্ব বিকাশের জন্য নেতার অহং বা আত্মজ্ঞানের বিশ্লেষণ ও উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী। ব্যক্তি তার চিন্তা চেতনা, আত্ম প্রত্যক্ষণ আবেগ বিশ্বাস ও মনোভাব সব মিলিয়ে তার অহং (ego) গঠিত হয়। নেতাকে সংগঠনের বিভিন্ন সদস্যদের সম্পর্কে জানতে হলে তার নিজস্ব অহং সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা প্রয়োজন। অহং হলো ব্যক্তির বিভিন্ন আচরণের সমন্বয় সাধক তন্ত্র। বিবেকানন্দ নেতৃত্ব বিকাশের এক অদ্ভুত কাহিনী উল্লেখ করেন। 'ধর্ম মহাসভায় বিবেকানন্দ এক নিগ্রো ছোকরাকে চমৎকার বক্তৃতা করতে দেখে ভাবলেন– বারে বাঃ! ছোকরাটি কে? কৌতুহলী হয়ে তিনি তার সঙ্গে পরিচয় ক'রে জিজ্ঞাসা করেছিলেন– তুমি কোথায় থাকো, কী করো, এমন সুন্দর বক্তৃতা করতে শিখলে কী করে? প্রশ্নের উত্তরে ছেলেটি তার জীবনের অদ্ভুত কাহিনী শুনিয়েছিল। ছোকরার জন্ম আফ্রিকায়, জঙ্গলের মধ্যে, এক নরখাদক বংশে। তার বাবা তেমন এক গোষ্ঠির দলপতি। ছোকরার খুব অল্প বয়সে তার বাবার গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্য একটি অনুরূপ গোষ্ঠীর লড়াই হয়, তার বাবার গোষ্ঠী হেরে যায়। তার ফলে তাদের দলবলকে বলি দিয়ে, সেই মাংস আহারের আয়োজন যখন করা হচ্ছে তখন ছেলেটি কোনও ক্রমে পালিয়ে গিয়ে অনেক কষ্টে সমুদ্র তীরে পৌঁছেছিল। একটি আমেরিকান জাহাজের নাবিকদের নজরে সে পড়ে যায়। তারা তাকে জাহাজে তুলে নিয়ে আমেরিকায় পৌঁছে দেয়। সেখানে সে এমন লেখাপড়া শেখে যে, বিশ্বধর্ম মহাসভার মতো বিরাট জ্ঞানী গুণীদের সভায় দাঁড়িয়ে সুন্দর বক্তৃতা করতে পেরেছিল।'[৮] পরাধীন দেশের অনগ্রসর জনগণ নেতৃত্ব বিকাশের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে।

ইচ্ছাশক্তির বিকাশ

ইচ্ছাশক্তির বিকাশ হলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়। এ সম্পর্ক বিবেকানন্দ বলেন, 'এদেশে লোকে শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে জন্মায়, ভোজন-পানাদি আজীবন নিয়মানুসারে করে, বিবাহাদিও সেইপ্রকার, এমন কি, মরিবার সময়ও সেই সকল শাস্ত্রোক্ত আইন অনুসারে প্রাণ ত্যাগ করে। এই কঠোর শিক্ষার একটি মহৎ গুণ আছে, আর সকলই দোষ। গুণটি এই যে দুটি-একটি কার্য পুরুষানুক্রমে প্রত্যহ অভ্যাস করিয়া অতি অল্পায়াসে সুন্দর রকমে লোকে করিতে পারে। তিনখানা মাটির ঢিপি ও খানকতক কাষ্ঠ লইয়া এদেশের রাঁধুনী যে সুস্বাদু অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করে, তাহা আর কোথাও নাই।...একখানা ছেঁড়া মাদুর, একটা মাটির প্রদীপ, তায় রেড়ির তেল, এই উপাদান-সহায়ে দিগ্‌গজ পণ্ডিত এ দেশেই হয়। খেঁদা-বোঁচা স্ত্রীর উপর সর্বসহিষ্ণু মহত্ত্ব ও নির্গুণ মহাদুষ্ট পতির উপর আজন্ম ভক্তি এ দেশেই হয়। এই তো গেল গুণ। কিন্তু এই সমস্তগুলিই মনুষ্য প্রাণহীন যন্ত্রের ন্যায় চালিত হয়ে করে; তাতে মনোবৃত্তির স্ফূর্তি নাই, হৃদয়ের বিকাশ নাই, প্রাণের স্পন্দন নাই, ইচ্ছাশক্তির প্রবল উত্তেজনা নাই, তীব্র সুখানুভূতি নাই, বিকট দুঃখেরও স্পর্শ নাই, উদ্ভাবনী-শক্তির উদ্দীপনা একেবারেই নাই, নূতনত্বের ইচ্ছা নাই, নূতন জিনিসের আদর নাই। এ হৃদয়াকাশের মেঘ কখনও কাটে না, প্রাতঃসূর্যের উজ্জ্বল ছবি কখনও মনকে মুগ্ধ করে না! এ অবস্থার অপেক্ষা কিছু উৎকৃষ্ট আছে কি না, মনেও আসে না, আসিলেও বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস হইলেও উদ্যোগ হয় না, উদ্যোগ হইলেও উৎসাহের অভাবে তাহা মনেই লীন হইয়া যায়।...এই ইচ্ছাশক্তির

Dhaka University Institutional Repository

যেথায় যত সফল বিকাশ, সেথায় সুখ তত অধিক। সে জীব তত বড়। ঈশ্বরে ইচ্ছাশক্তির পূর্ণ সফলতা, তাই তিনি সর্বোচ্চ।'[৯] সমাজ সংস্কারকগণের হৃদয়ে ঈশ্বরের অনন্ত ইচ্ছা শক্তির বিকাশ হলে, তখন সে সব কাজ বীরদর্পে করতে পারে।

সদস্য সংগ্রহ

জ্ঞান, কর্ম ও পূণ্যে মানুষ হয় সর্বশেষ্ঠ। আবার অজ্ঞতা ও সংকীর্ণতায় হয় সর্ব নিকৃষ্ট। মানুষই সমস্যা সৃষ্টি করে, আবার মানুষই সমাধান করে। বিবেকানন্দ বলেন, যে মানুষ অন্যায় করে আবার সেই মানুষই সাধনা বলে দেবতা হয়ে ওঠে। শান্তি-শৃঙ্খলা ও প্রগতির জন্য প্রয়োজন সৎ, নৈতিক, উদার, বিজ্ঞ, দায়িত্বশীল ও আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মানুষ। এ লক্ষ্যেই ব্যক্তিগত জীবন সুন্দর ও উজ্জ্বল করতে, নতুন সমাজ গঠন করতে, স্বনির্ভর বাংলাদেশ ও শান্তি পূর্ণ বিশ্ব গঠন করতে 'বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন' সদস্য সংগ্রহ করবে। দেশ-বিদেশের যে কোন ধর্ম, বর্ণ, পেশা, শ্রেণী ও বয়সের যে কোন ব্যক্তি সদস্য হতে পারেন। এতে কারও ধর্মান্তরিত হওয়ার প্রয়োজন নেই। বরং সদস্য হয়ে নিজ ধর্ম সঠিকভাবে পালন করার সুযোগ পাবে। সদস্যগণের লক্ষ্য হবে দারিদ্র্যমুক্ত সমাজ গঠন ও ধর্মবিজ্ঞান অনুশীলন করা।

প্রশিক্ষণ

সদস্যগণের নিকট বইপত্র প্রেরণ করা হবে, যাতে তারা জ্ঞানার্জন করে স্বনির্ভর হতে পারে। সদস্যগণের জন্য প্রশিক্ষণ ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এতে উন্নত জীবন গঠনের জন্য ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে সমন্বয়ী শিক্ষা দেওয়া হবে। এ প্রশিক্ষণের লক্ষ্য-

১. সদস্যগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠা
২. পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কর্মসংস্থান
৩. সৎ ও উন্নত জীবন গঠনে সহায়তা
৪. দেশের সার্বিক উন্নয়নে সহায়তা
৫. এ প্রতিষ্ঠানের কাজ হলো ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়ে সহযোগিতা প্রদান করা।

সদস্যগণ কুসংস্কার ও পুরাতন আইন বর্জন করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞানালোকে নতুন আইন প্রতিষ্ঠা করবে। তারা আপনজন হলেও অন্যায় কাজে বাধা দিবে, অন্যায়কারীর ভুল ভেঙ্গে দিবে। তারা জানবে সমষ্টির স্বার্থে ব্যক্তি স্বার্থ রয়েছে। যে সব গ্রামের অধিক সংখ্যক লোক এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য হয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে সৎ ও নৈতিক জীবন যাপন করতে আগ্রহী হবে, সে সব গ্রামে 'স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়' প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করবে। যাতে সেই গ্রামের দরিদ্র, ভিক্ষুক, কৃষক, সর্বহারা, ছিন্নমূল, বেকার ও সকল শ্রেণীর মানুষের কর্মসংস্থান করে বাঁচার উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হয়। নিম্নে প্রশিক্ষণের কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হল ঃ

সদস্যগণের পালনীয় বিষয়	সদস্যগণের বর্জনীয় বিষয়
১. স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস	১. সকল প্রকার সংকীর্ণতা ও গোঁড়ামী বর্জন
২. আত্মার প্রতি বিশ্বাস	২. ধূমপান ও সকল প্রকার মাদক দ্রব্য বর্জন
৩. সৃষ্টি রহস্য জানার প্রতি প্রবল কৌতুহল	৩. অশালীন ভাষা, আচরণ ও পোশাক বর্জন
৪. অসাম্প্রদায়িক মনোভাব	৪. সকল প্রকার অন্যায় ও অসৎ কাজ বর্জন
৫. নিষ্পাপ আনন্দ উপভোগ	৫. কথাই পাপ, কথাই পূণ্য। তাই হাসি-ঠাট্টা করে কখনও অশালীন ও মিথ্যা কথা বলবে না।
৬. নম্র, সৎ, নৈতিক ও শিশু সুলভ আচরণ	৬. নিজেকে সবজান্তা মনে করবে না।
৭. যথাসাধ্য অপরের উপকার সাধন	৭. মহৎ ও কল্যাণকর কাজে হতাশা বর্জন
৮. সুস্থতার জন্য যোগব্যায়াম অনুশীলন	৮. অপর ধর্ম ও ধর্মানুরাগীদের প্রতি হেয় মনোভাব বর্জন
৯. ঐশী বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তন ও উন্নয়ন	৯. সব রকম প্রতারণা বর্জন
১০. সুখ-দুঃখ ও উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে স্রষ্টার দিকে অগ্রসর হওয়া	১০. কেউ দুঃখ পায় এমন অনৈতিক কাজ বর্জন

Dhaka University Institutional Repository

১১. সদস্যগণ নিজ বিবেকের নিকট দায়বদ্ধ থাকবে ১২. সদস্যগণ বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন-এর কেন্দ্রীয় আইন মেনে চলবে, যোগাযোগ রক্ষা করবে ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণ করবে।	১১. যে কোন পরিস্থিতি ও সমস্যায় নতুন সমাধান সৃষ্টি করে স্বনির্ভর হতে ভুলবে না।

অধ্যাত্ম প্রতিভা

আমাদের দেশে অনেক ছেলে-মেয়ের মাঝেই অধ্যাত্ম প্রতিভা রয়েছে। যারা সামান্য চেষ্টা ও সাধনায় লাভ করতে পারে স্রষ্টার সান্নিধ্যের পরমানন্দ। কিন্তু পরিবার ও পরিবেশের চাপে, বিকৃত সংস্কৃতির প্রভাবে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞানের অভাবে নিষ্পাপ ছেলে-মেয়েরা অধ্যাত্ম জ্ঞানের আলো ও পরমানন্দ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিবেকানন্দ বলেন, তাদের আত্মার কথা, প্রাণের কথা শুনতে দেয়া হয় না। তারা জ্ঞানের আলো থেকে পতিত হচ্ছে অজ্ঞানতার মহাকালো গহ্বরে। তারা পারে পরিবারের গণ্ডি অতিক্রম করে, সমাজের বাধ ভেঙ্গে অজ্ঞানতা, কুসংস্কার ছিন্ন করে, ঐশী জ্ঞান অর্জন করে অনন্ত তৃষ্ণা মিটাতে। এমন ছাত্র-ছাত্রী নেই? যাঁরা প্রচলিত শিক্ষা ও পাঠ্যসূচির গণ্ডি অতিক্রম করে অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার জন্য অনন্তের পথে ছুটবে অসীম সাহসে। সেই পূণ্য পথের যাত্রীরা "ঐশী জ্ঞান (Divine knowledge)" অনুশীলন করবে দেশ-বিদেশের যে কোন প্রান্তে। তারা যে কোন মূল্যে সত্য রক্ষা করবে। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের মূল ভিত্তি ধর্ম। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা আমরা যতই কল্যাণকর বলে মনে করি না কেন, তার চেয়ে ধর্ম শিক্ষা এদেশের স্থায়ী উন্নয়নের জন্য বেশী প্রয়োজন। ধর্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, ভারতবর্ষের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সমস্ত উন্নতির মূলেই থাকবে ধর্ম, তখন তিনি ধর্মের এ স্বরূপটির উপরেই জোর দিয়েছিলেন এবং এই ধর্মভাব প্রসারের জন্য মাধ্যম করেছিলেন সেবা কর্মসূচিকে। বিবেকানন্দ প্রদর্শিত লোকশিক্ষার পথগুলো যদি আমরা অনুধাবন করার চেষ্টা করি, তবেই কল্যাণ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

আধ্যাত্মিক বিপ্লব

বিপ্লব ছাড়া কোন জতির মুক্তি সম্ভব নয়। পরিবর্তনশীল সমাজ জীবনে নতুন পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে মানব কল্যাণের জন্য বিপ্লব আবশ্যক। বিপ্লবের উদ্দেশ্য কৃষক, শ্রমিক, সর্বহারা, ছিন্নমূল, ভিক্ষুক, শিক্ষিত, অতিক্ষিত বিভিন্ন শ্রেণীর বেকারদের কর্মসংস্থান ও ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন এক অধ্যাত্মিক বিপ্লব। বিবেকানন্দের দর্শন অনুসারে বাংলাদেশের কাজের জন্য প্রয়োজন সর্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত এরকম বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, আত্মবিশ্বাসী এবং সর্বোপরি ক্ষাত্রবীর্য এবং ব্রহ্মতেজ সমন্বিত একশটি তাজা যুবক। আমাদের প্রয়োজন সর্বস্ব ত্যাগী কিছু বীর সৈনিক-যারা মুক্তি সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। বিবেকানন্দ বলেন, পৃথিবীর ইতিহাস হল আত্মবিশ্বাসী কয়েকজন মাত্র মানুষের ইতিহাস। সে বিশ্বাস ভিতরের দিব্য শক্তিকে বাইরে ডেকে আনে। তখন তুমি সকল কিছুই করতে পার। কেবল তখনই পার না, যখন সে অসীম শক্তিকে প্রকাশ করার চেষ্টা কর না। যখনই কোন মানুষ বা জাতি আত্মবিশ্বাস হারায় তখনই তার মৃত্যু ঘটে। প্রথমে নিজেকে বিশ্বাস কর, তার পরে ভগবানকে বিশ্বাস কর। সুষ্টিমেয় কয়েকজন বলিষ্ঠ মানুষই পৃথিবীকে আন্দোলিত করবে।

অস্তিত্ববাদ (Existentialism)

বিবেকানন্দের মতে মানব অস্তিত্বের ভিত্তি হলো আত্মা। যান্ত্রিক সভ্যতার যাতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে আমরা হারিয়েছি আমাদের ব্যক্তিত্ব, স্বাধীনতা, মর্যাদা ও মূল্যবোধ। অশিক্ষা, অপসংস্কৃতি, ধর্মান্ধতা, বেকারত্ব, অভাব, প্রতিকূল পরিবেশ এবং অজ্ঞানতার কারণে ও সৃজনশীলতার অভাবে মানুষ হারিয়ে যাচ্ছে প্রকৃতির মাঝে, ডুবে যাচ্ছে সংকীর্ণতা ও দুঃখের সাগরে। মানুষ পরিণত হচ্ছে যন্ত্রে। সে জীবনের চেয়ে যন্ত্রের প্রতি বেশী যত্মশীল। মানুষ যেন ছায় বা পুতুল। সে ভাল-মন্দ বিচার না করে অপরের অনুসরণ করে। বৃটিশ ও আমেরিকানদের আচরণ ও সংস্কৃতি তাদের ছায়ার মত অনুসরণ করলেই যেন আমরা উন্নত ও সভ্য হতে পারি। দার্শনিক জ্যাঁপল সার্ত্র বলেন, মানুষ ছায়া বা পুতুল নয়। সে অন্যের হাতের ক্রীড়নক (খেলনা) নয়। ব্যক্তি মানুষের মাঝে রয়েছে অসীম সম্ভাবনা। মানুষ তা-ই সে নিজেকে যেভাবে সৃষ্টি করে। মানুষ ব্যক্তিত্ব স্বাধীনতা মর্যাদা মূল্যবোধ ও

Dhaka University Institutional Repository

নৈতিকতা সৃষ্টি করে। মানুষের অস্তিত্বের ভিত্তি তার আত্মা। আর এই আত্মার বিকাশ ও মুক্তিকে কেন্দ্র করে রচিত হবে তার জীবনদর্শন। যে জীবন দর্শনের সহজ পথে মানুষ পৌঁছে যাবে স্রষ্টার নিকট এবং লাভ করবে চিরমুক্তি। মানুষের রয়েছে স্বাধীনতা ও সৃজনশীলতা। মানুষ যে কোন সমস্যায় সৃষ্টি করবে সমাধান। আত্মশক্তি মানুষকে মহান করে। নেতাজী সুভাষ বসু বলেন, 'আমার নিজের উপর পূর্ণ বিশ্বাস এবং হৃদয়ে অনন্ত শক্তি'। আত্মশক্তিতে উজ্জীবিত হয়ে কবি নজরুল বলেন, 'মোরা বিধাতার মত নির্ভয়, মোরা প্রকৃতির মত স্বচ্ছ'। মানুষের সব কাজ ও সাফল্যের মূলে রয়েছে ইচ্ছাশক্তি (Will force)। তাই বলা হয় you can do everything if you will.

কারিগরি প্রশিক্ষণ

দেশের উন্নয়নের জন্য কর্মী প্রশিক্ষণ খুবই জরুরী। সারা দেশে বিভিন্ন উন্নয়ন কেন্দ্র ও প্রতিষ্ঠানে যুব কর্মীদের প্রশিক্ষণ চলবে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মধ্যে প্রথমে থাকবে সংগঠন পরিচালনা পদ্ধতি, সদস্য সংগ্রহ, সংগঠনের হিসাব রাখার পদ্ধতি প্রভৃতি। এছাড়াও থাকবে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রভৃতি। বেশির ভাগ প্রশিক্ষণ হবে গ্রাম কেন্দ্রিক এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ভিত্তিক, যাতে যুবকগণ জীবিকার সংস্থান করতে পারে। গ্রামের যুবকগণ যাতে গ্রাম ছেড়ে শহরমুখো না হয়। লোকশিক্ষা পরিষদ বিশ্বাস করে, একটি গ্রামে নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত যুবক যুবতী থাকলে গ্রামের নানা দিকের উন্নয়নের একটা প্রেরণা সৃষ্টি হবে তাতে গ্রামের অবস্থার পরিবর্তন ঘটবে। লোক শিক্ষা পরিষদের এই বিশ্বাস অর্থহীন হয়নি। প্রশিক্ষণের সাথে গুচ্ছ সমিতির এবং গ্রামের সংগঠন বিশেষ ভাবে সম্পৃক্ত। প্রয়োজন ভিত্তিক প্রশিক্ষণে তারাই কর্মী পাঠান, প্রশিক্ষণে প্রাপ্ত জ্ঞান ব্যবহারের চেষ্টা ও উদ্যোগ তারাই করে থাকেন। বিবেকানন্দ কারিগরি শিক্ষার উপর বেশী গুরুত্ব দেন। আমাদের দেশে স্বাধীনতার পর স্কুল কলেজের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে, কিন্তু তা দিয়ে দেশের বেকার সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে বিবেকানন্দ বলেন 'তোরা একটা ছুঁচ পর্যন্ত করতে পারিস না, তবু ইংরেজদের সমালোচনা করিস। ওরে নির্বোধ, আগে তাদের পায়ের কাছে বসে যন্ত্রশিল্প, ব্যবসাবাণিজ্য, কার্যকরী বুদ্ধি শিখেনি, যাতে জীবন যুদ্ধে জিততে পারিস।'[১০] বিবেকানন্দ দরিদ্র মানুষদের আত্মবিশ্বাসী ও আত্মনির্ভরশীল করে তোলার কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যাতে মানুষ দান বা ভিক্ষা গ্রহণের পরিবর্তে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ অখণ্ডানন্দকে এক চিঠিতে লিখেন, 'উর্ধ্বরেদাত্মানাত্মানম (নিজেই নিজেকে উদ্ধার করবে)- সকল বিষয়েই এই সত্য- we help them to help themselves...ওরা যখন বুঝতে পারবে নিজেদের অবস্থা, উপকার এবং উন্নতির আবশ্যকতা, তখনই তোমার ঠিক কাজ হচ্ছে জানবে।'[১১] সুতরাং বিবেকানন্দের লোকশিক্ষা পুঁথিগত শিক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দেশের স্বাধীনতার ৩৮ বছর পরেও দেখা যাচ্ছে, উন্নয়নের জন্য কোটি কোটি টাকা ব্যয় করা সত্ত্বেও উন্নয়নের ফল দরিদ্র মানুষের মধ্যে পৌঁছে না। তাই এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিবেকানন্দের শিক্ষা অনুসারে সরকার ও স্থানীয় প্রশাসন ও গ্রাম উন্নয়ন কেন্দ্র একত্রে Awareness camp জন জাগরণ কর্মসূচি গ্রহণ করে সফল হবে।

কর্মসূচি নির্ধারণ ও মূল্যায়ন

গ্রাম সংগঠনগুলি প্রধান কার্যালয়ের সহায়তায় স্থানীয়ভাবে অনুভূত সমস্যার নিরিখে কর্মসূচি গ্রহণ করবে। কর্মীগণের সেবা ও আন্তরিকতার ভিত্তিতে গ্রাম সংগঠনের বিভিন্ন কর্মসূচির সুফল যাতে দরিদ্র মানুষের নিকট পৌঁছে সে ব্যবস্থা করা হবে। প্রধান কার্যালয় কর্মসূচির মূল্যায়ন ও আয়-ব্যয় হিসাব এবং তদারকি করবে। প্রতি বছর কেন্দ্রীয় কমিটির বার্ষিক সম্মেলনে গ্রাম, আঞ্চলিক ও বিভিন্ন শাখার দায়িত্বশীল প্রতিনিধিগণ অংশ গ্রহণ করবেন। এতে গত বছরের কর্মসূচি পর্যালোচনা এবং পরবর্তী-বছরের কর্মসূচির নীতি নির্ধারণ করা হবে। এছাড়া গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা ও বিভাগীয় কার্যালয় সুবিধামত ও প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন সভায় বিভিন্ন কর্মসূচি পর্যালোচনা, সংশোধন ও পরিবর্তন করবে। মাঝে মাঝে প্রতিনিধি সভাও অনুষ্ঠিত হবে। বিভিন্ন শাখা কার্যালয়ের প্রতিনিধিগণ বিভিন্ন গ্রাম সংগঠন পরিদর্শন করবেন। প্রতিনিধিগণ ডেস্ক-ইন-চার্জের উপস্থিতিতে সামগ্রিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করবেন। বার্ষিক কর্মী সভায় সকল স্তরের কর্মী ও সদস্য অভিজ্ঞতা বিনিময়ের সুযোগ পাবে। বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে আয়োজিত বার্ষিক আলোচনা সভায় গ্রাম, জাতীয় এমন কি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের বিশেষজ্ঞ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে সরাসরি কথা বলতে পারবেন। কলকাতা নরেন্দ্রপুরের লোকশিক্ষা পরিষদের পথ ধরেই আমরা বিশ্ব ঐশীদর্শন আন্দোলনে সাফল্য লাভ করতে পারি। 'গত ৩৬ বছর ধরে এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে লোকশিক্ষা পরিষদ গ্রাম সংগঠন করে আসছে। আনন্দের কথা, শুধু রাজ্য পর্যায়েই নয়

Dhaka University Institutional Repository

জাতীয় পর্যায়েও এই পদ্ধতি সমাদৃত হয়েছে, উন্নয়নশীল বিভিন্ন দেশেও। রাজ্য, জাতীয় এবং বিভিন্ন দেশের বহু সংগঠনকর্মী সারা বছর ধরেই আসছেন লোকশিক্ষা পরিষদে। এখানে থেকে এখানকার কর্ম পদ্ধতি পর্যবেক্ষণ করে অনুপ্রাণিত হয়ে ফিরে যাচ্ছেন। পক্ষান্তরে দেশ-বিদেশের বহু সংগঠন এবং কর্মীর সাথে লোকশিক্ষা পরিষদ আর তার সংগঠনগুলির এক আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠেছে।'[১২] এ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের সাথে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন সংগঠন ও কর্মীদের সাথে আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠবে। বর্তমান সরকারও গ্রামোন্নয়নের দিকে খুব মনোযোগ দিয়েছে। এ সুযোগটা আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কর্মীগণ গ্রামবাসীদের জাগিয়ে তুলবেন। হতাশা নয়, আশার কথা দিয়ে মন ভরিয়ে দিন। বাধা বিঘ্ন নয়, সাফল্যের কথা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করুন। 'প্রতি মহৎ কাজে বাধা বিঘ্ন থাকবেই। পায়ে দলে সেই বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে এগিয়ে যেতে হবে আপনাদের। বাধা বিঘ্ন থাকবে না? জীবনের লক্ষ্যই হচ্ছে সংগ্রাম। কিসের বিরুদ্ধে? বাধা-বিঘ্নের বিরুদ্ধে। সব বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করে আমরা এগিয়ে যাব এই দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।'[১৩] কর্মী ভাইগণ গ্রামের সকল যুবক-যুবতীদের ডাকুন। বলুন, এসো, আমরা একসঙ্গে কাজ করি। এই আমাদের গ্রাম তো আমরাই গড়ব। কে গড়বে? বাইরে থেকে কোন মানুষ আসবে কেন? আমরা সব কাজ করব। প্রত্যেক বাড়ী গিয়ে বলুন, বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। পরিবেশ সুন্দর করুন। গ্রামে মাটির ঘরগুলোও ছবির মতো সুন্দর করুন। আমাদের দেশে কোন অভাব নেই। আমাদের সুন্দর স্বাধীন সার্বভৌম দেশে রয়েছে কৃষি ও বনভূমি-অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ, মানব সম্পদ প্রভৃতি। বাঙালির রয়েছে সুন্দর ভাষা, সুন্দর পোশাক পরিচ্ছদ, শিল্প ও সমৃদ্ধ সংস্কৃতি ভাণ্ডার। সর্বোপরি বাঙালি জাতির রয়েছে সাফল্যের চাবি-অফুরন্ত প্রাণ শক্তি। দারিদ্র্য আছে বলেই কি আমরা হাসব না। 'সবাই বলে যে, বাঙালীর জীবনশক্তি, প্রাণশক্তি অফুরন্ত। কি করে বাঙালী এত হাসে, এ বাঙালী আবার গান গায়, এ বাঙালী আবার অভিনয় করে, প্রত্যেকে স্বপ্ন দেখে যে সে কবি হবে, সে শিল্পী হবে। এই তো বাঙালীর বৈশিষ্ট্য। আশ্চর্য প্রাণশক্তি বাঙালীর।'[১৪] তাই কালে বাঙালির সন্তান প্রজ্বলিত সূর্য সৈনিক স্বনির্ভর দেশ গড়তে সক্ষম হবেই হবে।

মানবতাবাদী দর্শন

জগতের মহাপুরুষগণের একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁরা কঠোর সাধনার মধ্য দিয়ে নিজেদের আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলেন। তাঁদের ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, গুণ, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি মানব সমাজে এক অনন্য আদর্শরূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এ কারণেই দেখা যায় মহাপুরুষগণের আদর্শ অনুসরণ করে চলেছে পৃথিবীর বহু মানুষ। মানুষ তাঁদের চরিত্র, মহানুভবতা, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি গুণের মাঝে খুঁজে পায় এক পরম তৃপ্তি, পরম আনন্দ। তাইতো মানুষ অনন্ত তৃষ্ণা মিটাতে অনুসরণ করে তার প্রিয় আদর্শ মহাপুরুষের যিনি মানুষরূপী দেবতা। আর মহাপুরুষগণ জগতের মানুষের কল্যাণের জন্য, শান্তির জন্য স্থাপন করেন অনন্য দৃষ্টান্ত। তাঁদের চিন্তা, কথা, কাজ, রচনা, বক্তৃতা, মানুষের প্রতি সদ্ব্যবহার, উদারতা, মহানুভবতা, দান, ক্ষমাশীলতা প্রভৃতি মানুষের মন জয় করে। আর মহাপুরুষগণ এভাবেই মানুষের মন জয় করে তাদের হৃদয়ের সিংহাসন অধিকার করে রাজত্ব করেন যুগের পর যুগ, শতাব্দীর পর শতাব্দী। জগতের মহাপুরুষগণের মধ্যে স্বামী বিবেকানন্দ শুধু নিজেকেই সত্য ও সুন্দররূপে প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি চেয়েছেন স্বদেশের ও বিদেশের প্রতিটি মানুষ হয়ে উঠবে আদর্শ মানুষ। তিনি হিন্দু ধর্মের অনুসারী হলেও তাঁর চিন্তা ও আদর্শ ছিল সর্বজনীন। অপর দিকে, তিনি ছিলেন একজন মহান ধর্মগুরু। আর এ দায়িত্বেই তিনি গড়ে তোলেন মানুষ গড়ার বিশাল আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্র। যেখানে গুরুর হুকুম নির্দ্বিধায় পালন করেন শিষ্যগণ। এভাবেই গুরু স্বামী বিবেকানন্দের হুকুম পালন করে মনুষ্যত্ব অর্জন করেন বহু জ্ঞান পিপাসু মুক্তিকামী সাধক। স্বামীজীর এ মানুষ গড়ার কারখানা রামকৃষ্ণ মিশন নামে আজও কাজ করে চলেছে অব্যাহত গতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে।

এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে রয়েছে অপার রহস্য। অধ্যাত্ম দর্শনের দৃষ্টিতে মহান সৃষ্টিকর্তারূপ ব্রহ্ম মানুষের মাঝে অবস্থান করে রহস্যের কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়েছেন। মানুষ তার উন্নত বুদ্ধিবৃত্তির জন্য অন্যান্য প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠ। কারণ মানুষ তার নিজ সম্পর্কে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ, ঈশ্বর এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে কোন বিষয় নিয়ে চিন্তা ও গবেষণা করতে পারে। সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে তাঁর মানবদর্শন সৃষ্টি করেন। তিনি মানুষের উৎপত্তি, প্রকৃতি, পরিণতি, লক্ষ্য এবং লক্ষ্য অর্জনের উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। বিবেকানন্দ মানুষের সাথে মানুষের এবং ব্রহ্মের সম্পর্ক আলোচনা করেন। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের অবস্থান এবং লক্ষ্য অর্জনের উপায় সম্পর্কে বিবেকানন্দ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আলোচনা করেন। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী বিবেকানন্দ তাঁর চিন্তা, ভ্রমণ, শিক্ষা, সাধনা ও গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে অর্জিত জ্ঞানের মাধ্যমে রচনা করেন সকল যুগের

Dhaka University Institutional Repository

উপযোগী আদর্শ মানবতাবাদ বা মানবদর্শন। তাঁর এই মানবদর্শন সুন্দর, সার্থক ও কল্যাণকর জীবন গঠনের জন্য অপরিহার্য। স্বামীজী বিশ্বের বহু মহাপুরুষ, ধর্মাবতার ও সমাজ সেবকগণের জীবনাদর্শ এবং ঐশী গ্রন্থ, বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, যুক্তি প্রভৃতি বিষয় অধ্যয়ন ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মৌলিক শিক্ষা গ্রহণ করে গড়ে তোলেন তাঁর মানবদর্শন নামক মহাসৌধ। আধুনিক বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে মারণাস্ত্রের সংকটের মুখে যুদ্ধ বিগ্রহ ও বৈরিতার আগ্রাসন থেকে মুক্ত করে একটি সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, আনন্দময় জীবন ও সুন্দর পৃথিবী গড়তে আজ বিবেকানন্দের দর্শন অপরিহার্য। মানব প্রেমই হল বিবেকানন্দের মানবতাবাদের মূল কথা। তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে ভালবাসেন। মানুষের প্রতি প্রেম, সহানুভূতি, মানুষের দুঃখ মোচনে আত্মনিয়োগে প্রেরণা দেয় বিবেকানন্দের মানবতাবাদী দর্শন। মানুষের প্রতি প্রেম ও সেবার বিচারে তিনি মহামানব। প্রেমের গভীরতায়, সেবার ব্যাপকতায় বিবেকানন্দ মানব ইতিহাসে উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। তার হৃদয় আকর্ষণকারী ধ্যানমূর্তি দর্শককে মুগ্ধ করে। মানুষের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনই বিবেকানন্দের বাল্যকাল থেকে মহাপ্রয়াণ পর্যন্ত মানুষের প্রতি ছিল সুগভীর প্রেম। এই প্রেমের অমৃত ধারায় রসময় হয়ে আছে তাঁর জীবন। বিবেকানন্দ বয়স ও পরিবেশের উপযোগী কাজ করে তাঁর বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার পরিচয় দেন। তিনি যুগোপযোগী কর্তব্য সম্পাদন করে দক্ষতার প্রমাণ করেন। বিবেকানন্দের সব কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় পরদুঃখকাতরতা, যা জাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিচারে মানুষের অন্তর স্পর্শ করে। শুধু মানুষ নয়, ইতর প্রাণী তাঁর অন্তর স্পর্শ করে। জীবের প্রতি প্রেমের স্পর্শ ক্রমেই তাঁর দিব্য জীবনের উত্তরণ ঘটায়।

বিবেকানন্দের মতবাদের মধ্যমণি 'মানুষ'। মানুষকে কেন্দ্র করেই তাঁর ধর্ম, দর্শন সবকিছু সৃষ্টি হয়েছে। তিনি চেয়েছেন মানবধর্ম অনুশীলন করেই মানুষের ও সমাজের উত্তরণ ঘটবে। বিবেকানন্দ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রতি বেশী গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে রাষ্ট্রনীতি মানুষের সেবা ও কল্যাণের জন্য একটি সাধারণ অঙ্গ। রাষ্ট্র মানুষের আংশিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। 'তাই রাষ্ট্রের বা সমাজের সর্বগ্রাসী পরিবেশে ব্যক্তিত্বের বিসর্জন তাঁর কাম্য নয়। তাঁর সকল চিন্তার পিছনে ব্যক্তিত্বের বিকাশই মুখ্য হয়ে থাকত। ফলে তিনি মনে করতেন, সমস্ত রাষ্ট্রনীতি, সমস্ত সমাজনীতি গড়ে তুলতে হবে মানবতাবাদকে ভিত্তি করে।'[১৫] বিবেকানন্দের মানবতাবাদ পাশ্চাত্য মানবতাবাদের চেয়ে উন্নত। কারণ মিল, কোঁত, বেন্থাম চেয়েছেন, নরকে নরোত্তম করে তুলতে। আর বিবেকানন্দ চেয়েছেন নরকে তার স্বরূপ নারায়ণে প্রতিষ্ঠিত করতে। পাশ্চাত্যের মানবতাবাদী দার্শনিকগণ চেয়েছেন মানুষের মধ্যে নতুন নতুন গুণ প্রবিষ্ট করাতে। অপরদিকে বিবেকানন্দ চেয়েছেন মানুষ তার নিজ স্বরূপ "নারায়ণ" ফিরে পাবে। কারণ মানুষের এরকম জীবন জিজ্ঞাসা সমাধান এনে দেয়, মানুষকে করে তোলে দেবতা। বিবেকানন্দের মানবতাবাদের ভিত্তি বেদান্তদর্শন। 'বেদান্তই তাঁকে সেই দৃঢ় আত্মবিশ্বাস দিয়েছে; তাঁর মানবতাবাদ ও বেদান্তবাদ, একে অপরের পরিপূরক।'[১৬] এ কারণে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বেদান্তবাদ অধ্যয়ন ও অনুশীলন প্রয়োজন।

শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের জীবনে মূর্ত হয়েছিল 'জীবই শিব'। আর বিবেকানন্দ বেদান্তের এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করেন মানবতাবাদ। বিবেকানন্দ জানতেন এ যুগের চাহিদা বস্তুবাদীদের মতো সাধ আহ্লাদ পূর্ণ করতে গেলে মনুষ্যত্ব ধ্বংস হয়। এ কারণেই তিনি ভোগের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে পারেননি। তাঁর জীবনের সাধনা ছিল মানুষকে তার প্রকৃত স্বরূপে প্রতিষ্ঠা করা। আর এ ধরনের আদর্শ মানুষ পারে সকল যুগের মানুষের সকল ক্ষুধা মেটাতে। তাই তিনি বলেন, 'আমাদের জাতীয় জীবনের প্রধান আকাঙ্খা- আধ্যাত্মিক উন্নতি...।'[১৭] অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতি মানুষকে তার স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলে। ভারতবাসীর উচ্চকাঙ্খার অভাব, দারিদ্রের তাড়না প্রভৃতি কারণে জাতি আকাঙ্খা পূরণের পথ খুঁজে পাচ্ছিল না। জাতির আকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বলেন, '...ভারত আবার জাগিতেছে এবং জগতের উন্নতি ও সভ্যতায় তাহার যাহা দিবার আছে, দিতে প্রস্তুত হইয়াছে।...ভারতীয় দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাবরাশি আবার সমগ্র পৃথিবী জয় করিবে।...আমাদের শুধু যে স্বদেশকে জাগাইতে হইবে তাহা নহে...আমার ধারণা হিন্দু জাতি সমগ্র জগৎ জয় করিবে।...ভারতকে অবশ্যই পৃথিবী জয় করিতে হইবে- ইহা অপেক্ষা, নিম্নতর আদর্শে আমি কখনই সন্তুষ্ট হইতে পারি না।'[১৮] ভারতে ধর্ম, দর্শন, আধ্যাত্মিকতা প্রভৃতি সম্পদের প্রাচুর্যতা রয়েছে। এসব সারা বিশ্বে প্রচার করে মানুষের শান্তি ও সমৃদ্ধি বয়ে আনবে ভারতবাসী। তাই বিবেকানন্দ বলেন, 'চিরকাল শিষ্য হইয়া থাকিল চলিবে না, আমাদিগকে গুরুও হইতে হইবে।...এখনও বহু শতাব্দী যাবৎ জগৎকে শিখাইবার বিষয় তোমাদের যথেষ্ট আছে। এখন এই কাজ করিতেই হইবে। ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন: আর আমি ইচ্ছা করি...সকলের মনে এই

Dhaka University Institutional Repository

কল্পনা জাগ্রত হউক...।'[১৯] একথায় বিবেকানন্দ আমাদের এক বিরাট জাতীয় আকাঙ্খার সন্ধান দিয়ে সারা বিশ্বে মানবতা উত্তরণের বীজ বপন করেন। তাঁর এই প্রেরণা ও শিক্ষা আজও মানুষকে গতিশীল করছে মনুষ্যত্বের পথে।

বিবেকানন্দের আত্মপ্রতিষ্ঠা

জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মহাপুরুষগণ কঠোর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জ্ঞান অর্জন করে, নৈতিক চরিত্র উন্নত ও সমৃদ্ধ করে সঠিক কর্মফল অর্জনের মাধ্যমে তাঁর সুমহান লক্ষ্যে অগ্রসর হয়েছেন। আর এ মহান ব্রত গ্রহণের ভিত্তি নিজ আত্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তিনি শিক্ষা-দীক্ষা, আচার-আচরণ ও কাজে-কর্মে নিজেকে সুন্দর মানুষরূপে গড়ে তোলেন। মহাপুরুষগণ জগতে তাঁদের লক্ষ্য ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য নিজেকে ঐ লক্ষ্য অর্জনের যাগ্য নেতৃত্বদানকারীরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। পূণ্যাত্মা স্বামী বিবেকানন্দ এক অসাধারণ প্রতিভা নিয়েই জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু পরিবারে আদর্শ পিতামাতার সান্নিধ্যে অধ্যয়ন ও শিক্ষা গ্রহণ করে জগদ্বিখ্যাত মহাপুরুষ হওয়ার গৌরব অর্জন করেন। জগৎ সম্পর্কে তাঁর কৌতুহলের সীমা ছিলনা। জগত ও জীবনের প্রতি অদম্য কৌতুহল তাঁকে করে তোলে মহান চিন্তাশীল দার্শনিক। অপরের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হতেন। দরিদ্রদের প্রতি তাঁর ছিল অসীম দয়া। একদিন বালক নরেন্দ্র দোতলা ঘরের জানালা দিয়ে কাপড়-চোপড় সব দরিদ্রদের দান করেন। দূরন্ত বালক নরেনের জন্য মা ভূবনেশ্বরী সময় সময় খুবই বিরক্ত হতেন। জনদরদী স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের সুখ-দুঃখ দেখার জন্য পায়ে হেঁটে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি মিশতেন ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ছোট-বড় সকল শ্রেণীর মানুষের সাথে। তিনি মানুষের দুঃখে সান্ত্বনা দেন, পথ হারাদের পথ দেখান, জ্ঞান পিপাসুদের জ্ঞান দান করেন এবং মুক্তিকামীদের দেখান মুক্তির পথ। তিনি দেশ ও জাতি গঠনের কাজে বিশ্বের সকল যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করেন। তিনি বলেন- 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছানো পর্যন্ত থামিও না'।

বিবেকানন্দের কথা, আচরণ, ভাবমূর্তি ও আকর্ষণীয় চেহারা দেখে সকলেই মুগ্ধ হন। তিনি সহজেই অপরকে আপন করে নেন এবং নিজের চিন্তাকে মানুষের প্রয়োজন অনুসারে সঞ্চারিত করেন। প্রেম, দয়া-মায়া, সৌজন্য, সৌভ্রাতৃত্ব তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি তাঁকে শ্রদ্ধার আসনে স্থান দিয়েছে। বিবেকানন্দ ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন, বিচার-বিশ্লেষণ ও বাস্তবতার ভিত্তিতে পর্যবেক্ষণ করে তাঁর জ্ঞানসৌধ নির্মাণ করেন। তিনি জীবন জিজ্ঞাসার জন্য ছুটে যান বহু সাধক-যোগী ও জ্ঞানী-গুণীর নিকট। অবশেষে শ্রীরামকৃষ্ণের সাক্ষাতে তাঁর জ্ঞান সাধনা এবং সত্য প্রচারের মাধ্যমে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়। জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় মহামনীষীগণ জ্ঞানান্বেষণ ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে প্রথমে আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন। কারণ আত্মপ্রতিষ্ঠার ভিত্তিতেই তাঁর চিন্তা, দর্শন ও লক্ষ্য বাস্তবায়নে অগ্রসর হন। স্বামী বিবেকানন্দও তেমনি যুক্তি ও বিজ্ঞান চেতনার মাধ্যমে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা করেন। তাই লক্ষ্য করা যায় তাঁর দর্শন চিন্তার সাথে জীবনের অদ্ভুত মিল রয়েছে। তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতা, বাণী, রচনা ও কাজে নিজস্ব চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন ঘটে। বিবেকানন্দ রচিত কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, রাজযোগ প্রভৃতি গ্রন্থে তাঁর ব্যক্তিত্বের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায়। এক কথায় বলা যায়, যে সকল সত্য তিনি উপলব্ধি করেন, সেসব নিজে অনুশীলন করেন এবং অপরকে অনুশীলন করার পরামর্শ দেন। আর এভাবেই বিবেকানন্দ সুঠাম দেহ, প্রেমিক হৃদয়, দূরদর্শী রাজনীতিবিদ, স্বাধীন ভারত প্রতিষ্ঠার অগ্রনায়ক, বিজ্ঞানমনস্ক মহাপুরুষ, সুনিপুণ শিল্পগুরু, মুক্তিকামী সাধক ও মানবতাবাদী সমন্বয়ী দার্শনিক প্রভৃতি বহুমুখী প্রতিভার মাধ্যমে মহামানব হিসেবে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁর শিক্ষা ও আদর্শের ভিত্তিতেই জগতে সাম্য, মৈত্রী, কল্যাণ ও শোষণমুক্ত স্বাধীন মানব সমাজ গড়তে চেয়েছেন। যাকে বলা হয় দিব্য সমাজ।

এ সমাজে মানুষের লক্ষ্য অধ্যাত্মজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে আত্মার মুক্তির পথে অগ্রসর হওয়া। রোমাঁ রোলাঁ যথার্থই বলেছেন- "ভারসাম্য ও সমন্বয়, এই দুইটি কথার মধ্যে বিবেকানন্দের সংগঠন প্রতিভা সংক্ষেপে প্রকাশ করা যায়। সমগ্র সম্পূর্ণ চারিটি যোগ, ত্যাগ ও সেবা, শিল্প ও বিজ্ঞান, ধর্ম ও সর্বাপেক্ষা আধ্যাত্মিক হইতে সর্বাপেক্ষা ব্যবহারিক সকল কর্ম- এই সমস্ত মানস পথকেই তিনি সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন।...তিনি ছিলেন সকল প্রকার মানসিক শক্তির সামঞ্জস্যের মূর্ত প্রকাশ।'[২০] বিবেকানন্দ তাঁর ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত ভিত্তির উপর স্থাপন করেই গড়ে তোলেন মানবতাবাদী দর্শন, যে শক্তি ও

Dhaka University Institutional Repository

আলো অতীতে মানুষকে সঠিক পথ নির্দেশনা দিয়ে জীবন ও সমাজের কল্যাণ সাধন করেছে, বর্তমানেও সেই ধারা অব্যাহত রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।

মানবপ্রকৃতি অনুসন্ধান

স্বামী বিবেকানন্দ বাল্যকাল থেকে শুরু করে কর্মজীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মানুষের প্রকৃতি নিয়ে গবেষণা করেন- শুধু মানবকল্যাণের জন্য। তাঁর মানব প্রকৃতি অনুসন্ধানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে মানবদর্শন। স্বামী বিবেকানন্দ ছেলেবেলা চিন্তা করেন, ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর মানুষের জন্য পৃথক হুকা কেন? তিনি পরীক্ষা করার চেষ্টা করেন ব্রাহ্মণেতর মানুষ উচ্চ বর্ণ বা ব্রাহ্মণ জাতির হুকায় ধূমপান করলে কিভাবে জাত যায়। বিবেকানন্দ শারীরতত্ত্ব (Physiology) ও মনোবিজ্ঞানের (Psychology) সাহায্যে মানবদর্শনের অভ্যন্তরীণ দিক ব্যাখ্যা করেন। বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ, গোত্র পেশা, উচ্চ, নীচ, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের সাথে মিশে তাদের জীবনদর্শন উপলব্ধি করেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মীতার মাধ্যমে কল্যাণমূলক সমাজ গঠনে সবাইকে উৎসাহিত করেন। তাঁর এ দৃষ্টিভঙ্গি মানব প্রকৃতির রহস্য উন্মোচন করে।

পরিব্রাজক স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের জীবন ও সংস্কৃতি অনুসন্ধানের জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। পাশ্চাত্য দেশে যাত্রা পথে তিনি গঙ্গার শোভা, বাংলার রূপ দেখেন। জাহাজে ভ্রমণ করে তাঁর অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি ইউরোপ, ফ্রান্স, জার্মান, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ও তুরস্ক প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেন, সে সব দেশের লোকদের জীবনধারা কার্য-প্রণালী, তাদের শিল্পকলা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতি লক্ষ্য করেন। পাশ্চাত্যে যাবার সময় বিবেকানন্দ শ্রীলঙ্কা কিছুদিন অবস্থান করেন। সেখানকার বৌদ্ধধর্ম ও কালচার সম্পর্কে বলেন, "এক অহিংসা পরমো ধর্মের বাড়ীতে ঢুকেছে- চোর। কর্তার ছেলেরা তাকে পাকড়া ক'রে বেদম পিটছে। তখন কর্তা দোতলার বারাণ্ডায় এসে, গোলমাল দেখে, খবর নিয়ে চেঁচাতে লাগলেন, 'ওরে মারিসনি, মারিসনি, অহিংসা পরমো ধর্মঃ। বাচ্চা অহিংসারা মার থামিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, তবে চোরকে কি করা যায়? কর্তা আদেশ করলেন, 'ওকে থলিতে পুরে জলে ফেলে দাও। চোর জোড় হাত ক'রে আপ্যায়িত হয়ে বললে, 'আহা, কর্তার কি দয়া।"[২১] বিবেকানন্দ ভারতের ধর্ম, দর্শন ও ঐতিহ্য অনুসন্ধান করেন। 'বিবেকানন্দ নতুন দিগন্ত আবিষ্কারের জন্য পথে নামেননি। প্রাচীন, মধ্যযুগ ও আধুনিক কালের ভারতবর্ষের মূল তাৎপর্য সন্ধান, তাকে জ্ঞান কর্ম ভক্তির আলোকে বুঝে নেওয়া এবং জগতের ইহ ও পরত্রের সমন্বয়সূত্রে মনুষ্যত্বকে ধারণ করা তাঁর সমস্ত কর্মপ্রচেষ্টা একই দিকেই ধাবিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের শাস্ত্র-সংহিতা, বেদ-উপনিষদ-তন্ত্র-পুরাণ ষড় দর্শন, বৌদ্ধ শীল-সদাচার, বিনয়, অভিধর্ম ও দার্শনিক তাৎপর্য, মধ্যযুগের সগুণাত্মক ভক্তিপন্থী ও নির্গুণাত্মক জ্ঞানপন্থী সন্তসাধকদের ভাবভঙ্গিমা তিনি তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সাধকের দৃষ্টিতে তাকে ব্যক্তির জীবনে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছেন।'[২২] বিবেকানন্দ ভারতীয় শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সাথে যুক্ত করতে চেয়েছেন বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির। আরও জানতে চেয়েছেন উন্নত ও শক্তিশালী দেশগুলোর রাষ্ট্রনীতি ও ঐতিহ্য। ইউরোপীয় সভ্যতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ ইতালী সম্পর্কে বলেন, 'জাহাজ নেপল্‌সে লাগল- আমরা ইতালীতে পৌঁছুলাম। এই ইতালীর রাজধানী রোম! এই রোম, সেই প্রাচীন মহাবীর্য রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী-যার রাজনীতি, যুদ্ধবিদ্যা, উপনিবেশ সংস্থাপন, পরদেশ বিজয় এখন সমগ্র পৃথিবীর আদর্শ।'[২৩]

বিবেকানন্দ জাহাজে পাশ্চাত্যে যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'এবার ভূমধ্যসাগর। ভারতবর্ষের বাইরে এমন স্মৃতিপূর্ণ স্থান আর নেই-এশিয়া, আফ্রিকা-প্রাচীন সভ্যতার অবশেষ। একজাতীয় রীতি-নীতি, খাওয়া-দাওয়া শেষ হ'ল, আর এক প্রকার আকৃতি-প্রকৃতি, আহার-বিহার পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার আরম্ভ হ'ল- ইউরোপ এল। শুধু তাই নয় নানা বর্ণ, জাতি, সভ্যতা, বিদ্যা ও আচারের বহুশতাব্দীব্যাপী যে মহাসংমিশ্রণের ফলস্বরূপ এই আধুনিক সভ্যতা, সে সংমিশ্রণের মহাকেন্দ্র এইখানে। যে ধর্ম, যে বিদ্যা, যে মহাবীর্য আজ ভূমন্ডলে পরিব্যাপ্ত হয়েছে, এই ভূমধ্যসাগরের চতুস্পার্শ্বেই তার জন্মভূমি। ঐ দক্ষিণে ভাস্কর্যবিদ্যার আকর, বহু ধনধান্যপ্রসূ অতি প্রাচীন মিসর; পূর্বে ফিনিসিয়ান, ফিলিস্টিন, য়াহুদী, মহাবল বাবিল, আসীর ও ইরানী সভ্যতার প্রাচীন রঙ্গভূমি–এশিয়া মাইনর; উত্তরে সর্বাশ্চর্যময় গ্রীকজাতির প্রাচীন লীলাক্ষেত্র।'[২৪] স্থান-কাল-পাত্রভেদে যে মানুষের কালচার ভিন্ন হয় তা বিবেকানন্দ ব্যাখ্যা করেন। নানা জাতি, বহু ধর্ম, সভ্যতা প্রভৃতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে এশিয়া, আফ্রিকার সভ্যতা। বিবেকানন্দ ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে বলেন, 'এই ভূমধ্যসাগর প্রান্ত যে ইউরোপীয়

Dhaka University Institutional Repository

সভ্যতা এখন বিশ্বজয়ী, তার জন্মভূমি। এই তটভূমিতে মিসরি, বাবিলি, ফিনিক, য়াহুদী প্রভৃতি সেমেটিক জাতিবর্গ ও ইরানী, যবন রোমক প্রভৃতি আর্যজাতির সংমিশ্রণে বর্তমান ইওরোপী সভ্যতা।'[২৫] মানুষকে জানতে হলে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করতে হলে জানা প্রয়োজন বিভিন্ন স্থান, কালের শিক্ষা-সংস্কৃতি, শিল্প, সভ্যতা প্রভৃতি। জাতি, ধর্ম- বর্ণভেদে মানুষের প্রকৃতি ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই মানুষকে জানার উদ্দেশ্যে, দরিদ্র শোষিত নিষ্পেষিত মানুষের সুন্দর ও সভ্য জীবন গড়তে বিবেকানন্দের এ ঐতিহাসিক ভ্রমণের ভূমিকা ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি বিবেকানন্দের কোন সাধারণ ভ্রমণ নয়, এটি ছিল ইটালী, ফ্রান্স, জার্মান, আমেরিকা ও ইউরোপের শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতি, রাষ্ট্রনীতি ও সভ্যতার মূলনীতি, শক্তি ও কৌশলগুলো জানার এক গভীর অনুসন্ধান। তাঁর এ ঐতিহাসিক সফর মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠার এক উচ্চতর গবেষণা। তাঁর গবেষণা সত্যিই মানব সমাজকে অগ্রসর করেছে বহুদূর। তাঁর এ জ্ঞান ও গবেষণা প্রয়োগ করে বর্তমান অধঃপতিত, পদদলিত অস্পৃশ্য মানব সমাজ আত্মসম্মান ও গৌরব অর্জন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে প্রতিযোগিতামূলক এ তৃতীয় বিশ্বের বুকে।

সামাজিক সমস্যা

স্বামী বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেন সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমস্যা। মানুষের অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা, শিক্ষা প্রভৃতি সমস্যা গভীরভাবে বিবেকানন্দকে ভাবিয়ে তোলে। তাই তিনি এ সকল সমস্যার সমাধান অনুসন্ধান করেন বাস্তব দৃষ্টি দিয়ে। তিনি মানুষের দুঃখ, কষ্ট, ব্যথা-বেদনা সহ্য করতে পারেননি। তিনি মানুষের মাঝেই খুঁজে পেয়েছেন ব্রহ্মকে। তাঁর মানবদর্শনের মূল কথা নরকে নারায়ণে পরিণত করা। নিরন্ন মানুষ, মূর্খ-অশিক্ষিত মানুষ, দরিদ্র কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষ ছিল তাঁর আরাধ্য দেবতা। তিনি সব সময় তাদের দুঃখ মোচনে সচেষ্ট হন। বিবেকানন্দ মানুষের সমস্যা সম্পর্কে চিন্তা করে শুধু লিখেই যাননি, বক্তৃতা করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও সচেতন করার পাশাপাশি কাজ করে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। তাঁর চিন্তা ও কাজের সমন্বয় এক মহান কর্মবীরের পরিচয়। বিবেকানন্দ সামাজিক সমস্যা গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি সমাজে অভাব, দারিদ্র্যতা, অজ্ঞতা সৃষ্টির জন্য দায়ী করেন তথাকথিত শিক্ষিত ও ধনী ক্ষমতাসীন লোকদের। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যাহারা লক্ষ লক্ষ দরিদ্র ও নিষ্পেষিত নরনারীর বুকের রক্ত দ্বারা অর্জিত অর্থে শিক্ষিত হইয়া এবং বিলাসিতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত থাকিয়াও উহাদের কথা একটিবার চিন্তা করিবার অবসর পায় না তাহাদিগকে আমি "বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া অভিহিত করি।'[২৬] বিবেকানন্দ আর্ত, দরিদ্র, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে অখন্ডানন্দের পত্রের উত্তরে জানান, 'রাজপুতনার স্থানে স্থানে ঠাকুরদের ভিতর ধর্মভাব ও পরহিতৈষণা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিবে।...খেতড়ি শহরের গরীব নীচ জাতিদের ঘরে ঘরে গিয়া ধর্ম উপদেশ করিবে আর তাদের অন্যান্য বিষয়, ভূগোল ইত্যাদির মৌখিক উপদেশ করিবে।'[২৭] গভীর জীবন সমস্যা থেকে দর্শনের জন্ম। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সমস্যা অনুধাবন করে স্বামী বিবেকানন্দ অনুসন্ধান করেন সমাধানের পথ। আর এই সামাজিক সমস্যা এবং এর সমাধান মিলেই সৃষ্টি হয় বিবেকানন্দের মানবতাবাদী দর্শন।

বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে মনুষ্যত্ব

স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন মহামানব। তাঁর মানবতা, মহানুভবতা তাঁকে সর্বদাই তাড়িত করতো মানুষকে যথার্থ মানুষরূপে গড়ে তুলতে। মানুষের মাঝে অজ্ঞতা, অনাচার, পাপ, পঙ্কিলতা তাঁকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। মানুষের যথার্থ গুণ বা মনুষ্যত্ব না থাকলে নিজেও যেমন সুখী হয় না তেমনি মানব সমাজের কল্যাণের জন্য কিছু করতেও পারে না, বরং কল্যাণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। তিনি মানুষের জীবন ও দুঃখ-দুর্দশা দেখে উপনিষদের সত্যতা উপলব্ধি করেন- অজ্ঞতাই সকল দুঃখ বা বন্ধনের কারণ। এ জন্য তিনি ব্রতী হন জ্ঞানালোকের সাহায্যে আদর্শ মানুষ গড়ার কাজে। যা ছিল তাঁর জীবনের প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। বস্তুতঃ মানুষের সেবা ও কল্যাণের জন্যই তিনি হন গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী, যাতে দেশ-বিদেশ ঘুরে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের কালচার প্রত্যক্ষ করে তাদের প্রয়োজনীয় শিক্ষা দিতে পারেন। বিবেকানন্দ মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য শিক্ষাকে গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে শিক্ষা ব্যক্তিকে স্বাধীন, স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে এবং সমস্যার সমাধান দেয়। বিবেকানন্দের মতে আদর্শ মানুষ হওয়ার জন্য বা মনুষ্যত্ব লাভের জন্য কতকগুলি গুণ বা বৈশিষ্ট্য অর্জন করা প্রয়োজন। মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরা হল:

Dhaka University Institutional Repository

মনুষ্যত্ব বিকাশে জ্ঞানার্জন

বিবেকানন্দ গভীর জ্ঞানানুরাগী ছিলেন। তাঁর চিন্তা,কর্ম, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতির পিছনে রয়েছে এক অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর। জগতের মহাপুরুষগণ জ্ঞান ও কর্মের মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকেন মানুষের হৃদয়ে। তাঁদের মতো স্বামী বিবেকানন্দও কর্মের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হন মানব সমাজের দিশারীরূপে। বিবেকানন্দ নিজে যেমন জ্ঞানার্জন করেন তেমনি তাঁর শিষ্য ও সকল মানুষকে জ্ঞানার্জন করতে আহ্বান জানান। জ্ঞানার্জনের জন্যই তিনি দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেন। মহানুভব বিবেকানন্দ প্রকৃতই অনুভব করেন আমাদের মনের সংকীর্ণতা, আলোকিত জীবনে প্রবেশের অন্তরায়। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ আমেরিকায় বেদান্ত শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাদের যত দুঃখ আমরা নিজেরাই বেছে নিয়েছি। এটাই হচ্ছে আমাদের প্রকৃতি। একজন বৃদ্ধ চৈনিক ষাট বৎসর কারারুদ্ধ ছিল। কোন নূতন সম্রাটের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়। কারাগার থেকে বের হয়ে সে চিৎকার করে বলল, 'আমি এখানে বাঁচতে পারব না'। তাকে আবার সেই মূর্ষিকাদিপূর্ণ ভীষণ রুদ্ধ কারাগারে যেতে হবে। সে আলোকে সহ্য করতে পারেনি। সে রুদ্ধ কর্মচারীদেরকে বলল, 'তোমরা আমাকে মেরে ফেল অথবা কারাগারে পাঠিয়ে দাও।' তাকে কারাগারেই পাঠান হল। মানুষ মাত্রেরই অবস্থা ঠিক এই রকম। আমরা উদ্দাম গতিতে সর্বপ্রকার দুঃখের পিছনে ছুটি, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করতে আমরা অনিচ্ছুক। প্রতিদিন আমরা সুখের পিছনে ধাবিত হই, নাগাল পাবার আগেই দেখি, তা বিলীন হয়ে গেছে, আঙুলের ফাঁক দিয়ে গলে পড়ে গেছে। তবুও আমরা উন্মত্তভাবে সুখান্বেষণ থেকে বিরত হই না বরং আরও এগিয়ে চলি। এমন মোহান্ধ নির্বোধ আমরা!"[২৮] অজ্ঞানতা, কুসংস্কার যুগ যুগ ধরে আমাদের চিন্তা ও মানসিকতায় এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যে, আমরা জ্ঞানের দিকে, আলোকিত জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে চাই না। আমরা অজ্ঞানতা, সংকীর্ণতা এবং দুঃখকেই যথার্থ বলে মনে করি এবং তাই জীবনে গ্রহণ করি। আমাদের আলোকিত পথ নির্দেশ করলেও আমরা কুসংস্কার ও বদভ্যাসজনিত কারণে সত্য, সুন্দর ও কল্যাণকে গ্রহণ করতে পারি না। বিবেকানন্দ এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যই যথার্থ ও গভীর জ্ঞানার্জনের উপর জোর দেন, যাতে সমাজ ও জীবন থেকে চিরতরে অন্যায়, অবিচার, কুসংস্কার প্রভৃতি সমূলে উচ্ছেদ করা যায়। আর এভাবে সম্ভব তাঁর "দিব্য সমাজ" প্রতিষ্ঠা করা।

Knowledge is power. মানুষ ছোট থেকে বড় হয়, দুঃখী থেকে সুখী হয় জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োগের মাধ্যমে। জ্ঞানই মানুষকে যথার্থ মানুষরূপে গড়ে তোলে। বিবেকানন্দ শিষ্যগণের ও সাধারণ মানুষের জ্ঞানার্জনের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন। জ্ঞানের শক্তিতে অজ্ঞান, অসচেতন ও ভগ্ন হৃদয় হয় জাগ্রত ও সচেতন। তিনি বলেন, ভারতবর্ষ ঘুমিয়ে আছে। ভারত মাতার সন্তানকে জাগ্রত করতে হবে। স্বামী বিবেকানন্দের মতে প্রত্যেক মানুষের কর্তব্য রয়েছে। কাজ করাই হল তার কর্তব্য। ফলের কথা না ভেবে কাজ করতে হবে। ফল ভগবানকে সমর্পণ করবে। কর্তব্য সম্পাদনেই মানুষের উন্নতি, সমাজের কল্যাণ। কর্তব্য অবহেলা করে কেউ কখনও বড় হতে পারে না, প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। মনুষ্যত্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য সহিষ্ণুতা। বিবেকানন্দের মতে, সহিষ্ণুতা মানুষের আত্মাকে শক্তিশালী করে, মন শান্ত করে, অধ্যাত্মশক্তি অর্জনে সহায়তা করে। তিনি ভারতবর্ষের মানুষের সহিষ্ণুতা সম্পর্কে বলেন, 'যুগ যুগ ধরে এরা সনাতন কষ্ট সয়েছে, এরা এক মুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে'। প্রকৃত মনুষ্যত্বের অপর একটি দিক উচ্চাকাঙ্খা। উচ্চাকাঙ্খা মানুষের জীবনকে গতিশীল করে, হীন ও ছোট থেকে বড় করে, মানুষকে যথার্থ মানুষে পরিণত করে। বিবেকানন্দের নিজের উচ্চাকাঙ্খা ছিল বলেই তো তিনি ভারতবাসীদের সুস্থ, সুন্দর ও স্বনির্ভর দেখতে চেয়েছেন, পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে চেয়েছেন। তাই তিনি বলেন– 'ওঠো, জাগো, লক্ষ্যে না পৌঁছা পর্যন্ত থামিও না'। তিনি যুব সমাজকে যথার্থ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে তাদের উন্নত মানসিকতা, সহনশীলতা, দায়িত্বশীলতা ও উচ্চাকাঙ্খী মানুষরূপে গড়তে চেয়েছেন। সমাজ ও বিশ্বপ্রকৃতিকে জয় করতে হলে নির্ভীক সৈনিকরূপে গড়ে তুলতে হবে মানুষকে। দুর্বল ও শক্তিহীন মানুষ কখনও নিজেকে এবং প্রকৃতিকে জয় করতে পারে না।

বিবেকানন্দ চেয়েছেন তার শিষ্যরা বীর হবে, বেপরোয়া হবে, দুর্ধর্ষ হবে। তারা জীবন-মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য মনে করবে। "সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ হিমালয়ে খাড়া পাহাড়ের উপর দিয়ে "ঊর্ধ্বশ্বাসে" পাহাড়ী ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন মাইলের পর মাইল চড়াই ও মাইলের পর মাইল উৎরাই রাস্তাটা কয়েক ফুট মাত্র চওড়া, খাড়া পাহাড়ের গায়ে যেন ঝুলে আছে, আর বহু সহস্র নিচে খাদ! হঠাৎ কি তাঁর খেয়াল হল– তাঁর শিষ্য বিরাজানন্দকে একদিন ডেকে বললেন, 'আয়', তোকে ঘোড়ায় চড়া শিখিয়ে দিই। বিরাজানন্দ এর আগে কখনও ঘোড়ায় চড়েননি। তার উপর

Dhaka University Institutional Repository

উচু নিচু রাস্তা। এমনিতেই ঘোড়ায় চড়তে তাঁর ভয়। তিনি কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু যে বিবেকানন্দ আকাশের নক্ষত্রপুঞ্জকে চিবিয়ে খেতে পারে তার শিষ্য ভয় করবে। বিবেকানন্দ তা কল্পনাই করতে পারেন না। তিনি জোর করে শিষ্যকে ঘোড়ায় তুলে দিলেন। ঘোড়ার গায়ে সপাসপ্ চাবুক মারলেন। ঘোড়াটি ভয়ার্ত বিরাজানন্দকে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। গুরুর উল্লাস তখন দেখে কে! তৃপ্তির হাসিতে উচ্ছল হয়ে উঠলেন তিনি– তাঁর সন্তানরা যে বীর হবে, বেপরোয়া হবে, মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়বে। আর তিনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করবেন সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য- কার শক্তি বেশী-মৃত্যুদেবতার, না তাঁর আত্মজের।'[২৯] বিবেকানন্দের আত্মার আলো এবং ঐশীশক্তি যার হৃদয়ে জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালিয়েছে, মৃত্যু তার নিকট তুচ্ছ। বিবেকানন্দ চেয়েছেন তাঁর শিষ্যেরা বীর হয়ে পৃথিবী জয় করবে। স্বনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয় গঠন সম্পর্কে বিবেকানন্দ যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বলেন, 'ডাক্তার ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ- ভাল করতে পারব না, মন্দ ক'রব, কি দিবি তা বল। পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা!'[৩০] স্বনির্ভরতা অর্জন করেই মানুষ গড়ে উঠে আদর্শ মানুষরূপে। বিবেকানন্দ অপরাধীর প্রতি করুণার দৃষ্টি দেন। অপরাধীকে হেয় বা নীচু করা নয়, পাপী বলে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা নয়, তাকে সংশোধন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বিবেকানন্দের অভিপ্রায়। তিনি বলেন, 'এখন কারাগারকে অনেক স্থলে "সংশোধনাগার" বলা হয়। সব বিষয়েই এরূপ ঘটিয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব আছে– এই ভারতীয় ভাবটি ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে।'[৩১] অজ্ঞানতার কারণে মানুষ ভুল করে অন্যায় করে। তবুও তার দেবত্ব প্রতিভা সুপ্ত থাকে। তাই সংশোধন করার সুযোগ দিলে পাপী মানুষও হয়ে উঠে দেবতা।

চরিত্র

বিবেকানন্দ চরিত্র ও বীরত্ব সম্পর্কে বলেন, 'ভালোর দিকে যাবার পথটি সবচেয়ে দুর্গম ও বন্ধুর।...সহস্র পদস্খলনের ভেতর দিয়েই চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। তথাপি উপস্থিত অবস্থার মধ্য দিয়াই কেবল কার্যে অগ্রসর হইতে পারা যায়, অন্য উপায় নাই। ভাল-মন্দ বিচারের শক্তি সকলের আছে। কিন্তু তিনিই বীর, যিনি এই সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ ও দুঃখপূর্ণ সংসারের তরঙ্গে পশ্চাৎপদ না হইয়া, একহস্তে অশ্রুবারি মোচন করেন ও অপর অকম্পিত হস্তে উদ্ধারের পথ প্রদর্শন করেন।'[৩২] বিবেকানন্দের শিক্ষা সকল যুগের উপযোগী, সকল মানুষ ও সমাজে প্রয়োগযোগ্য। মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিবেকবান হওয়া। বিবেকের কল্যাণেই মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করে। বিবেকহীন মানুষ যে কোন সময় অন্যায় করে বসে, মানব কল্যাণ ও শান্তি বিঘ্নিত করে। বিবেকানন্দ তাই অজ্ঞ, মূর্খ, ছোট-বড়, উঁচু-নিচু সকল শ্রেণীর মানুষকে বিবেক জাগ্রত করার আহবান জানান। বিবেকানন্দ বলেন, বিবেক সম্পন্ন হলে মানুষের দুঃখ চলে যায়, পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়, চিত্ত বিমুক্তি লাভ করে এবং অবশেষে ব্যক্তি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে। মনুষ্যত্ব লাভের জন্য প্রত্যেকের বিবেক সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। 'স্বামীজী লিখেছেন আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এইঃ মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্বকার্যে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।'[৩৩] বিবেকানন্দের ভাষণ ও রচনাদি পড়লে কোনও সন্দেহ থাকে না যে ভারতের কল্যাণ প্রচেষ্টায় তিনি বেশী রকম ব্যাপৃত থাকলেও তাঁর লক্ষ্য সমগ্র মানব জাতির কল্যাণ, তাঁর ব্রত মানুষকে দেবতা করার ব্রত। বিবেকানন্দের মতে দেবত্ব অর্জনই হল পূর্ণমানব। মানুষ পূর্ণতা লাভের মাধ্যমেই দেবত্ব অর্জন করে। বিবেকানন্দ মানুষকে দিতে চেয়েছেন পূর্ণতা। অর্থাৎ একজন মানুষের যে সকল গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন তা অর্জন করে পূর্ণ হতে পারে। পূর্ণমানব সামাজিক জীবনে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল ক্ষেত্রে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, এবং সঠিক কাজ করতে পারে। পাশ্চাত্যের চিন্তাবিদগণ এক বাক্যে বলেন, 'বিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিদ্যা, প্রগতি, সভ্যতার নব নব বস্তুসম্ভার মানুষকে জীবনের যথার্থ সুখের, আনন্দের সন্ধান দিতে পারবে না। মানুষ সভ্যতার আতিশয্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। দুর্নিবার জন বিস্ফোরণের মধ্যে মানুষ ক্রমশ নিঃসঙ্গ একাকিত্বে নিজেকে নির্বাসিত করে এক প্রচ্ছন্ন আতঙ্কে শিহরিত। এ সভ্যতার ফল হচ্ছে– নানা বিরুদ্ধ পরিবেশের সৃষ্টি। ভোগৈশ্বর্যের উত্তুঙ্গ শিখরের পাশেই দারিদ্রের গভীর খাদ।'[৩৪] এ অবস্থার অবসান ঘটাতে হলে প্রয়োজন বিবেকানন্দের নররূপী "নারায়ণ"। মানুষরূপী নারায়ণ যে সমাজে বাস করবে সেখানে শান্তি ও মুক্তির পথ প্রশস্ত হবে। আর এই দেবতাগণের সমন্বয়েই গড়ে উঠবে দিব্য সমাজ, সেখানে মানুষের সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব হবে এবং সমাজ স্বর্গে রূপান্তরিত হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মানবকল্যাণে দর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ একজন অন্যতম সমন্বয়ী দার্শনিক। তিনি মানুষের কল্যাণের জন্যই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে রচনা করেন শিক্ষাদর্শন, রাষ্ট্রদর্শন, ধর্মদর্শন, শিল্প, কৃষি ও অর্থনীতি চিন্তা প্রভৃতি বিষয়। কারণ জীবন ও দর্শন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, জীবনের জন্যই দর্শন। 'স্বামীজীর শিক্ষাচিন্তার মূল কথা হলঃ "Man making" এবং 'Character building'- এক কথায় মনুষ্যত্বের সর্বাঙ্গীন বিকাশ, যার দুটি আবশ্যিক শর্ত হল জাতীয় ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য এবং নৈতিক মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা। বিবেকানন্দের মতে যথার্থ শিক্ষার সংজ্ঞা হল- যার ফলে মানুষের মধ্যে আত্মপ্রত্যয় জাগবে, ব্যক্তিত্ব, স্বাধীন চিন্তা ও আত্মসচেতনতার উন্মেষ হবে, চরিত্রবল ও সিংহসাহসিকতা আসবে, মানুষ নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াতে পারবে এবং তার মধ্যে পরিপূর্ণ মনুষ্যত্বের উদ্বোধন হবে তা-ই শিক্ষা।'[৩৫] বিবেকানন্দের মতে শিক্ষা মানুষের অজ্ঞানতা, সংকীর্ণতা ও দুর্বলতা দূর করে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলে। বিবেকানন্দ বুঝতে পারেন মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশের জন্য, তার আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের জন্য অর্থের প্রয়োজন। তাই তিনি ইতিহাস ও অর্থনৈতিক বিষয়ে চিন্তা করেন। পুঁজিবাদী সমাজ যে কিভাবে শ্রমিকদের শোষণ করে তা তিনি লক্ষ্য করে প্রতিকারের পথ নির্দেশ করেন। বিবেকানন্দ অর্থনীতিতে স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য ভারতের আবহাওয়ার উপযোগী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষাবাদের কথা বলেন। এতে কৃষক, মজুর প্রভৃতি নিম্ন-আয়ের মানুষের কর্মসংস্থান হবে ও তারা দৈনন্দিন জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণে সক্ষম হবে। বিবেকানন্দ বলেন- আগামী যুগ শ্রমিক বা শুদ্র শ্রেণীর যুগ। সমগ্র পৃথিবীতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটবে। তিনি বলেন...'কিন্তু ধীরে ধীরে প্রাকৃতিক নিয়মে দুনিয়াময় কত পরিবর্তন হয়ে যাচ্চে। দেশ, সভ্যতা, প্রাধান্য ওলটপালট হয়ে যাচ্চে।...তোমরা উচ্চ বর্ণেরা কি বেঁচে আছ?...তোমরা শূন্যে বিলীন হও, আর নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি, মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনানের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।'[৩৬] বিবেকানন্দ মানুষের সুন্দর ও কল্যাণকর জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য রচনা করেন রাষ্ট্রদর্শন। তার দূরদর্শী চিন্তার গভীরতা ও ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় রাষ্ট্রদর্শন পাঠে। একটি কল্যাণমূলক, শোষণমুক্ত রাষ্ট্রে মানুষ পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। তাঁর মতে মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য স্বাধীনতা অপরিহার্য, যাতে মানুষ শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা লাভ করবে। বিবেকানন্দ বিশ্বতাত্ত্বিক যুক্তির ভিত্তিতে আদর্শ মানব জীবন ও আত্মার মুক্তির জন্য রচনা করেন ধর্মদর্শন। স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষা, অর্থ, রাষ্ট্র, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে দার্শনিক অনুসন্ধান ও গবেষণা চালিয়ে যেসব দর্শন সৃষ্টি করেন তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য মানুষের কল্যাণ প্রতিষ্ঠা করা।

মানবতাবাদী দর্শনে নারী জাগরণ

মানব প্রেমিক স্বামী বিবেকানন্দ দৃষ্টি দেন মানুষের বহুবিধ সমস্যার দিকে। তাঁর মহানুভব দৃষ্টি এড়ায়নি নারীদের সমস্যা সম্পর্কে। তিনি লক্ষ্য করেন ভারতবর্ষে নারীরা পিছিয়ে পড়েছে বিভিন্ন দিকে। ফলে তারা দুঃখ-দুর্দশার শিকার হচ্ছে। অজ্ঞানতা, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি কারণে পশ্চাৎপদ হয়েছিল ভারতবর্ষের নারী সমাজ। বিবেকানন্দ বলেন-'মেয়েদের বিষয়ে পুরুষের হস্তক্ষেপের অধিকার তাদের শিক্ষা দেওয়া পর্যন্ত...নারীগণকে এমন যোগ্যতা অর্জন করাইতে হইবে, যাহাতে তাহারা নিজেদের সমস্যা নিজেদেরভাবে মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। তাহাদের হইয়া অপর কেহ এ কার্য করিতে পারে না, করিবার চেষ্টা করাও উচিত নহে। আর জগতের অন্যান্য দেশের মেয়েদের মতো আমাদের মেয়েরাও এ যোগ্যতা লাভে সমর্থ।'[৩৭] এভাবেই বিবেকানন্দ নারীদের স্বনির্ভর হওয়ার শিক্ষা দেন যাতে নিজেদের সমস্যা নিজেরাই সমাধান করতে পারে। বিবেকানন্দ ক্ষোভে বলেন- 'আমাদের মেয়েরা বরাবরই প্যানপেনে ভাবই শিক্ষা করে আসছে। একটা কিছু হলে কেবল কাঁদতেই মজবুত। সেই যুগেই তিনি লিখেছিলেন ঃ একমাত্র ভারতবর্ষেই মেয়েদের লজ্জা, বিনয় প্রভৃতি দেখে চক্ষু জুড়ায়। এমন সব আধার পেয়েও তোরা এদের উন্নতি করতে পারলিনে। এদের ভেতর জ্ঞানালোক দিতে চেষ্টা করলিনে।'[৩৮] ভারতের সন্ন্যাসীবৃন্দ সাধনপথের অন্তরায় জ্ঞানে চিরকাল নারী জাতিকে দূরে রাখেন। কিন্তু সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ অত্যন্ত সচেতনভাবে নারী জাতির কথা ভাবেন। কারণ যদি নারী এবং পুরুষ উভয়েরই জীবন সমভাবে উন্নত না হয় তবে দেশের বা জগতের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সম্ভব নয়, যেমন– '...এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে।'[৩৯] বিবেকানন্দ বলেন, আমরা স্ত্রী লোককে নীচ, অধম, মহাহেয়, অপবিত্র বলি। তার ফল- আমার পশু দাস, উদ্যমহীন, দরিদ্র। তিনি বলেন, 'তোমাদের মেয়েদের উন্নতি করিতে পারো? তবে আশা আছে। নতুবা পশুজন্ম ঘুচিবে না।'[৪০] উপনিষদের 'ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী- তুমিই স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমিই কুমার, কুমারীও তুমি-'[৪১] এ তত্ত্ব বিবেকানন্দের হৃদয়ে সদা জাগ্রত ছিল। বিবেকানন্দের মতে, আত্মাতে লিঙ্গ

Dhaka University Institutional Repository

ভেদ নেই। ছেলে ও মেয়ের একই আত্মা। তাঁর দৃষ্টিতে সবাই সমান এবং সবাই মানুষ। বিবেকানন্দের একমাত্র আকাঙ্খা যে, তিনি এমন একটি যন্ত্র চালিয়ে যাবেন- যা প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট উচ্চ উচ্চ ভাব রাশি বহন করে নিয়ে যাবে। তারপর পুরুষই হোক আর নারীই হোক-নিজেরাই নিজেদের ভাগ্য রচনা করবে। বিবেকানন্দ চেয়েছেন, প্রাচ্যের অধ্যাত্মশক্তি ও পাশ্চাত্যের কর্মশক্তির মিলনে গড়ে উঠবে আদর্শ নারী।

সমাজে নারীর অবস্থা হীন হলেও সমাজ বা ব্যক্তি জীবনে নারীর প্রভাব যথেষ্ট। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন এ কারণে বলেন, 'যে কোন সমাজের আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক স্তরের যথার্থ পরিচয় বহন করে তার নারীজাতির অবস্থা। মহাকালের যাত্রাপথে বহু উত্থান-পতন ও সংকটের মধ্যে সমাজজীবনে হীনতম অবস্থা সত্ত্বেও মেয়েরাই সর্বদেশে- বিশেষত ভারতে, জ্বালিয়ে রেখেছিল ধর্মের অনির্বাণ দীপশিখা। প্রাত্যহিক জীবনের ছোট-খাট সকল কর্ম, পূজা, ব্রত উপবাসের মধ্যে ধরে রেখেছিল ধর্ম ও সংস্কৃতি যা কোন জাতির প্রাণস্বরূপ। অধিকাংশ মনীষীর জীবনে তাই দেখা যায় জননীর প্রভাব সর্বাধিক।'[৪২] নারীর কর্ম প্রচেষ্টা ও উন্নতি হল সকল সমাজ ও সভ্যতার ভিত্তি। নিবেদিতার প্রতি বিবেকানন্দের আশীর্বাণী ছিল 'মায়ের হৃদয় আর বীরের সংকল্প, (The mother's heart, the horo's will)।'[৪৩] মায়ের হৃদয় ও বীরের সংকল্পই আদর্শ নারীর বৈশিষ্ট্য। আগামী যুগের নারীর মধ্যে থাকবে একাধারে বীরোচিত দৃঢ় সংকল্প ও জননীর স্নেহ-কোমল হৃদয়। নারী হবে পতিব্রতা, শক্তি ও স্বাধীনতার প্রতীক। বিবেকানন্দের আকাঙ্খা ছিল, কিছু সংখ্যক শিক্ষিতা মেয়ে যেন আজীবন ব্রহ্মচর্যব্রত গ্রহণ করে এবং পবিত্র ও আদর্শ জীবনযাপন করে। আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভই হবে তাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং তারাই গ্রহণ করবে মেয়েদের শিক্ষার ভার। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে উন্নতির পথে পরিচালনার মূলে থাকবে নারীর প্রভাব। 'হে ভারত ভুলিও না- তোমার নারী জাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী...।'[৪৪] বিবেকানন্দ বলেন, সীতা, সাবিত্রী ও দময়ন্তীর আদর্শ অনুসরণ করে পার্থিব উন্নতির সাথে আধ্যাত্মিক উন্নতি করবে নারীসমাজ।

বিবেকানন্দ মেয়েদের এক উচ্চতর নতুন জীবনের সন্ধান দেন। নারীর প্রকৃত শিক্ষা দ্বারা স্বাধীনতার পথ সুগম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন আধ্যাত্মিক বিকাশ। তখনই নারীর পক্ষে স্থির করা সহজ হবে, কোন জীবন সে বেছে নেবে। আধ্যাত্মিক জীবনে উচ্চ স্থান অধিকার করার জন্য প্রয়োগ করবে সব শক্তি অথবা জীবন উৎসর্গ করবে মানব সেবায়। সমাজ, শিক্ষা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে দায়িত্ব গ্রহণই হবে নারীর লক্ষ্য। এছাড়া সাধারণভাবে মাতা ও পত্নীর দায়িত্ব পালনই হবে নারীর কাজ। নারী যে পথই গ্রহণ করবে, প্রত্যেকটিই তাকে পরিচালনা করবে মঙ্গলের পথে। 'আশার কথা, নব যুগের প্রারম্ভে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর পূর্ণ যৌবনা পত্নীকে মহাশক্তিরূপে পূজা করেছিলেন, আহ্বান করেছিলেন বিদ্যাশক্তিকে ভারতের তথা জগতের কল্যাণের জন্য। সমগ্র নারী জাতির মধ্যে সেই শক্তির স্ফুরণ হলেই অভূতপূর্ব জাগরণ ঘটবে। মনে হয় সে দিন আসন্ন! স্বামী বিবেকানন্দ তারই ইঙ্গিত দিয়েছেন, শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীকে কেন্দ্র করেই মহাশক্তির বিকাশ ঘটবে।'[৪৫] শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা- নারী জাতি শ্রদ্ধা ও পূজার পাত্র। আর নারীর প্রতি সেবা প্রেম ও পূজা এ মর্ত জগৎকে পরিণত করবে স্বর্গ। এভাবে বিবেকানন্দ অবহেলিত পশ্চাৎপদ নারী সমাজের জাগরণ ঘটিয়ে মানবতাবাদী দর্শনে সৃষ্টি করেন এক উজ্জ্বল অধ্যায়।

প্রত্যেকেই মহান

সত্যদ্রষ্টা ঋষি স্বামী বিবেকানন্দ বিচক্ষণ চিন্তাশক্তি ও গভীর আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে মানুষের প্রকৃত স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেন। তিনি মানুষের মাঝেই খুঁজে পান ব্রহ্মকে, যিনি মহাশক্তিরূপে, জগতের স্রষ্টা ও নিয়ন্ত্রণ কর্তারূপে বিরাজ করেন। সেই মহান ব্রহ্ম প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সকল শক্তির আধাররূপে, মহাশক্তির বীজরূপে রয়েছেন। তাই সে মানুষ কত মহান হতে পারে তা কল্পনারও অতীত, ব্যাখ্যা করাও দুঃসাধ্য। বিবেকানন্দ প্রত্যেক মানুষকেই "মহান" বলেছেন। কারণ সত্য, সুন্দর, কল্যাণ এক কথায় ধর্মের আদর্শ অনুশীলন করে "নর" হয়ে উঠতে পারে "নারায়ণ"। আর এই নরকে নারায়ণরূপে প্রতিষ্ঠা করাই বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তার মূল উদ্দেশ্য। বিবেকানন্দ অচেতন, অজ্ঞাত, ঘুমন্ত মানুষদের জেগে ওঠার আহবান জানান। তিনি বলেন, 'হে মহাপ্রাণ, ওঠ জাগো! জগৎ দুঃখে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে- তোমার কি নিদ্রা সাজে? এস আমরা ডাকতে থাকি, যতক্ষণ না নিদ্রিত দেবতা জাগ্রত হন, যতক্ষণ না অন্তরের দেবতা বাইরের আহবানে সাড়া দেন। জীবনে এর চেয়ে আর বড় কি আছে, এর চেয়ে মহত্তর কান কাজ আছে?'[৪৬] বিবেকানন্দ জানেন সাধারণ মানুষকে জাগ্রত করতে পারলে সমাজের অন্যায় অবিচার দূর হবে, শান্তি শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন সম্ভব হবে। বিবেকানন্দ কাউকে ছোট

Dhaka University Institutional Repository

করে কেউ যেন বড় না হয় সে বিষয়ে সচেতন করে দেন। তাই তিনি বলেন- 'কি, অপরকে ছোট করে আমি বড় হব? আমিতো পৃথিবীতে সে জন্য আসিনি!'[৪৭] জীবন সংগ্রামে মানুষের ব্যর্থতা স্বাভাবিক ঘটনা। এতে কোন চিন্তা নেই। ব্যর্থতা থেকেই মানুষ জ্ঞান লাভ করে জ্ঞানী হয়। যে মানুষ মিথ্যা কথা বলে, আবার সেই মানুষই দেবতা হয়ে ওঠে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় মহত্ত্বের যাত্রা পথের আহ্বান করে বলেন, 'তোমার কাজে কোন বিঘ্ন ঘটলে ভয় করবে না, কারণ বিঘ্ন ছাড়া কোন কাজই হতে পারে না। সব কর্ম ঈশ্বরে সমর্পণ কর এবং কোন ফলের দিকে তাকাবে না।'[৪৮] বিবেকানন্দ প্রতিটি মানুষকে মানুষ হিসাবে দেখেননি, দেখেছেন দেবতারূপে। মানুষের অন্তরে আত্মারূপে অবস্থান করছে মহান দেবতা "ব্রহ্ম"। মানুষ কঠোর সংযম ও সাধনার মাধ্যমে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বিকাশ সাধন করতে পারে। তিনি বলেন- 'আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই: মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সর্ব কার্যে সে দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।'[৪৯] বিবেকানন্দ সবক্ষেত্রেই হৃদয়ের দরদ মিশিয়ে এক মানবধর্মী বৈদান্তিক ব্যাখ্যার উপর জোর দেন। তিনি মানুষের মহত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'জীবাত্মাই নির্বিশেষে ব্রহ্ম। প্রকৃতির ভিতর যাহা সৎ বস্তু, তাহাই ব্রহ্ম; মায়ার অধ্যাসের জন্য তিনিই এই নানাত্ব বা প্রকৃতি বলিয়া প্রতীত হইতেছেন।'[৫০] বিবেকানন্দ তার বক্তৃতা ও রচনায় সর্বত্রই মানুষের মাঝে ব্রহ্মকে পরিপূর্ণ বিকাশের কথাই প্রচার করেন। ব্রাহ্মণ, চন্ডাল, মুচি, কৃষক, মজুর সবার মাঝে একই আত্মা, আর সবাই পারে তার আত্মার বিকাশ সাধন করে "নর" থেকে "নারায়ণ" এ পরিণত হতে। তাই কেউ হীন নয়, প্রত্যেকেই মহান।

বিবেকানন্দ বলেন, 'সূর্য এক, কিন্তু এর প্রতিবিম্ব সূর্য বহু। মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এক, কিন্তু নানা দেহে প্রতিবিম্ব আত্মা বহু।'[৫১] প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে আত্মা রয়েছে তা এক ব্রহ্ম বা পরমাত্মার প্রতিবিম্ব স্বরূপ। মানুষের উচিত অন্তর্মুখী চিন্তা, যুক্তি-বিচার ও অধ্যাত্ম সাধনার দ্বারা নিজ হৃদয়ে সেই বিশ্বাত্মার উপলব্ধি করা। যখন জীব নিজে আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করে তখন সে অখণ্ড মানব সমাজ ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উপলব্ধি করেন। তাঁর কাছে ছোট-বড়, উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র কোন ভেদাভেদ থাকে না। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও প্রকৃতির বৈচিত্র্যের মাঝে সত্যদ্রষ্টা ঐক্য উপলব্ধি করেন। আত্মোপলব্ধিতে মানুষ তার জীবন ও স্বরূপ উপলব্ধি করে মহামানবে রূপান্তরিত হয়। বিবেকানন্দ বলেন, 'ধর্মকে উপলব্ধি কর, শুধু কথা বলে কোন লাভ হবে না। কিন্তু এ কাজ খুবই কঠিন এবং অতি কষ্টেই তা সম্পন্ন হয়। তিনি পৃথিবীর প্রতিটি অণু পরমাণুর মধ্যে নিজেকে প্রচ্ছন্ন করে রেখেছেন, সেই আদি পুরুষ প্রতিটি মানুষের হৃদয়ের গভীরতম প্রদেশে বিরাজিত আছেন। ঋষিরা তাঁদের ধ্যান ও অন্তর্দর্শন ক্ষমতা দ্বারা সেই পুরুষকে উপলব্ধি করেছেন এবং সুখদুঃখ, পাপপুণ্য, সৎকর্ম, অসৎকর্ম, অস্তিত্ব অনস্তিত্ব সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছেন। যিনি তাঁকে দেখেছেন, তিনি সত্যকে দেখেছেন।'[৫২] অন্তর চক্ষুর মাধ্যমে ঈশ্বরদর্শন বা সত্যদর্শনই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য।

বিবেকানন্দ লন্ডনে প্রদত্ত এক ভাষণে বলেন, 'যম এবার "মানুষের দেহ বিনাশের কি পরিনাম হয়?" এই প্রশ্নটির উত্তর দিলেন। তিনি বললেন, জ্ঞানী ব্যক্তির মৃত্যু হয় না, জন্মও হয় না। কোন কিছুর থেকেই তাঁর উৎপত্তি হয় না, আবার কোন কিছুরই তাঁর থেকে উৎপত্তি হয় না। অজাত অমর, শাশ্বত এই আদি অবিনাশী সত্তার দেহনাশের পরেও বিনাশ হয় না। যদি কোন হত্যাকারী ভাবে, সে হত্যা করতে পারে, অথবা যদি নিহত ব্যক্তি ভাবে সে নিহত হয়, তা হলে বুঝতে হবে তারা কেউ সত্যকে জানে না, কারণ আত্মা কখনো নিধন করে না, নিহত হয় না।'[৫৩] বেদান্তের আদর্শ হলো 'সকল জ্ঞান এবং শুচিতা আত্মার মাঝে আগে হতেই ছিল- কখনো তারা অস্পষ্টভাবে প্রকাশিত অথবা কখনো উজ্জ্বলভাবে প্রকাশিত– এটাই একমাত্র পার্থক্য। মানুষে মানুষে এবং বিশ্বসৃষ্টির সকল বস্তুর মধ্যে যে পার্থক্য, তা শুধু মাত্রাগত, গুণগত নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই পটভূমির বাস্তব সত্য হচ্ছে সেই এক অনন্ত যিনি চির-আনন্দময়, নিত্যশুদ্ধ এবং নিত্যপূর্ণ এক, অদ্বিতীয়। ইনি আত্মারূপে সাধু এবং পাপী, সুখী এবং দুঃখী, সুন্দর এবং কুৎসিত, মানুষ এবং ইতর প্রাণী-সকলের মধ্যে নিত্য বিরাজ করছেন। তিনি সব কিছুর মধ্যেই এক। তিনি জ্যোতির্ময়। প্রকাশশক্তির তারতম্যের জন্যই প্রভেদ ঘটে।'[৫৪] আত্মোপলব্ধি ক্রমেই মানুষকে করে তোলে পূর্ণ ও মহান। বিবেকানন্দ বলেন, 'ত্যাগ হচ্ছে আমাদের প্রকৃত জীবনের ভিত্তি। যখন আমরা নিজেদের কথা একেবারেই ভাবি না, তখনই আমরা সততা ও প্রকৃত জীবনের মুহূর্তগুলিকে উপভোগ করি। সে কারণেই আমাদের এই ক্ষুদ্র সত্তার মৃত্যু হওয়া উচিৎ। তখন আমরা দেখব আমরা সেই পরম সত্যের মধ্যে আছি এবং সেই সত্যই হচ্ছে ঈশ্বর। তিনিই আমাদের স্বরূপ, তিনি আমাদের মধ্যেই এবং আমাদের সঙ্গেই আছেন। আমরা যেন তাঁর মধ্যেই জীবনধারণ করতে পারি এবং তাঁকে অবলম্বন করেই দাঁড়াতে পারি। এটাই

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে একমাত্র আনন্দময় অস্তিত্ব। জীবন যখন আধ্যাত্মিক স্তরে উন্নীত হয়, তখনই তা হয় প্রকৃত জীবন। আসুন আমরা সেই স্তরকে উপলব্ধি করার চেষ্টা করি।'[৫৫] আধ্যাত্মিক শিক্ষাই সকল উন্নতির ভিত্তি।

তেজস্বী কর্মবীর

মহান কর্মবীর তেজস্বী বিবেকানন্দের দেহ-মনে ছিল প্রবল শক্তি, যে শক্তি বলে আজও উদ্বুদ্ধ ও সুশৃঙ্খল হতে পারে বিশৃঙ্খল ও নিমজ্জিত যুব সমাজ। বিবেকানন্দ দুঃখী-দরিদ্র ও অজ্ঞ যুব সমাজকে জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে বলেন, 'তোমরা সিংহ স্বরূপ– তোমরা আত্মা, শুদ্ধস্বরূপ, অনন্ত ও পূর্ণ। জগতের মহাশক্তি তোমাদের ভিতর। হে সখে, কেন রোদন করিতেছ? জন্ম-মৃত্যু তোমার নাই, আমারও নাই। কেন কাঁদিতেছ? তোমার রোগ-দুঃখ কিছুই নাই, তুমি অনন্ত-আকাশ স্বরূপ, নানা বর্ণের মেঘ উহার উপর আসিতেছে, এক মুহূর্ত খেলা করিয়া আবার কোথায় অন্তর্হিত হইতেছে; কিন্তু আকাশ যে নীলবর্ণ, সেই নীল বর্ণই রহিয়াছে।– এইরূপ জ্ঞানের অভ্যাস করিতে হইবে।'[৫৬] মানুষের দুঃখ-ব্যথা সাময়িক, তা দূর হলে অন্তর্নিহিত আত্মার শান্তি আবার দেখা দিবে। বিবেকানন্দ যুব সমাজকে আত্মবিকাশ ও দৃঢ় প্রত্যয় শিক্ষার উদ্দেশ্যে বলেন, "...এরূপ ভাববি-আমি কার সন্তান? তাঁর কাছে গিয়ে আমার এমন হীন বুদ্ধি, হীন সাহস! হীনবুদ্ধি, হীনসাহসের মাথায় লাথি মেরে 'আমি বীর্যবান, আমি মেধাবান, আমি ব্রহ্মবিৎ, আমি প্রজ্ঞাবান বলতে বলতে দাঁড়িয়ে উঠবি। আমি অমুকের চেলা, কামকাঞ্চনাজিৎ ঠাকুরের সঙ্গীর সঙ্গী'– এরূপ অভিমান খুব রাখবি, এতে কল্যাণ হবে। ঐ অভিমান যার নেই, তার ভেতরে ব্রহ্ম জাগেন না।"[৫৭] মানুষ আত্মপরিচয় জেনে সাহসী হয়ে উঠবে। মানুষ তার দিব্যস্বরূপ জেনে মানবকল্যাণে এগিয়ে আসবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'If a man can realize his divine nature this with the help of an image, would it be right to call that a sin? Nor, even when he has passed that stage, should he call it an error. To the Hindu, man is not travelling from error to truth, but from truth to truth, from lower to higher truth.'[৫৮] মানুষ অনুশীলন দ্বারা নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্য লাভে অগ্রসর হয়। উচ্চ ভাবাপন্ন মানুষ সংকীর্ণ গণ্ডী অতিক্রম করে উদার ও অসীম জ্ঞান রাজ্যে প্রবেশ করে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Life is ever expanding, contraction is death. The self-seeding man who is looking after his personal comforts and leading a lazy life- there is no room for him even in hell.'[৫৯] সম্প্রসারিত জীবনই প্রকৃত কল্যাণকর জীবন।

আমাদের কঠিন অধ্যবসায়ের মাধ্যমে জটিল সমস্যাগুলো অতিক্রম করে জীবন সংগ্রামে অগ্রসর হতে হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'We can overcome the difficulty by constant practice. We must learn that nothing can happen to us, unless we make ourselves susceptible to it.'[৬০] কঠোর পরিশ্রম ছাড়া কোন কাজই সফল হয় না। কর্ম ফেলে দূরে থাকা উচিত নয়। সঠিক কর্ম সম্পাদনেই মুক্তি লাভ হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Do not fly away from the wheels of the world-machine, but stand inside it and learn the secret of work. Through proper work done inside, it is also possible to come out.'[৬১] পবিত্রতা, ধৈর্য, প্রেম– এসব কৃতকার্য হওয়ার উপায়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Purity, patience, and perseverance are the three essential to success and, above all- love.'[৬২] প্রেমই মানুষকে যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান ব্যক্তি সব কাজ করতে পারে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Faith in ourselves will do everything. I have experienced it in my own life and a still doing so; and as I grow older, that faith is becoming stronger and stronger.'[৬৩] বিশ্বাস মানুষের কর্ম শক্তিকে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করে সফলতার দিকে অগ্রসর করে। মানুষের মাঝে অফুরন্ত শক্তি ও সম্ভাবনা রয়েছে। মানবাত্মা অনন্ত জ্ঞানের খনি। একজন বিজ্ঞানী মানবাত্মার শক্তি ও প্রতিভা সম্পর্কে খুব সামান্যই জানতে পারে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Do you know how much energy, how many powers, how many forces, are still lurking behind that frame of yours? What scientist has known all that is in man? Millions of years have passed since man first came here and yet but one infinitesimal part of his powers has been manifested. Therefore, you must not say that you are weak. ...For behind you is the ocean at infinite power and blessedness.'[৬৪] আমাদের আত্মার অনন্ত শক্তি ও ক্ষমতার বিকাশ হলে মানবকল্যাণ সাধন সহজ হবে। সমাজ সংস্কারকগণকে পাশবিক স্তর অতিক্রম করে মনুষ্যত্বের স্তরে উপনীত হতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

মনুষ্যত্ববোধই মহৎ কার্যের প্রেরণা দেয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "...গরু, কুকুর ও অন্যান্য পশুগণ এইরূপ বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট, আর ঐ ভাবই তাহাদিগকে পশু করিয়াছে। অতএব যদি মানুষ বর্তমান লইয়া সন্তুষ্ট থাকে এবং জগদতীত সত্তার অনুসন্ধান একেবারে পরিত্যাগ করে, তবে মানবজাতিকে পশুর স্তরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। ধর্মই-জগদতীত সত্তার অনুসন্ধানই মানুষ ও পশুতে প্রভেদ করিয়া থাকে। এটি অতি সুন্দর কথা, সকল প্রাণীর মধ্যে মানুষই স্বভাবতঃ উপরের দিকে চাহিয়া দেখে; অন্যান্য সকল জন্তুই স্বভাবতঃ নিচের দিকে ঝুকিয়া থাকে। এই ঊর্ধ্ব দৃষ্টি, ঊর্ধ্ব দিকে গমন ও পূর্ণত্বের অনুসন্ধানকেই 'পরিত্রাণ' বা 'উদ্ধার' বলে; আর যখনই মানুষ উচ্চতর দিকে গমন করিতে আরম্ভ করে, তখনই সে এই পরিত্রাণ-রূপ সত্যের ধারণার দিকে নিজেকে উন্নীত করে। অর্থ, বেশভূষা বা গৃহের উপর উহা নির্ভর করে না, উহা নির্ভর করে মানুষের মস্তিষ্কস্থ আধ্যাত্মিক ভাব-সম্পদের তারতম্যের উপর। উহাতেই মানব জাতির উন্নতি, উহাই ভৌতিক ও মানসিক সর্ববিধ উন্নতির মূল; ঐ প্রেরণাশক্তি বলে- ঐ উৎসাহবলেই মানবজাতি সম্মুখে অগ্রসর হইয়া থাকে।"[৬৫] অতএব, আসুন– আমরা পূর্ণত্বের অনুসন্ধান করি এবং মানবকল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করি।

আমাদের সমাজের দুরবস্থার অন্যতম কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরিকল্পিত শিক্ষাব্যবস্থা। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমাদের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কথা ধরুন। পঞ্চাশ বৎসর হইল ঐগুলি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, কিন্তু ফল কি দাঁড়াইয়াছে? ঐগুলি শুধু পরীক্ষা কেন্দ্ররূপে দণ্ডায়মান। সাধারণের কল্যণের জন্য আত্মত্যাগের ভাব আমাদের ভিতর এখনও কিছুমাত্র বিকশিত হয় নাই।'[৬৬] আমাদের নেতিমূলক শিক্ষা যুব সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করে প্রেমহীন যন্ত্রে পরিণত করে। এ কারণে বিবেকানন্দ বলেন, "...যে কোন নেতিমূল শিক্ষায় সব ভাঙিয়া-চুরিয়া যায়- মৃত্যু অপেক্ষাও তাহা ভয়ানক। বালক স্কুলে গিয়া প্রথমেই শিখিল– তাহার বাপ একটা মূর্খ, দ্বিতীয়তঃ তাহার পিতামহ একটা পাগল, তৃতীয়তঃ প্রাচীন আর্যগণ সব ভণ্ড, আর চতুর্থতঃ শাস্ত্র সব মিথ্যা। ষোল বৎসর বয়স হইবার পূর্বেই সে একটা প্রাণহীন, মেরুদণ্ডহীন 'না'- এর সমষ্টি হইয়া দাঁড়ায়।"[৬৭] আর এই নেতিমূলক শিক্ষার ফলে গড়ে ওঠে কাণ্ডজ্ঞানহীন, দায়িত্ব জ্ঞানহীন যুব সমাজ। তারা নিজ দায়িত্ব স্বীকার না করে সমাজের ব্যর্থতার দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'নিজের দোষ পরের ঘাড়ে চাপানোটা মানুষের সাধারণ দুর্বলতা। আমরা নিজের দোষ দেখতে পাই না। চোখ কখনও নিজেকে দেখতে পায় না। ওটা অপর সবারই চোখ দেখতে পায়। মানুষ আমরা, যতক্ষণ অপরের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারি– ততক্ষণ নিজেদের দুর্বলতা- নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করতে বড় নারাজ। মানুষ সাধারণত নিজের দোষগুলো-নিজের ভ্রমত্রুটিগুলো তার প্রতিবেশীর ঘাড়ে চাপাতে চায়, তা যদি না পারে, তবে ঈশ্বরের ঘাড়ে চাপায়, তা না হলে অদৃষ্ট নামক একটি ভূতের কল্পনা করে এবং তারই ওপর দোষারোপ করে নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু কথা এই– অদৃষ্ট নামক এ বস্তুটির স্বরূপ কি এবং ওটা থাকেই বা কোথায় ? আমরা তো যা বপন করি, তারই ফসল পেয়ে থাকি।'[৬৮] দূরদর্শী বিবেকানন্দ আমুল সংস্কারের মাধ্যমে সমাজসংস্কার করতে চান। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'সংস্কারকগণকে আমি বলিতে চাই, আমি তাঁহাদের অপেক্ষা একজন বড় সংস্কারক। তাঁহারা একটু-আধটু সংস্কার করিতে চান আমি চাই অমূল সংস্কার। আমাদের পার্থক্য কেবল সংস্কার প্রাণালীতে। তাঁহাদের প্রণালী– ভাঙিয়া-চুরিয়া ফেল, আমার পদ্ধতি- সংগঠন। আমি সাময়িক সংস্কারে বিশ্বাসী নই, আমি স্বাভাবিক উন্নতিতে বিশ্বাসী।'[৬৯] আধ্যাত্মিক শিক্ষাই সকল সমাজ সভ্যতা সংস্কৃতি ও উন্নতির ভিত্তি। এ কারণে বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তিতে সমাজ সংস্কার করতে চেয়েছেন।

আত্মার প্রবল ইচ্ছাশক্তি মানুষকে মহান কর্মবীরে পরিণত করে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'ভাবিয়া দেখ, ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে তুমি এই মানুষ হইয়াছ। কে তোমাকে মানুষ করিল? তোমার নিজের ইচ্ছাশক্তি। তুমি কি অস্বীকার করিতে পার, ইচ্ছা সর্বশক্তিমান? যাহা তোমাকে এতদূর উন্নত করিয়াছে, তাহা তোমাকে আরও উন্নত করিবে। আমাদের প্রয়োজন- চরিত্র ও ইচ্ছাশক্তির দৃঢ়তা, এগুলির দুর্বলতা নয়।'[৭০] মানবকল্যাণ সাধনের জন্য প্রয়োজন প্রেম, প্রজ্ঞা ও কর্ম। এ উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমাদের তিনটি বস্তুর প্রয়োজন- অনুভব করিবার হৃদয়, ধারণা করিবার মস্তিষ্ক এবং কাজ করিবার হাত। প্রথমে নির্জনে থাকিয়া নিজেকে উপযুক্ত যন্ত্রে পরিণত করিতে হইবে। নিজেকে একটি তড়িৎ-উৎপাদক যন্ত্র করিয়া তুলিতে হইবে। প্রথমে জগতের লোকের জন্য অনুভব কর। যখন সকলেই কাজের জন্য উন্মুখ, তখন হৃদয়বান ব্যক্তি কোথায়?... যদি তুমি পবিত্র হও, যদি তুমি বলবান্ হও, তাহা হইলে তুমি একাই সমগ্র জগতের সমকক্ষ হইতে পারিবে।'[৭১] পবিত্র, দৃঢ়চিত্ত ও সাহসী ব্যক্তি হবেন প্রকৃত সেবক।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকানন্দ সৎকর্ম-সাধনে প্রেমের দুর্জয় শক্তি সম্পর্কে বলেন, 'সৎকর্ম-সাধনের দ্বিতীয় অঙ্গ-ধারণার জন্য মস্তিষ্ক, কিন্তু ইহা শুষ্ক সাহারা মরুতুল্য, কারণ বুদ্ধি একা কিছুই করিতে সমর্থ হয় না, যদি উহার পশ্চাতে হৃদয়বত্তা না থাকে। প্রেম অবলম্বন কর, প্রেম কোনকালে ব্যর্থ হয় না। প্রেম থাকিলে মস্তিষ্ক ধারণ করিতে পারিবে, হস্ত সৎকর্ম করিতে পারিবে।'[৭২] সমাজের অজ্ঞ ও দরিদ্রদের প্রেম দ্বারা জয় করতে হবে। '...ঘৃণা দ্বারা ঘৃণাকে জয় করা যায় না, প্রেম দ্বারা বিদ্বেষকে জয় করা যায়।'[৭৩] নির্ভিক ও শক্তিশালী ব্যক্তি হতে পারে প্রকৃত সমাজকর্মী। বিবেকানন্দ আত্মজ্ঞান ও শক্তি লাভের উদ্দেশ্যে বলেন, 'কিসের জোরে মানুষ উঠিয়া দাঁড়ায় ও কাজ করে?– শক্তির জোরে। এই বলবীর্যই ধার্মিকতা, দুর্বলতাই পাপ। যদি উপনিষদের এমন কোন শব্দ থাকে, যাহা বজ্রবেগে অজ্ঞান রাশির উপর পতিত হইয়া উহাকে একেবারে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে, তবে তাহা –"অভীঃ"। যদি জগৎকে কোন ধর্ম শিখাইতে হয়, তবে তাহা এই "অভীঃ"। কি ঐহিক, কি আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েই "অভীঃ"–এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিতে হইবে। কারণ ভয়ই পাপ ও অধঃপতনের নিশ্চিত কারণ। ভয় হইতেই মৃত্যু, ভয় হইতেই সর্বপ্রকার অবনতি আসে। এখন প্রশ্ন এই ভয়ের উদ্ভব কোথা হইতে? 'আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের অভাব হইতেই ভয়ের উদ্ভব। যিনি রাজাধিরাজ, তাঁহার তুমি উত্তরাধিকারী-তুমি সেই ঈশ্বরের অংশ। শুধু তাহাই নহে অদ্বৈতমতে তুমিই ব্রহ্ম- তুমি স্বরূপ ভুলিয়া গিয়া নিজেকে ক্ষুদ্র মানুষ ভাবিতেছ। আমরা স্বরূপ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছি- আমরা ভেদজ্ঞানে অভিনিবিষ্ট হইয়াছি...।'[৭৪] সফলতা লাভের জন্য আমাদের শারীরিক ও মানসিক শক্তি বা সাহসের প্রয়োজন। এ কারণে বিবেকানন্দ বলেন, 'সাহস দুই প্রকারেরঃ এক প্রকারের সাহস কামানের মুখে যাওয়া; আর এক প্রকার– আধ্যাত্মিক দৃঢ় প্রত্যয়ের সাহস।'[৭৫] কাপুরুষ ও দুর্বল ব্যক্তির দ্বারা কোন মহৎ কার্য সম্পন্ন হয় না। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'বৎসগণ মনে রেখ, কাপুরুষ ও দুর্বলেরাই পাপাচরণ করে ও মিথ্যা কথা বলে। সাহসী ও সবল চিত্ত ব্যক্তিরা সদাই নীতিপরায়ণ, সাহসী ও সহানুভূতি সম্পন্ন হবার চেষ্টা করে।'[৭৬] সবল চিত্ত ও সাহসী ব্যক্তিদের দ্বারা মহৎ কার্য সম্পন্ন হয়।

বিবেকানন্দ মহাশক্তির প্রেরণা লাভের উদ্দেশ্যে বলেন, 'মহৎ কার্য করিতে গেলে তিনটি জিনিস প্রয়োজনঃ প্রথমতঃ হৃদয়বত্তা– আন্তরিকতা আবশ্যক। বুদ্ধি, বিচারশক্তি আমাদিগকে কতটুকু সাহায্য করিতে পারে? উহারা আমাদিগকে কয়েক পদ অগ্রসর করাইয়া দেয় মাত্র, কিন্তু হৃদয়দ্বার দিয়াই মহাশক্তির প্রেরণা আসিয়া থাকে। প্রেম অসম্ভবকে সম্ভব করে– জগতের সকল রহস্যই প্রেমিকের নিকট উন্মুক্ত।'[৭৭] পবিত্র চরিত্র প্রতিকূল পরিবেশে মুক্তির পথ নির্দেশ করে। 'টাকায় কিছুই হয় না, নামেও হয় না, যশেও হয় না, বিদ্যায়ও কিছু হয় না। ভালবাসায় সব হয়- চরিত্রই বাধাবিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়ে পথ করে নিতে পারে।'[৭৮] বিবেকানন্দ প্রতিকূল পরিবেশের সকল বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে যুবকগণকে অগ্রসর হওয়ার প্রেরণা দিয়ে বলেন, 'যে শুধু "প্রভু প্রভু" বলে চিৎকার করে সে নয়, কিন্তু যে সেই পরম পিতার ইচ্ছানুসারে কাজ করে সেই ধার্মিক...যদিই বা মাঝে মাঝে সংসারে এক-আধটু ধাক্কা খাও, তথাপি বিচলিত হয়ো না, নিমেষেই ওটা চলে যাবে এবং পুনরায় সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'[৭৯] মানবকল্যাণ সাধনে আমাদের প্রয়োজন প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'প্রথম প্রথম সফল না হও, ক্ষতি নাই, এই বিফলতা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, ইহা মানবজীবনের সৌন্দর্য। এরূপ বিফলতা না থাকিলে জীবনটা কি হইত? যদি জীবনে এই বিফলতাকে জয় করিবার চেষ্টা না থাকিত, তবে জীবনধারণ করিবার কোন মুল্য থাকিত না।...গরুকে কখনও মিথ্যা কথা বলিতে শুনি নাই, কিন্তু উহা চিরকাল গরুই থাকে, কখনই মানুষ হয় না। অতএব, বার বার বিফল হও, কিছুমাত্র ক্ষতি নাই; সহস্রবার ঐ আদর্শ হৃদয়ে ধারণ কর আর যদি সহস্রবার অকৃতকার্য হও, আর একবার চেষ্টা করিয়া দেখ?'[৮০] দূরন্ত বাঙালি যুবসমাজ অবশ্যই বিবেকানন্দের মানবকল্যাণ সাধনের ইচ্ছা পূর্ণ করবে।

তথ্যনির্দেশ

১। স্বামী বিবেকানন্দ, *বিবেক-বাণী*, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলকাতা, ষষ্ঠ বিংশ সংস্করণ, ফাল্গুন- ১৪০৮, পৃ. ৫০।

২। ঐ, পৃ. ৫০-৫১।

৩। ঐ, পৃ. ৫১।

৪। ঐ, পৃ. ৫৩।

৫। ঐ, পৃ. ৫৩-৫৪।

৬। রওশন আরা, "নেতৃত্ব বিকাশে অহং বিশ্লেষণ ও আত্মউন্নয়ণ", কাজী নূরুল ইসলাম সম্পাদিত, *দর্শন*, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ২০২৮ কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা। ১৪শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৃ. ৮৫।

৭। ঐ, পৃ. ৮৫-৮৬।

৮। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বন্ধু বিবেকানন্দ*, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ, ৫২ রাজা রামমোহন রায় সারণি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮, পৃ. ১১৭।

৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, বিংশ পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

১০। শিব শংকর চক্রবর্তী, "লোকশিক্ষা পরিষদ কি ও কেন ?", স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, সুবর্ণ জয়ন্তী (৫০ বর্ষ) সংকলন, ২০০৭, রামকৃষ্ণ মিশন, লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৭, পৃ. ২২৭।
১১। ঐ, পৃ. ২২৭।
১২। ঐ, পৃ. ২৪২-২৪৩।
১৩। ঐ, পৃ. ২০১।
১৪। ঐ, পৃ. ২০২।
১৫. স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, "নতুন পৃথিবীর সন্ধানে কার্ল মার্কস ও স্বামী বিবেকানন্দ" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক: কলকাতা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৩৯৫, বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৯৯।
১৬. ঐ, পৃ. ৭৯৯।
১৭. নবনীহরণ মুখোপাধ্যায় "আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ১২২।
১৮. ঐ, পৃ. ১২২।
১৯. ঐ, পৃ. ১২৩।
২০. ঐ, পৃ. ১২৪।
২১. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খন্ড, কামিনী প্রকাশালয়: ১১৫ অখীল মিস্ত্রি লেন, কলি-৯, (প্রথম কামিনী সংস্করণ), ১৯৯৪, পৃ. ৭২।
২২. অজিত কুমার বন্দোপাধ্যায় "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতবর্ষ", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ২১৬।
২৩. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খন্ড, ঐ, পৃ. ৯১।
২৪. ঐ, পৃ. ৮৫।
২৫. ঐ, পৃ. ৮৯।
২৬. রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার, "স্বামী বিবেকানন্দ ও গণচেতনা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ. পৃ. ৩৪২।
২৭. ঐ, পৃ. ৩৪১।
২৮. প্রসূন বসু ও শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, অনুবাদক মনীন্দ্ররায়, শচীনদাস প্রমূখ, কলিকাতা- ৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯২, পৃ. ২৭৬।
২৯. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, "যুগ নায়ক ও দেশ নায়কঃ স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৯২৬।
৩০. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খন্ড, ঐ, পৃ. ২০।
৩১. নবনীহরণ মুখোপাধ্যায় "আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ১২৪।
৩২. ঐ, পৃ. ১২৬।
৩৩. স্বামী মুমুক্ষানন্দ, "মানবতাবাদঃ বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ," স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৬৯০।
৩৪. নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, "আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামী বিবেকানন্দ," স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ১২৩।
৩৫. স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, "যুগ নায়ক ও দেশ নায়ক", স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৯২৩-২৪।
৩৬. সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৪০৮।
৩৭. প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, "নারী জাগরণ ও স্বামী বিবেকানন্দ", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ২৯৮।
৩৮. ঐ, পৃ. ২৯৮।
৩৯. ঐ, পৃ. ২৯১।
৪০. ঐ, পৃ. ২৯৩।
৪১. শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ, ৪৩, ঐ, পৃ. ২৯৯।
৪২. ঐ, পৃ. ২৯৯।
৪৩. ঐ, পৃ. ৩০১।
৪৪. ঐ, পৃ. ৩০২।
৪৫. ঐ, পৃ. ৩০৩।
৪৬. স্বামী মুমুক্ষানন্দ, "মানবতাবাদঃ বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ", ঐ, পৃ. ৬৯০।
৪৭. ঐ, পৃ. ৬৯১।

Dhaka University Institutional Repository

৪৮. শুধাংশুরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খন্ড, ঐ, পৃ. ৪৯৪।
৪৯. স্বামী মুমুক্ষানন্দ, "মানবতাবাদঃ বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ" ঐ, পৃ. ৬৯০।
৫০. গোবিন্দ গোপাল মুখোপাধ্যায়, স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন, স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ২০৬।
৫১. ঐ, পৃ. ২০৫।
৫২. সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, দ্বিতীয় খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, ঐ, পৃ. ১৩৯।
৫৩. ঐ, পৃ. ১৪১।
৫৪. ঐ, পৃ. ১৪১।
৫৫. ঐ, পৃ. ১৪৬।
৫৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ঊনবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ২৯।
৫৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ০৪ অক্টোবর ২০০৭, পৃ. ৫৭-৫৮।
৫৮। Swami Vivekananda, *Chicago Addresses*, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Kolkata, Twenty-nineth Impression, December 2001, P. 44-45.
৫৯। *VIVAKANANDA HIS CALL TO THE NATION*, Advaita Ashrama (ed), 5 Dehi Entally road, Kolkata, 40th Impression, February 2009, P. 52.
৬০। op.cit., P. 53-54.
৬১। op.cit., P. 51.
৬২। op.cit., P. 52.
৬৩। Swami Vivekananda, *Thoughts of Power*, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally road, Kolkata, Twnty-eight Impression, August 2006, P. 11.
৬৪। Op.cit., P. 11.
৬৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধর্ম বিজ্ঞান*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, পৃ. ৪।
৬৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৩০৮।
৬৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, নবম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৩, পৃ. ৩০।
৬৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, ঐ, পৃ. ৬০।
৬৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৪, পৃ. ৭৭।
৭০। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ, পৃ. ৯-১০।
৭১। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৪, ঐ. পৃ. ২৬৮।
৭২। ঐ, পৃ. ২৬৮-২৬৯।
৭৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, পঞ্চম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৩২।
৭৪। ঐ, পৃ. ৩৯-৪০।
৭৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঐ, পৃ. ২৭।
৭৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, ঐ, পৃ. ২৩।
৭৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, ঐ, পৃ. ২৫।
৭৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, ঐ, পৃ. ৬৫।
৭৯। ঐ, পৃ. ২৬।
৮০। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ, পৃ. ৫-৬।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়
স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শন

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের দুঃখে শুধু চোখের জলই ফেলেননি। এই দুঃখ দূর করার জন্য দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি বিষয়ে বহুমুখী জ্ঞান অর্জন করে যুক্তি, প্রজ্ঞা, অর্ন্তদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টির মাধ্যমে রচনা করেন রাষ্ট্রদর্শন। শুধু তাই নয়, মানুষের দুঃখ মোচনের জন্য তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালান তাঁর রাষ্ট্রদর্শন বাস্তবায়নের জন্য। বিবেকানন্দ শোষণমুক্ত এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন, যেখানে জাতি, ধর্ম-বর্ণ, ছোট-বড়, উচ্চ-নীচ, ধনী-দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ সমান অধিকার ভোগ করবে। 'স্বাধীন স্বতন্ত্র ভারত জ্ঞানে বিজ্ঞানে প্রেমে, শৌর্যে মহীয়ান ভারত-জন সাধারণের ভারত, দারিদ্রমুক্ত, মালিন্যহীন এক উদার ভারত-এই ছিল বিবেকানন্দের স্বপ্ন। এই মহা-ভারত হবে প্রজা সাধারণের; জাতীয় ও স্বদেশপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এই নতুন ভারতের বুনিয়াদ এবং এই ভারতকে ধারণ করবে বেদান্তের জীব-ব্রহ্ম-তত্ত্ব-যে তত্ত্ব থেকেই মনে হয় বিবেকানন্দ সোস্যালিজমের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন।'[১] বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিকতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রদর্শন রচনা করেন। যেখানে মানুষ তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে সক্ষম হবে, 'নর' আত্মাত্মিক অনুশীলনের মাধ্যমে হয়ে উঠবে "নারায়ণ"। বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেন মানুষের আধ্যাত্মিক শিক্ষা, অনুশীলন ও বিকাশের জন্য প্রয়োজন একটি আদর্শ সমাজ। আর বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শন রচনার উদ্দেশ্য সেই দিব্য সমাজ' (Divine Society) প্রতিষ্ঠা করা। মানুষ দিব্য সমাজের অনুকূল পরিবেশে আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলন করে জীবনের পরম লক্ষ্য মুক্তি অর্জনে সক্ষম হবে।

রাষ্ট্রদর্শনের উৎস

স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শনের উৎস দু'টি। প্রথমত: বিবেকানন্দ একজন বৈদান্তিক গৈরিক সন্ন্যাসী। তিনি বেদান্তের মৌলিক শিক্ষার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেন তাঁর রাষ্ট্রদর্শন। দ্বিতীয়ত: বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শন রচনার অন্যতম কারণ, পরাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক সমস্যা-সমাধান। বেদের মানবতাবাদী শিক্ষা বিবেকানন্দকে মানুষের সেবার ব্রত গ্রহণে আগ্রহী করে। তাই তিনি বিশাল জনগোষ্ঠীর কল্যাণের জন্য এক যুগান্তকারী বৃহত্তর রাষ্ট্র সংঘের কথা চিন্তা করেন। বিবেকানন্দ বলেন যে, 'দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা উপনিষদেই লিখিত আছে।'[২] কিন্তু পরাধীন জাতির পক্ষে দৈহিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। বিবেকানন্দ জানতেন, 'পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা ব্যতীত কোন জাতির স্বাধীন চিন্তা বা কর্মের অধিকার নাই বা তার পক্ষে নিজের ইচ্ছা মতো শরীর, বুদ্ধি বা ধন ব্যবহারেরও সুযোগ নাই-সুতরাং সর্বাগ্রে প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা।'[৩] বিবেকানন্দ এই রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই ১৯০১ সালে বিপ্লবী হেম চন্দ্র ঘোষকে বলেন, 'India should be freed politically first.'[৪] আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা লাভের জন্য প্রথম প্রয়োজন রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

পরাধীন ভারতবর্ষ

১৭৫৭ সালে ২৩ শে জুন বৃটিশ ইষ্টইন্ডিয়া কোম্পানীর মুষ্টিমেয় সৈন্যের হাতে পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত ও নিহত হন। সেই সঙ্গে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য অস্তমিত হয়, শুরু হয় জাতীয় জীবনে দুঃশাসনের কালো রাত্রি। এ অবস্থায় একজন দূরদর্শী চিন্তাবিদের পক্ষেই সম্ভব শক্তিশালী বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারত স্বাধীনতার পথ আবিষ্কার করা। গভীর জীবন সমস্যা থেকে দর্শনের জন্ম। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতমাতার 'পরাধীনতার শৃঙ্খল' এই বড় সমস্যা থেকে দেশকে স্বাধীন করার প্রয়াসেই রাষ্ট্রদর্শন রচনা করেন। তাঁর এ দুঃসাহসিক অভিযান সম্ভব হয়েছে সাহসী পদক্ষেপ ও দার্শনিক প্রজ্ঞা বলে। বিবেকানন্দ এদেশের নিরীহ জনগণের উপর ইংরেজদের অমানুষিক নির্যাতন সম্পর্কে বলেন, 'ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখতে পাবেন, হিন্দুরা রেখে গেছে অপূর্ব সব মন্দির, মুসলমানরা সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ। আর ইংরেজরা? স্তূপীকৃত ভাঙা ব্রান্ডির বোতল-আর কিছু নয়।...ইংরেজদের কৃতকর্মের প্রতিশোধ ইতিহাস নেবেই নেবে। আমাদের গাঁয়ে গাঁয়ে দেশে দেশে যখন মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছে তখন ইংরেজরা আমাদের গলায় পা দিয়ে পিষেছে, নিজেদের তৃপ্তির জন্য আমাদের শেষ রক্তবিন্দুটি শুষে নিয়েছে, আর এ দেশের কোটি কোটি টাকা নিজের দেশে চালান করেছে।'[৫]

বিবেকানন্দ মিস মেরী হেলকে লিখিত এক পত্রে বৃটিশ শাসকদের রক্ত শোষণের কথা উল্লেখ করেন, 'কিন্তু রক্ত শোষণই যেখানে মূল উদ্দেশ্য, সেখানে মঙ্গলকর কিছু হতে পারে না।'[৬] বৃটিশ শাসনের পূর্বে ভারতের শাসনব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

অনেকটা ভাল ছিল, সেখানে ভারতীয়দের সম্পদ কেউ সর্বস্ব লুট করে নেয়নি এবং অনেকটা সুবিচার ও স্বাধীনতা ছিল।

বৃটিশ শাসন কালে ধর্মান্তরের ফলে হিন্দুদের সংখ্যা অনেক কমে গিয়েছিল। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ ঐ পত্রে লিখেন, 'কয়েক-শ অর্ধ-শিক্ষিত, বিজাতীয়, নব্যতন্ত্রী লোক নিয়ে বর্তমান বৃটিশ ভারতের সাজান তামাসা-আর কিছু নয়। মুলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে দ্বাদশ শতাব্দীতে হিন্দুর সংখ্যা ছিল ৬০ কোটি, এখন ২০ কোটিরও নিচে।'[৭] জনদরদী বিবেকানন্দ মেরী হেলকে লিখিত পত্রে বৃটিশ শাসনের নির্মম নিষ্ঠুর অত্যাচার, হত্যাযজ্ঞ এবং দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। 'ইংরেজ-বিজয়ের কালে কয়েক শতাব্দী ধরে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব চলেছিল, ব্রিটিশ শাসনের অবশ্যম্ভাবী পরিনাম রূপে ১৮৫৭ ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে বীভৎস হত্যাকান্ড ঘটেছে এবং তার চেয়েও ভয়ানক যে সকল দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে (দেশীয় রাজ্যে কখনও দুর্ভিক্ষ হয়নি), তা লক্ষ লক্ষ লোককে গ্রাস করেছে। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে, কিন্তু মুসলমান শাসনের আগে দেশ যখন সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল, এখনও সেই সংখ্যায় পৌছায়নি। বর্তমান জন সংখ্যার অন্ততঃ পাঁচগুণ লোককে সহজেই ভরণপোষণ করার মতো জীবিকা ও উৎপাদনের সংস্থান ভারতের আছে- যদি সবকিছু তাদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া না হয়।'[৮] বিবেকানন্দ বৃটিশ শাসকদের এদেশে শিক্ষা বিস্তার রোধ ও স্বাধীনতা হরণ সম্পর্কে মেরীকে লিখেন, 'এই তো অবস্থা- শিক্ষা বিস্তারও বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা অপহৃত, (অবশ্য আমাদের নিরস্ত্র করা হয়েছে অনেক আগেই) যেটুকু স্বায়ত্বশাসন কয়েক বছরের জন্য দেওয়া হয়েছিল, অবিলম্বে তা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। দেখছি, আরও কী আসে! কয়েক ছত্র সমালোচনার জন্য লোককে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, বাকিরা বিনা বিচারে জেলে। কেউ জানে না কখন কার ঘাড় থেকে মাথা উড়িয়ে দেওয়া হবে।'[৯] ভারতবর্ষে কয়েক বছর ধরে চলছে ত্রাসের রাজত্ব। বৃটিশ সৈন্য আমাদের পুরুষদের খুন করেছে, মেয়েদের মর্যাদা নষ্ট করেছে, বিনিময়ে আমাদেরই পয়সায় জাহাজে চড়ে দেশে ফিরেছে পেনশন ভোগ করতে। ভয়াবহ নৈরাশ্যে আমরা ডুবে আছি। কোথায় সেই ভগবান ? মেরী, তুমি আশাবাদী হতে পার, কিন্তু আমি কি পারি ? ধর, এই চিঠিখানাই যদি তুমি প্রকাশ করে দাও- ভারতের নতুন কানুনের জোরে ইংরেজ সরকার আমাকে এখান থেকে সোজা ভারতে টেনে নিয়ে যাবে এবং বিনা বিচারে আমাকে হত্যা করবে। আর আমি জানি, তোমাদের সব খ্রীষ্টান শাসকসম্প্রদায় ব্যাপারটা উপভোগ করবে, কারণ আমরা যে 'হিদেন'। এর পরেও আমি নিদ্রা যাব, আর আশাবাদী থাকব? পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আশাবাদীর নাম নীরো (Nero)। হায়, সেই ভয়ঙ্কর অবস্থার কথা তারা সংবাদ হিসাবেও লিখবার উপযুক্ত মনে করে না। নেহাতই যদি দরকার হয়, রয়টারের এজেন্ট এগিয়ে এসে 'আদেশ-মাফিক তৈরী' ঠিক উল্টো খবরটি বাজারে ছাড়বে।'[১০] ব্রিটিশ শাসক শোষণের উদ্দেশ্যে বাঙালিদের রাজনৈতিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

'পূর্বতন শাসকেরা শিক্ষার জন্য যে-সব জমি ও সম্পত্তি দান করেছিলেন, সে-সকলই গ্রাস করে নেওয়া হয়েছে, এবং বর্তমান সরকার শিক্ষার জন্য রাশিয়ার চেয়েও কম খরচ করে-আর সে কী শিক্ষা! মৌলিকতার সামান্য চেষ্টাও টুঁটি টিপে মারা হয়।'[১১] বিবেকানন্দ অবশেষে বৃটিশ শাসন অবসানের জন্য ভগবানের হস্তক্ষেপ কামনা করেন। তিনি মিস মেরীকে লিখেন, 'মেরী, আমাদের কোনও আশা নেই, যদি না সত্যি এমন কোনও ভগবান থাকনে, যিনি সকলের পিতাস্বরূপ, যিনি বলবানের বিরুদ্ধে দুর্বলকে রক্ষা করতে ভীত নন, এবং যিনি কাঞ্চনের দাস নন। তেমন কোনও ভগবান আছেন কি? কালেই বা প্রমাণিত হবে।'[১২] ইংরেজরা এদেশের মানুষকে বঞ্চিত করার পাঁয়তারা করে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় অধিকার থেকে। ইংরেজ সরকার এদেশের চাষীদের ধানের পরিবর্তে নীল চাষ করতে বাধ্য করে, চড়া হারে খাজনা আদায় করে। কেউ ইংরেজদের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলে তাকে চাবুকের তীব্র আঘাতে জর্জরিত করে। কৃষক সমাজকে করে অমানুষিক নির্যাতন, তাদের অনাহারে কাটে দিন। এ দেশের অর্থ সম্পদ লুটে নিয়ে গড়ে তুলে সমৃদ্ধশালী বৃটেন। মাতৃভাষার পরিবর্তে এদেশের মানুষের উপর চাপিয়ে দেয় ইংরেজী ভাষা, ভারতবাসী যাতে শিক্ষা ও জ্ঞানার্জন করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে না পারে। ইংরেজরা চিরতরে এদেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, রাজনীতি প্রভৃতি ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। তারা, রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে ভারতবাসীকে দাবিয়ে রাখে প্রায় দু'শ বছর।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এসব সমস্যা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন এবং মানুষের মুক্তির পথ অনুসন্ধান করেন। বিবেকানন্দ গভীরভাবে ভারতের সামাজিক সমস্যা উপলব্ধি করে বলেন, 'তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ-কোটি কোটি লোক

Dhaka University Institutional Repository

অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ- অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারতগগণ আচ্ছন্ন করিয়াছে?'[১৩] এসব কারণেই তিনি ইংরেজদের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করেন গণচেতনা, পরিকল্পনা করেন জাতীয় বিপ্লবের।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিবেকানন্দের ভূমিকা

মহৎ বাণী ও যুক্তিসিদ্ধ আশা কখনও মরে না। বিবেকানন্দ প্রথমেই স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা সরাসরি ঘোষণা দেননি। কারণ স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রথম প্রয়োজন ছিল আদর্শ ও আলোকিত মানুষ তৈরী করা। কারণ সচেতন মানুষই পারে তাদের অধিকার আদায় ও স্বাধীনতা অর্জন করতে। আর এ জন্য তিনি শিক্ষা, সত্য প্রচার ও ধর্মোপদেশের মাধ্যমে মানুষকে জাগিয়ে তোলেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সংগ্রামী জীবনের মাত্র পাঁচ বছর (১৮৯৭-১৯০২) সময়ের মধ্যে বৃটিশ বিরোধী সংগ্রামে জনগণকে জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হন। আর এই প্রেক্ষাপটের ভিত্তিতেই ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ভারতবাসী বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, সুভাষ বোস প্রমুখের নেতৃত্বে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয় এবং বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়। আর এই স্বাধীনতা সংগ্রাম ও বিজয় গৌরবের পতাকার ভিত্তি স্থাপন করেন গৈরিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। বিপ্লবী বিবেকানন্দ স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য হৃদয়গ্রাহী আহ্বান জানান তরুণ সমাজকে। তিনি বলেন 'তুচ্ছ জীবন, তুচ্ছ মরণ, তুচ্ছ ক্ষুধা, তুচ্ছ শীত।...অগ্রসর হও...পশ্চাতে চাহিও না। কে পড়িল দেখিতে যাইও না। এগিয়ে যাও, সম্মুখে, সমম্মুখে। এই রূপেই আমরা অগ্রগামী হইব-একজন পড়িবে, আর একজন তাহার স্থান অধিকার করিবে।'[১৪] স্বাধীনতার মহানায়ক, বিপ্লবের কর্ণধার কোন ক্রমেই পিছপা হবেন না। তিনি যে কোন মূল্যেই হোক বিপ্লব দেখবেন। তাই ডক্টর দত্তের প্রবীণ সহযোগী বিপ্লবকর্মী সখারাম গণেশ দেউস্করকে বিবেকানন্দ নিজেই বলেন 'The country has become a powder magazine. A little spark my ignite it. I will see the revolution in my life time'[১৫]

ভারতের "Renaissance" জনমনে সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ ও রাজনৈতিক চেতনার সৃষ্টি করে স্বাধীনতা সংগ্রামে বিরাট ভূমিকা পালন করে। সাহিত্য, ধর্ম ও রাজনৈতিক চেতনার মাধ্যমে প্রকাশিত হতে থাকে স্বৈরাচারী ইংরেজ সরকারের শোষণ ও লাঞ্ছনার স্বরূপ। এ অবস্থায় ভারতবাসী ক্রমে সংঘবদ্ধ রাজনৈতিক সংস্থার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৬), জমিদার সভা (১৮৩৮), ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৩৯), বেঙ্গলী বৃটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি (১৮৪৩), বৃটিশ ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন (১৮৫১) প্রভৃতির মাধ্যমে প্রকাশিত হচ্ছে ভারতবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষা।'[১৬] সারাদেশে চলছে বৃটিশ শোষণের বিরুদ্ধে কৃষক শ্রমিকদের বিরামহীন বিক্ষিপ্ত সশস্ত্র সংগ্রাম। একদিকে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন, বাণী ও হিন্দু ধর্মের নতুন ব্যাখ্যায় আকৃষ্ট হয়ে মানুষ ছুটেছে দক্ষিণেশ্বরে। অপর দিকে অসাধারণ মেধা, মনীষা ও বাগ্মিতা নিয়ে সুরেন্দ্রনাথ দেশে শুরু করেন 'বাস্তববাদী' রাজনৈতিক আন্দোলন। সে সময়ে বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেন সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ, গণ-আন্দোলন প্রভৃতি। সাহিত্য চর্চা এবং বিদেশী শাসকের স্বৈরাচারী নীতি ছাত্র অবস্থাতেই স্বামী বিবেকানন্দকে জাতীয়তাবাদী দেশপ্রেমিকে পরিণত করে। ছাত্র সমাজের মধ্যে দেশপ্রেম সঞ্চারের উদ্দেশ্যে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আনন্দমোহন বসুর উদ্যোগে 'ছাত্র সভা' বা Students Association প্রতিষ্ঠিত হয়। পদচ্যুত সিভিলিয়ান সুরেন্দ্রনাথ তাতে যোগ দেন। দেশপ্রেমের উত্তপ্ত আগুন জ্বলতে থাকে সবার বুকে। বিবেকানন্দের 'সঙ্গীত কল্পতরু' বইটি স্বদেশ প্রেমের অন্যতম দৃষ্টান্ত। এ বই থেকে জাতীয় সঙ্গীত, ধর্মীয় ও অন্যান্য সঙ্গীত হিন্দু মেলায় পরিবেশন করে দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করা হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের দেহ ত্যাগের পর বরাহনগর মঠে বুদ্ধের করুণা, শঙ্করের মেধা এবং চৈতন্যের প্রেম-এই মহাত্রিবেণীর সমন্বয়ে নবভারত গঠনের চিন্তায় বিভোর হলেন শ্রীশ্রীঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা।'[১৭] বিবেকানন্দ পায়ে হেঁটে সমগ্র ভারত ভ্রমণ করে দেখেন, বৃটিশ শাসনের ভয়াবহ চিত্র। দারিদ্র্য, ক্ষুধা, অজ্ঞানতা, অসারতা, পরনির্ভরশীলতা প্রভৃতি সমস্যায় জর্জরিত দেশ।

ভারতীয় ঐতিহ্য প্রচার ও স্বনির্ভরতা অর্জন

ভারতবর্ষ হীন নয়, দুর্বল নয়, নয় অন্তঃসার শূন্য। ভারতবর্ষ ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সম্পদে পূর্ণ। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষ পূণ্যভূমি, ধর্মভূমি এবং দেবভূমি। জগতের ধর্ম চেতনার প্রাণকেন্দ্র ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের প্রতি স্বামীজীর প্রবল আবেগের মূলে ছিল ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ প্রবল যুক্তি। বিবেকানন্দ ভারতের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং

Dhaka University Institutional Repository

সম্পদ সম্পর্কে একটি নিবন্ধে লিখেন, 'দর্শন, নীতিশাস্ত্র ও আধ্যাত্মিক যা কিছু মানুষের অন্তর্নিহিত পশুসত্তা বজায় রাখিবার নিরন্তর প্রচেষ্টায় বিরতি আনিয়া দেয়, যে সকল শিক্ষা মানুষকে পশুত্বের আবরণ অপসৃত করিয়া জন্মমৃত্যুহীন চিরপবিত্র অমর আত্মা-রূপে প্রকাশিত হইতে সাহায্য করে–এই দেশ সেই সবকিছুরই পূণ্যভূমি।...আমরা সকলেই ভারতের অধঃপতন সম্বন্ধে শুনিয়া থাকি। এককালে আমিও ইহা বিশ্বাস করিতাম। কিন্তু...আমার ভুল হইয়াছিল। হে পবিত্র আর্যভূমি, তোমার তো কখনও অবনতি হয় নাই। কত রাজদন্ড চূর্ণ হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কত শক্তির দন্ড এক হাত হইতে অন্য হাতে গিয়াছে, ভারতবর্ষের রাজা ও রাজসভা অতি অল্প লোককেই প্রভাবিত করিয়াছে।...শত শতাব্দীর সমুজ্জ্বল শোভাযাত্রার সম্মুখে আমি স্তম্ভিত-বিস্ময়ে দন্ডায়মান, সে শোভাযাত্রার কোন কোন অংশে আলোক রেখা স্তিমিতপ্রায়, পরক্ষণে দ্বিগুণ তেজে ভাস্বর, আর উহার মাঝখানে আমার দেশ মাতৃকা রাণীর মতো পদবিক্ষেপে পশু মানবকে দেব মানবে রূপান্তরিত করিবার জন্য মহিমময় ভবিষ্যতের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছেন; স্বর্গ বা মর্তের কোন শক্তির সাধ্য নাই-এ জয়যাত্রার গতিরোধ করে।"[১৮] বিবেকানন্দ বলেন, ভারতবর্ষ সম্পদ ও দুর্লভ সংস্কৃতিতে পরিপূর্ণ।

স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বশর্ত আত্মবিশ্বাস ও স্বনির্ভরতা অর্জন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বিবেকানন্দ যুব সমাজকে আত্মশক্তিতে অনুপ্রাণিত করেন। দুর্বল আত্মশক্তিহীন মানুষকে বিবেকানন্দ তীব্র কটাক্ষ করে বলেন, 'কে ধনী, কে বড়ো, তা নিয়ে মাথা ঘামিও না। ধনীদের সম্মান করা এবং তাহাদের সাহায্যের জন্য তাহাদের পিছু লেগে থাকা গণিকাদেরই শোভা পায়'। ইচ্ছে করলেই, মানুষ আত্মশক্তি ও আত্মসম্মান নিয়ে স্বনির্ভর হয়ে স্বাধীনভাবে বাঁচতে পারে। বিবেকানন্দ চেয়েছেন, আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সমাজের বিশাল অভ্যুত্থান। তাই তিনি আমাদের গ্রামভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সতর্কবাণী করেন, 'জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশী হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।'[১৯] ব্যক্তির স্বনির্ভরতা অর্জনের মাধ্যমেই জাতীয় স্বনির্ভরতা অর্জন সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন-'আগে জনসাধারণের দুঃখ-কষ্টের দিনে তাদের পাশে দাঁড়াতে হবে, সেবা করতে হবে-নিজেদের মানুষ হতে হবে- তা না হলে ইংরেজদের দেওয়া জিনিস তো রাখাই মুশকিল।...আহাম্মক! ওদের পায়ে ধরে জীবন সংগ্রামোপযোগী বিদ্যা...শিখ্‌গে। যখন উপযুক্ত হবি...ওরাও তখন তোদের কথা রাখবে। কোথাও কিছুই নেই, কেবল Congress করে চেঁচামেচি করলে কি হবে?'[২০] বিবেকানন্দ জাতিকে আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বৎসর আমাদের গরীয়সী ভারতমাতাই আমাদের আরাধ্য দেবতা হউন, অন্যান্য অকেজো দেবতা এই কয়েক বৎসর ভুলিলে কোন ক্ষতি নাই। অন্যান্য দেবতারা ঘুমাইতেছেন; তোমার স্বজাতি এই দেবতাই একমাত্র জাগ্রত...।'[২১] জনসাধারণের সেবা করে তাদেরকে 'মানুষ' করে তুলতে পারলেই দেশমাতার মুক্তি আসবে।

আমেরিকায় ভাষণের উদ্দেশ্য

১৮৯৭ সালে দূরদর্শী বিবেকানন্দ ভারত সম্পর্কে ইংরেজদের অপপ্রচার প্রতিরোধ এবং ভারতীয় ঐতিহ্য প্রচারের উদ্দেশ্য সামনে রেখেই আমেরিকা যান। আমেরিকা যাওয়ার সময় বেনারসে তিনি বলেন, 'আমি যাইতেছি; কিন্তু যতোদিন না আমি সমাজের উপর বোমার মতো ফাটিয়া পড়িতে পারি, যতোদিন না সমাজকে অনুগত ভৃত্যের মতো আমার অনুসরণ করাইতে পারি, ততোদিন আমি ফিরিব না।' সত্যি বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে বোমার মত তীব্র আঘাতে ফেটে পড়েন এদেশের বুকে। যার প্রতিঘাতরূপে প্রকাশ পেয়েছে দেশবাসীর জাতীয়তাবোধ ও স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার প্রবল স্পৃহা। ১৮৯৫ সালে আমেরিকায় এক বক্তৃতায় তিনি বলেন, 'ইংরেজী সভ্যতার উপাদান হল তিনটি 'ব'- বাইবেল, বেয়নেট ও ব্রান্ডি। এরই নাম সভ্যতা। এই সভ্যতাকে এতদূর পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয়েছে যে, একজন হিন্দুর গড়ে মাসিক আয় ৫০ সেন্টে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।'[২২] ইংরেজরা এদেশবাসীর সামাজিক সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির পথ অবরুদ্ধ করে রাখে।

বিবেকানন্দের আমেরিকায় ভাষণের উদ্দেশ্য দুটি– 'প্রথমত, ইংরেজ শাসনে দেশ স্থবির, জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট-দেশে সাম্প্রদায়িক অনৈক্য বিদ্যমান, জনমানসে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতি বীর্যবত্তা-সবকিছু সম্পর্কেই একটা হীনম্মন্যতা বিদ্যমান: দ্বিতীয়ত, ইংরেজের অপপ্রচারের ফলে বিদেশে ভারতের ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত– বিদেশীর চোখে ভারত তখন বর্বরের দেশ, এবং তাদের ধারণা ইংরেজের আগমনের ফলেই ভারতে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করেছে।'[২৩] এই অবস্থায় রাষ্ট্র পরিচালনায় অযোগ্য ভারত যদি স্বাধীনতা চায় তবে বিশ্বের সহানুভূতি পাবে না। সুতরাং এ অবস্থায় বিশ্বের সহানুভূতি লাভের জন্য বিদেশে ভারতের ঐতিহ্যশালী সভ্যতা ও সংস্কৃতি প্রচারের প্রয়োজন ছিল। বিদেশে

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকানন্দের কীর্তি ভারতবাসীকে দিয়েছে গৌরব, ঐক্যবোধ এবং আত্মপ্রত্যয়। এতে সুদৃঢ় হয় জাতীয়তাবোধের ভিত্তি এবং প্রাণবন্ত হয় দেশপ্রেম। বিদেশেও ভারত সম্পর্কে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়। বহু বৎসরের চেষ্টায় ভারতের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় নেতারা একত্রে যা করতে পারেন নি, বিবেকানন্দ তা করেন। এ সম্পর্কে সেপ্টেম্বর ১৮৯৪ খৃস্টাব্দে 'অমৃতবাজার পত্রিকা'য় উল্লেখ করা হয়, 'He has done much more to elevate our nation in the estimation of the people of the West than what has hitherto been done by all our political leaders together'[২৪]

আধ্যাত্মিক বিপ্লব ও সংগঠিতকরণ

স্বামী বিবেকানন্দ জাতির মুক্তির উদ্দেশ্যে সমগ্র ভারতবর্ষ, আমেরিকা এবং ইউরোপ ভ্রমণ করেন। তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও ভাবেন। কিন্তু বিবেকানন্দ দেখেন বিপ্লবের জন্য দেশ প্রস্তুত নয়। তাই তিনি চিন্তা করেন দেশের স্বাধীনতা ও স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য প্রথম প্রয়োজন সুনাগরিক তৈরি করা। বিবেকানন্দ সন্ন্যাসী, তাঁর কাছে ঈশ্বরই সত্য। আধ্যাত্মিক আলোকে মানুষের মনের অজ্ঞতা দূর করাই তাঁর কাম্য। তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র হল "Man making". তাঁর মতে রাজনৈতিক সফলতা অর্জনের জন্য প্রথম প্রয়োজন ভাল মানুষ। বিবেকানন্দ চেয়েছেন এমন যুবক যাদের থাকবে লৌহ দৃঢ় মাংসপেশী, ইস্পাত কঠিন স্নায়ু এবং বজ্র দুর্জয় মানসিকতা, যারা রচনা করবে জাতীয় জীবনের মুক্তির পথ। আর এই মানুষ গড়ার কাজেই তিনি বেশী ব্যস্ত ছিলেন। প্রকাশ্যে রাজনীতিতে যোগ দিয়ে কারারুদ্ধ হয়ে বৃথা সময় নষ্ট করা এবং শক্তি ক্ষয় করা ঠিক নয়। এর চেয়ে 'মানুষ' তৈরি করে জাতি গঠন করাই উত্তম।

বিবেকানন্দের ছিল গভীর দেশপ্রেম। তিনি স্বদেশকে পরাধীনতা শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে বিদেশের সাথে সংস্রব রাখার শিক্ষা দেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'ভারতকে আমি প্রাণের সহিত ভালবাসি, স্বদেশের কল্যাণের জন্য আমি সর্বদাই বদ্ধপরিকর, আমাদের প্রাচীন পূর্বপুরুষগণকে আমি বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তথাপি পৃথিবীর নিকট আমাদের যে অনেক কিছু শিখিতে হইবে– এ ধারণা আমি ত্যাগ করিতে পারি না।...ভারতের বাহিরের দেশগুলির সহিত আমাদের সংস্রব না রাখিলে চলিবে না। আমরা যে এক সময়ে অপরের সহিত সংস্রব না রাখিবার কথা ভাবিয়াছিলাম, তাহা শুধু আমাদের নির্বুদ্ধিতা; আর তাহারই শাস্তিস্বরূপ আমরা সহস্র বৎসর যাবৎ দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রহিয়াছি।'[২৫] বৈদেশিক সম্পর্ক, রাষ্ট্র পরিচালনা ও উন্নয়নের নীতিমালা প্রভৃতি ধারণা থেকে স্বাধীনতা লাভের পথ সুগম হয়। বিবেকানন্দ দেশকে এবং দেশের মানুষকে হৃদয় দিয়ে ভালবেসেছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'এই মাতৃভূমির প্রতিই আমার সারা জীবনের আনুগত্য; এবং আমাকে যদি সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে সেই সহস্র জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমার স্বদেশবাসীর, হে আমার বন্ধুবর্গ- তোমাদেরই সেবায় ব্যয়িত হইবে।'[২৬] বিবেকানন্দ স্বাধীনতা লাভের জন্য আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তার সুদৃঢ় ভিত্তি গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, '...তোমরা যদি ধর্ম ছাড়িয়া দিয়া পশ্চাত্য জাতির জড়-বাদ সর্বস্ব সভ্যতার অভিমুখে ধাবিত হও, তোমরা তিন পুরুষ যাইতে না যাইতে বিনষ্ট হইবে। ধর্ম ছাড়িয়া দিলে হিন্দুর জাতীয় মেরুদণ্ড ভাঙিয়া যাইবে– যে ভিত্তির উপর বিশাল জাতীয় সৌধ নির্মিত হইয়াছিল, তাহাই ভাঙিয়া যাইবে; সুতরাং ফল দাঁড়াইবে– সম্পূর্ণ ধ্বংস।'[২৭] আধ্যাত্মিক শিক্ষা ছাড়া জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় হয় না।

বিবেকানন্দ বিশ্বইতিহাস থেকে জড়বাদী সভ্যতা ধ্বংসের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এমন সময় ছিল, যখন প্রবল গ্রীকবাহিনীর বীরদর্পে বসুন্ধরা কম্পিত হইত। তাহারা এখন কোথায়? তাহাদের চিহ্নমাত্র নাই। গ্রীসের গৌরব-রবি আজ অস্তমিত! এমন একদিন ছিল, যখন রোমের শোনাঙ্কিত বিজয় পতাকা জগতের বাঞ্ছিত সমস্ত ভোগ্য পদার্থের উপরেই উড্ডীয়মান ছিল। রোম সর্বত্র যাইত এবং মানব জাতির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিত। রোমের নামে পৃথিবী কাঁপিত। আজ ক্যাপিটোলাইন গিরি ভগ্নস্তূপ মাত্রে পর্যবসিত। যেখানে সীজারগণ দোর্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিতেন, সেখানে আজ উর্ণনাভ তন্তু রচনা করিতেছে! অন্যান্য অনেক জাতি এইরূপ উঠিয়াছে, আবার পড়িয়াছে, মদগর্বে স্ফীত হইয়া প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া স্বল্পকাল মাত্র অত্যাচার-কলঙ্কিত জাতীয় জীবনযাপন করিয়া তাহারা জলবুদ্‌বুদের ন্যায় বিলীন হইয়া গিয়াছে! ...ভারত কিন্তু শান্তভাবে সহস্র সহস্র বর্ষ ধরিয়া জীবিত রহিয়াছে।'[২৮] জড়বাদ নয়, ভারতীয় অধ্যাত্মবাদই সভ্যতার সুদৃঢ় ভিত্তি। জড়বাদী ইউরোপীয় সভ্যতা আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'জড়-শক্তির লীলাভূমি ইউরোপ যদি নিজ সমাজের ভিত্তি পরিবর্তন করিয়া আধ্যাত্মিকতার উপর স্থাপিত না করে, তবে পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই উহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। উপনিষদের ধর্মই ইউরোপ রক্ষা করিবে?'[২৯] পরাধীন দেশের স্বাধীনতার জন্য, মুক্তির জন্য ধর্ম ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার প্রয়োজন, কিন্তু তার চেয়ে

Dhaka University Institutional Repository

বেশি প্রয়োজন অন্নহীনদের অন্নসংস্থান করা। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'প্রথমে অন্নের ব্যবস্থা করিতে হইবে, তারপর ধর্ম। গরিব লোকেরা অনশনে মরিতেছে, আমরা তাহাদিগকে অতিরিক্ত ধর্মোপদেশ দিতেছি! মতমতান্তরে তো আর পেট ভরে না! লক্ষ লক্ষ মতবাদের কথা বলিতে পার, কোটি কোটি সম্প্রদায় গঠন করিতে পার, কিন্তু যতদিন না তাহাদের দুঃখ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ, বেদের উপদেশ অনুযায়ী যতদিন না জানিতেছ যে, তাহারা তোমার শরীরের অংশ, যতদিন না তোমরা ও তাহারা, দরিদ্র-ধনী, সাধু-অসাধু সকলেই সেই অনন্ত অখণ্ডরূপ- যাঁহাকে তোমরা ব্রহ্ম বল, তাঁহার অংশ হইয়া যাইতেছে, ততদিন কিছুই হইবে না।'[৩০] ভারতের অভিজাত জমিদার ও পুরোহিতগণ সাধারণ মানুষকে শোষণ করে, পদদলিত করে তারা দরিদ্র মানুষদের মনুষ্যত্ববোধ লুপ্ত করে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমাদের অভিজাত পুরুষগণ দেশের সাধারণ লোকদের পদদলিত করিতে লাগিলেন– ক্রমশঃ তাহারা একেবারে অসহায় হইয়া পড়িল; অত্যাচারে এই দরিদ্র ব্যক্তিগণ ক্রমশঃ ভুলিয়া গেল যে তাহারা মানুষ। শত শত শতাব্দী যাবৎ তাহারা বাধ্য হইয়া কেবল কাঠ কাটিয়াছে, আর জল তুলিয়াছে। ক্রমশঃ তাহাদের মনে এই বিশ্বাস দাঁড়াইয়াছে যে, তাহারা ক্রীতদাস হইয়া জন্মিয়াছে– কাঠ কাটিবার ও জল তুলিবার জন্যই তাহাদের জন্ম।'[৩১] এভাবে দেশের সাধারণ মানুষদের শোষণ ও পদদলিত করা জাতীয় অবনতির অন্যতম কারণ। বিবেকানন্দ অবহেলিত মানুষদের শিক্ষার মাধ্যমে সচেতনতা সৃষ্টি করে জাতীয় উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার কথা বলেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমার মনে হয়, দেশের জনসাধারণকে অবহেলা করাই আমাদের প্রবল জাতীয় পাপ এবং তাহাই আমাদের অবনতির অন্যতম কারণ। যতদিন না ভারতের সর্ব সাধারণ উত্তমরূপে শিক্ষিত হইতেছে, উত্তমরূপে খাদ্য পাইতেছে, অভিজাত ব্যক্তিরা যতদিন না তাহাদের উত্তমরূপে যত্ন লইতেছে, ততদিন যতই রাজনীতিক আন্দোলন করা হউক না কেন, কিছুতেই কিছু হইবে না।'[৩২]

বিবেকানন্দ দেশের মুক্তির জন্য যুবকদের উৎসাহ, শক্তি ও চেতনা জাগ্রত করতে বলেন, মানুষ ঈশ্বরের সন্তান। মানুষ তার স্বরূপ ভুলে গিয়ে দুর্বল হয়ে পড়েছে। এ কারণে বিবেকানন্দ সিংহের মত মানুষের স্বরূপ ফিরে পাওয়ার উদ্দেশ্যে বলেন, 'Ye are the children of God, the sharers of immortal bliss, holy and perfect beings. ...Come up, O lions, and shake off the delusion that you are sheep; you are souls immortal, spirits free, blest and eternal; you are not matter, Ye are not bodies; matter is your servant, not you the servant of matter.'[৩৩] মানুষ আত্মসচেতন হলে জড়-শক্তির উপর প্রভুত্ব করবে। বিবেকানন্দ যুব সমাজকে দেশ গড়ার জন্য সঙ্কীর্ণতা মুক্ত হয়ে আলোর পথে আসার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'এস মানুষ হও। নিজেদের সঙ্কীর্ণ গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ, সব জাতি কেমন উন্নতির পথে চলেছে। তোমরা কি মানুষকে ভালবাস? তোমরা কি দেশকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা ভাল হবার জন্য- উন্নত হবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করি। পেছনে চেও না-অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক। পেছনে চেও না, সামনে এগিয়ে যাও।'[৩৪] দেশের জন্য ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ পরিহার করে বৃহৎ মানবকল্যাণে আত্মোৎসর্গ করতে হবে। দেশের মুক্তির জন্য, স্বাধীনতার জন্য প্রয়োজনে যুদ্ধ করতে হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Death is better than vegetating ignorant life; it is better to die on the battle-field than to live a life of defeat.'[৩৫] পরাজিত সৈনিকের চেয়ে যুদ্ধ ক্ষেত্রে মৃত্যু শ্রেয়। একটি দেশের মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রামও প্রয়োজন হতে পারে। দেশের মানুষ যখন সব কিছু ত্যাগ করে আত্মোৎসর্গের জন্য প্রস্তুত থাকবে তখন দেশ উন্নতির দিকে এগিয়ে যাবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'When you have men who are ready to sacrifice their everything for their country, sincere to the backbone-when such men arise, India will become great in every respect. It is the men that make the country!'[৩৬] দিব্যদর্শী বিবেকানন্দের দেশ গড়ার স্বপ্ন বিফলে যায়নি। তাঁর শিক্ষা নিয়ে যুবকগণ ভবিষ্যতেও স্বদেশের উন্নতি ও অগ্রগতি সাধন করতে পারবে। সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ ধ্যানলোকে ভারতের সুন্দর ও সফল ভবিষ্যৎ বর্ণনা করে বলেন, '...আমি যেন দিব্যচক্ষে দেখিতেছি যে, আমাদের সেই প্রাচীনা জননী আবার জাগিয়া উঠিয়া পুনর্বার নব যৌবনশালিনী ও পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে মহিমান্বিত হইয়া তাঁহার সিংহাসনে বসিয়াছেন। শান্তি ও আশীর্বাণীর সহিত তাহার নাম সমগ্র জগতে ঘোষণা কর।'[৩৭] ভারতের জাতীয় অধ্যাত্ম শক্তির মহিমা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে।

একতাই বল। দেশের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠী সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিশাল জাতীয় শক্তি গঠন করতে পারে। বিবেকানন্দ ইংরেজদের এমন দেশপ্রেম ও জাতীয় শক্তি গঠন সম্পর্কে বলেন, 'চার কোটি ইংরেজ তাহাদের সমুদয় ইচ্ছাশক্তি একযোগে প্রয়োগ করিতে পারে, এবং উহার দ্বারাই তাহাদের অসীম শক্তিলাভ হইয়া থাকে; তোমাদের ত্রিশ কোটি লোকের প্রত্যেকেরই ভাব ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং ভারতের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করিতে হইলে তাহার মূল রহস্যই এই

Dhaka University Institutional Repository

সংহতি-শক্তি সংগ্রহ, বিভিন্ন ইচ্ছাশক্তির একত্র মিলন।'[৩৮] যে কোন দেশের বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীর প্রবল ইচ্ছাশক্তির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে যে কোন জাতীয় মহাপরিকল্পনা সহজেই বাস্তবায়ন সম্ভব। প্রত্যেক জাতির মুক্তির পথ সেই জাতিকেই তৈরী করে নিতে হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'ব্যক্তির মত জাতিকেও নিজেকে নিজে সাহায্য করতে হবে।'[৩৯] স্বজাতির ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস ছাড়া কোন বিজাতীয় শক্তি স্বাধীনতা ও মুক্তি দিতে পারে না। বিবেকানন্দ রাষ্ট্রের স্বাধীনতার জন্য দৈহিক ও মানসিক বিভিন্ন পার্থিব চাহিদা পূরণের সাথে সাথে অধ্যাত্মিক শক্তি লাভের জন্যও ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করেছেন। তিনি অত্যাচারিত মানুষের মুক্তির জন্য প্রার্থনার আহ্বান করে যুব সমাজকে বলেন, 'এসো আমাদের মধ্যে প্রত্যেক দিবারাত্র দারিদ্র্য, পৌরহিত্য শক্তি এবং প্রবলের অত্যাচারে নিপীড়িত ভারতের লক্ষ লক্ষ পদদলিতদের জন্য প্রার্থনা করি; দিবারাত্র তাদের জন্য প্রার্থনা কর।...গরিবদের আমি ভালবাসি।'[৪০] প্রার্থনার শক্তি মানসিক ও শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি করে মহৎ জীবন গঠনে সাহায্য করে।

দেশের জমিদার মহাজন, পুরোহিত এবং স্বার্থপর শিক্ষিত মানুষদের অবহেলা, উদাসীনতা ও শোষণ জাতীয় অবনতির অন্যতম কারণ। বিবেকানন্দ এসব শোষণ ও নির্যাতনকারী মানুষদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে বলেন, 'তাঁদেরই আমি মহাত্মা বলি, যাঁদের হৃদয় থেকে গরিবদের জন্য রক্ত মোক্ষণ হয়, তা না হলে সে দুরাত্মা।...যতদিন ভারতের কোটি কোটি লোক দরিদ্র ও অজ্ঞানান্ধকারে ডুবে রয়েছে, ততদিন তাদের পয়সায় শিক্ষিত অথচ যারা তাদের দিকে চেয়েও দেখছে না, এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি দেশদ্রোহী বলে মনে করি। যতদিন ভারতের বিশ কোটি লোক ক্ষুধার্ত পশুর মতো থাকবে, ততদিন যে সব বড়লোক তাদের জন্য কিছু করছে না, আমি তাদের হতভাগ্য পামর বলি।'[৪১] বিবেকানন্দ জাতীয় উন্নয়নের জন্য স্ত্রী জাতির শিক্ষা ও অভ্যুদয়ের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'জগতের কল্যাণ স্ত্রী জাতির অভ্যুদয় না হইলে সম্ভাবনা নাই, এক পক্ষে পক্ষীর উত্থান সম্ভব নহে। সেইজন্যই রামকৃষ্ণবতারে 'স্ত্রীগুরু'– গ্রহণ, সেই জন্যই নারীভাব-সাধন, সেই জন্যই মাতৃভাব-প্রচার। কোন জাতির শ্রেষ্ঠ মাপকাঠি নারীদের প্রতি তাহার মনোভাব।'[৪২] নারীজাতি শিক্ষা ও সেবার মাধ্যমে সচেতন হয়ে জাতীয় উন্নয়নে অংশ গ্রহণ করতে সমর্থ হবে। এতে শিক্ষিত নারীদের দেশপ্রেমিক বীর সন্তান জন্ম নিবে। 'যখন ভারতে এমন লোক জন্মাবে, যারা দেশের জন্য সব ছাড়তে প্রস্তুত, আর যাদের মন মুখ এক, তখন ভারতও সব বিষয়ে বড় হবে। মানুষ নিজেই তো দেশের গৌরব।'[৪৩] বীর সন্তানেরাই হবে দেশের গৌরব ও উন্নয়নের কর্ণধার। শিক্ষিতা মেয়েরা স্বামীকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দিবে, এক দিকে সংসারে শান্তি ও উন্নতি হবে, অন্যদিকে জাতীয় উন্নয়নেও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে। বে করে সংসারী হলেও ঐরূপে শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চ ভাবের প্রেরণা দেবে এবং বীর পুত্রের জননী হবে। যারা চিরকুমারীব্রত অবলম্বন করবে, তারাই কালে এই মঠের শিক্ষয়িত্রী ও প্রচারিকা হয়ে দাঁড়াবে এবং গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে centre (শিক্ষাকেন্দ্র) খুলে মেয়েদের শিক্ষাবিস্তারে যত্ন করবে।'[৪৪] শিক্ষিত মেয়েরা দেশের অশিক্ষিত, নির্যাতিত মেয়েদের মুক্তির পথ তৈরী করবে। দরিদ্র, অশিক্ষিত মানুষেরা তাদের মনুষ্যত্ববোধ হারিয়ে ফেলে পশুপ্রায় হয়ে যায়। বিবেকানন্দ শিক্ষার মাধ্যমে পশুপ্রায় মানুষদের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত করে জাতীয় জীবন গঠনের আহ্বান জানান। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'জনসাধারণকে শিক্ষিত করা এবং তাহাদিগকে উন্নত করাই জাতীয় জীবন গঠনের পন্থা।...সমস্ত ত্রুটির মূলই এইখানে যে, সত্যিকার জাতি– যাহারা কুটিরে বাস করে, তাহারা তাহাদের ব্যক্তিত্ব ও মনুষ্যত্ব ভুলিয়া গিয়াছে। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান- প্রত্যেকের পায়ের তলায় পিষ্ট হইতে হইতে তাহাদের মনে এখন এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, ধনীর পদতলে নিষ্পেষিত হইবার জন্যই তাহাদের জন্ম। তাহাদের লুপ্ত ব্যক্তিত্ববোধ আবার ফিরাইয়া দিতে হইবে। তাহাদিগকে শিক্ষিত করিতে হইবে।...আসুন, আমরা তাহাদের মাথায় ভাব প্রবেশ করাইয়া দিই-বাকীটুকু তাহারা নিজেরাই করিবে। ইহার অর্থ, জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার করিতে হইবে।'[৪৫] জনগণ শিক্ষিত হলে নির্যাতিত ও পদদলিত না হয়ে উচ্চভাবে দেশ গঠনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে।

জাতীয় উন্নয়নের জন্য বিশ্বাস, অহিংসা ও সৎকর্ম প্রয়োজন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'বড় হইতে গেলে কোন জাতির বা ব্যক্তির পক্ষে এই তিনটি প্রয়োজন: (১) সাধুতার শক্তিতে প্রগাঢ় বিশ্বাস। (২) হিংসা ও সন্দিগ্ধভাবের একান্ত অভাব। (৩) যাহারা সৎ হইতে কিংবা সৎ কাজ করিতে সচেষ্ট, তাহাদিগকে সহায়তা।'[৪৬] জাতীয় উন্নয়নের জন্য অতীতের শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতের লক্ষ্য অনুযায়ী বর্তমান সময়ে কাজ করা প্রয়োজন। তাহলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যত অতীতের চেয়েও মহিমান্বিত হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমাদিগকে ভবিষ্যতের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিতে হইবে।...অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। অতএব যতদূর পারো অতীতের দিকে তাকাও, পশ্চাতে যে অনন্ত নির্ঝরিণী প্রবাহিত, প্রাণ ভরিয়া আকণ্ঠ তাহার জল পান কর, তারপর সম্মুখ-প্রসারিত দৃষ্টি লইয়া অগ্রসর হও এবং

Dhaka University Institutional Repository

ভারত প্রাচীনকালে যতদূর উচ্চ গৌরব শিখরে আরূঢ় ছিল, তাহাকে তদপেক্ষা উচ্চতর, উজ্জ্বলতর, মহত্তর, অধিকতর মহিমান্বিত করিবার চেষ্টা কর।'[৪৭] দেশবাসীর সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও কল্যাণ লাভ হবে।

বিবেকানন্দ যথার্থই চিন্তা করেন-সুনাগরিক বা আদর্শ মানুষ গড়ে তুলতে হলে প্রয়োজন ভারতের আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রসারের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বিপ্লব। এ বিপ্লবে মানুষ তার প্রকৃত স্বরূপ জানবে এবং দায়িত্বশীল হয়ে অপরের সেবার জন্য স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবে। এ উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বলেন, মানুষ যে পরিবেশে যে ভাবে বড় হয়, তাতে তার আত্মার কথা, জীবনের কথা শুনতে দেয়া হয় না। আর এ কারণেই মানুষ নিজ আত্মা সম্পর্কে সচেতন নয়। তাই মানুষকে তার আত্মার বাণী শুনাতে হবে। বিবেকানন্দ বেদান্তের ভিত্তিতে ঘোষণা করেন, 'এই দরিদ্রগণকে-ভারতের এই পদদলিত জনসাধারণকে তাহাদের স্বরূপ বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক। জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবলতা-দুর্বলতার বিচার না করিয়া প্রত্যেক নরনারীকে, প্রত্যেক বালক-বালিকাকে শুনাও, শিখাও সবল-দুর্বল, উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সকলেরই ভিতর সেই অনন্ত আত্মা রহিয়াছেন; সুতরাং সকলেই মহৎ হইতে পারে, সকলেই সাধু হইতে পারে। সকলেরই সমক্ষে উচ্চৈঃস্বরে বলো...উঠ, জাগো-যতদিন না চরম লক্ষ্যে পৌঁছিতেছ, ততদিন নিশ্চিন্ত থাকিও না।'[৪৮] মানুষের রয়েছে সুপ্ত প্রতিভা। দেবত্ব-অনুশীলনের মাধ্যমে জেগে উঠে মানুষ হতে পারে "মহামানব"। এছাড়া বিবেকানন্দ বিশ্বাস করেন যে, 'Renaissance precedes revolution- আর এই "renaissance" নিঃসন্দেহে "Spiritual renaissance"।'[৪৯] ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভারতের ধর্ম বিপ্লবের পরেই রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটে। আধ্যাত্মিক বিপ্লবের প্রভাবেই নর হতে পারে 'নারায়ণ'। তিনি বলেন, আমাদের বড় সমস্যা, আমরা স্থায়ীভাবে কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে পারি না। তাই বিবেকানন্দ, স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করেন। পরবর্তীতে তাঁর প্রভাবে অরবিন্দ ঘোষ, সুভাষ চন্দ্র, মহাত্মা গান্ধী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ জনগণকে রাজনৈতিকভাবে সচেতন এবং সংগঠিত করেন। কারণ সংগঠিত জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে পারে।

জাতীয়তাবাদের জনক

জাতীয় আন্দোলনে বিবেকানন্দের ভূমিকা ঐতিহাসিকের দৃষ্টি এড়ায়নি-ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে তিনি আধুনিক ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক। বিবেকানন্দের কার্যাবলী মূল্যায়ণ করলে উক্তিটির সত্যতা প্রমাণিত হয়। প্রথমতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্বে ভারতে বিভিন্ন জাতি থাকলেও জাতীয়তাবাদের কোনও অস্তিত্ব ছিল না। এ অবস্থায় বিবেকানন্দ বিভিন্ন জাতির মধ্যে ঐক্য গড়ে তুলে প্রকৃত জাতীয়তাবাদের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি কোন একটি জাতির কথা না বলে "ভারত" শব্দটি ব্যবহার করেন এবং জনসংখ্যার হিসেবে কোন জাতির সংখ্যা না বলে পূর্ণ জনসংখ্যার কথা বলনে। দ্বিতীয়তঃ বিবেকানন্দ বলেন, 'ভারতের ভবিষ্যৎ জাতির জন্ম হইবে দরিদ্র ও অস্পৃশ্যের কুটিরে।'[৫০] তৃতীয়তঃ 'জাতীয়তাবাদকে ধর্মের স্তরে উন্নীত করে তিনি ভারতবর্ষে আবেগময় আধ্যাত্মিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিভূমি প্রস্তুত করেন।'[৫১] বিবেকানন্দ মনে করেন কেবলমাত্র অতীত গৌরবের উপর ভিত্তি করেই জাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গঠন করা সম্ভব। উপরোক্ত কারণে বিবেকানন্দ যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বীরসৈনিক প্রস্তুত

বিবেকানন্দের মতো মহৎ প্রাণ, নির্ভীক ভারতের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে দুর্লভ। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিবেকানন্দের অপরিসীম প্রভাব পড়েছে এদেশের রাজনীতিবিদ ও সাধারণ মানুষের উপর। বিবেকানন্দের জীবনের সক্রিয় নেতৃত্বের কাল ১৮৯৭ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত। এই পাঁচটি বছর তিনি সমকালীন ভারতবর্ষের দিশারী হয়ে উঠেন, নতুন জ্ঞান ও কর্মযোগে স্বদেশবাসীকে দীক্ষা দেন। বিবেকানন্দের জীবন এবং বাণী অন্তহীন উৎসরূপে অবসন্ন, আত্মবিস্মৃত, পরাধীন জাতির জীবনে এনে দিয়েছে তেজ আর আলো। তাঁর তিরোধানের আগে সমগ্র দেশকে বিস্ফোরণোন্মুখ একটি বারুদ স্তুপে রূপান্তরিত করেন। কিন্তু উপযুক্ত নেতার অভাবে দেশের রাজনৈতিক জগতে বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি হয়। আর একারণেই পিঞ্জিরাবদ্ধ সিংহের মতো ক্ষোভে দুঃখে রক্তাক্ত হয় সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের হৃদয়। স্বামী বিবেকানন্দ যথার্থই জানতেন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে জয়ী হতে হলে বীর সৈনিক প্রস্তুত করতে হবে। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসেই চেয়েছেন দেশের কাজের জন্য সর্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত এরকম বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, আত্মবিশ্বাসী এবং সর্বোপরি ক্ষাত্রবীর্য এবং ব্রহ্মতেজ সমন্বিত একশটি তাজা যুবক। তিনি চেয়েছেন সর্বস্ব ত্যাগী কিছু বীর সৈনিক গড়ে তুলতে যারা স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে। পরাধীন ভাতবর্ষ পুনরুদ্ধারে বিবেকানন্দের করুণ আবেদন, 'আহা, দেশে গরবী-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদন্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে...তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে! ...আমরা এদের অন্ন

Dhaka University Institutional Repository

বস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল? ...সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না-এ নিশ্চয় জানবি।'[৫২] স্বামী বিবেকানন্দের ভক্ত মহান বীরসৈনিক সুভাষ চন্দ্র। তিনি ছিলেন আমরণ শক্তি সাধক, কৈশোরেই গঙ্গা জলে বিবেকানন্দের Kali the Mother কবিতাটি আবৃত্তি করেন।

'Who dares misery love.
And hug the form of Death.
Dance in Destruction's dance.
To him the Mother Comes.'[৫৩]

সুভাষ চন্দ্রকে কোন শক্তিই রোধ করতে পারেনি। বিবেকানন্দ বীর সৈনিক গঠনের উদ্দেশ্যে বলেন, সংগ্রামের পথ পিচ্ছিল দুঃখ, মৃত্যু এর নিত্যসঙ্গী। আজও তাঁর 'নাচুক তাহাতে শ্যামা' কবিতা ব্রহ্মতেজে উদ্বুদ্ধ করে বীর হৃদয় যুবকগণকে।

'জাগো বীর, ঘুচায়ে স্বপন, শিয়রে শমন, ভয় কি তোমার সাজে?
দুঃখভার, এভব-ঈশ্বর, মন্দির তাহার প্রেত ভূমি চিতা মাঝে ॥
পূজা তাঁর সংগ্রাম অপার, সদা পরাজয় তাহা না ডরাক তোমা।
চূর্ণ হোক স্বার্থ সাধ মান, হৃদয় শ্মশান, নাচুক তাহাতে শ্যামা ॥'[৫৪]

এভাবেই বিবেকানন্দ লেখনির মাধ্যমে প্রস্তুত করেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর সৈনিক। বিবেকানন্দের প্রভাবে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু যে কত বড় বীরসৈনিকের যোগ্যতা অর্জন করেন তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় শত্রুসেনার দৃষ্টি উপেক্ষা করে সুভাষ চন্দ্র ভয়ঙ্কর বিপদের ঝুঁকি নিয়ে জার্মান থেকে জাপান এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করেন। এমন ঘটনা সমগ্র পৃথিবীর মুক্তির ইতিহাসে বিরল। 'সমগ্র ইংলিশ চ্যানেল এবং আটলান্টিকের সমস্ত নাব্য অঞ্চল ছিল মাইন পরিপূর্ণ, শত্রুপক্ষের রেডার ছিল অতিমাত্রায় সক্রিয়, অধিকন্তু ছিল সতর্ক প্রহরায় নিযুক্ত জবরদস্ত বৃটিশ নৌ এবং বিমান বাহিনী। এই বিপদ সঙ্কুল পথে আটলান্টিক অতিক্রম করে তাঁকে যেতে হবে মাদাগাস্কারের চারশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে একটা জায়গায়। সেখানে উঠতে হবে অপেক্ষারত একটা জাপানী সাবমেরিনে টোকিওর উদ্দেশ্যে। প্রহরারত যুদ্ধজাহাজ অথবা সামরিক বিমানের চোখে পড়লে যে কোন মুহূর্তেই সব শেষ হয়ে যাবে। প্রত্যেক মুহূর্ত উত্তেজনার, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর সম্ভাবনা। এই প্রসঙ্গে সুভাষবন্ধু চারুচন্দ্র বলেছেন, জার্মান সরকারের পক্ষ থেকে সুভাষচন্দ্রকে তাঁর ঐ পরিকল্পনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বলা হয়েছিল: "The chance of success is only five percent". কিন্তু সুভাষচন্দ্র দৃপ্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছিলেন, "Even if the chance had been one percent. I must go." সুভাষ চন্দ্রের এই চরম দুঃসাহসিক চরিত্রের মূলে ছিল তাঁর উপর স্বামী বিবেকানন্দের প্রচন্ড প্রভাব। সুভাষ চন্দ্রের ঐ উক্তি প্রসঙ্গে গভীর প্রত্যয়ের সঙ্গে চারুচন্দ্র বলেছেন: একথা কে বলতে পারে? একমাত্র বিবেকানন্দ যাকে অনুপ্রাণিত করেন সে ছাড়া আর কেউ বলতে পারে না।"[৫৫] শুধু সুভাষ চন্দ্র নয়, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, মহাত্মা গান্ধী এবং আরো অনেকেই স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারা প্রভাবিত হন, যাঁদের নেতৃত্বের কথা ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে অনন্তকাল।

স্বাধীনতা সংগ্রাম

বিবেকানন্দের দেশপ্রেম, স্বদেশ চেতনা ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতের মুক্তি সংগ্রামে পরিচালিত হয়েছিল-কংগ্রেসী আন্দোলন। কংগ্রেস সত্যই বিবেকানন্দের আদর্শেই জনজাগরণ, জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, সেবা, অস্পৃশ্যতা-দূরীকরণ প্রভৃতির মাধ্যমে জাতি গঠনের কাজ করে। গান্ধীজী এ বিষেয়ে তার উপর বিবেকানন্দের প্রভাবের কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করেন। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে নরমপন্থীদের বিরুদ্ধে ভিক্ষানীতি-বর্জন ও আত্মশক্তির বলে স্বাধীকার লাভের জন্য চরমপন্থী দলের (extremist) উদ্ভব হয়। এতে বিবেকানন্দের মতাদর্শ ও কর্মপন্থার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। সত্যিই সেদিন ভারতবর্ষ জেগেছে বিবেকানন্দের প্রেরণায়। ভারতের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস নতুন পথে ধাবিত হয়। লক্ষ লক্ষ যুবক জাতীয়তার যুপকাষ্ঠে আত্মোৎসর্গ করতে এগিয়ে আসে। তাঁর দেহ ত্যাগের পরেই সংঘটিত হয় বাংলার স্বদেশীয় আন্দোলন, বিপ্লববাদীদের অভ্যুদয় এবং নতুন রাজনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে তিলকও গান্ধীর আবির্ভাব। ১৯৩০ খৃস্টাব্দে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত ওয়েন্ডেল টমাস লিখিত "Hinduism Invades America" নামক পুস্তকে বলা হয়েছে যে বিবেকানন্দ প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে ঘটেছে

Dhaka University Institutional Repository

'Anarchist movement in Bengal and the more recent drives for "Civil Disobedience" whcih Manmohandas Karamchand Gandhi, the saintly politician, has been organizing on a nation-wide scale.'[৫৬] জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য প্রয়োজন যে মানসিকতা, প্রস্তুতি ও জাতীয় চেতনার, এই মহত্তর জিনিসটিই যোগান বিবেকানন্দ। জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব সম্পর্কে সরকারও সতর্ক ছিলেন। 'বিপ্লবীদের আস্তানা খানা তল্লাস করতে গিয়ে পুলিশ বিবেকানন্দের বই পত্র পেত। বিবেকানন্দের উপরেও পুলিশী দৃষ্টি ছিল এবং তাঁর চিঠিপত্রও খোলা হতো।'[৫৭] বেলুড় মঠও পুলিসী সন্দেহ থেকে রক্ষা পায়নি।'[৫৮] বাংলার বিপ্লবীদের নিকট 'Swami Vivekananda appeared...to be more a political prophet than a religious teacher.'[৫৯] বিবেকানন্দ ধর্মগুরুর চেয়ে প্রধান রাজনৈতিক গুরু ছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন তত্ত্বে'র অনুকরণে বিবেকানন্দের আদর্শ ও অগ্নিময়বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিবেকানন্দের জীবন কালেই বাংলার প্রথম বিপ্লবী কেন্দ্র "অনুশীলন সমিতি" ১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে মার্চ, দোল পূর্ণিমা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র বসুর মতে, 'স্বামীজীর স্বপ্ন ছিল জাগ্রত, সমুন্নত, একযোগে মুক্ত স্বাধীন ভারত।'[৬০] ভগিনী নিবেদিতা অনুশীলন সমিতি'তে যাওয়া আসা করেন এবং স্বামী সারদানন্দ এখানে গীতা পড়ান। স্বামীজীর সম্মতির জন্যই এটা সম্ভব হয়। সতীশ চন্দ্রের বিবৃতি থেকে জানা যায়, 'অনুশীলন সমিতির, প্রতিষ্ঠার এক সপ্তাহ পরে তিনি জানতে পারেন যে বারোদা থেকে একটি দল (অরবিন্দ প্রেরিত যতীন্দ্রনাথ) কলকাতায় এসেছে। পরে দুই দল ব্যারিস্টার পি. মিত্রের নেতৃত্বের এক হয়ে যায়। অরবিন্দ ঘোষ তখন পশ্চিম ভারতে ঠাকুর সাহেব পরিচালিত গুপ্ত সমিতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত-ইতিমধ্যেই তিনি সমিতির পুনা শাখার সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন এবং বিপ্লব সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর কয়েকজন উচ্চপদস্থ অফিসারের সঙ্গেও গোপন আলোচনা করেছেন।'[৬১] এভাবেই স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রস্তুতি শুরু হয়।

'প্রখ্যাত বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ, হেমচন্দ্র ঘোষ, যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, হরিকুমার চক্রবর্তী, মহানায়ক সুভাষচন্দ্র তাঁদের ব্যক্তিগত জীবন ও বিপ্লব-আন্দোলনের উপর স্বামীজীর প্রভাবের কথা অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেছেন।'[৬২] হেমচন্দ্রের উদ্বৃতিতে জানা যায়, ' বিবেকানন্দ স্বাধীনতা সম্পর্কে বলেছিলেন, "পরাধীন জাতির ধর্ম নেই। তাদের একমাত্র ধর্ম মানুষের শক্তি লাভ করে পরস্বাপহারীকে তাড়িয়ে দেওয়া।" সেদিনই আমি এবং আমার কতিপয় বন্ধু বিপ্লব ধর্মে যথার্থ দীক্ষিত হয়েছিলাম।'[৬৩] বিবেকানন্দ সম্পর্কে অরবিন্দ ঘোষ বলেন, '...সন্ন্যাসী হয়েও তিনি দেশের স্বাধীনতার কথা অবিরত চিন্তা করতেন। এমনও বলা হয় যে, তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের কথাও ভাবতেন।...প্রত্যক্ষভাবে যে কাজ নিজে করেননি, তাঁর শিষ্যাকে তিনি সে কাজের ভার দিয়ে যান।'[৬৪] সমাধির কিছু দিন পূর্বে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক কামাখ্যা মিত্রকে বিবেকানন্দ বলেন, 'What India needs to-day is bomb'.[৬৫] বাংলাদেশে এর পরেই অরবিন্দ ও বারীন্দ্র কুমারের নেতৃত্বে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে বোমার আবির্ভাব হয়। বিপ্লব-আন্দোলন চিরদিনই লোক চক্ষুর আড়ালে চলে। বিবেকানন্দ যে বিপ্লবের জ্বলন্ত প্রতিমূর্তি ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিবেকানন্দ জীবিত থাকলে হয়তো ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে স্বদেশী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিতেন। খাপ খোলা তলোয়ার বিবেকানন্দের বিপ্লবী চরিত্র শ্রী মায়েরও জানা ছিল। তাই তিনি স্বদেশী আন্দোলনের সময় বলেন, 'ও বাবা, নরেন আমার আজ থাকলে কোম্পানি কি আজ তাকে ছেড়ে দিত? জেলে পুরে রাখত।'[৬৬] কারণ বিবেকানন্দ ছিলেন বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের প্রধান অগ্রনায়ক।

সমাজতন্ত্র

সত্যদ্রষ্টা ঋষি বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শনের মধ্য বিন্দু 'সমাজতন্ত্র'। তিনি চেয়েছেন স্বাধীনতা অর্জনের পর ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। এ শাসন ব্যবস্থায় মানুষ ফিরে পাবে তাদের সমানাধিকার, প্রতিটি মানুষ পাবে তার প্রতিভা বিকাশের সমান সুযোগ। দারিদ্র্য, আনাহার, রোগ-ব্যাধি থেকে মুক্ত হবে স্বাধীন ভারতবর্ষের মানুষ। বিবেকানন্দের বিশ্বাস সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষের দীর্ঘ দিনের আশা-আকাঙ্খা পূরণ হবে। ১৮৯৭ সালে বিবেকানন্দ বলেন, 'আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে'। ঠিক পঞ্চাশ বছরের মাথায় ১৯৪৭ সালে বিবেকানন্দের স্বাধীনতার মহৎ বাণী সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এতে বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তার প্রথম ধাপ বাস্তবায়ন হয়েছে। এখন ভারতের শোষিত বঞ্চিত, সর্বহারা মানুষ অপেক্ষা করছে বিবেকানন্দের রাষ্ট্রচিন্তার দ্বিতীয় ধাপ 'সমাজতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার জন্য। বিবেকানন্দ অকপটে স্বীকার করেন ভারতবর্ষে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। তিনি বেদান্তের ভিত্তিতেই স্যোসালিজমের সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিবেকানন্দের স্যোসালিজমে হবে ট্রাডিশন ও আধুনিকতার সমন্বয়। ভারতবর্ষে বিভিন্ন জাতি,

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রদায়, গোষ্ঠী ও ধর্ম সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতির স্থান রয়েছে স্যোসালিজমে। সেখানে সকলেই তাদের চিরায়ত ঐতিহ্য ও স্বাধীনতা নিয়ে বাঁচতে পারবে। বিবেকানন্দ যুক্তি পরিপন্থি ও বিজ্ঞান বিরোধী এমন একটি কথাও বলেননি, বরং তাঁর চিন্তার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর অপূর্ব যুক্তিবত্তা ও ঐকান্তিক বৈজ্ঞানিকতা। তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণের উপর ভিত্তি করে স্বতন্ত্র ও মৌলিক সমাজতন্ত্রবাদ রচনা করেন। জীবব্রহ্মবাদই বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তি। বিবেকানন্দ সামগ্রিক সমাজ চিন্তায় বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অনুসন্ধান করার প্রয়াস পান।

মানব জীবনের উদ্দেশ্য নিরূপণের উপর সমাজ জীবন নির্ভরশীল। বিবেকানন্দের অভিমত, 'আমরা সেই অনন্ত পুরুষ, সেই আত্মা। আমরা জল স্বরূপ, আর এই জল সমুদ্র হইতে উৎপন্ন, উহার সত্তা সমুদ্রের উপর নির্ভর করিতেছে, বাস্তবিকই উহা সমুদ্র-সমুদ্রের অংশ নহে, সমুদয় সমুদ্র-স্বরূপ।'[৬৭] জল যেমন সমুদ্রের বাইরে নদী-খাল-বিলে এসে ভুলে যায় যে সে সমুদ্র, তেমনি মানুষ মায়া দ্বারা আবরিত হয়ে ভুলে যায় আপন স্বরূপ। অদ্বৈত বেদান্ত বলে আত্মার অনন্তজ্ঞান-শক্তি-আনন্দ আমাদের ভিতরেই আছে, এসব গুণ বাইরে থেকে উপার্জন করতে হবে না; অনুশীলন দ্বারা এ গুণগুলি প্রকাশ করতে হবে মাত্র। বিভিন্ন প্রণালীর মধ্য দিয়ে প্রতি মুহূর্তে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে আত্মা নানারূপ শক্তিবিকাশ করছে। এই ক্রমবিকাশ তত্ত্ব বিবেকানন্দের প্রত্যক্ষ অনুভূত সত্য। তাঁর মতে আমাদের বাস্তব জীবন হবে এই সত্য রূপায়নের ভিত্তি। 'অদ্বৈত বেদান্তের কর্মায়ত বা ফলিত দিক মানুষের মধ্যে বন্দী সুপ্ত শক্তির জাগরণ, তার সত্তার জাগরণ ও পুনর্গঠন। এরূপ মানুষ প্রকৃতির দাস নয়, প্রকৃতি তার দাস। সেই শক্তিমান মানুষই নিত্য নূতন সৃষ্টি করতে পারে, সভ্যতাকে অর্থে, সম্পদে, শিল্পকলায় সর্বতোভাবে উন্নত করতে পারে, নিজের সুখ-সম্পদ লাভ করতে পারে।'[৬৮] ফলিত বেদান্ত দর্শনের শিক্ষা হলো, 'মানুষের মধ্যেই যদি সর্বব্যাপী অনন্ত চৈতন্য থেকে থাকে, তা হ'লে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই সেই একত্বের অবস্থান স্বীকার করতে হয় আমাদের ধর্মে, সমাজ গঠন, নিয়ম-শৃঙ্খলা আইন রচনায়।'[৬৯]

মানব দেহ ভগবানের মন্দির হলে, মানব সেবা দ্বারাই ভগবানের পূজা করতে হয়। মানব সেবাই শ্রেষ্ঠ ধর্মাচরণ- তাই যদি সত্য হয় তাহলে পৃথিবীর শোষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত মানুষ ও অত্যাচারিত শোষিত অনুন্নত জাতি- এদের মুক্তি ও উন্নতি সাধনই বেদান্তবাদীর কর্তব্য। তাই বিবেকানন্দের সমাজ গঠনে এই মহান ভাবধারা। 'উচ্চ শ্রেণীর অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা, শিক্ষিতদের অপেক্ষা অশিক্ষিতরা শক্তিশালীর অপেক্ষা দুর্বলেরা অধিকতর পরিমাণে চাহিতেছে-, আমাদের এই পদদলিত নিপীড়িত জাতি...চাহিতেছে।'[৭০] যে সব কোটি কোটি মানুষ আজ অনাহারে আছে, যুগ যুগ ধরে অর্ধাহারে আছে, যাদের জীবন ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত অন্ধকারে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, যাদের যুগ যুগ ধরে শোনানো হচ্ছে– তোমরা কেউ নও, কিছু নও, মানুষ নও, যাদের শতাব্দীর পর শতাব্দী এমন আতঙ্কের মধ্যে রাখা হয়েছে যে তারা পশুতে পরিণত হয়েছে। এমনকি যারা অত্যাচারীদের চিনতে পর্যন্ত পারছে না- তাদের অধিকার ফিরে পাবার ও উন্নত হবার উপায় হলো বিবেকানন্দের অদ্বৈতবেদান্ত ভিত্তিক সমাজতন্ত্র। মানব জীবনের যে আধ্যাত্মিক প্রবণতা স্বাভাবিক তাকে স্বীকৃতি দিয়ে মানুষের সব স্বার্থ ও উদ্দেশ্যকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। তাই বিবেকানন্দ সমাজ-সংস্কৃতির রূপান্তর সাধন সম্পর্কে বলেন, 'I want root and branch reform--- "আমূল রূপান্তর সাধনই আমি চাই"।'[৭১] আমরা এক অভিনব সাম্যবাদী সমাজ ও রাষ্ট্র পাব, যেখানে দরিদ্র চণ্ডাল মূর্খ পতিত সকলেই একই অধিকার ভোগ করবে। বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র মার্ক্স ও অন্যান্য সমাজতন্ত্রবাদীদের চিন্তাধারা থেকে ভিন্ন এক নতুন সমাজ ব্যবস্থা। 'বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করলেই সে সাম্যতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে না। সে রাষ্ট্রে সমস্ত কার্যপদ্ধতি, সে সমাজের সমগ্র জীবন মানব-জীবনের দেবত্ব ও অধ্যাত্মিকতা উন্মেষের সহায় হওয়া চাই। ফলে শুধু রাষ্ট্র বিপ্লব নয়, আর্থিক বিপ্লব নয়, মানুষের সমগ্র জীবনজোড়া এক আমূল পরিবর্তনের তিনি রূপ দিয়েছেন।'[৭২] বিবেকানন্দ মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সমাজের আমূল সংস্কার করতে চেয়েছেন।

ভারতবর্ষের শিক্ষা, প্রগতির কেন্দ্রবিন্দু 'ব্যক্তি মানুষ' এবং প্রগতির লক্ষ্য সৃষ্টি শক্তির সঙ্গে খাপ খেয়ে চলা। ব্যক্তি মানুষের রয়েছে মহৎ সম্ভাবনা। এই সম্ভাবনার পূর্ণ প্রকাশ ঘটলে মানুষ হয়ে উঠবে পুরুষোত্তম। বিবেকানন্দ ব্যক্তি মানুষের মুক্তি লাভের উদ্দেশ্যেই প্রগতিশীল সমাজ গঠনের চেষ্টা চালান। বিবেকানন্দ লক্ষ্য করেন জাতি-গোষ্ঠী সম্প্রদায়, প্রভৃতির বিভিন্ন অনাচার, নির্যাতন ও কুসংস্কারে পূর্ণ সমাজ, সেখানে ব্যক্তি মুক্তির পথ রুদ্ধ। তাই মুক্তির জন্য আমাদের কর্তব্য স্যোসালিস্ট ধর্মান্ধতার ও অমানবিকতার পিচ্ছিল পথ পরিহার করে মৌলিক স্যোসালিষ্ট উদ্দেশ্য খুঁজে বের করা। বিবেকানন্দ স্যোসালিষ্ট বলেই সমর্থন করেন, 'A board human movement for the bottom dog'.[৭৩] স্বামী বিবেকানন্দ সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম আর্থিক সংকটকে তুলে ধরেন। আর তিনি এই

Dhaka University Institutional Repository

অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য এক ধরনের সমাজতন্ত্রের কথা বলন। তাঁর মতে সমাজের অন্যান্য সমস্যাগুলোর মধ্যে রয়েছে অজ্ঞানতা, অশিক্ষা, সংকীর্ণতা নিম্নমানের জীবনযাত্রা প্রভৃতি। বিবেকানন্দের মতে, সমাজে মানুষের প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ করা হলে মানুষ তার চাহিদাগুলো মিটাতে পারবে। ফলে জীবনযাত্রার মান উন্নত হবে। আর এমন সমাজের মানুষের পক্ষেই ব্রহ্মের জ্ঞান অর্জন করে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। যেখানে মানুষের খাদ্য নেই, সেখানে ধর্ম বা ঈশ্বরের কথা গুরুত্ব পাবে কেমন করে। তাই তিনি বলেন, "At first bread and then religion." স্বামী বিবেকানন্দ গণতন্ত্রের ত্রুটি তুলে ধরে বলেন, 'ও তোমার "পার্লামেন্ট" দেখলুম, "সেনেট" দেখলুম ভোট ব্যালট মেজরিটি সব দেখলুম, রামচন্দ্র! ...সব দেশেই ঐ এক কথা। শক্তিমান পুরুষরা যেদিকে ইচ্ছে সমাজকে চালাচ্ছে, বাকিগুলো ভেড়ার দল।...রাজনীতির নামে যে চোরের দল দেশের লোকের রক্ত চুষে সমস্ত ইউরোপীয় দেশে খাচ্ছে, মোটা তাজা হচ্ছে...সে ঘুষের ধুম, সে দিনে ডাকাতি, যা পাশ্চাত্য দেশে হয়, রামচন্দ্র! যদি ভেতরের কথা দেখতে তো মানুষের উপর হতাশ হয়ে যেতে।'[৭৪] জনগণের সাথে প্রতারণা করার ঘৃণ্য শাসন ব্যবস্থা শান্তি দিতে পরে না। তাই স্বামীজী সমাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যে বলেন 'সমষ্টির জীবনে ব্যাষ্টির জীবন, সমষ্টির সুখে ব্যাষ্টির সুখ, সমষ্টি ছাড়িয়া ব্যাষ্টির অস্তিত্বই অসম্ভব, এ অনন্ত সত্য-জগতের মূল ভিত্তি। অনন্ত সমষ্টির দিকে সহানুভূতিযোগে তাহার সুখ, দুঃখ ভোগ করিয়া শনৈঃ অগ্রসর হওয়াই ব্যাষ্টির একমাত্র কর্তব্য।'[৭৫] পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মীতার ভিত্তিতেই সমাজে শান্তি ও প্রগতি সৃষ্টি হয়।

আদর্শ রাষ্ট্র প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বলেন, 'যদি এমন একটি রাষ্ট্র গঠন করতে পারা যায়, যাতে ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়ের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্প্রসারণ-শক্তি এবং শূদ্রের সাম্যাদর্শ-এইসব গুলিই ঠিক ঠিক বজায় থাকবে অথচ এদের দোষগুলি থাকবে না, তাহলে তা একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।'[৭৬] এই রাষ্ট্র মানুষের সকল চাহিদা পূরণ করবে। 'We talk foolishly against material civilization. The grapes are sour material civilization, nay, even luxury is necessary to create work for the poor Bread! Bread! I do not believe in a Good who can not give me bread here, giving me eternal bliss in heaven.'[৭৭]

সমাজতন্ত্রের মূলনীতি

বিভিন্ন সমাজতন্ত্রের ধারা পর্যবেক্ষণ ও বিচার-বিশ্লেষণ করে যে মূলনীতিগুলো লক্ষ্য করা যায়, তা স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রদর্শনেও লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে সমাজতন্ত্রের মূলনীতিগুলো উল্লেখ করা হলো।

১। ধনী শ্রেণীর শোষণ থেকে দরিদ্র শ্রেণীকে মুক্ত করা।
২। সকল মানুষের কর্মসংস্থান করা।
৩। প্রত্যেক মানুষকে মর্যাদার সাথে বাঁচতে দেয়া।
৪। উঁচু নীচু কোন শ্রেণী বৈষম্য না করা।
৫। মানুষের প্রতিভা বিকাশ ও স্বাধীনতা লাভের সুযোগ দেয়া।

'সমগ্র অদ্বৈত বেদান্ত তত্ত্বকে বিবেকানন্দ দুটি সরলীকৃত মূলসূত্রে পরিণত করেছেন ঃ
১। মানুষের দেবত্ব:
২। মানব জীবনের অনিবার্য আধ্যাত্মিক পরিণতি।

বেদান্তের এই দুটি সূত্র যদি সত্য হয়, তাহলে তাকে বাস্তব হতেই হবে। এ দুটি সূত্র হতে সঙ্গে সঙ্গেই আমরা আরও দুটি সূত্র পাই যা বাস্তব রূপায়ণের পক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যময়।

এই দুটি সূত্র ঃ
১। মানুষের সব সমাজ, সব রাষ্ট্র, সব ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের স্বীকৃতির উপর;
২। মানুষের সব স্বার্থ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে মানুষের অনিবার্য আধ্যাত্মিক পরিণতির প্রয়োজনে।'[৭৮]
এই শেষের সূত্র দুটির উপর বিবেকানন্দ রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন করনে।

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকানন্দ ও মার্ক্সের সমাজতন্ত্র

সোস্যালিজম নিয়ে মতভেদ রয়েছে। গোঁড়া মার্ক্সবাদীগণ মনে করেন Marxism- এর মতবাদই হল সোস্যালিজম। কিন্তু স্থান, কাল, পাত্র ভেদে মার্ক্সবাদের ব্যাখ্যা ভিন্ন হয়েছে। ফলে সোস্যালিজমের রূপ পরিবর্তন হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ চীন ও কিউবার সমাজতন্ত্রের কথা উল্লেখ করা যায়। এ দুটি রাষ্ট্রের সমাজতন্ত্র সোভিয়েত রাশিয়ার সমাজতন্ত্র থেকে ভিন্ন। বিবেকানন্দ মার্ক্সের অনেক আগেই অর্থাৎ ১৯০২ সালের আগেই সোস্যালিজমের কথা বলেন। এই গৈরিক সন্ন্যাসী প্রথম বলেন, 'I am a socialist'. বিবেকানন্দ প্রজাসাধারণের উপর বিত্তবানদের শোষণের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন, 'এ শোষণ দানবিক ও পাশবিক।'[৭৯] তিনি বলেন কারও কোন বিশেষ অধিকার নেই। প্রত্যেক ব্যক্তির উন্নতি করার সমান সুবিধা থাকবে। বিবেকানন্দ বলেন, 'সামাজিক উন্নয়নের বাণী ছড়িয় দাও, সাম্যের বাণী প্রচার কর'।

স্বামী বিবেকানন্দ ও কার্ল মার্ক্স এ'দুই জ্ঞানপুরুষ বিশ্বের সমগ্র ইতিহাস মন্থন করে মানুষের মুক্তির সোপান রচনা করেন, যা আজও অগণিত মানুষের মনে আশা জাগায়। তাঁরা উপলব্ধি করেন, ব্যক্তি মানুষের বিকাশের জন্য প্রয়োজন স্বাধীন নতুন পৃথিবী। এজন্য প্রয়োজন উচ্চ দর্শনিক তত্ত্বগুলির বাস্তব প্রয়োগ। দর্শন তখন হয়ে ওঠে 'Programme of action.' একদিকে মার্ক্স বলেন, 'The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point however is to change it. অন্যদিকে স্বামীজীও আমাদের চোখ ফেরালেন Practical Vedanta'র দিকে। বলেন তিনি, The abstract Advaita must become living-poetic-in every-day life'[৮০] মার্ক্স ও বিবেকানন্দের মতবাদের প্রধান পার্থক্য হল মার্ক্স নিরীশ্বরবাদী এবং সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক, অপরদিকে বিবেকানন্দ এক ঈশ্বরবাদী এবং প্রত্যক্ষ বিপ্লবের বিপক্ষে। মার্ক্স যাদের প্রলেতারিয়েত বলেন, বিবেকানন্দ তাদেরই শূদ্র নামে অভিহিত করেন। বর্তমান যুগ শূদ্র অভ্যুত্থানের যুগ। তাঁরা বলেন, অর্থনৈতিক কারণেই কৃষক-শ্রমিকদের দুরবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উদ্বৃত্ত ভোগ করার মাধ্যমেই যে মালিকেরা শোষণ চালায়, সে বিষয়টি তাঁরা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়েছেন। বিবেকানন্দের মতে, ধনী শ্রেণী কর্তৃক দরিদ্র কৃষক-শ্রমিক শ্রেণী শোষিত হওয়ার কারণ শিক্ষার অভাব, বহির্জগৎ সম্বন্ধে অজ্ঞতা, নিম্নমানের জীবনযাত্রা, শ্রমের উপযুক্ত দাম না পাওয়া, একতা ও উচ্চ আদর্শের অভাব প্রভৃতি।

শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির উপায় হল শিক্ষার সাহায্যে শ্রমিক শ্রেণীকে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন করে তোলা, জীবন যাত্রার মানোন্নয়ন, একাধিক পেশায় সুশিক্ষিত করা এবং প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে পারিশ্রমিক প্রদান। মুক্তির সর্বশেষ উপায় শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা। যেখানে ধনী দরিদ্র উচ্চ নীচ সকলে সমান অধিকার পাবে, প্রত্যেকে তার ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পাবে। লেনিন সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের অধিকার সম্পর্কে বলেন, 'From each according to his capacity and to each according to his need'. বিবেকানন্দ শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি নির্মম শোষণের কথা উল্লেখ করেন। 'মেলা কলকব্জা মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপাপত্তি করে জড়পিন্ড তৈয়ার করে। খারখানায় লোকগুলো দিনের পর দিন, রাতের পর রাত, বছরের পর বছর সেই একঘেয়ে কাজই কচ্চে-এক দলে এক একটা জিনিসের এক এক টুকরোই গড়ছে। পিনের মাথাই গড়ছে, সুতোর জোড়াই দিচ্চে, তাঁতের সঙ্গে এগু-পেছুই কচ্চে-আজন্ম। ফল, ঐ কাজটিও খোয়ানো, আর তার মরণ-খেতেই পায় না। জড়ের মতো একঘেয়ে কাজ করতে করতে জড়বৎ হয়ে যায়।'[৮১] বিবেকানন্দ এখানে আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থায় শ্রমিকের পক্ষে ক্ষতিকর দুটি মূল ত্রুটি তুলে ধরেন। প্রথমত, উৎপাদনের একটি সামান্য ভগ্নাংশ তৈরী করায় শ্রমিকের বর্তমান কাজ চলে গেলে বেকার হবে, কারণ সে অন্য অংশ তৈরী করতে পারবে না। দ্বিতীয়ত, এমন একটি আংশিক কাজ সম্পন্ন করতে হয় বলে শ্রমিকের সৃজনীশক্তি লোপ পায়, বুদ্ধি জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়। ফলে সে যান্ত্রিক হয়ে যায়।

মার্ক্স বলেন, পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক উৎপাদন প্রক্রিয়া থেকে মানুষ বিচ্যুত হয়, অন্য দিকে সে উৎপন্ন দ্রব্য থেকেও বিচ্যুত হয়। মানুষের আত্ম-আবিষ্কারের পথ একটিই। যে ব্যক্তিগত মালিকানার ফলে মানুষের আত্মচ্যুতি ঘটে, সেই মালিকানা পদ্ধতির নিষেধ করতে হবে। তাতেই মানুষের মুক্তি। উন্নত মানবসমাজ সম্পর্কে মার্ক্স বলেন, মানুষের পক্ষে দিব্য জীবন লাভ সম্ভব, মানুষ দেবতা হয়ে উঠবে অনুকূল পরিবেশে। সেই অনুকূল পরিবেশ হল পুনর্বিন্যস্ত শোষণহীন সমাজ। 'As Engles put it. German Philosopher discovery philosophy's discovery that "God is man" called for a rearrangement of the world that would make it possible for

Dhaka University Institutional Repository

নায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই ভদ্র জাতদের কল্যাণ।...তা না হলে কিন্তু তোদের (ভদ্র জাতিদের) কল্যাণ নেই। তোরা চিরকাল যা করে আসছিস-ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে সব ধ্বংস হয়ে যাবি! এই Mass (জনসাধারণ) যখন জেগে উঠবে, আর তাদের ওপর তোদের (ভদ্র লোকদের) অত্যাচার বুঝতে পারবে-তখন তাদের ফুৎকারে তোরা কোথায় উড়ে যাবি! তারাই তোদের ভেতর Civilization (সভ্যতা) এনে দিয়েছে; তারাই আবার তখন সব ভেঙ্গে দেবে।'[৮৮] বিবেকানন্দ যুব সমাজকে মহৎ কাজের প্রেরণা দানের উদ্দেশ্যে বলেন 'হতাশ হবেন না।। জাগ্রত হন, উঠে দাঁড়ান, লক্ষ্যে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত থামবেন না।'[৮৯]

কেউ হীন নয়

ভারতীয় দর্শন ও ধর্মে স্বীকৃত যে, সব মানুষই শেষ পর্যন্ত মুক্ত হবে। কাজেই সব মানুষই ক্ষমতার (Potentiality) দিক থেকে সমান। অতীত কর্মফলের জন্য কেউ উচ্চ বর্ণে, কেউ নিম্ন বর্ণে জন্মগ্রহণ করে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে পার্থক্য ঘটে। বিবেকানন্দের মতে, ধর্ম ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক কোন বিরোধিতা নেই, বরং ধর্ম সমাজতন্ত্রের মূল উদ্দেশ্য সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিশেষ সুবিধা চূর্ণ করা। প্রকৃত ধর্মের মূল বিষয়, কেউ হীন নয়, ছোট নয়, তুচ্ছ নয়, সকলেরই বড় হবার এবং মহৎ হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। বিবেকানন্দ এই তত্ত্বের ভিত্তিতে বলেন, 'অজ্ঞ অশক্ত নরনারী সকলেই শোন, সকলেই সেই অজর অমর অনন্ত শাশ্বত আত্মা, সকলেরই বড় হবার অনন্ত সম্ভাবনা আছে। অতএব ওঠ,, দৌর্বল্যের এ জড়তা হতে জাগো...তোমার মধ্যে যে ভগবান আছেন তাঁকে অস্বীকার কারো না।'[৯০] কেউ হীন নয়, সকলেই শ্রদ্ধার পাত্র। তাই বিবেকানন্দ বলেন, '...ভারতের চিরপদদলিত শ্রমজীবি।- তোমাকে প্রণাম করি'। বিবেকানন্দের চোখে শোষণ বা নিপীড়নের চারটি রূপ: ১। জ্ঞান বলে বা বুদ্ধি বলে বলীয়ানের অত্যাচার, ২। অস্ত্রশক্তিতে বলীয়ানের অত্যাচার, ৩। অর্থশক্তিতে সম্পদশালীর অত্যাচার এবং ৪। কায়িক শ্রমের শক্তিতে অত্যাচার।

বিবেকানন্দ ইতিহাসের আলোকে ব্যাখ্যা করে বলেন, 'মানব সমাজ ক্রমান্বয়ে চারটি বর্ণ দ্বারা শাসিত হয়-পুরোহিত (ব্রাহ্মণ), সৈনিক (ক্ষত্রিয়), ব্যবসায়ী (বৈশ্য) এবং মজুর (শূদ্র)। প্রত্যেকটির শাসনকালে রাষ্ট্রে দোষগুণ উভয়ই বর্তমান'। পুরোহিত (ব্রাহ্মণ) শাসন চক্রে বংশানুক্রমে ঘোর সঙ্কীর্ণতা রাজত্ব করে। তারা নিজেরা শিক্ষা গ্রহণ করে মনের উৎকর্ষ সাধন করে রাজত্ব করে, অন্যদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে। ক্ষত্রিয় শাসন চরম নিষ্ঠুর ও অত্যাচার পূর্ণ। বৈশ্য শাসন মানুষের শরীর নিষ্পেষণ ও রক্ত শোষণ করে এবং সভ্যতা ধ্বংস করে। শূদ্র শাসনে সংস্কৃতির অবনতি ঘটে, সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা কমে যায়। বিপ্লবের মাধ্যমে সকল দ্বন্দ্বের অবসান ঘটবে।

বিবেকানন্দের মতে বিপ্লব

১. বন্দুকের নল কখনও শক্তির উৎস হতে পারে না। শক্তির উৎস মানুষ। তাই তিনি বিপ্লবীদের চরিত্র ও মনুষ্যত্বের উপর জোর দেন।
২. স্বামী বিবেকানন্দ কোন দল বা পার্টি কেন্দ্রিক নন, তাঁর মতে কোটি কোটি সাধারণ মানুষই শক্তির উৎস।
৩. বিপ্লব সকল শ্রেণীর দায়িত্ব।
৪. সমাজের তরুণ সম্প্রদায়ই নেতৃত্ব দেবে।
৫. গণচেতনার জন্য সুদৃঢ় জাতীয়তাবাদ ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চারই বিপ্লবীদের প্রধান কর্তব্য।
৬. গণচেতনা জাগিয়ে তোলাই বিপ্লব অভিযান।
৭. বিপ্লবের সময় ধ্বংস নয় গঠনমূলক কাজ করতে হবে।
৮. শ্রেণী-সংগ্রাম সম্ভাব্য, অনিবার্য নয়।

কেউ দাবাতে পারবে না

সর্বহারা শূদ্র শ্রেণীকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ইতিহাস তাদের শোষণ-নির্যাতনের প্রতিশোধ নেবেই। শূদ্রশ্রেণীকে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বলেন, '...পেছনে চেওনা-অতিপ্রিয় আত্মীয় স্বজন কাঁদুক; পেছনে চেওনা, সামনে এগিয়ে যাও।'[৯১] শূদ্রশ্রেণী কখনও পিছপা হবে না। কারণ তারা কোন ক্রমেই দুর্বল নয়, তেজে, বীর্যে তারা তো ব্রহ্মেরই অংশ। কারণ ব্রহ্ম তার অন্তরাত্মা, বুদ্ধিতে তাঁরই জ্যোতি এবং বাহুতে তাঁরই শক্তি। অতএব হতাশ ও দুর্বল হওয়ার কোন কারণ নেই। নিজ আত্মার অনন্ত শক্তিতে বিশ্বাসী হলে, সে বিশ্বাস তাকে জাগ্রত করবেই। বিবেকানন্দ বলেন, উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত-ওঠ জাগো, আত্মার অনন্ত শক্তি মত্তায় বিশ্বাসী হও; সে শক্তি তাহলে জাগ্রত হবেই হবে'।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী বিবেকানন্দ বুর্জোয়াদের অপছন্দ করেন। কারণ, তারা অর্থলোভী, স্বার্থপর এবং বিশ্ব প্রগতির পরিপন্থি। অপর দিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ চাষী, মুচি-মেথর এই অসহায় দরিদ্র মানুষগুলো যুগ যুগ ধরে পৃথিবীর সব মানুষের জন্য উৎপাদন করে আসছে। দরিদ্র মানুষগুলো সবার জন্য পোশাক, ঘর-বাড়ি তৈরী করছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এসব মানুষ কখনো তাদের প্রাপ্য পায়নি। তারা পদে পদে হয়েছে অবহেলিত, শোষিত ও বঞ্চিত। তাই বিত্তবান শোষকদের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দের সতর্কবাণী, 'যারা শ্রমজীবী মানুষের শ্রমের বিনিময়ে শিক্ষা গ্রহণ ও সম্পদ সংরক্ষণ করে সেসব মানুষের কথা ভুলে যায় তারা বিশ্বাস ঘাতক, দেশদ্রোহী।'[৯২] বিবেকানন্দ বলেন, '...এইসব নীচ জাতদের ভেতর বিদ্যা দান জ্ঞান দান করে এদের ঘুম ভাঙাতে যত্নশীল হ।'[৯৩] কারণ ঘুমন্ত মানুষ জেগে উঠলেই তারা দাবী আদায়ে সোচ্চার হবে। বিবেকানন্দ জাতিকে শিক্ষার জন্য..."Mass Education Programme" সুস্পষ্ট কর্মসূচী দেন। তিনি বলেন, 'শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকানির্মিত কুটির ও হল প্রস্তুত কর। গোটাকতক ম্যাজিক লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদি যোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব অনুন্নত, এমন কি, চন্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো কর, তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও।'[৯৪] বিবেকানন্দের মত জনশিক্ষার ব্যাপারে এত বৈজ্ঞানিকভাবে আর কেউ আগে এদেশে চিন্তা করেননি। বিবেকানন্দ চেয়েছেন গ্রামে, বস্তিতে অজ্ঞ অশিক্ষিত, পিছিয়ে পড়া দরিদ্র মানুষ তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষা গ্রহণ করে সচেতন হয়ে বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে অভিযান করবে। বিবেকানন্দ বলেন, ধনী শ্রেণীর শোষণ, নির্যাতন এবং ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে জনগণকে দাবিয়ে রাখার ষড়যন্ত্র সম্পর্কে সচেতন হলে শূদ্র বিপ্লব সংঘটিত হবে। আর এই বিপ্লব ধনী-বুর্জোয়া শ্রেণীর শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদ করবেই করবে।

দিব্য সমাজ

বিবেকানন্দ বলেন, প্রত্যেক মানুষের সুখে থাকার অধিকার রয়েছে। অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ, শোষণ বা নির্যাতন সম্পূর্ণ অনৈতিক ও অমার্জনীয় অপরাধ। সবাই সুখী না হতে পারলে, প্রকৃতপক্ষে কেউই সুখী হতে পারে না। আবার একজন যদি অন্য কাউকে আঘাত করে তাহলে সে নিজেও আহত হয়; কারণ আঘাতকারী ও আহত উভয়েই তো একই ব্রহ্মের অংশ। এ যুক্তিতেই বিবেকানন্দ বলেন, নীচ জাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর-এরা সবাই আমাদের রক্ত, আমাদের সকলের ভাই'। বিবেকানন্দ গ্রহণ করেন জীব-ব্রহ্ম-তত্ত্ব। তিনি বলেন, জীবাত্মা জ্ঞানের শক্তিতে, আনন্দ আস্বাদে এবং মুক্তির প্রচেষ্টায় তুচ্ছ নয়। জীব ক্ষণ ভঙ্গুর নয়। মুক্ত স্বাধীন ও অসীম। 'You are free free free! Oh blessed am I! I am infinite! In my soul I can find no beginning and no end. All is myself! In its essence it is free, unbounded, holy pure and perfect, No books, no scriptures, no science can ever imagine the glory of the self that appears as man, the most glorious God that ever was, the only God that ever existed, exists or ever will exist.'[৯৫]

বেদান্তের কথা, জীব অসীম, জীবই ব্রহ্ম। অজ্ঞানের প্রভাবে জীব নিজেকে মনে করে সসীম, তুচ্ছ, রোগশোকে ভারাক্রান্ত। বিবেকানন্দ চেয়েছেন, সোস্যালিজমের অনুকূল পরিবেশে জীব তার স্বরূপ ফিরে পাবে। বিবেকানন্দ বুঝেছেন, ভারতবর্ষের পিছিয়ে পড়া সমাজ, অনুন্নত অর্থনীতি এবং জাতি সম্প্রদায়ের সংঘাত। এখানে বৈষম্যমূলক সমাজ জীবকে জীবত্বে, সসীমত্বে আবদ্ধ করে রেখেছে। ধর্মের নামে চলছে অধর্ম ও গোঁড়ামি, উচ্চ বর্ণের শোষণ সব মিলে জীব যে ব্রহ্ম এসত্য প্রকাশ পায়নি। এই সত্য প্রকাশের জন্য এবং জীবরে আত্ম-স্বরূপ আবিষ্কারের জন্য সমাজের নবজন্ম প্রয়োজন। তাই বিবেকানন্দের দাবী Realization of Vedantic Philosophy; স্বামী বিবেকানন্দ যে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেন সেই সমাজতন্ত্র হবে একটি দিব্য সমাজ (Divine Society)। যেখানে মানুষ পাবে তার সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অধিকার। শোষণমুক্ত সমাজে মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্মানুশীলন করে মুক্তির লক্ষ্যে অগ্রসর হবে। রামকৃষ্ণ একদিন বিবেকানন্দকে বলেন, খালি পেটে ধর্ম হয় না। অভুক্ত এবং ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে শুকনো ধর্মের কথা এক নিষ্ঠুর প্রহসন মাত্র। দিব্য সমাজে থাকবে মানুষের খাদ্য ও জীবন ধারণের সকল উপাদান। কারণ অনুকূল পরিবেশেই 'নর' হয়ে উঠবে 'নারায়ণ'। আর এই প্রত্যাশিত 'দিব্য সমাজ' প্রতিষ্ঠা করবেন 'এমন এক সহৃদয় আত্মা হয়ত আছেন অথবা এই অনন্তকাল ও এই বিপুল ও জনবহুল পৃথিবীতে এমন এক আত্মা জন্মগ্রহণ করবেন যিনি এ কাজ সম্পন্ন করবেন।' (ভবভূতি)[৯৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার; গোলপার্ক: কলকাতা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩২২।
২. জীবন মুখোপাধ্যায়, 'স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ২৫৯-৬০।
৩. ঐ, পৃ. ২৬০।
৪. ঐ, পৃ. ২৬০।
৫. ঐ, পৃ. ২৬২।
৬. স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিন ১৪১৪, পৃ. ৪৮।
৭. ঐ, পৃ. ৪৮।
৮. ঐ, পৃ. ৪৮।
৯। ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯।
১০। ঐ, পৃ. ৪৯।
১১। ঐ, পৃ. ৪৯।
১২। ঐ, পৃ. ৪৯।
১৩। সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, 'স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৩৭৬।
১৪। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, 'যুগনায়ক ও দেশনায়ক স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী, সুভাষ চন্দ্র" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৯১০।
১৫। Bhupendranath Datta, *Swami Vivekananda Patriot-Prophet*, Nababharat Publishers. Calcutta. 1954, p. ix.
১৬। জীবন মুখোপাধ্যায়, "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" ঐ, পৃ. ২৫৮।
১৭। ঐ, পৃ. ২৬১।
১৮। স্বামী প্রভানন্দ, "ভারত সংস্কৃতিতে স্বামীজীর অবদান" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ২৩৪।
১৯। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৩৫৭।
২০। জীবন মুখোপাধ্যায়, "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" ঐ, পৃ. ২৬৩-৬৪।
২১। ঐ, পৃ. ২৬৫।
২২। ঐ, পৃ. ২৬১।
২৩। ঐ, পৃ. ২৬৪।
২৪। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বিবেকানন্দ ও সমকালীন ভারতবর্ষ*, প্রথম খন্ড, মন্ডল বুক হাউজ, কলিকাতা, ১৯৮৯, পৃ. ১৯০।
২৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ঊনবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ৪৩-৪৪।
২৬। ঐ, পৃ. ৫১।
২৭। ঐ, পৃ. ৩৯-৪০।
২৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৩, পৃ. ৩১-৩২।
২৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ, পৃ. ৪০।
৩০। ঐ, পৃ. ১৭-১৮।
৩১। ঐ, পৃ. ৪০-৪১।
৩২। ঐ, পৃ. ৪৮-৪৯।
৩৩। Swami Vivekananda, *Thoughts of Power*, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Kolkata, Twenty-eighth impression, Aughst 2006, page- 5.
৩৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ, পৃ. ৪৩।
৩৫। *VEVEKANANDA HIS CALL TO THE NATION*, Advaita Ashrama (ed), 5 Dehi Entally Road, Kolkata, 40th impression, February 2009, page- 39.
৩৬। Swami Vivekananda, *Thoughts of Power*, op.cit, page- 44.
৩৭। ঐ, পৃ. ৫০-৫১।
৩৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, ঐ, পৃ. ২৮।
৩৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ০৪ অক্টোবর, ২০০৭, পৃ. ৪৭।
৪০। ঐ, পৃ. ৬৫।
৪১। ঐ, পৃ. ১৯-২০।
৪২। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, ঐ, পৃ. ২।
৪৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ, পৃ. ৪৮।
৪৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, ঐ, পৃ. ১৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। ঐ, পৃ. ২৪।
৪৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ, পৃ. ৫৩-৫৪।
৪৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, ঐ, পৃ. ৩০।
৪৮। সাত্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা" ঐ, পৃ. ৩৮৪।
৪৯। জীবন মুখোপাধ্যায়, "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা", ঐ, পৃ. ২৬৯।
৫০। ঐ, পৃ. ২৬৮।
৫১। ঐ, পৃ. ২৬৮।
৫২। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৩৫৮।
৫৩। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, "যুগনায়ক ও দেশনায়ক: স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, ঐ, পৃ. ৯২৫।
৫৪। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খন্ড, কামিনী প্রকাশালয়: ১১৫ অখিল মিস্ত্রি লেন, কলি-৯, (প্রথম সংস্করণ), ১৯৯৪, পৃ. ১৮৭।
৫৫। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, "যুগনায়ক ও দেশনায়ক: স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, ঐ, পৃ. ৯২৬।
৫৬। জীবন মুখোপাধ্যায়, "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" ঐ, পৃ. ২৬৬।
৫৭। ঐ, পৃ. ২৬৬।
৫৮। Swami Gombhirananda, *History of the Ramkrishna Math and Mission*, Advaita Ashrama, Calcutta, 1957, PP. 202-23.
৫৯। জীবন মুখোপাধ্যায়, "স্বামী বিবেকানন্দ ও ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম" ঐ, পৃ. ২৭২।
৬০। ঐ, পৃ. ২৭২।
৬১। ঐ, পৃ. ২৭৩।
৬২। ঐ, পৃ. ২৭৪।
৬৩। ঐ, পৃ. ২৭৪।
৬৪। ঐ, পৃ. ২৭৫-৭৬।
৬৫। ঐ, পৃ. ২৭৬।
৬৬। ঐ, পৃ. ২৭৬।
৬৭। সাত্ত্বনা দাসগুপ্ত, *বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, প্রথম উদ্বোধন সংস্করণ; ২৩শে ডিসেম্বর, ২০০৫, পৃ. ৪৪।
৬৮। ঐ, পৃ. ৪৫।
৬৯। ঐ, পৃ. ৪৬।
৭০। ঐ, পৃ. ৪৬।
৭১। ঐ, পৃ. ৪৭।
৭২। ঐ, পৃ. ৪৯।
৭৩। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৩২৯।
৭৪। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, "নতুন পৃথিবীর সন্ধানে কাল মার্ক্স ও স্বামী বিবেকানন্দ", ঐ, পৃ. ৮০৯।
৭৫। সাত্ত্বনা দাশগুপ্ত "স্বামী বিবেকানন্দের সামাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা " ঐ, পৃ. ৩৬৫।
৭৬। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, "নতুন পৃথিবীর সন্ধানে কাল মার্কস ও স্বামী বিবেকানন্দ" ঐ, পৃ. ৮১৬-১৭।
৭৭। Swami Vivekananda, *Letters of Swami Vivekananda*, Advaita Ashrama, Calcutta, 'Third Edition (1970), P. 174.
৭৮। সাত্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজ দর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা", ঐ, পৃ. ৩৬৩।
৭৯। Bhupendranath Datta, "Swami Vivekananda: Patriot-Prophet", Nababharat Publishers, Calcutta, 1954, P- xii.
৮০। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, "নতুন পৃথিবীর সন্ধানে কার্ল মার্কস ও স্বামী বিবেকানন্দ", ঐ, পৃ. ৭৯৩।
৮১। সাত্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা", ঐ, পৃ. ৪০৬।
৮২। Robert Lucker, "*Philosophy and Myth*" *Karl Marx*, Cambridge University press 1961, PP. 26.
৮৩। সাত্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা, ঐ, পৃ. ৩৮১।
৮৪। ঐ, পৃ. ৩৮১।
৮৫। Bhupendranath Datta, *Swami Vivekananda, Patriot-Prophet*, ibed, P. 335.
৮৬। রমেন্দ্র নারায়ণ সরকার, "স্বামী বিবেকানন্দ ও গণচেতনা" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৩৪৮।
৮৭। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৩৫৮-৫৯।
৮৮। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, "নতুন পৃথিবীর সন্ধানে কাল মার্ক্স ও স্বামী বিবেকানন্দ", ঐ, পৃ. ৮২১।
৮৯। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, ঐ, পৃ. ৬৫৩।
৯০। সাত্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা, ঐ, পৃ. ৩৭৯।
৯১। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, "যুগনায়ক ও দেশনায়ক: স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, ঐ, পৃ. ৯১০।

Dhaka University Institutional Repository

৯২। আমিনুল ইসলাম, "স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও মানবতাবাদ", স্বামী অক্ষরানন্দ সম্পাদিত, *উদ্দীপন*, স্মারকগ্রন্থ, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা, বাংলাদেশ, ১৯৮৫, পৃ. ৪৮।
৯৩। স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, "যুগনায়ক ও দেশনায়ক: স্বামী বিবেকানন্দ ও নেতাজী সুভাষ চন্দ্র, ঐ, পৃ. ৯০৮।
৯৪। ঐ, পৃ. ৯০৯।
৯৫। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম" ঐ, পৃ. ৩৩২-৩৩।
৯৬। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খন্ড, ঐ, পৃ. ৬৬১।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়

সময় বিরামহীন গতিতে চলেছে অন্তহীন মহাকালের দিকে। নিত্য পরিবর্তন হচ্ছে পরিবর্তনশীল এই জগৎ। থেমে নেই প্রকৃতির উত্থান-পতনের খেলা। বুদ্ধিমান মানবজাতি প্রগতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে তাদের পিছিয়ে পড়া সমাজ। বিরামহীন প্রচেষ্টায় গড়ে তোলার চেষ্টা চলেছে তাদের আত্মনির্ভরশীল জীবন, স্বনির্ভর গ্রাম ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বসমাজ। কিন্তু এই পরিবর্তনশীল জগৎ ও জীবনের মাঝে নিশ্চল স্থবির হয়ে পড়ে রয়েছে আমাদের নিরন্ন সর্বহারা বাঙালির জীবন ও সমাজ। আমরা হারিয়েছি উন্নত দেশের সাথে সমান তালে চলার সঙ্গতি। দরিদ্র ক্ষুধার্ত বেকার আশ্রয়হীন শোষিত বঞ্চিত কৃষক শ্রমিক মজুর এমনি কোটি কোটি মানুষের হাজার বছরের স্বপ্ন স্বনির্ভর গ্রাম, একটি স্বনির্ভর সোনার বাংলাদেশ। কিন্তু হাজার বছরেও আমাদের দেশ গড়ার স্বপ্ন পূরণ হয়নি কেন? –এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পৃথিবীতে এসেছিলেন এক ক্ষণজন্মা দূরদর্শী গৈরিক সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। তাঁর দর্শনে খুঁজে পাওয়া যায় সর্বজনীন গ্রাম উন্নয়নের এক বাস্তব মহাপরিকল্পনা। বিবেকানন্দের এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন। এ প্রতিষ্ঠান দেশের প্রতিটি গ্রামে "স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়" স্থাপনের মাধ্যমে স্থায়ীভাবে গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে আন্তরিকতার সাথে নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে। মঠ মিশনের আদর্শ ও অনুপ্রেরণার শক্তি মহানায়ক বিবেকানন্দ বহু স্থানে বলেছেন, 'গ্রামই জাতির জীবন। গ্রামের কল্যাণ দেশের কল্যাণ।'[১] শহরের তুলনায় গ্রামের লোকসংখ্যা অনেক বেশি। গ্রামই সনাতনকাল ধরে দেশের প্রাচীন ধারা ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি রক্ষা করে চলেছে। গ্রামের দোষগুলো দূর করে, প্রাণপণে গুণগুলো রক্ষা করতে হবে। শিল্পোন্নত দেশের মত আমাদের অন্ধ অনুকরণ করার প্রয়োজন নেই। খাদ্য বস্ত্র ঔষধ শিল্প বিল্ডিং আমাদের প্রয়োজন। তার চেয়ে বেশি প্রয়োজন আমাদের অধ্যাত্ম সম্পদ। সেই মহামূল্যবান সম্পদ সুরক্ষার জন্যই গ্রামীণ জীবন উন্নত করতে হবে। বিবেকানন্দের শিক্ষা, আধুনিক আদর্শ ও দেশীয় আধ্যাত্মিকতার সমন্বয়ে আমরা এগিয়ে যাব।

পল্লী গ্রামে হাজার বছরের নিভৃত কান্না

যুগ যুগ ধরে অশান্তির দাবানল জ্বলছে গ্রামে গ্রামে। পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে সুখ শান্তির জীবন স্বপ্ন এবং পরিবার। গ্রামের মানুষের মনে রয়েছে জানা-অজানা সীমাহীন দুঃখ বেদনা ও নিভৃত কান্না। ক্ষুধা, দারিদ্র্য, রোগ-শোক, অভাব-অনটন এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত সংঘর্ষ কেড়ে নিচ্ছে জীবনের সুখ শান্তি ও আশার আলো। যুগ যুগ ধরে গ্রামবাসী অন্যায়, অত্যাচার শোষণ নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।

প্রাচীন কাল থেকে অসহায় মানুষ অন্ন বস্ত্র, বাসস্থান প্রভৃতির জন্য প্রতিকূল পরিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আসছে। মানুষ ক্রমান্বয়ে আবিষ্কার করে আগুন, যন্ত্রশিল্প প্রভৃতি। শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার আলো পৃথিবীর স্থানে স্থানে পৌঁছালেও এখনও পৌঁছেনি অনেক দরিদ্র পল্লী গ্রামে, দারিদ্র মানব সমাজে এখনও পৌঁছেনি কল্যাণ ও শান্তির ছায়া। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অভাব-অনটন, শোষণ, নির্যাতনে মানুষ হারিয়ে ফেলেছে মনুষ্যত্ব। তাই বিবেকানন্দ বলেন, 'তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ– কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ-অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত গগণ আচ্ছন্ন করিয়াছে।'[২] হাজার বছর ধরে বংশ পরমপরায় মানুষ জীবন অতিবাহিত করছে অজ্ঞানতার ঘন কালো অন্ধকারে। তারা সত্য, সুন্দর, কল্যাণ ও সভ্যতার আলো কখনও অনুভব করতে পারেনি। তারা যে অন্ধকার নিয়ে পৃথিবীতে আসে, সেই অন্ধকার নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

একটি গ্রামের ইতিহাস খুঁজলে পাওয়া যাবে অনেক পৈশাচিক নারকীয় জঘন্য অপরাধ-কত কান্না, কত দুঃখ। বৃটিশ শাসনের প্রভাব পড়েছে এদেশের গ্রামের সাধারণ মানুষের উপর। তাদের ধানের পরিবর্তে নীল চাষে বাধ্য করে, চড়া হারে খাজনা আদায় করে। ইংরেজ শোষণের ফল ১৩৫০ সনের দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায় বহু মানুষ। অভিজাত জমিদার মহাজন চড়া সুদে টাকা ঋণ দেয়। সামন্ত, পুরোহিত শোষণ করে। তারপর পাকিস্তানী শাসক গোষ্ঠী এদেশের অর্থ সম্পদ লুট করে নিয়ে যায়, সরকারি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব গ্রহণ করে দাবিয়ে রাখে দেশবাসীকে। মুক্তিযুদ্ধে

Dhaka University Institutional Repository
পাকিস্তানী সেনাবাহিনী এদেশের ৩০ লক্ষ লোককে শহীদ করে এবং দু'লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রম লুটে নেয়, পুড়িয়ে দেয় ঘর-বাড়ী। যুদ্ধের কারণে সৃষ্টি হয় ১৯৭৪ সালের দুর্ভিক্ষ। এরপর স্বাধীন বাংলাদেশে নতুন রূপে, নতুন কৌশলে আসে শোষক শ্রেণী। বিভিন্ন এন.জি.ও প্রতিষ্ঠান গ্রামের দরিদ্র মানুষদের সেবার চেয়ে শোষণ করছে বেশি। রাজনৈতিক দল সাধারণ মানুষকে ব্যবহার করছে উদ্দেশ্য পূরণের জন্য। ফলে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের শিকার হয়ে কেউ কেউ আহত বা পঙ্গু হয়, আবার অনেকে প্রাণ হারায়। প্রতি বছর সড়ক দুর্ঘটনায় আহত, পঙ্গু ও নিহত হয় অনেক মানুষ এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয় অনেক টাকার সম্পদ। প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় আহত, নিহত ও ক্ষতিগ্রস্থ অসংখ্য পরিবার স্বজন হারিয়ে সারা জীবন ভাসতে থাকে দুঃখের সাগরে। এসব বেদনার্ত মানুষের প্রতি ছিল বিবেকানন্দের গভীর মমত্ববোধ, সমবেদনা। তাই তিনি বলেন, 'আহা, দেশে গরীব দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে ! যারা জাতির মেরুদণ্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে তাদের সুখেদুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে !...আমরা এদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল?...সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না– এ নিশ্চয় জানবি।'[৩] সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া জাতীয় উন্নয়ন সম্ভব নয়।

গ্রামের দরিদ্র কৃষক, কামার, কুমার, তাঁতী, জেলে তাদের দুঃখের শেষ নেই। ভাঙ্গা ঘরে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় তারা মৃত্যুর সাথে সংগ্রাম করে অকালে প্রাণ হারায়। গ্রামে রয়েছে অনেক অসহায় দরিদ্র এতিম ছেলেমেয়ে। তাদের কে দেবে সান্ত্বনা? কে করবে লালন-পালন? কর্মহীন, আশ্রয়হীন, স্বামী হারা বিধবা মহিলারা কোথায় দাঁড়াবে? কোথায় আশ্রয় পাবে? সন্তানদের কি খাওয়াবে? যৌতুকের কারণে অথবা অন্য কোন অজুহাতে অনেক মহিলা তালাক প্রাপ্তা হয়ে ছেলে মেয়েদের নিয়ে উঠে বৃদ্ধ কৃষক পিতার অভাবী সংসারে। ভূমিহীন কৃষক শ্রম দিয়ে অন্যের জমি চাষ করে, সার বীজ ও ফসলের ভাগ দিয়ে তার চাষের খরচ ওঠে না। সে বাঁচে কি ভাবে? শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীর কর্মহীন জীবন ক্রমে অধঃপতিত হয়। তারা বাঁচার জন্য, অর্থের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। শ্রমিক সারা দিন হাঁড় ভাঙ্গা খাটুনির পর সামান্য পারিশ্রমিক দিয়ে উর্ধ্ব মূল্যের বাজারে সংসার চালাতে পারে না। অনেক দিন সন্তান ও স্ত্রীকে নিয়ে উপোস থাকে। নদী ভাঙ্গা গৃহহীন মানুষের দুঃখের শেষ নেই। তারা কোথায় ঘর উঠাবে? কিভাবে উপার্জন করবে? রাস্তা ঘাটে, শহরের ময়লা স্তুপের পাশে, নোংরা পরিবেশে পলিথিনের কুঁড়ে ঘরে, কেউ কেউ দুর্গন্ধযুক্ত বস্তিতে বাস করে। সেখানে চোরা চালান, মাদক ব্যবসা ও অপরাধী চক্রের কেন্দ্র গড়ে উঠে। শহরের এতিম দরিদ্র ছোট ছেলে-মেয়ে টোকাই, পথ শিশুদের জীবন কাটে রাস্তায় রাস্তায়। তারা রাতে ঘুমায় রাস্তার পাশে, হাট-বাজার, স্টেশন বা খোলা জায়গায়। চুরি ডাকাতি ছিনতাই, অপহরণ, ধর্ষণ হত্যা চলেছে চারিদিকে। জন জীবনে নেই নিরাপত্তা। মানুষ কোথায় শান্তি পাবে?

প্রাচীন উন্নয়ন ধারা

স্বাধীনতা লাভের ৩৮ বছর পার হলেও যুগোপযোগী হয়নি অনেক নিয়ম ও কর্মপদ্ধতি। বর্তমান বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে এখনও আমাদের দেশের গ্রামগুলোতে প্রাচীন উন্নয়ন ধারায় কাজ চলেছে। অনেক কৃষক অর্থের অভাবে আধুনিক কৃষি সরঞ্জাম ক্রয় করতে না পেরে মান্ধাতার আমলের কৃষি কাজ করছে। কৃষকগণ এনজিও, ব্যাংক ও মহাজনদের নিকট থেকে সুদে টাকা নিয়ে সার ও বীজ কিনে পর্যাপ্ত ফসল ফলাতে না পেরে, ঋণের টাকা শোধ করতে না পেরে দেউলিয়া হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল ও জনজীবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

প্রাচীন জনজীবন বিছিন্ন কেরানিগিরির শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব, অনভিজ্ঞ চিকিৎসা, অনুন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা আমাদের উন্নয়ন দিন দিন ব্যাহত করছে। উন্নয়ন কাজে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় পরিকল্পনার মধ্যে রয়েছে বৈষম্য, সরকারের পর্যাপ্ত সহযোগিতার অভাব। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, এনজিও প্রভৃতির জন বিচ্ছিন্ন উন্নয়ন কাজ হয় পরিকল্পনা প্রণয়নকারীদের স্বার্থ ও সুবিধা অনুযায়ী। তাছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রাচীন সংবিধান উন্নয়ন কাজ মারাত্মকভাবে ব্যাহত করছে। এতে প্রতিষ্ঠানের কর্মী এবং জনসাধারণ আইনের ধারায় সেবা ও কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়, সৃষ্টি হয় সংঘর্ষ। সম্প্রতি বিডিআর বিদ্রোহের অন্যতম কারণ প্রাচীন সংবিধানের দাবী-দাওয়ার নিয়ম নবায়ন না করা। এ কারণে প্রতিষ্ঠানের নিয়ম বা সংবিধান যুগোপযোগী করা জরুরী প্রয়োজন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিম্নমানের প্রশিক্ষণ, প্রকৃত শিক্ষা ব্যবস্থার অভাব, সঠিক ধর্ম জ্ঞানের অভাব, গোঁড়ামী, সংকীর্ণতা সাম্প্রদায়িকতা, নৈতিক অবক্ষয় প্রকৃত উন্নয়ন কর্ম মারাত্মকভাবে ব্যাহত করে।

Dhaka University Institutional Repository

গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের দৃষ্টান্ত (Example of village wise development)

গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের পরিকল্পনা নতুন নয়। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ এবং মাও সেতুং গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের কথা অনেক পূর্বে বললেও আমাদের দেশের গ্রামগুলো এখনও যুযোপযোগী হয়ে উঠেনি। তাই তাঁদের দর্শনের ভিত্তিতে আমাদের গ্রামগুলো যত দ্রুত সম্ভব গড়ে তুলতে হবে। বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজোড়া গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের শিক্ষা প্রচার করেন। তাঁদের আশা ও বিশ্বাস-এ উন্নয়ন বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়বে। কলকাতার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ রামকৃষ্ণ- বিবেকানন্দ আন্দোলনের গতি প্রকৃতি বিকাশের লক্ষ্যে যুগ যুগ ধরে অবহেলিত, লাঞ্ছিত মানুষদের কাছে টেনেছে লোকশিক্ষা পরিষদের "গ্রাম সেবা" কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। "সমাজশিক্ষা সমাজের ওপর তলার মানুষকে নয়, যারা অনুন্নত তাদেরই কথা যা বেশি করে বলে, অর্থাৎ গ্রামীণ মানুষকে শিক্ষিত করে কিভাবে কৃষি, শিল্প (কুটিরশিল্পই প্রধানত), ব্যবসাবাণিজ্যের দ্বারা গ্রামীণ মানুষকে স্বনির্ভর করা যায়, 'সমাজ শিক্ষা' সেই কথাই প্রচার করে বেশি করে।"[৪] বর্তমান ভারত সরকার এমন নীতিতেই গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ব্যাপক উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এতে দরিদ্র কৃষক সাধারণ মানুষের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ বরাদ্দ, রেশন, খাদ্য-সামগ্রী, শিক্ষা, রাস্তাঘাট, যোগাযোগ, নিরাপত্তা প্রভৃতি বিষয়ে দ্রুত ফলপ্রসূ ও ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের এক অপূর্ব যুক্তিভিত্তিক বাস্তব সম্মত শিক্ষা আমরা পাই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমাজ দর্শনে। তিনি "স্বদেশী সমাজ" প্রবন্ধে সহজ সরল হৃদয়গ্রাহী ভাষায় শিল্প শৈলীতে ফুটিয়ে তুলেছেন স্বনির্ভর গ্রাম প্রতিষ্ঠার এক বাস্তব বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা। তিনি বলেন, 'আমরা স্থির করিয়াছি আমরা কয়েক জনে মিলিয়া একটি সমাজ স্থাপন করিব। আমাদের নিজের সম্মিলিত চেষ্টায় যথাসাধ্য আমাদের অভাব মোচন ও কর্তব্য সাধন আমরা নিজে করিব, আমাদের শাসনভার নিজে গ্রহণ করিব, যে-সকল কর্ম আমাদের স্বদেশীয়ের দ্বারা সাধ্য তাহার জন্য অন্যের সাহায্য লইব না। এই অভিপ্রায়ে আমাদের সমাজের বিধি আমাদের প্রত্যেককে আমাদের একান্তভাবে পালন করিতে হইবে। অন্যথা করিলে সমাজ বিহিত দন্ড স্বীকার করিব।'[৫] রবীন্দ্রনাথের সমাজদর্শনের ভিত্তিতে আমাদের যুব সমাজ স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তুলবে।

প্রতিকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি অতিক্রম করে এলাকা বা গ্রামভিত্তিক উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করেন গণচীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং। তিনি দরিদ্র কৃষক সাধারণের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কতকগুলি গ্রাম নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন "কমিউন"। সারা চীন জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ উন্নয়নকেন্দ্র বিখ্যাত "কমিউন"। 'কমিউন যে কি, তা হয়তো অনেকেই ভাল করে জানেন না। এই কমিউন গঠনই ছিল মাও সেতুং-এর স্বপ্ন। অনেকগুলি গ্রামকে একত্রিত করে এক একটি কমিউন গঠিত হয়েছে। এমনি ধারা কমিউন আজ সারা চীন জুড়ে। কমিউনে জমির মালিক হল কৃষক সম্প্রদায়। শুধু কৃষি কার্য নয় অনেক কমিউনে কল-কারখানাও রয়েছে। এর যাবতীয় উন্নতি অগ্রগতি; কমিউনের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত জনগণের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দায়িত্ব রয়েছে কমিউনের উপর।'[৬] সমাজতান্ত্রিক রাশিয়াতেও চলেছে আঞ্চলিক ও গ্রাম উন্নয়ন ভিত্তিক জাতীয় স্বনির্ভর আন্দোলন। কৃষক শ্রমিক ও মেহনতী মানুষের মহান নেতা কার্ল মার্ক্সের দর্শন ১৯১৭ সালে রাশিয়াতে বাস্তবে রূপান্তর করেন মহামতি লেনিন। তিনি মানুষের জন্য চালু করেন গণশিক্ষা, যৌথ কৃষিখামার, গণহোটেল প্রভৃতি। তিনি প্রতিটি মানুষের জন্য নিশ্চিত করেন কর্মসংস্থান, ব্যবস্থা করেন প্রতিটি নাগরিকের ভরণ-পোষণ। তার নীতি ছিল 'সামর্থ অনুযায়ী কাজ করবে, প্রয়োজন অনুযায়ী পাবে'।

লিবিয়ার অবিসংবাদিত নেতা প্রেসিডেন্ট কর্ণেল গাদ্দাফী, লিবিয়ায় শুরু করেন গ্রামভিত্তিক উন্নয়ন কর্মশালা। এতে প্রতিটি গ্রামোন্নয়ন কমিটি নিজেদের গ্রামের সমস্যা নিজেরা আলোচনা করে, নিজেদের মত বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁদের পরিকল্পনার কথা ধাপে ধাপে উচ্চতর সংসদে পৌঁছে। সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণের শিক্ষা নেয়া যেতে পারে চীনের কমিউন, ভারতের প্রাদেশিক কার্যক্রম থেকে। গ্রামগুলো চীনের কমিউনের মত সকল আয়-ব্যয়, লাভ-লোকসান, আমদানী-রপ্তানী, শিক্ষা-স্বাস্থ্য প্রভৃতির ব্যবস্থা করবে। গ্রামগুলো ভারতের প্রদেশগুলোর মত আভ্যন্তরীণ সকল জনকল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করবে। গ্রামের অফুরন্ত জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তুলতে হবে। সর্বোপরি কঠোরভাবে গ্রামের নিয়ম-শৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণ, উন্নয়ন-পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করবে। তবেই গ্রামের সম্পদেই হবে স্বনির্ভর গ্রাম।

Dhaka University Institutional Repository

স্বপ্নের পরিবার– স্বপ্নের গ্রাম

যুগ যুগ ধরে আমাদের কামনা সুন্দর ছবির মত ছায়া ঢাকা, পাখি ডাকা, শান্ত-সমৃদ্ধ এক সবুজ গ্রাম। গ্রামের পাশে থাকবে বিস্তীর্ণ সবুজ ফসলের মাঠের ভিতর দিয়ে আঁকা-বাঁকা রাস্তা। রাস্তার দু'ধারে আম, কাঁঠাল, তাল, নারিকেল, খেজুর গাছ। গ্রামের প্রতিটি পরিবারের জন্য থাকবে সুন্দর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন একটি বাড়ি। ছেলেমেয়েরা নিয়মিত স্কুলে যাবে, পড়াশুনা করবে। তারা জ্ঞান বুদ্ধি, আচার-ব্যবহার, নৈতিকতা, দায়িত্ব-কর্তব্য শিখবে- এক কথায় আদর্শ মানুষ হয়ে উঠবে। তারাই ভবিষ্যতে গ্রাম, রাষ্ট্র ও বিশ্বের দায়িত্বভার গ্রহণ করবে। গ্রামবাসীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী যথাসম্ভব নিজেরা উৎপাদন করবে। একান্ত প্রয়োজন না হলে কোন দ্রব্য আমদানী করবে না। তারা হবে মিতব্যয়ী, সহজ-সরল জীবন-যাপন করবে। প্রতিটি ব্যক্তি হবে আত্মবিশ্বাসী আর প্রেমের বন্ধনে কর্ম ও সাফল্যে প্রতিটি পরিবার হবে স্বনির্ভর। বিবেকানন্দ চেয়েছেন এক আত্মনির্ভরশীল এবং আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী সমাজের বিশাল অভ্যুদয়। এ কারণেই তিনি আমাদের গ্রামভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন, 'জনসাধারণকে যদি আত্মনির্ভরশীল হতে শেখানো না যায়, তবে জগতের সমগ্র ঐশ্বর্য ভারতের একটা ক্ষুদ্র গ্রামের পক্ষেও পর্যাপ্ত সাহায্য হবে না।'[৭] স্বনির্ভর ব্যক্তিই পারে স্বনির্ভর গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে।

গ্রাম উন্নয়ন বিভাগ ও কমিটি

সাধারণ কোন গ্রাম্য ক্লাব বা সংগঠন দীর্ঘ মেয়াদী কোন উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করতে পারে না। তাই গ্রামোন্নয়নের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন মূল চালিকা শক্তি। আর এই জাতীয় চালিকা শক্তির উৎস হলো "বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন"। এ প্রতিষ্ঠানের কেন্দ্রীয় কমিটি, গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও গ্রামবাসীর সমন্বিত প্রয়াস, উদ্যোগ ও শ্রমের ফসল হবে "স্বনির্ভর গ্রাম"। গ্রাম কার্যালয়ে থাকবে কেন্দ্রীয় কার্যালয় নিয়োগকৃত স্থায়ী কর্মকর্তা এবং মনোনীত গ্রাম উন্নয়ন কমিটি। গ্রাম কার্যালয়ে সেবা কাজের সুবিধার জন্য থাকবে ১০টি বিভাগ। সেগুলো হলো– ১. প্রশাসন বিভাগ ২. অর্থ বিভাগ ৩. শিক্ষা বিভাগ ৪. কর্মসংস্থান বিভাগ ৫. কৃষি ও শিল্প বিভাগ ৬. চিকিৎসা ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগ ৭. ধর্ম বিভাগ ৮. সংস্কৃতি বিভাগ ৯. মাদকাসক্তি নিরাময় বিভাগ ১০. বিচার বিভাগ। এই ১০টি বিভাগে ১০ জন বা প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা কাজ করবেন। তাদের উন্নয়ন কাজে সহযোগিতার জন্য প্রতিটি পাড়া বা বিভিন্ন পেশাজীবি থেকে ১ জন করে অথবা প্রয়োজনীয় সংখ্যক আগ্রহী বিশ্বস্ত ও কর্মঠ সদস্য-সদস্যা নিয়ে গ্রাম উন্নয়ন কমিটি "গ্রাম সংসদ" গঠন করবে। গ্রামের অভিজ্ঞ ও সম্মানিত ব্যক্তিগণ, শিক্ষক, সমাজ সেবক ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবে। কমিটি সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ দিয়ে স্বেচ্ছাসেবক বা নির্ভীক গ্রাম সৈনিক গড়ে তুলবে।

গ্রাম সৈনিক

গ্রামের কর্তা ছাড়া উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনা হয় না, সেবক ছাড়া দুঃস্থ মানুষের সেবা হয় না এবং অভিজ্ঞ ধৈর্যশীল সৈনিকের যুদ্ধ ছাড়া অশুভ শক্তির প্রতিকূল পরিবেশ জয় করা যায় না। তাই অন্ধকার নিমজ্জিত ক্ষুধার্ত বেকার দুঃখী মানুষে পূর্ণ গ্রামগুলো রক্ষা করতে, স্বনির্ভর করতে আমাদের সৃষ্টি করতে হবে অভিভাবক, সেবক ও সৈনিক– এই ত্রিশক্তির ধারক। কাজী নজরুল ইসলামের সেই দেশ গড়ার "আমি সৈনিক" এখন জরুরী প্রয়োজন। তাঁর সর্ব গুণের অধিকারী সৈনিক হলো দেশপ্রেমিক সেবক। এমন কতিপয় নিঃস্বার্থ যুবক শুধু একটি গ্রাম নয়, সমগ্র বিশ্ব উন্নয়নের আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। বিবেকানন্দ এমন যুবকগণকে আহ্বান করে বলেন, 'Give me a few men and women who are pure and selfless and I shall shake the world.'[৮] সেবকগণের উচিত গ্রামের মানুষদের দেবতার মত সেবা করা, কৃপার দৃষ্টিতে দেখা নয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দের শিক্ষা হলো– 'মন্দিরের বিগ্রহকে যেমন পূজা করি, তেমনি যেখানে দুঃস্থ, নিরন্ন, রুগ্ন অশিক্ষিতরা আছে তাদের পূজা করার ভাবে সেবা করতে হবে, যেন সেখানে তাঁরা আমাদের সেবা নেবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন।...বিগ্রহের পূজার সময় যেমন আমরা নিজেদের দেবতার চেয়ে বড় মনে করি না, ঠিক সেভাবে সেবা করতে হবে। স্বামীজী এই শিক্ষা দিয়ে গেছেন।'[৯]

ভগিনী নিবেদিতা ভারতে আসার অনুমতি চাইলে বিবেকানন্দ তাঁকে বলেন, 'তুমি ভারতে এসে জনসাধারণের সেবা করতে পার। আমি তোমায় সেজন্য সবরকম সাহায্য করব। কিন্তু একটি কথা মনে রেখো। যখন তুমি সেবা করতে আসবে তখন তুমি তোমার আভিজাত্য নিয়ে কৃপা করতে এসো না। তা আমি চাই না। এখানে দারুণ দারিদ্র্য-দৈন্য নগ্ন মূর্তিতে প্রকট হবে। এসব দেখেও কি তুমি এ দেশকে ভালবাসতে পারবে ?...সেবিকার মনোবৃত্তি নিয়ে সব সময় থাকবে।'[১০] বিবেকানন্দের এ শিক্ষা শুধু নিবেদিতার জন্য নয়, দেশের সকল সেবকগণের জন্যও একই শিক্ষা প্রযোজ্য। আদর্শ সম্পর্কে অচেতন হলে সেবা হয় না। বিভিন্ন সেবা সংঘের, প্রতিষ্ঠানের সেবকগণের উচিত

Dhaka University Institutional Repository
বিবেকানন্দের এই আদর্শ অনুসরণ করা। বিভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠান ও এনজিও কর্তৃক সহজ-সরল, নিরীহ দরিদ্র গ্রামবাসী বিভিন্নভাবে নির্যাতিত শোষিত ও প্রতারিত হয়েছে বহুবার। পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় বিভিন্ন এনজিও প্রতিষ্ঠান জনগণের অসংখ্য টাকা নিয়ে উধাও হয়। তাই কোন প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা করতে এলাকায় গেলে গ্রামবাসীরা সন্দেহের চোখে দেখে। সেবকগণকে বিশুদ্ধভাব, আদর্শ ও আন্তরিক ভালবাসা দিয়ে গ্রামবাসীর সাথে একীভূত হতে হবে, মিশতে হবে। সেবকগণ কাজে নৈপুণ্য হবে এবং পরস্পরের সহযোগিতা করবে। এছাড়া গ্রামবাসীর হৃদয় পাবে না। ধৈর্যের সাথে দীর্ঘ দিন সেবা করলে গ্রামবাসীর বিশ্বাস আসবে এবং প্রতিরোধ কম আসবে। বিশুদ্ধ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেবা করলে মানুষ জানবে কর্মীদের প্রতারণা করার কোন প্রকার মতলব নেই। ভাল মনে কাজ শুরু করলেও পরে স্বার্থ চিন্তা সব ভণ্ডুল করে দিতে পারে। অর্থ, সম্পদ, পদমর্যাদা এমন কি সামান্য প্রশংসার আকাঙ্ক্ষাও স্বার্থ চিন্তা। আদর্শনিষ্ঠ হয়ে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করলে ঈশ্বরের কৃপা লাভ হবে, হৃদয় জ্যোতির্ময় হবে।

গ্রাম সৈনিকগণ বাংলাদেশের প্রতিনিধি। তারা ঘুমন্ত বাংলাদেশকে জাগ্রত করবে, দিনদিন সেবা ও বিশাল কর্মযজ্ঞের মাধ্যমে দেশকে এগিয়ে নিবে। তারা পরস্পরকে ভালবেসে সহযোগিতা করে আদর্শ সমাজ গড়ে তুলবে। সবাই প্রত্যেকের জন্য ভাববে, এগিয়ে আসবে। আমরা সবাই এক সূত্রে গাঁথা, এক প্রতিষ্ঠানের সদস্য। একের ভাগ্যের সাথে অন্যের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। তাই আমরা মিলেমিশে থাকব, যা আছে ভাগ করে খাব। 'আমি একা ধনোপার্জন করছি, কিভাবে করছি, না অপরকে ঠকিয়ে। অপরের কম বুদ্ধি, দুর্বলতা আর অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে আমি আমার অর্থোপার্জন করছি। এই ভাবে আদর্শ সমাজ গড়ে উঠবে না। আমি নিজে এগিয়ে যাচ্ছি, ধনোপার্জন করছি। আমার আশে পাশে যারা, যাদের বুদ্ধি কম, উদ্যম কম, শিক্ষা কম, যাদের সুযোগ সুবিধা কম, তাদেরও আমি এগিয়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছি। এই ভাবেই আমাদের এগিয়ে চলতে হবে।'[১১] সকলের সহযোগিতা ও স্বনির্ভরতা অর্জন ছাড়া শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় না।

সেবকগণের থাকবে বিবেক, সহানুভূতি, আন্তরিকতা ও কর্মনিষ্ঠা। সৈনিকগণ সেবা কার্যে নিন্দার সম্মুখীন হবেন। হতাশার কারণ নেই। সব সমাজেই নীচু মনের মানুষ রয়েছে। তাদের নিন্দা ও বাধার কথা স্বীকার করেই নামতে হবে দেশ গড়ার কাজে। 'কেউ বলবে এ উন্মাদ। এই জন্য উন্মাদ যে ঘরের খাবার খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। বাড়িতে দারিদ্র্য আছে। অভাব আছে, নিজে এখনও একটা ভাল চাকরী যোগাড় করতে পারেনি। কোথায় চেষ্টা করবে কিসে অর্থ উপার্জন হয়, দারিদ্র্য দূর হয়, তা না করে সে নিছক কেবল এই ঘুরেই বেড়াচ্ছে, ক্লাব করছে, সংঘ করছে, তার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কত রকমের সমস্যা।'[১২] সেবকগণের উদ্দেশ্য মহৎ, তাই কারও নিন্দা বা প্রশংসার দিকে তাকাবে না। পৃথিবীর ইতিহাসে অসংখ্য জন দরদী মানুষ কাজ করছে, পরের জন্য ভাবছে, অপরের দুঃখকে নিজের দুঃখ মনে করছে। সেই ভাগ্যবান মহাপুরুষদের মানুষ শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। নিন্দুকদের সমালোচনায় সৈনিকদের ত্রুটি সংশোধন করে এগিয়ে যেতে হবে। অনেকে মনে করবে সরকার বা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যের অনেক অর্থ কর্মীদের পকেটে যাচ্ছে। কর্মীগণ নিঃস্বার্থভাবে গ্রামের সেবা করছেন। নরনারায়ণের পূজা করছেন। কখনও যেন গর্ব না আসে। 'আমি একজন কেউকেটা, চেয়ে দেখ আমাকে, চিনে রাখ আমাকে, তা নয়।'[১৩] আমাদের দেশে পল্লীগ্রামে রয়েছে অফুরন্ত সম্পদ ও সংস্কৃতি। বাড়িগুলোতে শত কষ্টের সহিষ্ণু নারীপুরুষের সহজ সরল মনে রয়েছে শান্তি, তৃপ্তি, সন্তোষ ও আনন্দ। তাদের সহজ সরল জীবন অতিবাহিত হচ্ছে মাটির ঘরে, খড়ের ঘরে। '...এ একটা পূণ্যভূমি। আমাদের শরীরে এখনও ঋষিদের রক্ত প্রবাহিত। তাদের সেই চিন্তা সংস্কার এখনও আমাদের মধ্যে রয়েছে। সূক্ষ্মভাবে কাজ করছে। আমরা একটা মহৎ চিন্তা করতে পারি। বিদেশীরা মহৎ চিন্তা করতে পারে না।'[১৪] আমাদের রয়েছে অক্ষয়, দুর্জয়, অফুরন্ত প্রাণশক্তি। আমরা সফল হবই। আমাদের মত মানুষ পৃথিবীতে আর নেই। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কর্মরত রয়েছে আমাদের বাংলাদেশী উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, রাজনীতিবিদ, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক। তাই আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে গ্রাম সৈনিকগণ গ্রামের ঘুমন্ত মানুষদের জাগিয়ে তুলুন, তাদের উৎসাহের বন্যায় ভাসিয়ে নিয়ে চলুন। গ্রামবাসীদের বলুন, 'তোমরা ওঠো, জাগো! এই সুযোগে আমরা দেশ গড়ব, গ্রাম গড়ব, আমরা সুন্দর জীবন গড়ব। আমরা দেখতে চাই, প্রত্যেকের মুখে হাসি ফুটে উঠেছে। প্রত্যেকে ভাল খায়, ভাল পরে। প্রত্যেকে নিজের পায়ে দাঁড়ান, অপরের মুখের দিকে চেয়ে থাকা নয়, অদৃষ্টের দোষ দেওয়া নয়। অদৃষ্টকেই আমরা গড়ব।'[১৫] কারণ পরিশ্রম সৌভাগ্যের প্রসূতি।

Dhaka University Institutional Repository

১. প্রশাসন বিভাগ

বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের বিধানে 'স্বনির্ভর গ্রাম' কার্যালয়ের সকল কার্যক্রম জনস্বার্থে নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হবে। প্রশাসনিক বিভাগের প্রধান হবেন প্রশাসনিক কর্মকর্তা। তিনি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের নিয়মানুসারে সব কাজ করবেন। তিনি গ্রাম উন্নয়ন কমিটি ও উপদেষ্টা কমিটি গঠন করবেন। অনগ্রসর মহিলাদের উন্নয়ন ও নেতৃত্ব বিকাশের জন্য মহিলা উন্নয়ন কমিটি এবং ছাত্রদের শিক্ষা উন্নয়ন ও সেবা কার্যক্রমের জন্য ছাত্র সংগঠন তৈরী করবেন। এসব কমিটি যৌথভাবে সার্বিক গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে। প্রশাসন বিভাগের কর্মকর্তা ও সদস্যগণ সকল বিভাগের উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন।

একটি স্বনির্ভর গ্রাম হলো একটি স্বনির্ভর ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করবে "গ্রাম সংসদ"। এ সংসদে সভাপতি (President), মন্ত্রী, সেবক ও কর্মকর্তাসহ মোট ৩৫ জন সদস্য থাকবেন।

১. সভাপতি – (President) – ১ জন (সার্বিক উন্নয়ন কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন)।
২. মন্ত্রী (Minister) – ১০ জন।
৩. সেবক (Volunteer) – ১৪ জন (জরুরী ও প্রয়োজনীয় কাজে সহযোগিতা প্রদান করবেন)।
৪. কর্মকর্তা (Officer) – ১০ জন (প্রতি বিভাগে ১ জন)।
৩৫ জন মোট সদস্য।

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সহায়তায় প্রশাসনিক কর্মকর্তা সততা, দূরদর্শিতা, আন্তরিকতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে সভাপতি, মন্ত্রী ও সেবক নির্বাচন করবেন। গ্রামবাসীর ইচ্ছা ও সমর্থনে– মৌখিক নির্বাচন অথবা প্রয়োজনে ভোটে সদস্য নির্বাচন করবে। জাতীয় সংসদের মত "গ্রাম সংসদ" কখনও থাকবে, আবার কখনও না ও থাকতে পারে। নির্বাচিত সদস্যগণ আসবেন– কাজ করবেন, আবার চলে যাবেন। কিন্তু গ্রামের স্থায়ী উন্নয়ন অন্তর্বর্তীকালীন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সচিবালয়ের মত গ্রাম কার্যালয়ের প্রশাসন বিভাগের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনায় সব চলবে। প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষা অনুযায়ী, ঘর না হলে প্রয়োজনে প্রথমে গ্রাম সংসদ অধিবেশন বসবে গাছের নীচে। তবুও যেন কাজ এগিয়ে যায়। পরে অফিসের সংসদ ভবনে সভা হবে। জরুরী সভাগুলো অন্য স্থানে হতে পারে। গ্রাম কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ সক্রিয় দলীয় রাজনীতি থেকে বিরত থাকবেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ মঞ্চে মিলিত হয়ে উন্নয়ন কার্যে সহযোগিতা করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-বর্ণ-দল-মত নির্বিশেষে গ্রামবাসী সবাই একত্রে কাজ করবেন। ভারতে 'গ্রাম সংগঠনগুলি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব ধর্মের সমন্বয়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর বিষয়ে অধিক যত্ন দেওয়া হয়। সংগঠনগুলি সর্বধর্মের কর্মীদের মিলন ক্ষেত্র হিসেবে কাজ করে।'[১৬] ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যাতে গ্রামোন্নয়ন কাজে সহযোগিতা করতে পারে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে। অধিক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের অংশ গ্রহণে উন্নয়ন দ্রুততর হবে।

ক্ষমতার মেয়াদ

প্রথম এক বছর 'স্বনির্ভর গ্রাম' গঠন কাল রূপে গণ্য হবে, তখন স্থায়ী সভাপতি থাকবে না। 'একটি প্রতিষ্ঠা সমিতি মন্ত্রীসভা ও কর্মীসভা নির্বাচন করিবেন।'[১৭] যোগ্যতা ও বয়োজ্যেষ্ঠতা অনুসারে পর্যায়ক্রমে এক একজন মন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট-এর পদ গ্রহণ করবেন। সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যগণের সম্মতিতে কল্যাণকর আইন প্রণয়ন করতে পারবে। 'এক বৎসরের শেষে এই মন্ত্রী ও কর্মীসভা অবসর লইবেন ও তখন সমাজের নিয়ম অনুসারে নূতন নির্বাচন হইবে।'[১৮] এভাবে গ্রাম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে উন্নয়ন কার্য পরিচালিত হবে।

দণ্ড ও অপসারণ

১. কোন সদস্য সঞ্চয় বা চাঁদা না দিলে তাকে প্রতিষ্ঠান থেকে অপসারণ করা হবে না।
২. যারা সভাপতির আদেশ অমান্য করবে, সংবিধান লঙ্ঘন করবে, সম্মানিত ব্যক্তিকে অপমান করবে এবং সদস্যদের বিদ্রোহী করে তোলার চেষ্টা করবে, কাজে যোগ দিয়েও বার বার অনুপস্থিত থাকবে– এদের সভাপতি অনেকবার সতর্ক করলেও প্রতিষ্ঠান তাদের শাস্তি বা দণ্ড দিলে তা স্বীকার করে আচরণ সংশোধন না করলে, তাহলে সভাপতির আদেশে সমাজ থেকে বহিষ্কার করা হবে।
৩. কর্মকর্তাগণ কাজে অবহেলা করলে অথবা দূর্নীতি করলে জরিমানা, শাস্তি, জেল দেওয়া হবে বা বরখাস্ত করা হবে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. 'সমাজের বিচারে কোন সামাজিক সমাজ বিরুদ্ধ গুরুতর অপরাধ করিলে সমাজের বার আনা লোকের সম্মতি ক্রমে সামাজিকগণ তাহার সহিত সর্বপ্রকার ব্যবহার রহিত করিবেন।'[১৯]

গ্রাম উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ পরিসংখ্যান

"স্বনির্ভর গ্রাম" অর্থ যে গ্রামের উৎপন্ন অর্থ-সম্পদ দ্বারা সেই গ্রামবাসী চলতে পারে। স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য পরিসংখ্যান প্রয়োজন। যাতে ক্রমান্বয়ে ঘাটতি পূরণ করে উদ্বৃত্ত রাখা যায়। এ জন্য সবাইকে উন্নয়নের নীতিমালা অনুসরণ করতে হবে। একটি স্বনির্ভর গ্রাম হলো একটি ক্ষুদ্র স্বনির্ভর রাষ্ট্র। গ্রামবাসী সংবিধান মেনে নিয়ে আন্তরিকতার সাথে কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লে ধাপে ধাপে সমৃদ্ধি অর্জন করা যাবে। ফলে মৌলিক চাহিদাসহ সকল মানবাধিকার সংরক্ষণ ও নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। গ্রাম কার্যালয়ের উন্মুক্ত পরিসংখ্যানের তথ্যগুলো হল নিম্নরূপ:

১. গ্রামের জনসংখ্যা– কত?
২. গ্রামের আয়তন–
৩. আবাদী জমির পরিমাণ–
৪. বার্ষিক উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ–
৫. বার্ষিক খাদ্য চাহিদার পরিমাণ–
৬. খাদ্য উদ্বৃত্ত বা ঘাটতির পরিমাণ–
৭. ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা–
৮. ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা–
৯. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা–
১০. অতিরিক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন–
১১. শিক্ষার হার শতকরা–
১২. পরিবার সংখ্যা–
১৩. বার্ষিক জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের হার–
১৪. বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয়–
১৫. পুষ্টিহীনতা ও শিশু মৃত্যুর হার–

এসব ছাড়াও থাকবে প্রয়োজনীয় তথ্য। স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য বিশেষ প্রয়োজন শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও কর্মদক্ষতা, অধিক খাদ্য উৎপাদন, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং বিশেষ জরুরী প্রয়োজন জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ।

২. অর্থ বিভাগ

মানব জীবনে অর্থের গুরুত্ব অপরিসীম। অর্থ ছাড়া চলার কোন বিকল্প নেই। আর তাই মানুষ অর্থ উপার্জনের কঠিন জীবন সংগ্রামে লিপ্ত। প্রতিটি সমাজের অর্থনৈতিক উপরিকাঠামোর উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সেই সমাজের ইতিহাস, রাজনীতি, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন প্রভৃতি কাঠামো। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ দরিদ্র গ্রামবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'The real India lives in the villages. Unless we are able to uplift the tribals and backward classes, India faces a dark future. Along with their economic improvement, they have also to be raised culturally and spiritually. The backward classes are liveing the terrible poverty.'[২০] বিবেকানন্দের অর্থনৈতিক দর্শনের ভিত্তি হল তাঁর আধ্যাত্ম দর্শন। প্রতিটি মানুষ পরমাত্মার অংশ। তাই প্রতিটি মানুষ সমান সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ধর্মীয় জীবনযাপন করে আত্মদর্শন বা মুক্তি লাভ করতে পারে। অর্থনীতির মুল মন্ত্রের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে সমাজের সুখ-শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ। বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে বিশ্ববাজারে অর্থনৈতিক মন্দার বেশি প্রভাব পড়ছে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশের দরিদ্র মানুষের উপর। সারা বিশ্বে গণতন্ত্র চর্চা, অবাধ ও মুক্তবাজার অর্থনীতি, শিল্পায়ন প্রভৃতি কারণে দরিদ্র মানুষ আরও দরিদ্র হচ্ছে, গ্রামীণ অর্থনীতি বিপর্যস্ত হচ্ছে। বিবেকানন্দ বলেন, বিপর্যস্ত অর্থনীতি এবং ভয়াবহ দারিদ্র্যের মূল কারণ দুটি।

'(১) প্রথমটি অর্থনৈতিক তথা ভারতে বৃটিশ শাসকদের শোষণ,
(২) দ্বিতীয়টি সামাজিক তথা অভিজাত, জমিদার ও পুরোহিতদের অকথ্য শোষণ ও অত্যাচার।'[২০]

Dhaka University Institutional Repository

এ দেশে বৃটিশ শাসনের চরম বর্বরতার ফলে সৃষ্টি হয় তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট ও ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বিবেকানন্দ এদেশের সহজ সরল দরিদ্র মানুষের চরম দুর্ভিক্ষের করুণ চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বলেন, 'ভারতের কোন কোন অঞ্চলের মানুষ মাসের পর মাস, বছরের পর বছর, মহুয়া ফুল সেদ্ধ করে খেয়ে জীবনধারণ করে। কোথাও কোথাও পরিবারের জোয়ান পুরুষেরাই কেবল ভাত খায়, নারী ও শিশুরা ফেন খেয়ে থাকে। ভারতের অধিকাংশ লোক সম্বন্ধে বলা যায়– মোটামুটি অনাহারই তাদের সাধারণ অবস্থা। আয়ের একটু হেরফের হলেই লক্ষ লক্ষ লোকের মৃত্যু।'[২২]

শোষিত বঞ্চিত নিরন্ন দরিদ্র মানুষের প্রতি ছিল বিবেকানন্দের গভীর ভালবাসা। তাই তো তিনি দুঃখী মানুষের কথা ভেবেছেন। তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি নিম্ন আয়ের দিন মজুরের জীবন। তাই বিবেকানন্দ এক প্রতিবেদনে বলেন, 'শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১২ পেন্স মাত্র।'[২৩] তিনি শ্রমিকদের নগণ্য পারিশ্রমিক ও নিম্নমানের জীবন যাত্রার দুর্বিসহ চিত্র তুলে ধরেন। আমাদের জীবন সংগ্রামে জয়ী হওয়ার জন্য, পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশে খেয়ে বেঁচে থাকার জন্যই বিপর্যস্ত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করতে হবে। সমবায় নীতির মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনীতি সহজেই সমৃদ্ধ করা সম্ভব। সমবায় নীতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "আজকালকার দিনে অর্থশক্তি বিশেষ ধনী সম্প্রদায়ের মুঠোর মধ্যে আটকে পড়েছে। তাতে অল্প লোকের প্রতাপ ও অনেক লোকের দুঃখ। অথচ বহু লোকের কর্ম শক্তিকে নিজের হাতে সংগ্রহ করে নিতে পেরেছে বলেই ধনবানের প্রভাব। তার মূলধনের মানেই হচ্ছে বহু লোকের কর্মশ্রম তার টাকার মধ্যে রূপক মূর্তি নিয়ে আছে। সেই কর্ম শ্রম হচ্ছে সত্যকার মূলধন। এই কর্ম শ্রমই প্রত্যক্ষভাবে আছে শ্রমিকদের প্রত্যেকের মধ্যে। তারা যদি ঠিকমত করে বলতে পারে যে, 'আমরা আমাদের ব্যক্তিগত শক্তিকে এক জায়গায় মেলাব'– তাহলেই সেই হয়ে গেল মুলধন। স্বভাবের দোষে ও দুর্বলতায় কোন বিষয়েই যাদের মেলবার ও মেলাবার সাধ্য নেই তাদের দুঃখ পেতেই হবে। অন্যকে গাল পেড়ে বা ডাকাতি করে তাদের স্থায়ী সুবিধা হবে না।"[২৪]

ধনী পুঁজিবাদী শোষক শ্রেণীর হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে দরিদ্র গ্রামবাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবায় নীতির মাধ্যমে এগিয়ে আসতে হবে। বিবেকানন্দ সংঘ শক্তির মাধ্যমে অর্থনীতি তথা সকল প্রকার কল্যাণ সাধনের শিক্ষা দিয়েছেন। সমাজের অধিকৃত বিদ্যা বা শক্তি যদি সর্বস্তরে পৌঁছাতে না পারে তাহলে সে সমাজ ক্রমে ধ্বংস হয়। ধনীরা দরিদ্রদের অর্থ-সম্পদ অবৈধভাবে কুক্ষিগত করে সুখী হতে পারে না, কারণ তাদের ধ্বংস অনিবার্য, পরিণতি ভয়াবহ। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'বিদ্যাবুদ্ধি, ধন, জন, বল বীর্য- যা কিছু প্রকৃতি আমাদের নিকট সঞ্চিত করেন, তা পুনর্বার সঞ্চারের জন্য; একথা মনে থাকে না– গচ্ছিত ধনে আত্মবুদ্ধি হয়, অমনি সর্বনাশের সূত্রপাত।' প্রতিভাধর সৃষ্টিশীল সমাজ দার্শনিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দরিদ্র মানুষদের শোষক মহাজনদের হাত থেকে রক্ষার জন্য একটি ক্ষুদ্র ব্যাংক গঠন করে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। 'মহাজনদের হাত হতে চাষীদের রক্ষা করার প্রয়াসও তিনি চলালেন। এ জন্য তিনি শুরু করলেন কৃষক সমবায়। ন্যায্য সুদে অর্থ দেয় এমন একটি ব্যাংক গড়া হল। ধর্মগোলা থেকে বীজ ও শস্য বন্টন করা হত। তিনি তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়া সমুহ অর্থই জমা রেখেছিলেন তার জমিদারী ক্ষুদ্র সমবায় ব্যাংকে।'[২৫] রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিক্ষা ও দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে নিমজ্জিত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার করে দুঃখী-দরিদ্র মানুষ স্বনির্ভর হতে পারে। এটাই মুক্তির সহজ ও শ্রেষ্ঠ উপায়।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ

অর্থ বিভাগ অর্থ সঞ্চয় ও বিনিয়োগের জন্য বিশ্বস্ত অর্থ কর্মকর্তা বা একজন কোষাধ্যক্ষ, একজন সৎ শিক্ষক ও একজন বিশ্বস্ত আদায়কারী– এ তিন জনের নামে ব্যাংকে যৌথ একাউন্টে অর্থ সঞ্চয় করবে। কারণ কেউ যেন অর্থ-সম্পদ লুট করতে না পারে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। কারণ পত্রিকা ও বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে দেখা যায় বিভিন্ন এনজিও এবং প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তি টাকা লুট করে, আত্মসাৎ করে উধাও হয়। তাই গ্রামীণ অর্থনীতি দাঁড় করাতে যাতে অর্থ লুট হওয়ার কোন কারণ বা সন্দেহ না থাকে তার সকল ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থ বিভাগ দুটি কাজ পরিচালনা করবে।

প্রথমতঃ সদস্যগণ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করে সঞ্চয় ও তহবিল গঠন করবে।
দ্বিতীয়তঃ সঞ্চয়ের অর্থ প্রতিষ্ঠান ও সদস্যগণের উন্নয়ন কাজে বিনিয়েগ করবে।

এতে সদস্য সংখ্যা ও প্রতিষ্ঠানের অর্থ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাবে। যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যত বেশী অর্থ সঞ্চয় করবে, সে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তত বেশী শতকরা হারে লভ্যংশ পাবে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ সংগ্রহের উপায় ও খাত

মানুষ শূন্য হাতে পৃথিবীতে আসে, আবার শূন্য হাতে বিদায় নেয়। অনেকে দরিদ্র ঘরে জন্ম নিয়েও অনেক অর্থ-সম্পদের মালিক হয় কিভাবে? ভিখারী রাজা হয়, আবার রাজা ভিখারী হয় কিভাবে? কার্যকারণ নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক কাজেরই কারণ আছে। ধনী এবং দারিদ্র্যেরও কারণ আছে। দারিদ্র্যের কারণ উদ্যমহীন, শ্রমবিমুখ, অলসতা, সংকীর্ণ মানসিকতা, ধৈর্যহীন, অসন্তোষ, নৈতিক অবক্ষয় প্রভৃতি দোষ। আর ধনী হওয়ার কারণ উদ্যম কর্মঠ, উদারতা, সন্তোষ, ধৈর্যশীল ও নৈতিকতা প্রভৃতি গুণ। তাই ধনী হতে চাইলে দারিদ্র্যের দোষত্রুটি বর্জন করে ধনী হওয়ার গুণগুলো অর্জন করতে হয়। পৃথিবীতে অর্থের কোন অভাব নেই, যত অভাব সংকীর্ণ মনের ও সদিচ্ছার। নিঃস্ব পথের সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের মনে প্রবল ইচ্ছাশক্তি বলেই অর্থ সংগ্রহ করে মঠ মিশন স্থাপন করে বিশ্ববাসীর অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। তাঁর কঠোর শ্রম ও শিক্ষার বিনিময়ে ভক্তরা যে সামান্য অর্থ দেয় তা দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন বিশ্বের বিস্ময় শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির, বেলুড় মঠ। অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি পাশ্চাত্যে চলে যান। 'স্থায়ীভাবে নিজস্ব ভূমিতে মঠ স্থাপনের উদ্দেশ্যে স্বামীজী উক্ত সালের (১৮৯৮) ৫ই মার্চ ইংরেজ ভক্ত মহিলা মিস হেনরিয়েটা মূলার এবং মার্কিন ভক্তমহিলা মিসেস ওলি বুলের অর্থ সাহায্যে (৩৯০০০ টাকা মুদ্রার) যেখানে বর্তমান বেলুড় মঠ বিদ্যমান, সেই বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের কিয়দংশ ক্রয় করিয়া নূতন মঠ নির্মাণ কার্যে তৎপর হইলেন।'[২৬] রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ, লোকশিক্ষা পরিষদ এবং গ্রাম সংগঠনগুলোর দৃষ্টান্ত গ্রহণ করে আমরাও অর্থ সংগ্রহের পথ খুঁজতে পারি। আমাদের কাজ উদ্যোগী হয়ে আমাদেরই করতে হবে। আমরা গ্রাম কার্যালয়ের সদস্য, বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে অর্থ সংগ্রহ করতে পারি। এর সাথে যোগ হবে গ্রামের সম্পদ। সমাজ বিজ্ঞানী, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশ ভাবনা' প্রবন্ধে সমাজ উন্নয়ন এবং অর্থ সংগ্রহের শিক্ষা আমরা গ্রহণ করতে পারি। সদস্যগণ সমবায়ের ভিত্তিতে অর্থ সংগ্রহ করবে। দু'ভাবে অর্থ সঞ্চয় হবে। যথা– (ক) প্রত্যক্ষ সঞ্চয় ও (খ) পরোক্ষ সঞ্চয়।

(ক) প্রত্যক্ষ সঞ্চয়

সরাসরি নগদ অর্থ এবং যেসব কাজ বা শ্রমের বিনিময়ে যে অর্থ আসে তা হল প্রত্যক্ষ সঞ্চয়। বিবেকানন্দের বীর গ্রাম সৈনিকগণ কোন ক্রমেই লক্ষ্যচ্যুত হবে না। তারা যে কোন মূল্যেই হোক লক্ষ্যে পৌঁছবেন। তাই তারা নিম্নলিখিত খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করবেন।

১. সদস্যগণের প্রতিষ্ঠানে ভর্তি ফি।
২. বার্ষিক গ্রামোন্নয়ন ফি। 'সমাজবর্তী প্রত্যেকেই নিজের আয়ের নির্দিষ্ট অংশ কর স্বরূপ সমাজকে দিতে হইবে।'[২৭]
৩. বিবাহ ও শুভ কাজে বিশেষ ফি। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'বিবাহাদি ক্রিয়া কর্মে সামাজিকগণ যে ব্যয় করিবেন তাহার অন্তত শতকরা আট আনা সমাজে দান করিতে হইবে।'[২৮]
৪. বিশেষ দান: এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'প্রত্যেক সামাজিকের বাড়িতে একটি করিয়া বাক্স থাকিবে। এ বাক্সে পরিবারস্থ ব্যক্তিগণের স্বেচ্ছা প্রদত্ত খুচরা দান জমা হইবে। মাসের শেষে এই দান সমাজের বাক্সে গৃহীত হইবে। কোন বাক্স হইতে কত গৃহীত হইল তাহা যাহাতে অগোচর থাকে, সেইরূপ উপায় অবলম্বিত হইবে।'[২৯]
৫. সদস্যগণ আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী প্রতি সপ্তাহ, মাস বা এককালীন সঞ্চয়ের অর্থ জমা দিবেন। সদস্যগণ যত বেশী ইচ্ছা সঞ্চয় করতে পারেন। কারণ তিনি মূল ধনের লভ্যাংশ শতকরা হারে পাবেন। মূলধন কখনও প্রতিষ্ঠানের কোন কাজে খরচ করা যাবে না। তা সদস্যদের প্রাপ্য, পবিত্র আমানত।
৬. সদস্যগণ সমাজ সেবক, বিত্তবান, শিল্পপতি, রাজনীতিবিদ, দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ব্যক্তির আর্থিক সহযোগিতা ও দান গ্রহণ করতে পারেন।
৭. বেসরকারি বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক, বীমা থেকে আর্থিক সহায়তা গ্রহণ।
৮. বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান, যেমন- সমাজসেবা, সমাজকল্যাণ, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সেবা ও বৃত্তি, বিভিন্ন প্রজেক্ট ও পূনর্বাসন, দান ও ত্রাণ প্রভৃতি খাতের অর্থ সংগ্রহ।
৯. বিদেশী প্রতিষ্ঠান- সদস্যগণ বিভিন্ন বিদেশী প্রতিষ্ঠান, এনজিও, ব্যাংক বীমা, সাহায্য সেবা, পুনর্বাসন, দান, ত্রাণ, বৃত্তি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রভৃতি খাতের অর্থ সংগ্রহ করবেন।
১০. ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ- সদস্যগণ বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের অর্থ সংগ্রহ করতে পারেন। যেমন- ইসলাম ধর্মে দুঃখী দরিদ্র মানুষের অভাব মোচন ও পুনর্বাসনের জন্য যাকাতের বিধান রয়েছে। সদস্যগণ যাকাত আদায় ও ধর্মীয় বিধান অনুসারে মানুষের কল্যাণে ব্যয় করবেন।

Dhaka University Institutional Repository

১১. সদস্যগণ কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজ চুক্তিতে নিয়ে তা যৌথভাবে সম্পন্ন করে অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন।

১২. সদস্যগণ গ্রাম কার্যালয়ের চিকিৎসা বিভাগ থেকে হেল্‌থ কার্ড (Health card)-এর মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে চিকিৎসা সেবা নিয়ে অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন।

১৩. প্রতিষ্ঠানের মালিকানার নামে বিপনন বা ব্যবসায় অর্থ বিনিয়োগ করে এবং সদস্যগণ সুলভ মূল্যে পণ্য ক্রয় করে অর্থ সঞ্চয় করতে পারেন।

১৪. শিক্ষিত বেকার, আগ্রহী সদস্য-সদস্যাগণ দরিদ্র এতিম অমনোযোগী, পিছিয়ে পড়া দুর্বল ছাত্রদের স্বল্প বেতনে গৃহ শিক্ষা দিতে পারেন। এতে শিক্ষার্থীদের যেমন উপকার হবে, তেমনি শিক্ষক বিনিময়ে পাবেন সম্মান ও অর্থ। এ অর্থ থেকে একটি অংশ সঞ্চয় করতে পারেন।

১৫. প্রতিষ্ঠান অর্থ সঞ্চিত না রেখে সুবিধামত ঝুঁকি মুক্ত খাতে বিনিয়োগ করবে।

১৬. গ্রামের রাস্তাঘাট, খাল-বিল, নদী-জলাশয়, পরিত্যক্ত ঘরবাড়ী, জনশক্তি ও প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে অর্থ সঞ্চয় হবে। কেউ চুরি করে সরকারি গাছ না কেটে, সমবেতভাবে গাছ লাগিয়ে যৌথ উন্নয়ন করবে।

গতিশীল অর্থনীতি

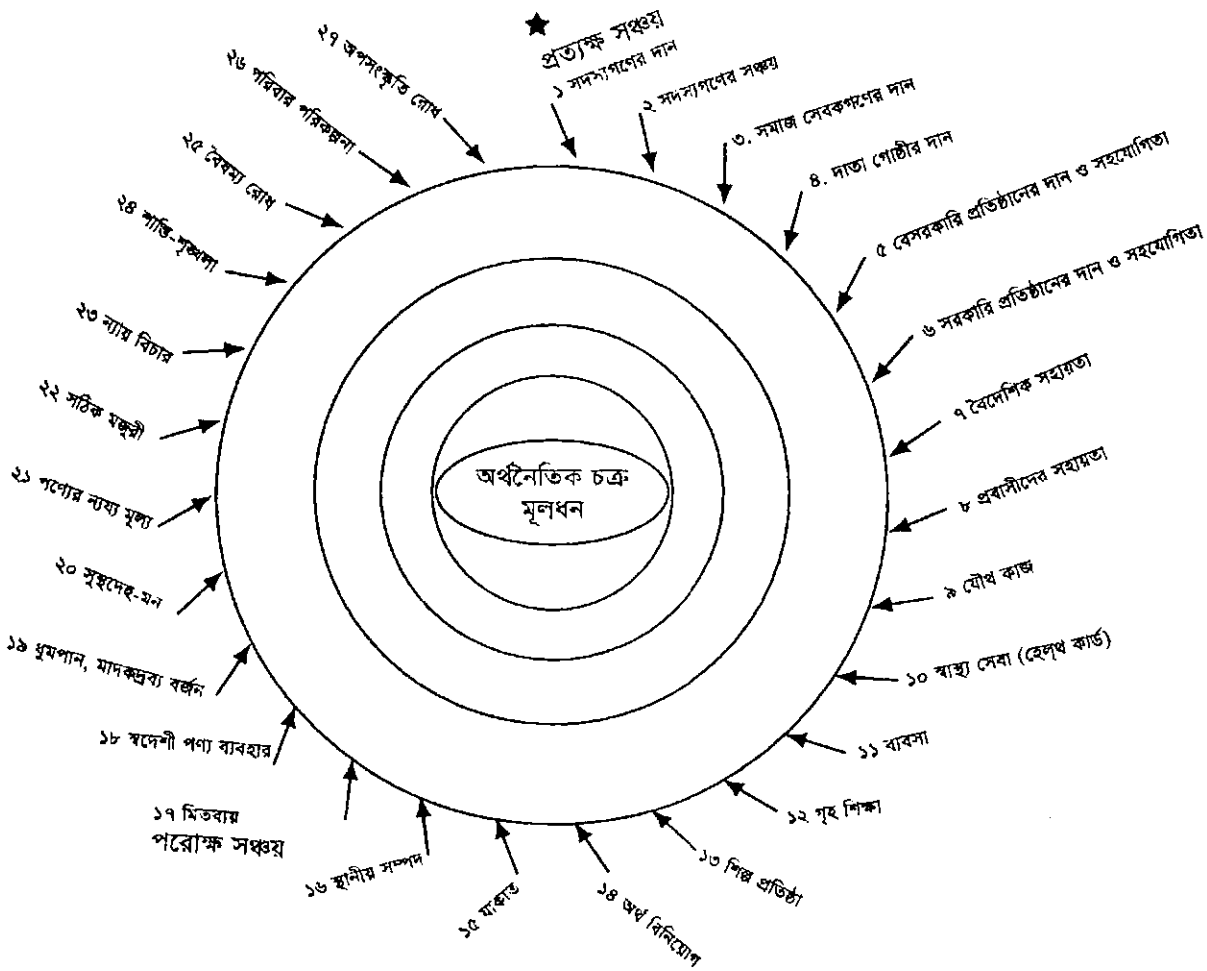

গতিশীল অর্থনীতির সঞ্চয় প্রক্রিয়া

Dhaka University Institutional Repository

(খ) পরোক্ষ সঞ্চয়

যে সব কাজ বা শ্রমের ফলে অপচয় রোধ হয়, অথবা কোন অর্থ ব্যয় হয় না, তাতে পরোক্ষভাবে অর্থ সঞ্চয় হয়। যেমন ধুমপান বা মাদকাসক্তি বর্জন।

১. মিতব্যয় একটি মহৎ গুণ। অপরিকল্পিত ভাবে অর্থ ব্যয় না করে উন্নয়নমূলক কাজে অর্থ ব্যয় হলে তাতে অর্থ সঞ্চয় হয়।

২. কম মূল্যে অনেক ভাল স্বদেশীয় পণ্য রয়েছে, সেগুলো ব্যবহার করলে অর্থ সঞ্চয় হয় এবং দেশী শিল্প টিকে থাকে।

৩. ধুমপান ও মাদকদ্রব্য বর্জন করবে। এতে অনেক অর্থ সাশ্রয় হয়।

৪. সুস্থ দেহ ও সুস্থ মনে কাজ ভাল হয়, এতে অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা আসে।

৫. পণ্যের ন্যায্য মূল্য দেওয়া হলে কৃষকের হাতে অর্থ আসে।

৬. কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের ন্যায্য মজুরী বা পারিশ্রমিক দিতে হবে। এতে তাদের আর্থিক কষ্ট অনেকটা দূর হবে এবং দেশে স্বচ্ছলতা আসবে।

৭. সামাজিক ন্যায়-বিচার, শান্তি-শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীল পরিবেশ, কাজকর্ম ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অনকূল পরিবেশ সৃষ্টি হলে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন হয়। অপর দিকে অন্যায়, অবিচার, শোষণ, ঝগড়া-বিবাদ, চিকিৎসা ও মামলা-মোকদ্দমার জন্য অর্থ ব্যয় হয়। অবরোধ, ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতি কারণে যোগাযোগ বন্ধ হলে এবং অফিস আদালত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হলে ব্যাপক অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়।

৮. পরিবার-পরিকল্পনা: অর্থাৎ দুটি সন্তান ও সংসার ছোট হলে শান্তি-শৃঙ্খলা আসে এবং খরচ কম হয়। বেশি সন্তান হলে অশান্তি সৃষ্টি হয় ও খরচ বেড়ে দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়।

অর্থ বিনিয়োগ

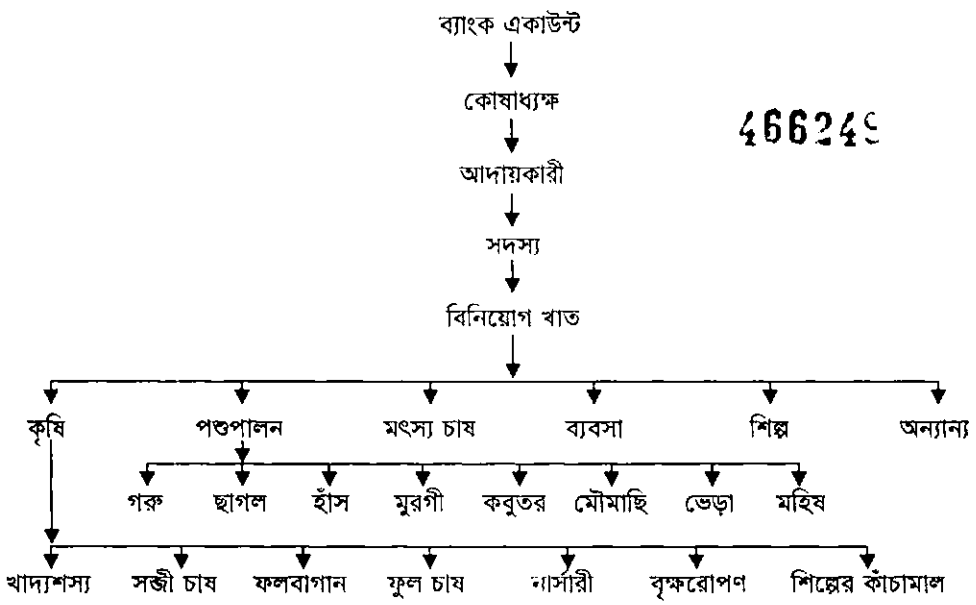

466249

Dhaka University Institutional Repository

বিনিয়োগ চক্র

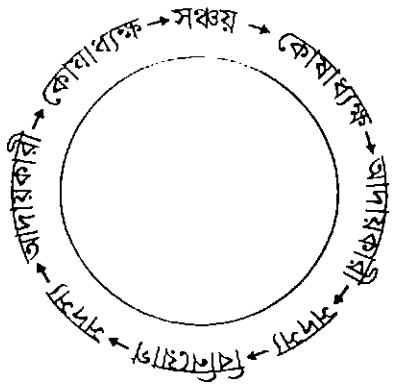

এভাবে গড়ে উঠবে জাতীয় অর্থনীতি

ব্যাংকে যথেষ্ট পরিমাণ টাকা জমা হলে কমিটি প্রতিষ্ঠানের নামে এবং সদস্যদের সমপরিমাণ অর্থ বা সম্পদ বন্ধক বা জামানত দিয়ে বিনিয়োগ করবে। যাতে অর্থ পরিশোধ করতে না পারলেও সম্পদ বিক্রয় করে তা উঠান যায়। সদস্যগণ লাভজনক খাতে অর্থ বিনিয়োগ করবে। সম্ভাব্য খাতগুলো হল- কৃষি, নার্সারী, ফল বাগান, বৃক্ষরোপণ, পশু পালন, মৎস্য চাষ, ব্যবসা, শিল্প প্রভৃতি। সদস্যগণ নির্দিষ্ট সময়ে লভ্যাংশ এবং শেষে মূলধন ফিরিয়ে নিবে। বিনিয়োগকৃত অর্থ সদস্যদের নিকট থেকে ব্যাংকে জমা হবে, আবার ব্যাংক থেকে সদস্যদের কাছে আসবে। এভাবে বার বার অর্থ বিনিয়োগে সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে। সদস্যগণের ত্যাগ, আন্তরিকতা ও শ্রমের বিনিময়ে অর্থ সংগ্রহ ও সঞ্চয় করবে। প্রতিষ্ঠান বিনিয়োগ ছাড়াও সদস্যদের সুবিধার্থে সুদমুক্ত ঋণ দিবে। এতে অনেক বেকার মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এতে তারা ক্রমে স্বচ্ছল হয়ে উঠবে। এ প্রতিষ্ঠান কোন ক্রমেই সুদে অর্থ লেনদেন করবে না, কারণ সুদ অবৈধ। অসৎ উপার্জন আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভের অন্তরায়। ইসলাম ধর্মে সুদ হারাম। বিবেকানন্দ বলেন, সৎ উপার্জনে চিত্ত শুদ্ধি হয়। যৌথ অর্থ বিনিয়োগে গড়ে উঠবে যৌথ মালিকানা। এ প্রতিষ্ঠানের অর্থ-সম্পদ কেউ যেন কখনও ধ্বংস লুট, আত্মসাৎ এবং চুরি ও ডাকাতি করতে না পারে, সে জন্য সবাই সতর্ক দৃষ্টি রাখবে। প্রত্যেক সদস্য এই গ্রাম, এই দেশ ও এই বিশ্বের সাফল্য এবং গৌরবের অংশীদার, মালিক। সকলেই সমান সুযোগ সুবিধা পাবে।

৩. শিক্ষা বিভাগ

স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়ে মানুষ গড়ার এক গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ হলো শিক্ষা বিভাগ। এ বিভাগ পরিচালনা করবেন একজন শিক্ষা কর্মকর্তা। তিনি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সহায়তায় গ্রামের শিক্ষক, সমাজসেবক ও সিনিয়র ছাত্রছাত্রী, শিক্ষানুরাগীদের সমন্বয়ে একটি 'গ্রাম শিক্ষা কমিটি' গঠন করবেন। কমিটির সদস্যগণ গ্রামের স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসা, আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে সহযোগিতা করবেন। গ্রামোন্নয়নের শিক্ষানীতি সম্পর্কে বিবেকানন্দ হার্বার্ট স্পেন্সারের 'মঠ পদ্ধতি' (Monastery system of education) এর শিক্ষা দর্শন উল্লেখ করেন। 'এই পদ্ধতি অনুসারে গ্রামে একজন শিক্ষক থাকিবেন, তাঁহার ভার ঐ গ্রামকে লইতে হইবে।...প্রত্যেক বালক একটি ছোট মাদুরের আসন লইয়া আসে। তাল পাতাতে লেখা আরম্ভ হয়, কারণ কাগজের দাম অনেক। প্রত্যেকটি বালক তাহার আসন বিছাইয়া বসে, দোয়াত ও পুস্তক সঙ্গে লইয়া আসে এবং লিখিতে আরম্ভ করে।...এই সকল আচার্যের ব্যয়নির্বাহের জন্য ধনী পরিবারের লোকেরা বিবাহ-শ্রাদ্ধাদি উপলক্ষে তাঁহাদিগকে দান করিতেন। বিশেষ বিশেষ দানের অধিকারি বলিয়া তাঁহারা বিবেচিত হইতেন এবং আচার্য দিগকেও ছাত্রগণকে প্রতিপালন করিতে হইত।'[৩০] গ্রামবাসীদের দান ও শিক্ষার্থীদের সামান্য বেতনে শিক্ষকগণের বেতন দেওয়া সম্ভব হবে।

'শিক্ষা কমিটি' গ্রামের সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনে আরও নতুন শিক্ষা কেন্দ্র গড়ে তুলবেন। এসব কেন্দ্রের শিক্ষার্থী হবে পিছিয়ে পড়া, অমনোযোগী, দরিদ্র, অনগ্রসর ও ঝরে পড়া ছাত্রছাত্রী। বয়স্কদের জন্য থাকবে গণ-শিক্ষা কেন্দ্র। কমিটি অধিক শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণের সুবিধার্থে শিক্ষা কর্মসূচি, শিক্ষা উপকরণ, পাঠ দানের সময়সূচি নির্ধারণ করবে। ছেলে ও মেয়েদের পৃথক শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'সে জন্য আমার ইচ্ছা, কতকগুলি ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণী তৈরী করব। ব্রহ্মচারীরা কালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে দেশে-দেশে, গাঁয়ে-গাঁয়ে গিয়ে mass-এর (জনসাধারণের) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে যত্নপর হবে। আর ব্রহ্মচারিণীরা মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার

Dhaka University Institutional Repository
করবে।'[৩১] বিবেকানন্দ শিক্ষয়িত্রীদের গুণ ও কর্ম সম্পর্কে বলেন, '...স্ত্রীলোক না হলে কি ছাত্রীদের এমন করে শিক্ষা দিতে পারে?...শিক্ষিতা, বিধবা ও ব্রহ্মচারিণীগণের ওপরই স্কুলের শিক্ষার ভার সর্বদা রাখা উচিত।'[৩২] পুরুষদের জন্য যেমন কতকগুলি শিক্ষা কেন্দ্র করতে হবে, মেয়েদের শিক্ষা দিতেও তেমনি কতকগুলি কেন্দ্র করতে হবে। শিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা ব্রহ্মচারিণীরা ঐ সকল কেন্দ্রে মেয়েদের শিক্ষার ভার নিবে।

শিক্ষা

শিক্ষা হলো কোন বিষয় জানা বা কোন বিষয় জেনে অভ্যাসের মাধ্যমে আয়ত্ব করা। সাধারণত লেখা-পড়া বা বিদ্যার্জনকেই শিক্ষা বলা হয়। বিবেকানন্দ অন্তর্নিহিত ব্রহ্মের বিকাশ সম্পর্কে বলেন, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান, তারই প্রকাশ। শিক্ষার্থীরা শিক্ষার মাধ্যমে অন্তর্দৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি লাভ করবে। শিক্ষক তাদের মহৎ ও উচ্চভাব শিক্ষা দিবেন। উচ্চ ভাবনাগুলিকেও জীবনে কার্যকরী করা যায়। লক্ষ্য স্থির করে, যোগ্য আচার্যের নির্দেশ মেনে, সশ্রদ্ধ অনুশীলন করলে, অবশ্যই আদর্শকে নিজ নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা যায়। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের যথার্থ মানুষে পরিণত করে। মনুষ্যত্ব বলতে আমরা বুঝি কতকগুলি সৎভাবকে। দয়া, ক্ষমা, সত্যনিষ্ঠা, ত্যাগ, পবিত্রতা প্রভৃতি মহৎ গুণাবলী তো মানুষের থাকেই। মানব হৃদয়ে সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগ্রত করাই শিক্ষা। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'অশেষ জ্ঞান ও অনন্ত শক্তির আকর ব্রহ্ম প্রত্যেক নরনারীর অভ্যন্তরে সুপ্তের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন: সেই ব্রহ্মকে জাগরিত করাই শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য।'[৩৩] বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানরাশি ভাব বিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করতে পারে না, শিক্ষা মজ্জাগত হয়ে কৃষ্টিতে পরিণত হলেই ভাব বিপ্লবের ধাক্কা সহ্য করতে পারে। বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান মজ্জাগত হয়ে সংস্কারে পরিণত হলেই মানবকল্যাণ সাধিত হয়। "মানব জাতির চরম লক্ষ্য-জ্ঞান লাভ।...সুখ-দুঃখ উভয়েই তাহার মহান শিক্ষক, সে শুভ হইতে যেমন, অশুভ হইতেও তেমন শিক্ষা পায়। সুখ-দুঃখ যেমন আমাদের উপর দিয়া চলিয়া যায়, অমনি তাহারা উহার উপর নানাবিধ চিত্র রাখিয়া যায়, আর এই চিত্র সমষ্টির বা সংস্কার সমষ্টির ফলকেই আমরা মানুষের 'চরিত্র' বলি।...জগতের মহাপুরুষগণের চরিত্র আলোচনা করিলে দেখা যায়, অধিকাংশ স্থলে সুখ অপেক্ষা দুঃখ তাঁহাদিগকে অধিক শিক্ষা দিয়াছে ধনৈশ্বর্য অপেক্ষা দারিদ্র্য অধিক শিক্ষা দিয়াছে, প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দারূপ আঘাতই তাঁহাদের অন্তরের অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে অধিক পরিমাণে সাহায্য করিয়াছে।"[৩৪] দুঃখ ও দারিদ্র্যের আঘাতে আত্মার সুপ্ত শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ ঘটে।

'...পুনঃ পুনঃ অনুভূত নানাবিধ ভয়ের সংস্কার কালক্রমে জীবনের প্রতি এই মমতায় পরিণত হইয়াছে। এই কারণেই বালক অতি বাল্যকাল হইতেই স্বাভাবিকভাবে ভয় পাইয়া থাকে, কারণ তাহার মনে দুঃখযন্ত্রণার পূর্ব অভিজ্ঞতা রহিয়াছে।'[৩৫] 'অনেক সময়ে এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যখন কুক্কুটী দ্বারা হংস ডিম্ব ফুটানো হইয়াছে, তখন হংস শাবক ডিম্ব হইতে বাহির হইবা মাত্র জলের দিকে চলিয়া গিয়াছে; কুক্কুটী-মাতা মনে করে, শাবকটা বুঝি জলে ডুবিয়া গেল।'[৩৬] পূর্ব সংস্কারের কারণেই হংস শাবক সাঁতার কাটে। প্রকৃত শিক্ষা সংস্কাররূপে আত্মায় সঞ্চিত থাকে, যা সহজে পরিবর্তন হয় না।

আমরা রাস্তার একটা কুকুরকে কিভাবে চিনি? যখন আমাদের মনের উপর কুকুরের ছাপ পড়ে তখন আমরা মনের ভিতরকার স্তরে স্তরে সাজানো পূর্ব সংস্কার গুলোকে মিলানোর চেষ্টা করি। এভাবে কুকুরের নতুন ধারণার সাথে পুরাতন সংস্কার মিলিত হলে মনে তৃপ্তি আসে। তখন আমরা সেটাকে কুকুর বলি। "যখন উহার তুল্য সংস্কার আমার ভিতরে দেখিতে পাই না, তখনই আমার অতৃপ্তি আসে। এইরূপ হইলে উহাকে 'অজ্ঞান' বলে। আর তৃপ্তি হইলেই উহাকে 'জ্ঞান' বলে।"[৩৭] "জ্ঞানের আলো জ্বাল, এক মুহূর্তে সব অশুভ চলিয়া যাইবে। নিজের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ কর, প্রকৃত 'আমি'কে– সেই জ্যোতির্ময়, উজ্জ্বল, নিত্যশুদ্ধ 'আমি'কে প্রকাশ কর; প্রত্যেক ব্যক্তিতে সেই আত্মাকে দর্শন কর।"[৩৮] আত্মায় সঞ্চিত পূর্ব সংস্কারের কারণে শিশু কুকুর দেখে ভয় পায় এবং ফুল ভালবাসে। জ্যোতির্ময় আত্মদর্শনই প্রকৃত শিক্ষার লক্ষ্য।

বাল্য শিক্ষা

বালক বালিকারা প্রথমে পিতামাতা ও পরে শিক্ষকদের আচরণ অনুকরণ ও অনুসরণ করে। এজন্য পিতামাতা ও শিক্ষকগণের বিদ্যাবত্তা ও সৎজীবন ধারার দৃষ্টান্ত থাকা প্রয়োজন। গৃহ ও বিদ্যালয়ের সম্পর্ক বিষয়ে শিক্ষাব্রতী নিবেদিতা বলেন, শিক্ষার প্রকৃত মর্ম তার আদর্শের মধ্যে নিহিত। বিদ্যালয় ও গৃহ উভয়কে পরস্পরের পরিপূরক হতে হবে। কিন্তু এ দুটির মধ্যে গৃহই হবে প্রধান। বিদ্যালয় থাকবে গৃহের অধীন, গৃহ বিদ্যালয়ের অধীন নয়। অতএব বলা

Dhaka University Institutional Repository

যায়, একটি ভারতীয় বালিকার (বালকেরও) শিক্ষা এভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত যে, যাতে সে আরও যথার্থভাবে ভারতীয় নারীতে বা পুরুষে পরিণত হতে পারে। দেশের সুসন্তানেরা যেন শৈশবে হবে জাতীয় বৃক্ষের শোভা বর্ধনের ফুল, তারুণ্যে হবে সুমিষ্ট ফল এবং পরিণত বয়সে অবস্থান করবে সুদৃঢ় মূল রূপে, তার শাখা-প্রশাখা রস সঞ্চার করবে– এই আমাদের আদর্শ ও শুভ কামনা। বিবেকানন্দ বলেন, 'অতি শৈশবাবস্থা হইতেই তোমাদের সন্তানগণ তেজস্বী হউক, তাহাদিগকে কোনরূপ দুর্বলতা, কোনরূপ বাহ্য অনুষ্ঠান শিক্ষা দিবার প্রয়োজন নাই। তাহারা তেজস্বী হউক, নিজের পায়ে নিজেরা দাঁড়াক, সাহসী সর্ব জয়ী সর্বংসহ হউক। সর্ব প্রথমে তাহারা আত্মার মহিমা সম্বন্ধে জানুক।'[৩৯] প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে স্বনির্ভর করে।

শিক্ষায় পিতা-মাতার প্রভাব

উন্নতির জন্য প্রথম প্রয়োজন-স্বাধীনতা। পিতামাতার অসঙ্গত শাসনের জন্য ছেলেমেয়েরা স্বাধীনভাবে বৃদ্ধি হওয়ার সুযোগ পাবে না। পিতা-মাতার উচিত শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দেওয়া। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "জোর করে সংস্কারের চেষ্টার ফল এই যে, তাতে সংস্কার বা উন্নতির গতিরোধ হয়। কউকে বলো না– 'তুমি মন্দ', বরং তাকে বল– 'তুমি ভালই আছ, আরও ভাল হও।'...যদি তুমি কাউকে সিংহ হতে না দাও তা হলে সে ধূর্ত শৃগাল হয়ে দাঁড়াবে। কাহার কল্যাণ করিতে পার- এ ধারণা ছাড়িয়া দাও। তবে যেমন বীজকে জল মৃত্তিকা বায়ু প্রভৃতি তাহার বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় জিনিসগুলি যোগাইয়া দিলে উহা নিজ প্রকৃতির নিয়মানুযায়ী যাহা কিছু আবশ্যক গ্রহণ করে এবং নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী বাড়িতে থাকে, তোমরাও সেই ভাবে অপরের কল্যাণ সাধন করিতে পার।"[৪০] শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বিকাশের সুযোগ দিলে মহামানবে পরিণত হবে, অন্যথা শিশুদের প্রতিভা বিকাশের সুযোগ না দিলে বাধাগ্রস্ত হয়ে বিকৃত মানসিকতা সৃষ্টি হবে এবং দুষ্কৃতকারী মানুষে পরিণত হয়ে সমাজের অমঙ্গল সাধন করবে।

শিক্ষকের কর্তব্য

একটি শিশু চারা গাছের মত প্রাকৃতিক নিয়মে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকশিত হয়। শিক্ষক শুধু বাধাগুলো দূর করে শিশুকে নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী বৃদ্ধি হতে সাহায্য করতে পারেন। কোন শিশু বিকাশের প্রকৃতি সম্পর্কে না জেনে, তার মাথায় জোর করে শিক্ষকের ভাব ঢুকিয়ে দিলে, শিশুর মানসিক কষ্ট হয় ও উন্নতি বাধা প্রাপ্ত হয়। তাই শিশুর শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'শিশু নিজে নিজেই শিখিয়া থাকে।...নিজস্ব নিয়মানুসারেই জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়া থাকে। মাটিটা একটু খুঁড়িয়া দিন, যাহাতে অঙ্কুর সহজে বাহির হইতে পারে; চারিদিকে বেড়া দিয়া দিতে পারেন, যেন কোন জীব-জন্তু চারাটি না খাইয়া ফেলে; এই টুকু দেখিতে পারেন যে, অতিরিক্ত হিমে বা বর্ষায় যেন উহা একেবারে নষ্ট না হইয়া যায়– ব্যস, আপনার কাজ ঐখানেই শেষ।...বাকিটুকু অন্তর্নিহিত প্রকৃতির বহির্বিকাশ। শিশুর শিক্ষা সম্বন্ধেও এইরূপ।'[৪১] শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বাধাগুলো অপসারণ করে স্বাভাবিক ও প্রাকৃতিক নিয়মে বর্ধিত হওয়ার সুযোগ করে দিতে হয়।

বিবেকানন্দ শিক্ষায় গণচেতনা সম্পর্কে বলেন, আমাদের কাজ হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষ-সমাজের সকলকে শিক্ষা দেওয়া। সেই শিক্ষার ফলে তারা কোনটি ভাল, কোন্‌টি মন্দ সব বুঝতে পারবে এবং নিজেরা মন্দটা করা ছেড়ে দেবে। তখন আর জোর করে সমাজের কোন বিষয় ভাঙতে গড়তে হবে না। বিবেকানন্দ কঠিন জীবন সংগ্রামে ঝরে পড়া ছেলেমেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে বলেন, 'যদি আমরা গ্রামে গ্রামে অবৈতনিক বিদ্যালয় খুলিতে সক্ষমও হই, তবু দরিদ্র ঘরের ছেলেরা সে-সব স্কুলে পড়িতে আসিবে না ; তাহারা বরং ঐ সময় জীবিকার্জনের জন্য হাল চাষ করিতে বাহির হইয়া পড়িবে।...কিন্তু আমি ইহারই মধ্যে একটি পথ বাহির করিয়াছি। তাহা এই–যদি পর্বত মহম্মদের নিকট না-ই আসে তবে মহম্মদকেই পর্বতের নিকট যাইতে হইবে। দরিদ্র লোকেরা যদি শিক্ষার নিকট পৌঁছিতে না পারে (অর্থাৎ নিজেরা শিক্ষা লাভে তৎপর না হয়), তবে শিক্ষাকেই চাষীর লাঙ্গলের কাছে, মজুরের কারখানায় এবং অন্যত্র সব স্থানে যাইতে হইবে।'[৪২]

বয়স্ক শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দ আধুনিক বিজ্ঞান ভিত্তিক শিক্ষার কথা বলেন, 'শহরের সর্বাপেক্ষা দরিদ্রগণের যেখানে বাস, সেখানে একটি মৃত্তিকা– নির্মিত কুটির ও হল প্রস্তুত কর। গোটা কতক ম্যাজিক-লণ্ঠন, কতকগুলি ম্যাপ, গ্লোব এবং কতকগুলি রাসায়নিক দ্রব্য জোগাড় কর। প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় সেখানে গরীব, অনুন্নত, এমন কি চণ্ডালগণকে পর্যন্ত জড়ো কর; তাহাদিগকে প্রথমে ধর্ম-উপদেশ দাও, তারপর ঐ ম্যাজিক লণ্ঠন ও অন্যান্য দ্রব্যের সাহায্যে জ্যোতিষ, ভূগোল প্রভৃতি চলিত ভাষায় শিক্ষা দাও। অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত একদল যুবক গঠন কর। তোমাদের উৎসাহাগ্নি

Dhaka University Institutional Repository
তাহাদের ভিতর জ্বালিয়া দাও।'[৪৩] বিজ্ঞান মনস্ক বিবেকানন্দের বাস্তব ও কর্মমুখী শিক্ষার প্রয়োগে দারিদ্র ও অনুন্নত যুব সমাজ দ্রুত স্বনির্ভর হবে।

স্ত্রী শিক্ষা

এদেশে প্রাচীন আরণ্য শিক্ষাকেন্দ্রে বালক-বালিকার সমানাধিকার ছিল, তার চেয়ে অধিকতর সাম্য আর কি হতে পারে? স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'ধর্ম, শিল্প, বিজ্ঞান, ঘরকন্না, রন্ধন, সেলাই, শরীর পালন- এ সব বিষয়ের স্থূল মর্মগুলিই মেয়েদের শেখানো উচিত। নভেল নাটক ছুঁতে দেওয়া উচিত নয়।...কেবল পূজা পদ্ধতি শেখালেই হবে না; সব বিষয়ে চোখ ফুটিয়ে দিতে হবে। আদর্শ নারীচরিত্রগুলি ছাত্রীদের সামনে সর্বদা ধরে উচ্চ ত্যাগ রূপ ব্রতে তাদের অনুরাগ জন্মে দিতে হবে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, লীলাবতী, খনা, মীরা-এঁদের জীবনচরিত মেয়েদের বুঝিয়ে দিয়ে তাদের নিজেদের জীবন ঐরূপে গঠিত করতে হবে।'[৪৪] ছাত্রীদের ধর্ম পরায়ণ ও নীতি পরায়ণ করতে হবে যাতে তারা ভাল গিন্নী তৈরী হয়। মেয়েদের শিক্ষা দিয়ে ছেড়ে দিবে। তারপর নিজেরাই ভেবে চিন্তে যা হয় করবে বিয়ে করে সংসারী হলেও শিক্ষিতা মেয়েরা নিজ নিজ পতিকে উচ্চভাবের প্রেরণা দিবে এবং বীর পুত্রের জননী হবে।' বৈদিক যুগে মৈত্রেয়ী, গার্গী প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয়া মেয়েরা ব্রহ্ম বিচারে ঋষি স্থানীয়া হয়ে রয়েছেন। তখন মেয়েদের যে অধিকার ছিল এখনও সেই অধিকার থাকবে না কেন ? কারণ, Histroy repeats itself- ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয়।

বিদ্যালয়ের বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ

শিক্ষকগণ শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্ব সুলভ আচরণ করবে। কোমলমতি শিশুদের প্রতি কখনও ভীতিপূর্ণ আচরণ করবে না। শিক্ষার্থীদের প্রতি মাতৃসুলভ, পিতৃসুলভ বা বন্ধুসুলভ আচরণ করলে বিদ্যালয়ে গৃহের মত আনন্দদায়ক শিক্ষণীয় ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশ গড়ে উঠবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সংস্কৃতি খেলাধুলা বিনোদন প্রভৃতি আরও আনন্দদায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করবে। এতে শিক্ষার্থীরা আগ্রহ করে বিদ্যালয়ে আসবে। রবীন্দ্রনাথ প্রতিকূল পরিবেশের শিক্ষা মোটেই পছন্দ করেননি। তাই তিনি শান্তিনিকেতনে তাঁর শিক্ষাদর্শন বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট হন। "...রবীন্দ্রনাথ অল্প বয়সে তখনকার ইস্কুলের রীতিপ্রকৃতি এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের আচরণ সহ্য করতে পারেন নি। তারই বেদনায় যেন গড়েছিলেন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়।...সকল দেশেই শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ জীবন-যাত্রায় যোগ আছে। আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি, ডাক্তারি, ডেপুটিগিরি, দারোগাগিরি, মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে–প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষায় প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারের চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও পৌছায় নাই। অন্য কোনো শিক্ষিত দেশে এমন দুর্যোগ ঘটিতে দেখা যায় না। তাহার কারণ, আমাদের নূতন বিশ্ববিদ্যালগুলি দেশের মাটির উপরে নাই, তাহা পরগাছার মতো পরদেশীয় বনস্পতির শাখায় ঝুলিতেছে। ভারতবর্ষে যদি সত্য বিদ্যালয় স্থাপিত হয় তবে গোড়া হইতে সে বিদ্যালয় তাহার অর্থশাস্ত্র, তাহার কৃষিতত্ত্ব, তাহার স্বাস্থ্যবিদ্যা, তাহার সমস্ত ব্যবহারিক বিজ্ঞানকে আপন প্রতিষ্ঠাস্থানের চতুর্দিক্‌বর্তী পল্লীর মধ্যে প্রয়োগ করিয়া দেশের জীবনযাত্রার কেন্দ্রস্থান অধিকার করিবে। এই বিদ্যালয় উৎকৃষ্ট আদর্শে চাষ করিবে, গোপালন করিবে, কাপড় বুনিবে এবং নিজের আর্থিক সম্বল লাভের জন্য সমবায়- প্রণালী অবলম্বন করিয়া ছাত্রশিক্ষক ও চারি দিকের অধিবাসীদের সঙ্গে জীবিকার যোগে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হইবে। এইরূপ আদর্শ বিদ্যালয়কে আমি 'বিশ্ব ভারতী' নাম দিবার প্রস্তাব করিয়াছি।"[৪৫] রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন 'বিশ্বভারতী' শিক্ষা ও কর্মের সমন্বয়ে মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার জন্য বাস্তব রূপ লাভ করেছে।

পাঠ্যসূচি

স্বনির্ভর উন্নত ও মহৎ জীবনের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি শ্রেণীতে আবশ্যিক বা বাধ্যতামূলক বিষয় রাখতে হবে ধর্ম নীতিবিদ্যা ও দেশপ্রেম। এরপর স্বনির্ভর দেশ গড়ার জন্য বাস্তবতা ভিত্তিক কর্মমূখী শিক্ষা ও বহুমুখী শিক্ষা প্রণয়ন করতে হবে। পাঠ্য বিষয়গুলো হবে- ইতিহাস, সাহিত্য, ভূগোল, গণিত, অর্থনীতি, কৃষি, ব্যবসা-বাণিজ্য, বিজ্ঞান-প্রকৌশল, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও দর্শন প্রভৃতি। গ্রামভিত্তিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কোন্নয়নের জন্য শ্রেণী ভিত্তিক বিভিন্ন বিষয় পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত থাকবে। 'পূরাণ, ইতিহাস, গৃহকার্য, শিল্প, ঘরকন্নার নিয়ম ও আদর্শ চরিত্র গঠনের সহায়ক নীতিগুলি বর্তমান বিজ্ঞানের সহায়তায় শিক্ষা দিতে হবে।'[৪৬] শিক্ষার মাধ্যম হবে সহজ সরল, বোধগম্য চলিত মাতৃভাষা। পরে ধর্ম, ইংরেজী ও অন্যান্য ভাষা। শ্রুতি, গল্প, ছড়া, সঙ্গীত, কাব্য, সাহিত্য প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদান করবে। শ্রেণী বিভাগ অনুযায়ী বিভিন্ন চিত্র, খেলনা, শ্লেট-পেন্সিল, বই-খাতা-কলম, রং-তুলি, স্মরণীয়, দর্শনীয়, ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় বিভিন্ন বিষয়ের সচিত্র, মানচিত্র, গ্লোব, মডেল প্রভৃতি শিক্ষা উপকরণ

Dhaka University Institutional Repository
হিসেবে ব্যবহার করবে। ছাত্রছাত্রীরা পিতামাতা ও শিক্ষকগণের সহায়তায় মনোযোগ সহকারে বাড়ীতে ও বিদ্যালয়ে নিয়মিত পাঠাভ্যাস করবে। উচ্চ স্বরে পাঠ করলে এবং বেশি বেশি লিখলে মনোযোগ ও ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষকগণ অমনোযোগী, মেধাহীন ও দুষ্ট শিক্ষার্থীদের প্রতি বিশেষ যত্ন নিবেন।

শিশুদের ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী সহজ-সরল বোধগম্য বিষয় শিক্ষা দিবে, তাদের স্বাধীনভাবে চিন্তা করার উৎসাহ দিবে। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকরণ ও ইংরেজী শিক্ষার বিরাট পাঠ্যসূচির বোঝা কোমল মতি শিশুদের উপর চাপিয়ে দিলে তাদের সুপ্ত প্রতিভা ও জীবন নষ্ট হয় এবং মানসিক কষ্ট হয়। বিবেকানন্দ বলেন, শিক্ষার্থীদের উপর শিক্ষার বোঝা চাপিয়ে দেয়া বিরাট অন্যায়। তিনি শিক্ষার্থীদের ত্যাগ ও সেবার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে বলেন, "ত্যাগের ভৈরবরাগের নিকট অন্যান্য রাগরাগিনী যেন লজ্জায় মুখ লুকাইয়াছে। বুদ্ধ ত্যাগ প্রচার করিলেন, ভারত শুনিল, ছয় শতাব্দী যাইতে না যাইতে সে তাহার সর্বোচ্চ গৌরব শিখরে আরোহণ করিল। ইহাই রহস্য, 'ত্যাগ ও সেবাই' ভারতের জাতীয় আদর্শ– ঐ দুটি বিষয়ে উহাকে উন্নত করুন, তাহা হইলে অবশিষ্ট যাহা কিছু আপনা হইতেই উন্নত হইবে।"[৪৭] ছাত্রছাত্রীরা পিতামাতা শিক্ষক ও বড়দের অত্যন্ত বিনয়ের সাথে শ্রদ্ধা ভক্তি করবে ও উপদেশ পালন করবে। আর ছোটদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা প্রদর্শন ও বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করবে। ছাত্রীরা মা-বাবা, ভাইবোন, পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সবার প্রতি যথাসাধ্য দায়িত্ব পালন করবে। প্রকৃত বন্ধু ও সৎসঙ্গ লাভে সচেষ্ট হবে এবং গ্রামের প্রতি কর্তব্য পালন করে সকলের সাথে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে। তারা বাংলাদেশকে স্বনির্ভর ও শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসাবে গড়ে তুলবে এবং শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গড়তে অংশগ্রহণ করবে।

মানব জীবনে সাফল্যের স্বর্ণ শিখরে পৌঁছতে হলে প্রয়োজন সুস্থ দেহ ও সুস্থ মন। শিক্ষার্থীদের সুস্থ দেহের জন্য প্রয়োজন শরীর চর্চা, খেলাধুলা, ব্যায়াম, খাদ্যনীতি, পরিচ্ছন্নতা, রোগমুক্ত থাকার উপায়। সুস্থ মনের জন্য প্রয়োজন মহাপুরুষদের আদর্শ জীবন চরিত, চিন্তামুক্ত প্রফুল্ল মন, উৎসাহ-উদ্দীপনা ও সৎ সাহস। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Brain (মস্তিস্ক) ও muscles (মাংস পেশী) সমানভাবে developed (সুগঠিত, পরিপুষ্ট) হওয়া চাই। Iron nerves with a well intelligent brain and the whole world is at your feet. (লোহার মতো শক্ত স্নায়ু ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলে সমগ্র জগৎ পদানত হয়। আমি চাই এমন লোক- যাদের শরীরের পেশীসমূহ লৌহের ন্যায় দৃঢ় ও স্নায়ু ইস্পাত নির্মিত হইবে, আর তাহাদের শরীরের ভিতর এমন একটা মন বাস করিবে, যাহা বজ্রের উপাদানে গঠিত। বীর্য, মনুষ্যত্ব, ক্ষাত্রবীর্য, ব্রহ্মতেজ!'[৪৮] উন্নত ও মহাজীবন পর্যালোচনা, শিক্ষামূলক চিত্তবিনোদন, নিষ্পাপ আনন্দ, ধর্মচর্চা ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুশীলন শিক্ষার্থীর মনে উচ্চ ভাব গঠন করে। বিবেকানন্দ বলেন, 'মস্তিষ্কে উচ্চ উচ্চ চিন্তা, উচ্চ উচ্চ আদর্শে পূর্ণ কর, ঐগুলি দিবারাত্র মনের সম্মুখে স্থাপন করিয়া রাখ, তাহা হইলে উহা হইতেই মহৎ মহৎ কার্য হইবে। অপবিত্রতা সম্বন্ধে কোন কথা বলিও না, কিন্তু মনকে বল আমরা শুদ্ধ-পবিত্রস্বরূপ।'[৪৯] সুস্থ দেহ, সুস্থ মন ও অবিরত উচ্চতর ভাবনা মানুষকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করে।

৪. কর্মসংস্থান বিভাগ

কর্মসংস্থান বিভাগ বিভিন্ন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দিয়ে গ্রামবাসী পুরুষ ও মহিলাদের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে গ্রামে বা বইরে যে কোন স্থানে। সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, শিল্প, ব্যাংক, এনজিও, পোশাক শিল্প প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গ্রামবাসী যোগ্যতা অনুসারে চাকুরী করতে পারে। গ্রামবাসী বিভিন্ন শিল্প, ব্যবসা, কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, গরু-ছাগল পালন, সব্জি ও ফলবাগান, বৃক্ষরোপণ প্রভৃতি আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। অনেকে কারিগরি প্রশিক্ষণ নিয়ে কর্মসংস্থান করতে পারে।

দিনমজুর, কুলি, কামার-কুমার, তাঁতী, জেলে, স্বর্ণকার, কাঠ মিস্ত্রী, নির্মাণ শ্রমিক, ড্রাইভার, প্রহরী, মালি, ধোপা, নাপিত, ঝাড়ুদার প্রভৃতি শ্রেণীর শ্রমজীবী মানুষ এক দিকে সমাজের বৃহত্তর কল্যাণ সাধন করে, অপরদিকে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। এসব ছাড়াও ছোট বড় বিভিন্ন কর্মসংস্থান রয়েছে। সৎ উপার্জন যে কাজে তা যতই ছোট ও নীচু মনে হোক-তাতে লজ্জার কিছু নেই বরং তা গর্বের বিষয়। বিবেকানন্দ চাকরীর পরিবর্তে দরিদ্র মানুষের আত্মকর্মসংস্থান সম্পর্কে বলেন, 'এই যে চাষাভূষো, মুচি-মুদ্দাফরাশ- এদের কর্মতৎপরতা ও আত্মনিষ্ঠা তোদের অনেকের চেয়ে ঢের বেশী। এরা নীরবে চিরকাল কাজ করে যাচ্ছে, দেশের ধন-ধান্য উৎপন্ন করছে, মুখে কথাটি নেই। এরা শীঘ্রই তোদের উপরে উঠে যাবে।...আর তোরা "হা চাকরি, জো চাকরি" করে করে লোপ পেয়ে

Dhaka University Institutional Repository
যাবি।"[৫০] কর্মসংস্থান বিভাগ ভিক্ষুকদের ভিক্ষাবৃত্তি বন্ধ করে তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী কর্মসংস্থান করবে। গ্রামবাসী ভিক্ষুকদের ভিক্ষার পরিবর্তে কাজের বিনিময়ে খাদ্য ও অর্থ দিবে। এভাবে বাধ্যতামূলক কাজ দিয়ে এক দিনেই গ্রাম থেকে চিরতরে ভিক্ষাবৃত্তি নির্মূল করা সম্ভব হবে। এছাড়া বেকার যুবক-যুবতী, অকর্মণ্য, ভবঘুরে বিপথগামী ছেলে-মেয়েদের সৎকর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করে তাদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসবে কর্মসংস্থান কমিটি। সকল পেশাজীবীর নাম-ঠিকানা কর্মসংস্থান বিভাগে লেখা থাকবে। যাদের কাজের প্রয়োজন হবে তারা অফিসে যোগাযোগ করে ডেকে নিবে। এটা হবে শ্রমিক ও মালিকদের মিলন কেন্দ্র। এতে উভয়েরই কাজে সুবিধা হবে।

৫. কৃষি ও শিল্প বিভাগ

গ্রাম কার্যালয়ের কৃষি ও শিল্প বিভাগ কৃষি উন্নয়ন ও শিল্প স্থাপন করবে। স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা– কথাটি বিস্ময়কর হলেও সত্য। বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। এদেশের শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। বাকী শতকরা ৩০ জনও প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কৃষি কাজের উপর নির্ভরশীল। এদেশে অনুন্নত কৃষি ব্যবস্থা, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, ঝড়-বন্যা, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে ফসল, পশু-পাখি ও মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করে। আর কৃষি কাজে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য আধুনিক কৃষি বিজ্ঞান ব্যবস্থা এবং সার, বীজ, কীটনাশক, সেচ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সরকারের ভর্তুকী দেওয়া প্রয়োজন। কারণ উচ্চ মূল্যে কৃষি সরঞ্জাম ক্রয় করে গরীব কৃষকদের অনেক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হওয়া কষ্টসাধ্য। এক্ষেত্রে সরকারের করণীয় হবে কৃষি সরঞ্জামের মূল্য হ্রাস করে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের নায্য মূল্য নির্ধারণ করা।

'বিবেকানন্দ জানতেন, যেদেশের অধিকাংশ লোক কৃষির উপর নির্ভরশীল, সেদেশে কৃষির উন্নতি ঘটিয়ে যেমন মানবিক সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যাবে, তেমনি খাদ্য সঙ্কটের মোকাবিলা করা সম্ভব হবে।'[৫১] গ্রামবাসীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জন জরুরী প্রয়োজন। চীনের কমিউনের মত আমাদের গ্রামভিত্তিক কৃষি উন্নয়ন করতে হবে। অর্থাৎ একটি গ্রামের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্য, তৈলবীজ, ফলমূল, শাকসব্জী চাষ, বৃক্ষরোপণ, মৎস্য চাষ ও পশু পালন করতে হবে। বেলুড় মঠে বিবেকানন্দের অন্যতম শখ ছিল গৃহপালিত পশু-পাখি পালন করা। তিনি বেলুড় মঠে নিজ হাতে বিভিন্ন কাজ করেন এবং পশু-পাখির যত্ন নেন। এ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ এক পত্রে নিবেদিতাকে লিখেন, "মঠের জমিতে যে বর্ষায় জল দাঁড়ায়। তার নিষ্কাশনের জন্য একটি গভীর নরদমা কাটা হচ্ছে। সেই কাজে খানিকটা খেটে আমি এইমাত্র ফিরলাম। কোনও কোনও জায়গায় বৃষ্টির জল কয়েক ফুট দাঁড়িয়ে যায়। আমার সেই বিশালকায় সারসটি এবং হংস-হংসীগুলি খুব স্ফূর্তিতেই আছে। আমার পোষা কৃষ্ণসার (হরিণ)-টি মঠ থেকে পালিয়েছিলো এবং তাকে খুঁজে বের করতে আমাদের দিন কয়েক বেশ উদ্বেগে কাটাতে হয়েছে। আমার একটি হংসী দুর্ভাগ্যক্রমে কাল মারা গেছে। প্রায় এক-সপ্তাহ যাবৎ শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল। আমাদের একজন হাস্যরসিক বৃদ্ধ সাধু তাই বলেছিলেন, 'মশায়, এই কলি যুগে যখন জল-বৃষ্টিতে হাঁসেরও সর্দি লাগে, আর ব্যাঙও হাঁচতে শুরু করে, তখন আর বেঁচে থেকে লাভ নেই।' একটি রাজহংসীর পালক খসে যাচ্ছিল। আর কোনও প্রতিকার জানা না থাকায় একটা টবে খানিকটা জলের সঙ্গে একটু কার্বলিক এসিড মিশিয়ে তাতেই কয়েক মিনিটের জন্য তাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল– উদ্দেশ্য ছিল যে, হয় সেরে উঠবে, না হয় মরে যাবে; তা হংসীটি এখন ভাল আছে।"[৫২] বিবেকানন্দের শিক্ষা অনুসরণ করে গৃহপালিত পশু-পাখী পালনের মাধ্যমে স্বচ্ছলতা অর্জন করা সম্ভব হবে। গ্রামবাসীর প্রয়োজনীয় কোন কিছু যাতে বাইরে থেকে আমদানী করতে না হয়, বরং উদ্বৃত্ত খাদ্য ও পণ্য সামগ্রী শহরে ও বিদেশে রপ্তানী করে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটবে। দেশের বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়ন হলেও জনসংখ্যার তুলনায় কর্মসংস্থান ও কৃষি উন্নয়ন হয়নি। এখনও খাদ্যের জন্য চারদিকে হাহাকার। অনেক বেকার যুবক, দুঃখী দরিদ্র মানুষ অনাহারে দিন কাটায়। তাইতো বিবেকানন্দ অন্নসংস্থানের চিন্তা ও পরিকল্পনা করেন।

'প্রথমেই চাই অন্ন। কে দেবে অন্ন? ঈশ্বর? ধর্ম? "যে-ধর্ম বিধবার চোখের জল মোছাতে পারে না, অনাথ শিশুর মুখে এক মুঠো অন্ন তুলে দিতে পারে না- সে ধর্মে আমি বিশ্বাস করি না।"– স্বামীজী গর্জে উঠলেন। বিবেকানন্দের মাথায় কেবল ঘুরপাক খাচ্ছিল বৈজ্ঞানিক শ্রীরাম কৃষ্ণের কথাটা– 'খালি পেটে ধর্ম হয় না'।'[৫৩] বিবেকানন্দ সেই নতুন ধর্মের, সেই ঈশ্বরের সন্তান। তিনি পরিকল্পনা করেন কৃষি-শিল্পের উন্নতি সাধন করবেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ভূমিহীন নিম্নবিত্ত মানুষ, দিনমজুর, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, রিক্সা চালক এবং অনেকে কর্মহীন ও উপার্জনহীন অবস্থায় দিন কাটায়। উচ্চ বিত্তের মানুষ এ পরিস্থিতিতে তাদের ভূমিগুলো দরিদ্র ভূমিহীনদের মধ্যে বন্টন করে দিতে পারে, ফসলের একটি অংশের বিনিময়ে। বিবেকানন্দ কৃষির উন্নতির জন্য কৃষকদের ভূমির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন, 'নিজের দায়িত্ব না থাকলে কেউ কোন বড় কাজ করতে পারে না'। বিবেকানন্দের মতে মধ্যস্বত্ত্ব ভোগীদের গ্রাম থেকে জমির

Dhaka University Institutional Repository
মালিকানা প্রকৃত কৃষিজীবীদের হাতে তুলে দিলে কৃষি বিপ্লব সংঘটিত হবে। তিনি কৃষি উন্নতির জন্য বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার প্রয়োগের কথা বলেন। দারিদ্র্য পীড়িত সমাজে শিক্ষার চেয়ে ক্ষুধার অন্ন অনেক বেশী প্রয়োজন। তাই তিনি কর্ম ক্ষেত্রে গিয়েই কৃষকদের শিক্ষা দানের কথা বলেন। কারণ কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিদ্যার প্রসার ঘটাতে শিক্ষিত মন চাই। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'নেহাত চাষাড়ে বুদ্ধিতে চাষ নয়, বিদ্বান বুদ্ধিমানের বুদ্ধিতে চাষ করতে হবে।...উৎপাদন ঠিক পরিমাণে হচ্ছে না।...লেখাপড়া-জানা লোক পল্লীগ্রামে বাস করলে আর চাষবাসটা বিজ্ঞান সাহায্যে করলে উৎপাদন বেশী হয়- চাষাদের চোখ খুলে যায়।'[৫৪] বিবেকানন্দ কৃষির উন্নতির জন্য পাশ্চাত্যের কৃষি বিজ্ঞান অনুসরণ করতে বলেন, 'পাশ্চাত্যবিজ্ঞান-সহায়ে মাটি খুঁড়তে লেগে যায়, অন্নের সংস্থান কর– চাকরি গুখুরি করে নয়, নিজের চেষ্টায় পাশ্চাত্যবিজ্ঞান সহায়ে নিত্য নূতন পন্থা আবিষ্কার করে।'[৫৫] বিবেকানন্দ আধুনিক পাশ্চাত্যের কৃষিবিজ্ঞান অনুশীলনের শিক্ষা দেন।

বর্তমান সময়ে শিক্ষিত যুবকদের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি ডিপ্লোমা প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি কাজে আকৃষ্ট করা হচ্ছে। বিদেশের অন্ধ অনুকরণে নয়, বাংলাদেশের পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হলে কৃষি সমস্যার সমাধান হবে। একই জমিতে একজন অনভিজ্ঞ কৃষক যে ফসল ফলাবে, সেই জমিতে একজন অভিজ্ঞ কৃষক তার চেয়ে অধিক ফসল ফলাবে। অধিক ও উন্নত ফলনের জন্য ভূমি নির্বাচন, ভূমি কর্ষণ, উন্নত বীজ, নিড়ানী, সার, সেচ, কীটনাশক দেওয়া প্রভৃতি পরিচর্যা প্রয়োজন। উচ্চতর কৃষি গবেষণা ও প্রয়োগে গ্রাম ও দেশকে স্বনির্ভর করতে পারে। কৃষি কাজে কোন লজ্জা নেই। তাই বিবেকানন্দ শিক্ষিত যুবকদের জনক রাজার দৃষ্টান্ত দেন। 'জনক-ঋষি এক হাতে লাঙল দিচ্ছেন, অন্য হাতে বেদ পড়াচ্ছেন। তিনি আবার রাজাও, রাজকার্য চালাচ্ছেন।'[৫৬] বিবেকানন্দ কৃষি কার্যে আমেরিকার এত বড় হওয়ার সফলতার কথা যুবদের বলেন, 'আমেরিকার ইতিহাস পড়ে দ্যাখ। তাহলে সবই জানতে পারবি। দেখবি তারা কিভাবে বুদ্ধিমানের মতো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করছে। আর আমাদের পাড়া গাঁয়ের ছেলেরা দু'পাতা ইংরেজী পড়ে শহরে পালিয়ে আসে। চাকরির গোলামি তাদের করতেই হবে। এর ফলে গ্রামগুলো নষ্ট হচ্ছে, আর শহরগুলো ভরে যাচ্ছে তোদের মত অপদার্থ শিক্ষিত লোকের দ্বারা।'[৫৭] বিবেকানন্দ শিক্ষিত যুবকদের কৃষি কাজের মাধ্যমে স্বনির্ভরতা অর্জনের শিক্ষা দেন।

পল্লী গ্রামে গাছপালা আর মুক্ত বাতাসে স্বাস্থ্যভাল থাকে। বিবেকানন্দ গ্রামোন্নয়নে শিক্ষিত যুবকদের অসাধারণ সাফল্যের কথা বলেন, 'যদি শিক্ষিত লোক গাঁয়ের মানুষকে নিয়ে চাষবাস শুরু করে, যদি তাদের ঘৃণা না করে আপন লোকের মতো ব্যবহার করে, যদি তাদের সঙ্গে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তোলে, তাহালে এই উঁচুজাত আর ছোটজাতের বিকট বিভেদ দূর হবে। এই বিভেদই তো ভারতবর্ষের সর্বনাশ ক'রে দিচ্ছে। যদি সাধারণ মানুষকে তোরা জীবন ধারণের উপযোগী শিক্ষা দিতে পারিস, আর সেই সঙ্গে ধর্মের উচ্চ উচ্চ ভাবগুলো তাদের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারিস, তাহলে রাজনৈতিক আন্দোলন ক'রে হাজার বছর যা না করা যাবে তার থেকে শতগুণ বেশি ফল দশ বছরে পাওয়া যাবে।'[৫৮] শিক্ষিত মানুষ অশিক্ষিত মানুষদের শিক্ষার আলো দিয়ে স্বনির্ভর গ্রাম গড়ে তুলতে পারে।

শিল্প

বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেন শিল্পোন্নয়নই দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন তথা দরিদ্র্য দূরীকরণের মূখ্য উপায়, এ বিষয়ে তিনি আধুনিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (Economic Modernization)-এর একজন মূখ্য প্রবক্তা। 'কিন্তু শুধু কৃষিতে হবে না। শিল্প চাই অর্থসম্পদ বৃদ্ধির জন্য। কিন্তু কে শেখাবে যন্ত্রশিল্প এই দেশে! শাসক ইংরেজরা সে কাজে হাত লাগাবে না। ভারতীয়রা যাতে উচ্চমানের যন্ত্রবিদ্যা না শিখতে পারে, সেটাই তো তাদের চেষ্টা। তারাই তো একদিন ঢাকার বস্ত্রশিল্প নষ্ট করার জন্য তাঁতিদের আঙুল কেটে দিয়েছিল।'[৫৯] তিনি ভাবেন ইংরেজ শাসিত পরাধীন ভারতবর্ষকে স্বাধীন করেই প্রকৃত শিল্প বিপ্লব সম্ভব। তিনি দুঃখী দরিদ্র মানুষের মুক্তির উপায় খুঁজতেই বিদেশ যান। বিবেকানন্দ শিল্পোন্নয়নের জন্য পাশ্চাত্যের সঙ্গে একটি আদান-প্রদান ব্যবস্থা করতে চেয়েছেন। তাহলো– পাশ্চাত্য ভারতকে দেবে প্রযুক্তি বিদ্যা, কারণ এটি ভারতের অভাব। অপর দিকে ভারত পাশ্চাত্যকে দেবে আধ্যাত্মিকতা- এটি পাশ্চাত্যের অভাব। তিনি চেয়েছিলেন আমেরিকা থেকে অর্থ সংগ্রহ করে একটি প্রযুক্তি বিদ্যা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করতে, সেখান থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ত্যাগী কর্মীগণ গ্রামে গ্রামে লোকদের আধুনিক প্রযুক্তি বিদ্যা শেখাবেন। বিবেকানন্দ উন্নত প্রযুক্তি, যন্ত্র শিল্প ও পণ্য সামগ্রী দেখে এসে এদেশে প্রবর্তন করবেন। তিনি আমেরিকা আসার পথে চীন ও জাপান কিছুটা ঘুরে দেখেছিলেন। চীনের কর্ম তৎপরতা এবং জাপানের শিল্প বোধ তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। জাহাজে আলাপ হয়েছিল ভারতবর্ষের বিখ্যাত ব্যবসায়ী জামসেদজী টাটার সঙ্গে। বিবেকানন্দ ভারতবর্ষে কিভাবে বিজ্ঞান চর্চা, কলকারখানা ও শিল্প প্রসার ঘটানো যায়, এ বিষয়ে কথা বলেন। মি. টাটা বিদেশ থেকে মাল কিনে দেশে

Dhaka University Institutional Repository
বিক্রি করেন। এতে মূল লাভটা পায় বিদেশী কোম্পানী। তাই বিবেকানন্দ বুদ্ধিমান, হৃদয়বান দেশপ্রেমিক সম্বোধন করে মি. টাটাকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, "আর আপনার উচিত বড় মাপের কলকারখানা তৈরী ক'রে উৎপাদনে নেমে পড়া। ভারতবর্ষে কত জায়গায় খনিজ সমৃদ্ধ অঞ্চল রয়েছে, কয়লা লোহা প্রচুর। আপনি লৌহ শিল্পের কারখানা তৈরী করুন। তাতে দেশের টাকা শুধু দেশেই থাকবে তাই নয়, আপনার তৈরী জিনিস বিদেশে রপ্তানি হলে বাইরের টাকা ঘরে ঢুকবে। তখন এদেশের কতক মানুষের রুজিরোজগারের ব্যবস্থা আপনি করতে পারবেন। দেশের মানুষের প্রতি আপনার ভালবাসা আছে বলেই এসব কথা আপনাকে বলছি। জামসেদজী টাটা স্বামীজীর ইচ্ছা সত্যই পূরণ করেছিলেন। একদিকে বিজ্ঞানশিক্ষা দেবার জন্য একটি 'পোস্ট-গ্রাজুয়েট রিসার্চ ইনস্টিটিউট' (পরে যার নাম হয় টাটা রিসার্চ ইনস্টিটিউট) তৈরীতে বিপুল অর্থ দান করেন, অন্যদিকে তাঁরই নীতি মেনে জামসেদপুরে তৈরী হয় টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানী।"[৬০] বিবেকানন্দের শিক্ষায় বিজ্ঞান ও উন্নত প্রযুক্তিতে দিন দিন গড়ে উঠছে শিল্প কারখানা।

বিবেকানন্দের স্বপ্ন ছিল কৃষি ও শিল্প গবেষণা সংস্থায় চলবে ব্যাপক গবেষণা, অনুসন্ধান ও পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম। এ সংস্থা কৃষকদের বিভিন্ন তথ্য ও উপকরণ সরবরাহ করবে, উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, '...চাই প্রথমতঃ এক এক রাজধানীতে এক এক কেন্দ্র ও সেথা হইতে ধীরে ধীরে ভারতের সর্ব স্থানে ব্যাপ্ত হওয়া।...ঐ সকল প্রধান কেন্দ্রে কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি শিখানো যাবে এবং শিল্পাদিরও যাহাতে এদেশে উন্নতি হয়, তদুপায়ে কর্মশালা খোলা যাবে।'[৬১] গ্রামবাসী প্রশিক্ষণ নিয়ে সাধ্য অনুযায়ী প্রতিটি গ্রামেই শিল্প গড়ে তুলবে। বৃহৎ শিল্প ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র বা অল্পসংখ্যক মালিকের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ করে দরিদ্রদের শোষণ ও বঞ্চনা করে। তাই বিবেকানন্দ দরিদ্র মানুষের জন্য স্বল্পপুঁজির ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেন। নিবেদিতা বলেন, 'ব্যবসাতে অধিক মূলধন নিয়োগে অধিক লাভের সম্ভাবনা, এরূপ মতাবলম্বীদের বিপক্ষে তিনি যারা অল্প জমিতে চাষ করে, অথবা স্বল্প পুঁজি নিয়ে কৃষিজাত দ্রব্যের কারবার করে, সর্বদা তাদের সমর্থন করতেন।'[৬২] বিবেকানন্দ গরীবদের অল্প জমি ও অল্প পুঁজি নিয়ে কাজ করার উৎসাহ দেন।

বিবেকানন্দ দেশীয় কাঁচামাল শিল্পে ব্যবহার করে সমৃদ্ধি অর্জন সম্পর্কে বলেন, 'ভারতে কত জিনিস জন্মায়। বিদেশী লোক সেই raw material (কাঁচামাল) দিয়ে তার সাহায্যে সোনা ফলাচ্ছে। আর তোরা ভারবাহী গর্দভের মতো তাদের মাল টেনে মরছিস। ভারতে যে-সব পণ্য উৎপন্ন হয়, দেশবিদেশের লোক তা-ই নিয়ে তার ওপর বুদ্ধি খরচ করে, নানা জিনিস তৈয়ের করে বড় হয়ে গেল; আর তোরা তোদের বুদ্ধিটাকে সিন্দুকে পুরে রেখে ঘরের ধন পরকে বিলিয়ে "হা অন্ন, হা অন্ন" করে বেড়াচ্ছিস।'[৬৩] তিনি স্বল্প পুঁজির দরিদ্র মানুষদের শিল্প ব্যবসা সম্পর্কে পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'টাকা না জোটে তো জাহাজের খালাশী হয়ে বিদেশে চলে যায়। দিশী কাপড়, গামছা, কুলো, ঝাঁটা মাথায় করে আমেরিকা-ইউরোপে পথে পথে ফেরি করগে।'[৬৪] গরীব লোরো ক্ষুদ্র ব্যবসার মাধ্যমে সহজেই জীবিকা নির্বাহ করতে পারে।

আমাদের দেশে প্রাণীজ উদ্ভিজ, ভেষজ, কৃষিজ, খনিজ শিল্পের জন্য বিভিন্ন প্রকার কাঁচা মাল পাওয়া যায়। প্রশিক্ষণ নিয়ে গ্রামবাসী প্রয়োজনীয় হস্ত কুটির, ক্ষুদ্র মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প স্থাপন করতে পারে। হস্ত ও কুটির শিল্পে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহারের পণ্য সামগ্রী তৈরী করবে। বস্ত্র, জুতা, অলঙ্কার, প্রসাধনী, খেলনা, ঔষধ, খাদ্য-সামগ্রী, আসবাবপত্র প্রভৃতি উৎপাদনের শিল্প খুব গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া পাট ভেষজ, বাঁশ, বেত, কাঠ, সোনা, রূপা, লোহা, তামা-কাঁসা-পিতল, রাবার-প্লাস্টিক, বালি-মাটি-পাথর, পানি প্রভৃতি কাঁচামাল দিয়ে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী তৈরী হয়। অর্থাৎ একটি গ্রামের মানুষের স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য টুথপেষ্ট, সাবান, হাড়ি-পাতিল, বাটি, গ্লাস, পোষাক-পরিচ্ছদ, আসবাসপত্র গ্যাস পানি ও বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম প্রভৃতি গৃহস্থালী দ্রব্য উৎপাদন শিল্প দেশে স্থাপন করবে। বিবেকানন্দ স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য স্বদেশীয় পণ্য ব্যবহার সম্পর্কে বলেন, 'ভারতবাসীদিগকে স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা এবং ভারতীয় শিল্প দ্রব্যাদি যাতে ভারতের বাইরে বিক্রয় হয়, তার জন্য বাজার সৃষ্টি করা।'[৬৫] স্বদেশীয় পণ্য ব্যবহার করলে শিল্প টিকে থাকবে।

স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য স্বদেশী পণ্য ব্যবহার করতে হবে। এ সম্পর্কে সমাজ বিজ্ঞানী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, "দেশের উৎপাদিত পদার্থ আমরা নিজে ব্যবহার করব। এই ব্রত সকলকে গ্রহণ করতে হবে। দেশকে আপন করে উপলব্ধি করবারও একটি প্রকৃষ্ট সাধনা। যথেষ্ট উদ্‌বৃত্ত অন্ন যদি আমাদের থাকত– অন্তত এতটুকুও যদি থাকত যাতে দেশের অজ্ঞান দূর হয়, রোগ দূর হয়, দেশের জলকষ্ট পথকষ্ট বাসকষ্ট দূর হয়, দেশের স্ত্রীমারী, শিশুমারী দূর হতে

Dhaka University Institutional Repository

পারত, তা হলে দেশের অভাবের দিকেই দেশকে এমন একান্তভাবে নিবিষ্ট হতে বলতুম না। কিন্তু আত্ম-আঘাত এবং আত্মগ্লানি থেকে উদ্ধার পাবার জন্যে সমস্ত চেষ্টাকে যদি উদ্যত না করি, অদ্যকার বহু দুঃখ, বহু অবমাননার শিক্ষা যদি বর্থ্য হয়, তবে মানুষের কাছ থেকে ঘৃণা ও দেবতার কাছ থেকে অভিশাপ আমাদের জন্যে নিত্য নির্দিষ্ট হয়ে থাকবে, যে পর্যন্ত আমাদের জীর্ণ হাড় কখানা ধুলার মধ্যে মিশে না যায়।"[৬৬] বিবেকানন্দ শিল্প বিকাশের জন্য, নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির জন্য বলেন, '...প্রয়োজনের অতিরিক্ত বস্তুর ব্যবহারও আবশ্যক, যাহাতে গরীব লোকের জন্য নূতন নূতন কাজের সৃষ্টি হয়।'[৬৭] বিবেকানন্দ বাস্তব দৃষ্টিতে উপলব্ধি করেন ভারতের মতো দেশে লক্ষ লক্ষ বেকার যুবকের দ্রুত কর্মসংস্থানের জন্য ছোট আকারের কুটির শিল্প প্রয়োজন। তিনি চাকরির লোভে বেকারদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে সচেতন করে বলেন, চাকরিতে গোলামিতে এত দুঃখ দেখেও তোদের চেতনা হচ্ছে না, কাজেই দুঃখও দূর হচ্ছে না। ওদেশে দেখলুম, যারা চাকরি করে parliament-এ (জাতীয় সমিতিতে) তাদের স্থান পেছনে নির্দিষ্ট।

৬. চিকিৎসা বিভাগ

গ্রামবাসীর স্বাস্থ্য রক্ষা ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি চিকিৎসা বিভাগ কাজ করবে। এ বিভাগে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার ও একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত সেবিকা (nurse) থাকবে। চিকিৎসা বিভাগে দুটি দল থাকবে। ডাক্তারের আহ্বানে আগ্রহী ছাত্র, শিক্ষিত পুরুষদের নিয়ে একটি দল (Medical team) গঠন করবে। তারা গ্রামের পুরুষদের চিকিৎসা সেবা দানে সহযোগিতা করবে। আর সেবিকার (nurse) আহ্বানে আগ্রহী ছাত্রী ও শিক্ষিতা মহিলাদের নিয়ে একটি Medical team গঠন করবে, তারা গ্রামের শিশু ও মহিলাদের স্বাস্থ্য সেবা দান করবে। চিকিৎসা বিভাগ গ্রামবাসীর নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন লাভের জন্য রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, খাদ্যনীতি, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, যোগব্যায়াম, ঔষধপত্র এবং পরিবার পরিকল্পনা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে কাজ করবে। গ্রামবাসী স্বল্প মূল্যে হেলথ কার্ডের মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করবে।

'ধর্মই স্বাস্থ্য ও শান্তির প্রধান উপায়। পাপই রোগ ও অশান্তির মূল কারণ। আমাদের ব্যাধি দুই প্রকার, শারীরিক ও মানসিক। মনঃকষ্ট, কাম ও ক্রোধাদি মানসিক ব্যাধি, আর জ্বরাদি শারীরিক ব্যাধি। ক্রোধ হইলে অন্তঃকরণ দগ্ধ হয়। শোক হইলে শরীর অবসন্ন হয়। শারীরিক ব্যাধির চেয়েও মানসিক ব্যাধিতে শরীর নষ্ট ও আয়ু ক্ষয় বেশী হয়।'[৬৮] চিকিৎসক আন্তরিকতার সাথে বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক রোগীর চিকিৎসা করবেন। তিনি দুর্ঘটনায় আহত, বিভিন্ন শারীরিক সমস্যা এবং দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, বিষণ্নতা, আত্মহত্যার প্রবণতা বিভিন্ন প্রকার মানসিক রোগীর সেবা দিবেন। এখানে কঠিন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থাও থাকবে, আরও থাকবে চিকিৎসা সংক্রান্ত বইপত্র, চিকিৎসা সরঞ্জাম, ঔষধপত্র প্রভৃতি। রোগ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টিই হলো প্রথম কাজ।

সুস্থতার জন্য বিবেকানন্দের খাদ্যনীতি সম্পর্কে ধারণা থাকা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ আহার গ্রহণে দেহ ও ইন্দ্রিয় সবল হয়ে সঠিকভাবে কাজ করে এবং মনও শুদ্ধ হয়। কদর্য আহারে ইন্দ্রিয়গুলোর গ্রহণ শক্তি হ্রাস পায়। আহারের অভাব এবং অজীর্ণ দোষে দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পায়। বিবেকানন্দ পুষ্টিকর খাদ্য সম্পর্কে বলেন, 'এখন সর্ববাদি সম্মত মত হচ্ছে যে, পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন খাওয়া খাওয়া। অল্প আয়তনে অনেকটা পুষ্টি অথচ শীঘ্র পাক হয়, এমন খাওয়া চাই। যে খাওয়ায় পুষ্টি কম, তা কাজেই এক বস্তা খেতে হয়, কাজেই সারাদিন লাগে হজম করতে; যদি হজমেই সমস্ত শক্তি টুকু গেলে, বাকি আর কি করবার শক্তি রইল?'[৬৯] সুস্থ দেহের জন্য বয়স ও পরিশ্রম অনুযায়ী নিয়মিত সুষম খাদ্য গ্রহণ করতে হয়। নিয়মিত খাদ্য তালিকায় রাখতে হয় ছয় প্রকার খাদ্য– শর্করা, শ্বেতসার, আমিষ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। দেহে এক এক প্রকার খাদ্য ঘাটতির জন্য এক এক প্রকার রোগ উৎপন্ন হয়। যেমন আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড রোগ হয়, তাই আয়োডিন লবণ খেলে ভাল হয়। বিবেকানন্দ স্বাস্থ্য সম্মত খাদ্য উপাদান সম্পর্কে বলেন, 'ভাত, ডাল, আটার রুটি, শাক, দুধ যথেষ্ট খাদ্য। তবে ডাল দক্ষিণীয়দের মতো খাওয়া উচিত, অর্থাৎ ডালের ঝোল মাত্র, বাকিটা গরুকে দিও। মাংস খাবার পয়সা থাকে, খাও; তবে ও পশ্চিমি নানা প্রকার গরম মসলাগুলো বাদ দিয়ে। মসলাগুলো খাওয়া নয়– এগুলো অভ্যাসের দোষ। ডাল অতি পুষ্টিকর খাদ্য, তবে বড়ই দুষ্পাচ্য। কচি কলাই শুঁটির ডাল অতি সুপাচ্য এবং সুস্বাদু।'[৭০] সহজ পরিপক্ক এবং পুষ্টিকর খাদ্য স্বাস্থ্যসম্মত।

বিশুদ্ধ জল এবং বিশুদ্ধ আহার স্বাস্থ্যসম্মত। আমাদের দেশের খাবারগুলো স্বাস্থ্যের উপযোগী। বিবেকানন্দ অখাদ্য বা খাদ্যের দোষত্রুটি সম্পর্কে সতর্ক করেন। কারণ বিশেষ আহার বিশেষ শারীরিক ও মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। 'রামানুজাচার্য ভোজ্য দ্রব্য সম্বন্ধে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলেছেন। জাতি-দোষ অর্থাৎ যে দোষ ভোজ্য দ্রব্যের জাতিগত;

Dhaka University Institutional Repository
যেমন প্যাঁজ, লসুন ইত্যাদি উত্তেজক দ্রব্য খেলে মনে অস্থিরতা আসে অর্থাৎ বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়। আশ্রয় দোষ অর্থাৎ যে দোষ ব্যক্তি বিশেষের স্পর্শ হ'তে আসে ; দুষ্ট লোকের অন্ন খেলেই দুষ্ট বুদ্ধি আসবেই, সতের অন্নে সদ্‌বুদ্ধি ইত্যাদি। নিমিত্ত দোষ অর্থাৎ ময়লা কদর্য কীট-কেশাদি-দুষ্ট অন্ন খেলেও মন অপবিত্র হবে।'[৭১] খাদ্য থেকে সৃষ্টি হয় দেহ, পরে দেহ থেকে সৃষ্টি হয় মনের সদ্ অসদ্ প্রতিক্রিয়া। যেমন মদ পান করলে মনে অসদ্ মাতলামি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ধার্মিকগণের জন্য নিরামিষ আহার উত্তম, শ্রমজীবীগণ মাংস খেতে পারেন।

গরীবরা অনাহারে মরে আর ধনীরা অখাদ্য খেয়ে মরে। অখাদ্য গ্রহণের চেয়ে উপবাস ভাল। তেল ঘি যত কম খাওয়া যায় ততই ভাল। ভাজা খাবারগুলো বিষ। বিবেকানন্দ অজীর্ণ রোগের কারণ সম্পর্কে বলেন, 'ময়রার দোকানের খাবারের খাদ্যদ্রব্যে কিছুই নেই, একদম উলটো আছে বিষ-বিষ-বিষ। পূর্বে, লোকে কালেভদ্রে ঐ পাপগুলো খেত; এখন শহরের লোক, বিশেষ বিদেশী যারা শহরে বাস করে, তাদের নিত্য ভোজন হচ্ছে ঐ। এতে অজীর্ণ-রোগে অপমৃত্যু হবে তার কি বিচিত্র।'[৭২] আমাদের বাংলাদেশের পল্লী গ্রামের খাদ্য দ্রব্য স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উপযোগী।

চিকিৎসা

সুস্থ জীবন লাভের জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অপরিহার্য। আমরা ময়লাকে ঘৃণা করে স্পর্শ করি না, দরজার পাশে পচতে দেই। এতে একটা অনাচারের ভয়ে আর একটা মহাঘোর অনাচার। একটা পাপ এড়াতে গিয়ে আর একটা গুরুতর পাপ হয়। যার বাড়িতে ময়লা সে পাপী। রোগে ভুগে সে পাপের শাস্তি পায়। অজ্ঞতা বা পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয় অসুখে। অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন চিকিৎসায় ব্যয় হয়। তাই প্রবাদে বলে, পাপের ধন প্রায়শ্চিত্তে যায়। ওলা ওঠা, মহামারী, ম্যালেরিয়া প্রতিকারের জন্য প্রয়োজন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "চাই কি?– পরিষ্কার শরীরে পরিষ্কার কাপড় পরা। মুখধোয়া দাঁত মাজা- সব চাই, কিন্তু গোপনে। ঘর পরিষ্কার চাই। রাস্তাঘাটও পরিষ্কার চাই। পরিষ্কার রাঁধুনী, পরিষ্কার হাতের রান্না চাই। আবার পরিষ্কার মনোরম স্থানে পরিষ্কার পাত্রে খাওয়া চাই– 'আচার প্রথমো ধর্মঃ'। আচারের প্রথম আবার পরিষ্কার হওয়া– সব রকমে পরিষ্কার হওয়া। আচার-ভ্রষ্টের কখন ধর্ম হবে? অনাচারীর দুঃখ দেখছ না, দেখেও শিখছ না? এত ওলাউঠা, এত মহামারী, ম্যালেরিয়া- কার দোষ? আমাদের দোষ, আমরা মহা অনাচারী !!!"[৭৩] পরিচ্ছন্ন জীবন ও পরিবেশ রোগমুক্ত রাখে।

দাঁত ভাল রাখার উপায় হলো খাওয়ার পর দাঁত মাজা। অজীর্ণ ও প্রস্রাবের রোগের কারণ বাজারের ধুলি ময়লা যুক্ত খোলা খাবার। অনেকের পুরে খেয়ে বদহজম হয়, মাথা ঘামায়। শরীর শুকিয়ে যায় বা মোটা হয়। যেটুকু খাবার হজম হয়, সেটুকুই খেতে হয়। সুস্থতার জন্য ব্যায়াম বা শারীরিক শ্রম প্রয়োজন। রোগে ভুগলে আয়ু ক্ষয় হয়। শরীর ও মন দুর্বল ও অবসন্ন হয়ে পড়ে, কাজে মন বসে না। অকাল মৃত্যুতে পরিবার ও জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়। বিবেকানন্দ বহুমূত্র রোগের চিকিৎসা ও প্রতিকার সম্পর্কে বলেন, 'পায়ের মাংস লোহার মত শক্ত হওয়া চাই। প্রস্রাবে চিনি বা আলবুমেন (albumen) দেখা দিয়েছে বলেই 'হাঁ' করে ব'সো না। ও সব আমাদের দেশে কিছুই নয়। ও গ্রাহ্যের মধ্যেই এনো না। খাওয়ার দিকে খুব নজর দাও, অজীর্ণ না হ'তে পায়। ফাঁকা হাওয়ায় যতক্ষণ সম্ভব থাকবে। খুব হাঁটো আর পরিশ্রম কর। যেমন করে পারো ছুটি নাও, আর বদরিকাশ্রম তীর্থ যাত্রা কর। হরিদ্বার থেকে পায়ে হেঁটে ১০০ ক্রোশ ঠেলে পাহাড় চড়াই ক'রে বদরিকাশ্রম যাওয়া-আসা একবার হলেই ও প্রস্রাবের ব্যায়রাম ফ্যায়রাম ভূত ভাগবে।'[৭২] বিবেকানন্দ বলেন, বড় লোকের যেসব সন্তান কচুরি, মন্ডা, মিঠাই খায়- সেগুলো ভোলা পেট মোটা জানোয়ার হবে না তো কি? সেকালের পাড়াগাঁয়ের জমিদাররা এক কথায় দশ ক্রোশ হেঁটে দিত, দু'কুড়ি কই মাছ, কাঁটাসহ চিবিয়ে খেত, ১০০ বৎসর বাঁচত। তাদের অলস ছেলেরা কলকাতায় এসে লুচিকচুরি খায়, সারাদিন গাড়ীতে চড়ে, চশমা চোখে দেয় আর প্রস্রাবের ব্যামো হয়ে মরে। একটু পেট গরম হলেই ওষুধ খায়, পোড়া বদ্দিও বলে না দু'ক্রোশ হেটে আয়, ওষুধ লাগবে না। বিবেকানন্দ অলস ও দুর্বল ব্যক্তিদের ব্যঙ্গ করে বলেন, 'ধন [ধনী] হওয়া, আর কুড়ের বাদশা হওয়া- দেশে এক কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাকে ধরে হাঁটতে হয়, খাওয়াতে হয়, সেটা তো জীবন্ত রোগী, সেটা তো হতভাগা। যেটা লুচির ফুলকো ছিঁড়ে খাচ্ছে, সেটা তো মরে আছে। যে এক দমে দশক্রোশ হাঁটতে পারে না, সেটা মানুষ, না কেঁচো? সেধে রোগ অকাল মৃত্যু ডেকে আনলে কে কি করবে?'[৭৫] হাঁটা, পরিশ্রম এবং ব্যায়াম দেহকে সুস্থ-সবল রাখে।

যোগব্যায়াম: গ্রামবাসী বিনামূল্যে সহজেই যোগব্যায়াম অনুশীলন করে রোগমুক্ত হতে পারে। কোন প্রকার যন্ত্র ছাড়াই ঘরে বসেই অল্পায়াসে যোগব্যায়াম করা যায়। মানবদেহ যন্ত্র সদৃশ। ব্যায়ামে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নড়াচড়া হয় এবং রক্ত

Dhaka University Institutional Repository
চলাচল করে দেহকে স্বাভাবিক কার্যক্ষম করে তোলে। এতে দেহের ভিতর জীবনী শক্তি সৃষ্টি হয়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং রোগ আরোগ্য করে। ব্যায়ামের কোন প্রকার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। ঔষধ কার্যকরী না হলেও ব্যায়ামের কার্য ক্ষমতা কখনও ব্যর্থ হয় না, ক্রমে সুস্থ করে তুলবেই। ভারতীয় যোগীগণ নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন লাভ করে, এক জীবনেই মুক্তি লাভ করার জন্য যোগব্যায়াম আবিষ্কার করেন। 'হিমালয়ের নীচেও অনেক যোগী সন্ন্যাসী আছেন। যাঁহাদের বয়স ৩০০-৫০০ বৎসর। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীর নাম বোধ হয় অনেকেই জানেন, তিনি ১৫০ বৎসরের উপর জীবিত ছিলেন।'[৭৬] যোগব্যায়ামে যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সহকারে রোগের লক্ষণ, উৎপত্তির কারণ, কোন ব্যায়াম কিভাবে রোগ আরোগ্য করবে সেসব বর্ণনা রয়েছে। দৈহিক বা বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ত্রুটির জন্য বিভিন্ন মানসিক ত্রুটি দেখা দেয়। যেমন যকৃতের দোষে মেজাজ খিট খিটে হয়। তাই ব্যায়াম অনুশীলনে দৈহিক ত্রুটি দূর হলেই মানসিক ত্রুটিও দূর হয়। প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মানুষই ভাল।

অসংখ্য মানুষ জরা ব্যাধি ও অকাল মৃত্যুর শিকার হচ্ছে। কঠিন রোগ যন্ত্রণায় ভুগে অবশেষে মৃত্যুবরণ করছে। একমাত্র ভারতীয় যোগবিদ্যার সাহায্যে হয়তো মানুষ এই ব্যাধি, জরা ও অকাল মৃত্যু জয় করতে পারবে। '...জরা, ব্যাধি ও অকালমৃত্যু প্রতিরোধের সহজতম উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে– সকলের পক্ষেই ইহা করায়ত্ত ও করা সম্ভব। সর্ব সাধারণ যদি এই সহজ যৌগিক পন্থা গ্রহণ করে, তাহা হইলে ভবিষ্যতে পৃথিবীর সমুদয় মানুষই ব্যাধি ও অকালমৃত্যু জয় করিয়া ইচ্ছা মৃত্যুকে আয়ত্ত করিতে পারিবে।...যৌগিক চিকিৎসার বৈশিষ্ট্য এই– উহা যেমন রোগ আরোগ্য করিতেও পারে, তেমিন ভাবী রোগের আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাও তাহার অসাধারণ। যৌগিক আসন, মুদ্রা ও প্রাণায়াম অভ্যাসে স্নায়ু, পেশী, ধমনী, গ্রন্থি, হৃৎপিন্ড, ফুসফুস প্রভৃতি দেহ পরিচালক যন্ত্রগুলি এমন সবলতর হয়, এমন প্রাণবান হইয়া উঠে যে কোন রোগবিষ বা কোন রোগ-জীবাণুই দেহে প্রবেশ করিয়া বৃদ্ধি পাওয়ার সুযোগ পায় না।'[৭৫] রোগে আয়ু ক্ষয় হয়, শরীর ও মন নষ্ট হয়, চিকিৎসার জন্য প্রচুর অর্থ অপচয় হয় এবং পরিণামে ঔষধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় নতুন রোগ সৃষ্টি হয়। আর রোগীরা ঠিকমত কাজ করতে পারে না জীবন সংসার, স্বপ্ন ধুলিস্মাৎ হয়ে যায়। যোগব্যায়াম ও আহার বিহারে সংযত হলে সুস্থদেহ ও যৌবন অটুট রাখা যায়। এ সম্পর্কে যোগীগণের অভিমত, '৫ বৎসরের শিশু হইতে ৯০ বৎসরের বৃদ্ধ পর্যন্ত সকল বয়সের সকল নর-নারীর উপযোগী সহজ সহজ যৌগিক ক্রিয়া আছে। আহারে-বিহারে সংযত থাকিয়া, সুষম পথ্য বা আদর্শ পথ্য গ্রহণ করিয়া মাঝে মাঝে কিছু সময় যৌগিক আসন মুদ্রা ও প্রাণায়ামাদির অনুষ্ঠান করিলে আমরণ দেহকে নীরোগ রাখা যায়, আমরণ যৌবনকে অটুট রাখা যায়। এইরূপ মহোপকারী যোগপদ্ধতি স্বাধীন ভারতের ঘরে ঘরে স্বাস্থ্যহীন ভারতবাসীর গৃহে গৃহে প্রচারিত হউক।'[৭৮] ভারতীয় যোগীগণের উদ্ভাবিত যোগ ব্যায়াম বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে প্রচারিত হলে বৃহত্তর মানব সমাজের কল্যাণ সধান সম্ভব হবে। 'এই সহজসাধ্য যৌগিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান ও নিয়মপথ্যাদি পালন করিলে সর্বব্যাধিমুক্ত দেহ লাভ করা যায়, জরা ও অকাল-মৃত্যু জয় করা যায়, উদার ও উন্নত মনের অধিকারী হওয়া যায়।'[৭৯] যোগব্যায়াম অত্যন্ত সহজসাধ্য ফলপ্রদ এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া মুক্ত চিকিৎসা প্রণালী।

ব্রহ্মচর্য সাধন: বিবেকানন্দ দেহ ও মনের উন্নতি এবং মুক্তি লাভের জন্য ব্রহ্মচর্য সাধনের উর গুরুত্ব দিয়েছেন। "বীর্য্যধারণং ব্রহ্মচর্য্যম্"– বীর্য ধারণই ব্রহ্মচর্য। স্বাস্থ্যবিধি ব্যায়াম ও নৈতিক শৃঙ্খলার মাধ্যমে বীর্য ধারণ সম্ভব হয়। 'বীর্য ধারণে স্বাস্থ্য অক্ষুণ্ন থাকে; শরীর নীরোগ ও শীতাতপ সহিষ্ণু হয়; শরীরে লাবণ্য, মুখমণ্ডলে কমনীয়তা, কণ্ঠস্বরে মাধুর্য বিকশিত হয়। ধৃতবীর্য্য ব্যক্তির বাক্য সুচিন্তিত, কার্য সুশৃঙ্খল, আচরণ শিষ্ট ও প্রীতিপ্রদ, গমন স্বচ্ছন্দ। অন্তঃকরণ নির্ভীক, ধৃতবীর্য ব্যক্তি– অনলস, অকপট, চরিত্রবান, সত্য পরায়ণ, মিতভাষী, মিতাচারী, লোকহিতকারী। ধৃতবীর্য্য ব্যক্তির দৃষ্টি মধুময়, হাস্যমধুময়, বাক্য মধুময়। বীর্যই অমৃত। অমৃত পানে দেবগণ অমর হইয়াছিলেন, আর এই বীর্যধারণে মানব জন্ম-মৃত্যু- বন্ধন অতিক্রম করে সত্য বস্তুকে উপলব্ধি পূর্বক অমৃতত্বের অধিকারী হয়।'[৮০] ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষার পাশাপাশি ব্রহ্মচর্য সাধন করে দেহ-মনের উন্নতি করে মহামানব হতে পারে। সুস্থ দেহ, প্রফুল্ল ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মনের অধিকারী হয়ে মানবকল্যাণ সাধন করতে পারে।

জল চিকিৎসা: যোগব্যায়ামে জল চিকিৎসা বিশেষ উপকারী। মানব দেহের শতকরা নব্বই ভাগ জল। প্রতিদিন পরিমিত জল পান করতে হয়। খালি পেটে জল পানে রক্ত পরিষ্কার, খাদ্য হজম এবং কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কোষ্ঠবদ্ধতাই সব রোগ উৎপত্তির মূল কারণ। নাসা পান– অর্থাৎ নাক দিয়ে পরিষ্কার জল পান করলে মস্তিষ্ক ও শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়। বারিসার ধৌতি– খালি পেটে জল পান করে বমি করলে জলের সাথে অজীর্ণ খাদ্য, খাদ্য

Dhaka University Institutional Repository
হজমের অতিরিক্ত মিউসিন, পেপসিন বিভিন্ন রকম এনজাইম বেরিয়ে গিয়ে দূরারোগ্য গ্যাসট্রিক, অজীর্ণ বা পেটের পীড়া দূর হয়।

স্বরোদয় যোগঃ স্বাস্থ্য রক্ষা রোগ মুক্তি ও সাফল্য লাভে ভারতীয় দর্শনের অন্যতম শাখা স্বরোদয় যোগ। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি পরিবর্তনের প্রক্রিয়া হলো স্বরোদয় যোগ। মানুষের দুটি নাসারন্ধ্রে পর্যায় ক্রমে শ্বাস প্রবাহিত হয়। ডান নাসায় শ্বাস প্রবাহিত হলে কোন কাজ এবং বাম নাসায় শ্বাস প্রবাহিত হলে কোন কাজে সফলতা লাভ করা যায় তা স্বারোদয় যোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে কোন অসুস্থতায় এক ঘন্টা পর পর ডান থেকে বাম, এবং বাম থেকে ডান নাশ্বায় শ্বাস পরিবর্তন করা হলে দ্রুত আরোগ্য হয়। স্বরোদয় যোগ শাস্ত্রে স্থির যৌবন ধরে রাখার উপায় রয়েছে। তা হলো- 'দিবাভাগে বাম নাসিকায়, রাত্রিতে দক্ষিণ নাসিকায় শ্বাস প্রবাহিত রাখিতে পারিলে চিরদিন যৌবন বর্তমান থাকে। ২০ বৎসর বয়সের সময় হইতে যদি দিবসে বাম নাসিকায় ও রাত্রিতে দক্ষিণ নাসিকায় প্রত্যহ শ্বাস বায়ু রাখা যায়, তাহা হইলে ৮০ বৎসর বয়সে ও ২০ বৎসর বয়সের যুবকের মত দেখাইবে। এমনকি চুল, দাঁড়ি, গোঁফও পাকিবে না। তবে স্ত্রী-সঙ্গমাদি ও অতিরিক্ত পরিশ্রমের কার্য করিলে ওইরূপ হইবে না।'[৮১] শ্বাস পরিবর্তনের জন্য দিনে ডান নাসিকা ও রাত্রে বাম নাসিকা তুলার পুটলি দিয়ে বন্ধ রাখতে হয়। আবার এক নাসায় একাধারে শ্বাস প্রবাহিত হলে জটিল রোগ- এমনকি মৃত্যুও হতে পারে। তাই স্বরোদয় যোগ শ্বাস-প্রশ্বাসের কৌশল শিক্ষা দিয়ে রোগারোগ্য করে দীর্ঘজীবী করে তোলে।

ঔষধঃ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রামকৃষ্ণ মিশনে রোগ নিরাময়ে স্বামীজীর খাদ্যনীতি ও নিয়মকানুন অনুশীলনের শিক্ষা প্রচার করা হয়। এছাড়া সেখানে ব্যায়ামের পাশাপাশি আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থাও রয়েছে। রামকৃষ্ণ সেবামিশনের সেবামূলক কাজের মধ্যে অভিজ্ঞ ডাক্তার দ্বারা রোগীদের চিকিৎসা সেবা অন্যতম কাজ। স্বয়ং শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ অসুস্থ হলেও ডাক্তার দেখিয়েছেন, ঔষধপত্র ও ব্যবস্থা নিয়েছেন। যখন খাদ্য, নিয়মকানুন, ব্যায়াম ও স্বাস্থ্যবিধি পালনের সময় এবং সুযোগ নেই তখন বাধ্য হয়ে ডাক্তার ও ঔষধের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। বিবেকানন্দ বলেছেন, 'ডাক্তার-ফাক্তার কাছে আসতে দিও না, ওরা অধিকাংশ ভাল করতে পারব না, মন্দ ক'রব, কি দিবি তা বল।' পারতপক্ষে ওষুধ খেও না। রোগে যদি এক আনা মরে, ওষুধে মরে পনের আনা।'[৮২] ভুল চিকিৎসায় অনেক রোগী মারা যায়। তবুও বাধ্য হয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের শরণাপন্ন হতে হয়। চিকিৎসক রোগ নিরাময়ের জন্য হোমিও, আয়ুর্বেদীয় হামদর্দ, এ্যালোপ্যাথিক যে কোন কার্যকরী ঔষধ দিয়ে ব্যবস্থা নিতে পারেন। আমাদের এ জগতে উত্থান-পতন, রোগ-শোক, দুঃখ-বেদনার খেলার মাঝে শারীরিক ও মানসিক শক্তি অর্জন করে বাঁচতে হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'This world is the great gymnasium where we come to make ourselves storng.'

পরিবার পরিকল্পনা

"একটি সন্তান যথেষ্ট, দু'য়ের অধিক নয়"– এটি হলো স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়ে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের শ্লোগান। বাংলাদেশে এখনও অসংখ্য ধনী ও দরিদ্র পরিবারে অধিক সন্তান দেখা যায়। দেশের দারিদ্র্য দূরীকরণের প্রথম শর্ত জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ। আদর্শ সন্তান একটি যথেষ্ট, দুয়ের অধিক কেউ সন্তান নিবে না। সন্তান কম হলে ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও আদব-কায়দা শিখিয়ে আদর্শ মানুষরূপে গড়ে তোলা সহজ সাধ্য হয়। অধিক সন্তানের জন্য ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-দীক্ষা ও যত্নের জন্য অধিক শ্রম ও অর্থ ব্যয় হয় এবং পর্যাপ্ত যত্নের অভাবে পূর্ণভাবে মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে না। অধিক সন্তান দারিদ্র্য ও অশান্তি সৃষ্টি করে। বিবেকানন্দ বাল্যবিবাহ ও অধিক সন্তানের দূরবস্থা সম্পর্কে বলেন, 'বাল্যবিবাহে মেয়েরা অকালে সন্তান প্রসব করে অধিকাংশ মৃত্যু মুখে পতিত হয়; তাদের সন্তান-সন্ততিগণও ক্ষীণজীবী হয়ে দেশে ভিখারির সংখ্যা বৃদ্ধি করে। কারণ পিতামাতার শরীর সম্পূর্ণ সমর্থ ও সবল না হলে সবল ও নীরোগ সন্তান জন্মাবে কেমন করে?'[৮৪] বিবেকানন্দ অধিক সন্তান জন্মদান সম্পর্কে পুরুষদের সচেতন করতে বলেন, 'মেয়েদের তোরা এখন যেন কতকগুলি manufacturing machine (উৎপাদন যন্ত্র) করে তুলেছিস।'[৮৫] মেয়েরা শিক্ষিত হলে ভাল মন্দ বুঝে স্বেচ্ছায় কম সন্তান নিবে।

শিক্ষিত জ্ঞানী আদর্শ পিতামাতা লাভ করতে পারে আদর্শ সন্তান। সুসন্তান লাভের জন্য শৈশব থেকেই পিতামাতাকে সৎ, নৈতিক ও ধার্মিক চরিত্রবান মানুষ হতে হয়। স্বাস্থ্যবিধি পালন করে বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী হতে হয়। মহামানব জন্ম সম্পর্কে বিবেকানন্দের শিক্ষা হলো, 'ছাত্রীদের ধর্ম পরায়ণ ও নীতি পরায়ণ করতে হবে; কালে যাতে তারা ভাল

Dhaka University Institutional Repository
গিন্নি তৈরী হয়, তাই করতে পারবে যাদের মা শিক্ষিত ও নীতি পরায়ণা হন, তাদের ঘরেই বড় লোক জন্মায়।'[৮৬] শিক্ষিত পিতামাতার আদর্শ ও বলিষ্ঠ চরিত্র সুস্থ দেহ এবং প্রফুল্ল মন থেকেই জন্ম নেয় আদর্শ সন্তান।

গর্ভবতী মহিলার পরিচর্যা : সন্তান ধারণের পুর্ব থেকেই গর্ভবতী মহিলাদের মহৎ ও সৎচিন্তা, সৎকর্ম, ধর্মকর্ম বেশি পালন করতে হয়। কারণ এতে মাতার দেহ-মনের প্রভাব সন্তানের উপর পড়ে, সন্তান মহৎ হয়। গর্ভবতী মহিলাদের পূর্ব থেকে পরিমিত খাদ্য গ্রহণ ও নিয়মিত ডাক্তার দেখান প্রয়োজন। তা হলে স্বাভাবিক প্রসব হয়। 'আমাদের দেশের মেয়েদের রান্না-বাড়া, ঘর-উঠান ঝাড়ু দেওয়া, জল তোলা, বাটনা বাটা, কুটনা কুটা- এই সব কার্য করিলেই প্রসব সময়ে আর কষ্ট পাইতে হয় না। সুখে ও সহজে প্রসব হওয়ার এইরূপ উপায় আর নাই।'[৮৭] নবজাতক শিশুর জন্য মাতৃদুগ্ধ বিশেষ উপযোগী। '...শিশুর পক্ষে মাতার স্তনের দুধ যেরূপ উপকারী, অন্য দুধ সেরূপ হইতে পারে না।'[৮৮] শিশুদের বয়স অনুযায়ী নিয়মিত ও পরিমিত সুষম খাবার বিশ্রাম, নিদ্রা, খেলাধুলা এবং আনন্দ বিনোদনের ব্যবস্থা করতে হয়। শিশুর শরীর ও মন গঠনে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। শিশুর কান্না শরীর ও মনের জন্য খুব ক্ষতিকর। এজন্য শিশুর যত্ন নিতে হবে যাতে না কাঁদে। 'শিশু কাঁদিয়া উঠিলেই তখন শত কার্য পরিত্যাগ করিয়াও শিশুকে ধরিতে হইবে ও যাহাতে না কাঁদে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।...যখন আমাদেরই ইচ্ছার বিরুদ্ধজনক কাজে রাগ আসে, তখন শিশুদের সহজেই হইতে পারে। শিশুকে কাঁদিতে অবসর দিলে অনেক রকম ক্ষতি হইয়া থাকে।'[৮৯] পিতামাতা আন্তরিকতার সাথে মধুর ভাবে সন্তানদের সদাচার মিষ্টভাষা সততা আন্তরিকতা নীতি ধর্ম ও উচ্চভাব শিক্ষা দিবে। শিশুরা পিতামাতার আচরণ দেখে শিখে অনুকরণ করে। 'মাতাপিতাই প্রধান গুরু, তাহাদের কাছেই শিশুর প্রধান শিক্ষা। মাতাপিতা যদি মিথ্যা বলে, সন্তান নিশ্চয়ই মিথ্যাবাদী হইবে। অতএব, পিতামাতার চরিত্রের উপর সন্তানের স্বভাবের ভালমন্দ নির্ভর করে।'[৯০] '...বর্তমানে ভারতে প্রকৃত মায়ের অভাব বলিয়াই ভারতের এ দুর্দশা; এত মিথ্যা-প্রবঞ্চনা এবং নানারূপ ব্যাভিচার। যে পর্যন্ত "মা" তৈয়ারী না হইবে, কিছুতেই ভারতের কল্যাণ নাই।'[৯১] তাই আমাদের ঘরে ঘরে সচ্চরিত্র বীর মাতা গড়ে তুলতে হবে, তারাই হবে মহাপুরুষদের জননী।

৭. ধর্ম বিভাগ

স্বনির্ভর ও শান্তিপূর্ণ দেশ গড়তে হলে স্বনির্ভর ও শান্তিপূর্ণ গ্রাম প্রতিষ্ঠা করতে হবে। আর একমাত্র প্রকৃত ধর্মীয় শিক্ষা প্রকৃত দিক-নির্দেশনা দিয়ে স্বনির্ভর ও শান্তিপূর্ণ গ্রাম গড়ে তুলতে পারে। গ্রামে ধর্মীয় কার্যাবলী পরিচালনার জন্য ধর্ম বিভাগের কর্মকর্তা আগ্রহী বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী নেতাদের সমন্বয়ে গঠন করবে একটি ধর্ম পরিচালনা কমিটি। এ কমিটি গ্রামের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলনের মাধ্যমে ঐক্য সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করবে। বিবেকানন্দ বলেন, '...আমাদের মাতৃভূমির জাতীয় জীবনের মূল ভিত্তি ধর্ম-শুধু ধর্মই। উহাই আমাদের জাতীয় জীবনের মেরুদণ্ড, উহারই উপর আমাদের জীবনরূপ প্রাসাদের মূল ভিত্তি স্থাপিত।...এই ধর্ম পথের অনুসরণ করাই ভারতের জীবন, ভারতের উন্নতি ও ভারতের কল্যাণের একমাত্র উপায়।'[৯২] এ ধর্ম জ্ঞানে ভব বন্ধন মুক্তি হয় আবার বৈষয়িক উন্নতিও হয়। তাই গ্রামের স্থায়ী উন্নতি করতে হলে, ধর্ম পথেই উন্নতি করতে হবে। ধর্ম কি? 'ধর্ম' অর্থ ধারণ করা। মানুষ তার চিন্তা চেতনা, আচরণ ও কর্মে কতকগুলো নীতি ধারণ ও অনুসরণ করে। আর এই নীতিগুলোই হলো ধর্ম। ধর্মে রয়েছে জগৎ ও জীবনের সাথে জড়িত সমস্যাবলীর ব্যাখ্যা। আত্মা, ঈশ্বর, পাপ-পূণ্য, স্বর্গ-নরক, সেবা কল্যাণ নৈতিকতা মুক্তি প্রভৃতি বিষয় ধর্মের অন্তর্ভুক্ত। বিবেকানন্দের মতে, ধর্ম মানুষের মধ্যে ঈশ্বরানুভূতির প্রয়াস। তিনি পূর্ণাঙ্গ ধর্ম সম্পর্কে বলেন, 'ধর্ম, কর্ম, উপাসনা, মনঃসংযম অথবা জ্ঞান- ইহাদের মধ্যে এক, একাধিক বা সকল উপায়ের দ্বারা নিজের ব্রহ্মভাব ব্যক্ত কর ও মুক্ত হও। ইহাই ধর্মের পূর্ণাঙ্গ। মতবাদ, অনুষ্ঠান-পদ্ধতি, শাস্ত্র, মন্দির বা অন্য বাহ্য ক্রিয়াকলাপ উহার গৌণ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মাত্র।'[৯৩] ধর্মের আনুষ্ঠানিকতার উর্ধ্বে রয়েছে আধ্যাত্মিক সাধনা, এই সাধনার অনুশীলনেই ঈশ্বরদর্শন বা মুক্তি লাভ হয়।

ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র

ধর্ম শিক্ষা প্রচারের জন্য প্রয়োজন শিক্ষা কেন্দ্র। গ্রামের ধর্মীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মাদ্রাসা, মসজিদ, মঠ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডাগুলোকে আরও উন্নত করতে হবে। শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, পুরুষ-মহিলা সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ধর্মীয় শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে প্রয়োজনে আরও নতুন শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে। এসব হতে পারে কোন গাছের নিচে, শান্ত পরিবেশে, বাড়ীতে, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা নতুন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। অভিজ্ঞ সৎ নৈতিক ধার্মিক যাঁরা ঈশ্বরদর্শন লাভ করেছেন এমন শিক্ষক শিক্ষা দিবেন। প্রকৃত গুরু সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'গুরু বলিতে শুধু গ্রন্থকীট বুঝায় না; তিনিই গুরু, যিনি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিয়াছেন, যিনি সত্যকে পাইয়াছেন– অপর কাহারও নিকট শুনিয়া নহে।'[৯৪]

Dhaka University Institutional Repository
প্রকৃত গুরুর আলোকিত আত্মাই পারে শিষ্যের অন্ধকার আত্মাকে আলোকিত করতে। অভিজ্ঞ শিক্ষক বা গুরু ধর্মগ্রন্থের সঠিক অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করবেন এবং শিক্ষার্থীদের বোধগম্য আনন্দদায়ক শিক্ষণীয় বিষয়ের পাঠ্যসূচি তৈরী করবেন। কমিটি শিক্ষার্থীদের ভাল বই-খাতা-কলম ও বিভিন্ন শিক্ষা উপকরণের ব্যবস্থা করবেন। এ শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করা যেতে পারে আগ্রহী ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষার্থীদের বেতন থেকে। শিশু ও মহিলাদের ভোরে এবং কর্মজীবী পুরুষদের রাতে শিক্ষা দানের সময় নির্ধারণ করা যাবে। পাঠ্যসূচির বিষয়সমূহ হবে– ধর্মগ্রন্থ পাঠ এবং অনুবাদ ও ব্যাখ্যা, চরিত্র গঠন ও মনুষ্যত্ব বিকাশ, কর্মমুখী শিক্ষা, ঈশ্বরদর্শন বা সাধনা, সেবা ও দেশ প্রেম। বিবেকানন্দ সকল সমাজের উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধর্মীয় শিক্ষার ভিত্তি নির্দেশ করেন। এ সম্পর্কে নিবেদিতা বলেন, 'স্বামীজীর কাছে ধর্মের সঙ্গে সম্পর্ক হীন এমন কোন কিছুই ছিল না।'[৯৫] তিনি জগৎ ও জীবনের অখণ্ড ব্যাখ্যা দানের প্রচেষ্টা করেন।

মনুষ্যত্ব বিকাশ

ধর্মের উদ্দেশ্য হলো এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের অবস্থান, কাজ, জীবনের লক্ষ্য, লক্ষ্য অর্জনের উপায়, আত্মার মুক্তি বা ঈশ্বরদর্শন লাভের পথ নির্দেশ করে মানুষকে সেই পথে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করে। ধর্ম মানুষকে অজ্ঞানতা ও পাপ-পঙ্কিলতা, অন্যায়-অবিচার থেকে সত্য, ন্যায়, কল্যাণ ও মুক্তির পথে পরিচালিত করে। ধর্মের বাণী শুনে ভাল লাগা, আনন্দে আত্মহারা ও আবেগধর্মী হওয়া, ক্রন্দন করা– তৃপ্তি লাভ করা বা চিন্তা করা ধর্ম নয়। বিবেকানন্দের মতে ধর্ম একটি বিজ্ঞান। ধর্মের শিক্ষা ও বাণীগুলো জীবনে-কার্যে পরিণত করে বিজ্ঞানের মতই প্রমাণ করা যায় এতে মানবকল্যাণ, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর দর্শন ও মুক্তি লাভ হয়। বিবেকানন্দ ধর্মের চরম লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, 'আত্মা মাত্রেই অব্যক্ত ব্রহ্ম। বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করিয়া আত্মার এই ব্রহ্মভাব ব্যক্ত করাই জীবনের চরম লক্ষ্য।'[৯৬] ধর্মের দুটি দিক রয়েছে, যথা– মানবকল্যাণ ও আত্মার মুক্তি।

মানব হৃদয়ের অব্যক্ত ব্রহ্মকে জাগ্রত করা বা মনুষ্যত্ব অর্জন করাই হলো ধর্ম চর্চার মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন প্রকার স্বভাব জন্মগত। প্রাণীকে কষ্ট করে প্রাণীত্ব অর্জন করতে হয় না। কিন্তু মানুষকে বহু কষ্ট ও সাধনা করে মনুষ্যত্ব অর্জন করতে হয়। প্রেম-প্রীতি দয়ামায়া, ক্ষমা, সহিষ্ণুতা, সততা, সরলতা বিভিন্ন নৈতিক ও ধর্মীয় গুণাবলী মনুষ্যত্ব বিকাশ সাধন করে। সহসী বা তেজস্বী হওয়া একটি গুণ। 'উপনিষদ্ বলিতেছেন– হে মানব, তেজস্বী হও, তেজস্বী হও, উঠিয়া দাঁড়াও, বীর্য অবলম্বন কর।'[৯৭] বিবেকানন্দ বীরত্ব সম্পর্কে বলেন, সকল বিষয়ে বীরত্বের কঠোর মহাপ্রবণতা আনতে হবে। এইরূপ ideal follwo (আদর্শ অনুসরণ) করলে তবে এখন জীবের কল্যাণ, দেশের কল্যাণ। বিবেকানন্দ মনুষ্যত্বের অপূর্ব বিকাশ সম্পর্কে বলেন, আমাদের এখন কেবল আবশ্যক আত্মার এই অপূর্ব তত্ত্ব- অনন্ত শক্তি, অনন্ত বীর্য, অনন্ত শুদ্ধত্ব ও অনন্ত পূর্ণতার তত্ত্ব অবগত হওয়া। যদি আমার একটি ছেলে থাকত, তবে সে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র আমি তাকে শুনাতে আরম্ভ করতাম 'ত্বমসি নিরঞ্জনঃ'। তুমি আপনাকে মহান বলে উপলব্ধি কর তুমি মহান হবে। জগতের মহাপুরুষগণ আত্মবিশ্বাসের প্রেরণাতেই মহৎ হয়েছিলেন।

উদারনৈতিক ধর্ম শিক্ষা

প্রকৃত ধর্মের আলো, জ্ঞান ও সত্যের আলো মানুষের নিকট পৌঁছে না বলেই মানুষ হয় অজ্ঞ, সংকীর্ণ, গোঁড়া, উগ্র ও ধর্মান্ধ। আজকাল বহু শিক্ষিত লোক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকা সত্ত্বেও খুব কম সংখ্যক লোকের হৃদয়ে ধর্মের প্রকৃত আলো প্রজ্জ্বলিত হয়েছে। বর্তমানে সারা পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে এবং সেসব ধর্মের যত অনুসারীরা আছে তাদের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক নিজ ধর্ম সম্পর্কে কোন ধারণাই রাখে না। এদের মধ্যে শতকরা একজনও নেই যে অন্য ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এ সুযোগটাই নিচ্ছে ধর্ম–রাজনীতিবিদগণ। স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থের লক্ষ্যে তারা নিরীহ ধর্মপ্রাণ মানুষকে বানাচ্ছে ধর্মান্ধ, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিকে বানাচ্ছে সাম্প্রদায়িক, কিছু সুযোগ-সুবিধা আর ধর্মীয় আবেগের সিরিঞ্জ দিয়ে নিষ্কলুষ মানুষের অন্তরে প্রবেশ করাচ্ছে হিংসা-বিদ্বেষ আর ঘৃণার বিষ। এর ফলে অতীতের ন্যায় আজকের পৃথিবীও মারাত্মক ধর্মীয় বিদ্বেষ-দ্বন্দ্ব-ঘৃণায় পূর্ণ এবং অনেকেই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

অতএব মানবকল্যাণ, শান্ত সহনশীল পরিবেশ ও ঈশ্বর লাভের জন্য প্রকৃত ধর্মশিক্ষা আবশ্যক। প্রকৃত ধর্মীয় জ্ঞানের জন্য উদার নিরপেক্ষ ও সহনশীল মনে প্রবেশ করতে হবে অসীম জ্ঞান সমুদ্রের গভীরে। সেখানে বিশাল বৈচিত্র্যময় বিশ্বের নানা ধর্ম, নানা মত, স্থান-কাল-পাত্র বিশ্লেষণ করে সত্য জ্ঞান রত্ন আহরণ করতে হবে। প্রকৃত সত্য সর্বজনীন, সবার জন্য প্রযোজ্য। সত্য শুধু কোন একটি ধর্ম গ্রন্থে সীমাবদ্ধ নয়। এ সত্য বিভিন্ন ধর্ম ও গ্রন্থেও থাকতে পারে। ধর্মের ব্যাখ্যা হবে যুক্তি ও বিজ্ঞান নির্ভর বাস্তব সম্মত কল্যাণকর ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ বিধায়ক। বিবেকানন্দের মতে

Dhaka University Institutional Repository

ধর্ম একটি বিজ্ঞান। 'প্রত্যেক নিশ্চিত- বিজ্ঞানেরই (exact science) একটি সাধারণ ভিত্তিভূমি আছে, উহা হইতে লব্ধ সিদ্ধান্ত সমূহ ঠিক না ভুল, তাহা আমরা সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারি।'[৯৮] অনেক শিক্ষিত লোক মনে করে ধর্ম কতকগুলো মত এগুলোর সত্যাসত্য বিচারের কোন মানদণ্ড নেই। কিন্তু বিবেকানন্দ বলেন, বিজ্ঞানের মত ধর্মের সত্যাসত্য বিচারেরও সার্বভৌম মানদণ্ড আছে। তিনি বলেন, '...ধর্ম বিশ্বাসের এক সার্বভৌম মূলভিত্তি আছে– উহাই বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মতবাদ ও সর্ববিধ বিভিন্ন ধারণা সমূহের নিয়ামক। ঐগুলির ভিত্তি পর্যন্ত অনুসরণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, ঐগুলি সর্বজনীন অভিজ্ঞতা ও অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত।'[৯৯] জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো ধর্মের নীতিগুলো অনুসরণ করে ঈশ্বরদর্শন লাভ করা। যোগবিদ্যার আচার্যগণ তাই বলেন, 'ধর্ম কেবল পূর্বকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত নয়, পরন্তু স্বয়ং এই-সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেউই ধার্মিক হইতে পারে না। যে বিজ্ঞানের দ্বারা এইসকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম "যোগ"। যতদিন না ধর্ম অনুভূত হইতেছে ততদিন ধর্মের কথা বলাই বৃথা। ভগবানের নামে এত গণ্ডগোল, যুদ্ধ ও বাদানুবাদ কেন ? ভগবানের নামে যত রক্তপাত হইয়াছে, অন্য কোন বিষয়ের জন্য এত রক্তপাত হয় নাই; কারণ সাধারণ মানুষ ধর্মের মূল উৎসে যায় নাই।'[১০০] মানুষের অপরিচ্ছন্ন ধর্মজ্ঞানই দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সাম্প্রদায়িকতার মূল কারণ। বিজ্ঞান মনস্ক মানুষের ধর্মজ্ঞান কল্যাণ ও মুক্তির উৎস।

কর্মমূখী শিক্ষা

ধর্ম শিক্ষার অপরিহার্য একটি দিক হলো সৎ উপার্জনের কর্মমূখী শিক্ষা। শিক্ষার্থীরা যাতে হাতে-কলমে শিক্ষা নিয়ে বাস্ত ব জীবনে কর্মসংস্থান করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কর্মমূখী শিক্ষার বাস্তব রূপ হলো কলকাতা নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ। এ পরিষদের উন্নয়ন কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে, স্বাক্ষরতা, মা ও শিশু কল্যাণ, সঞ্চয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, অচিরাচরিত শক্তির বিকাশ, কৃষি ও প্রযুক্তি সহায়তা, স্বাস্থ্যবিধি, স্যানিটারী মার্ট প্রভৃতি।

সেবা ও দেশপ্রেম শিক্ষা

গ্রামের ছেলেমেয়েরা শৈশবেই সেবার আদর্শ ও দেশপ্রেম শিক্ষা করবে। বিজ্ঞান ভিত্তিক ধর্ম আধ্যাত্মিক জাগৃতির পথ দেখিয়ে দেয়, সর্ব প্রাণীতে ঈশ্বরের প্রকাশ– এই বোধ এনে দেয়। এই জাগরণের ফলে মানুষ গোষ্ঠীগত, জাতিগত ও পেশাগত ধর্মের গণ্ডীর উপর চলে যায়, তখন তার মনে সর্বধর্ম, ধর্মহীন মানব, এমন কি মনুষ্যত্বের জীবের সঙ্গে একাত্মবোধ অনুভূত হয়। নবযুগে বিবেকানন্দ কর্ম ও সেবার মাধ্যমে ধর্ম প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন, কর্ম ক্ষেত্রে মানুষকে ঈশ্বর জ্ঞানে সেবা করা। কোন কিছু দিতে গেলে নতজানু হয়ে দেবে, ভাববে ভগবান তোমাকে এভাবে দেবার সুযোগ দিয়েছেন। ভুলিওনা জন্ম হতেই তুমি মায়ের জন্য বলি প্রদত্ত। ভুলিও না তোমার সমাজ যে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র। মানব সেবা একদিকে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে দিবে অপর দিকে পারিবারিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কল্যাণ এনে দেবে।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান

গ্রামবাসী ধর্মানুশীলনের জন্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান যত্ন ও সংস্কার করবে, প্রয়োজনে শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশে নতুন প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, অনুষ্ঠান ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করলে মন ধর্মের দিকে ধাবিত হয় ও ধর্ম দ্বারা প্রভাবিত হয়। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের শান্ত নিরিবিলি পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়। বিবেকানন্দ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের পবিত্রভাব সম্পর্কে বলেন, 'স্নান না করিয়া ও শরীরমন শুদ্ধ না করিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিও না। এ-ঘরে সর্বদা পুষ্প রাখিবে; যোগীর পক্ষে এরূপ পরিবেশ অতি উত্তম। সুন্দর চিত্রও রাখিতে পার। প্রাতে ও সায়াহ্নে সেখানে ধূপ-ধুনা প্রজ্বলিত করিবে। ঐ গৃহে কোন প্রকার কলহ ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা করিও না।...এইরূপ করিলে ক্রমে ঘরটি পবিত্রভাবে ভরিয়া উঠিবে। এমন কি, যখন কোন প্রকার দুঃখ বা সংশয় আসিবে অথবা মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল ঐ ঘরে প্রবেশ করিবামাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। ইহাই ছিল মন্দির, গীর্জা প্রভৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য।'[১০১] যারা ধর্মানুশীলনের মাধ্যমে ঈশ্বরদর্শন বা আত্মার মুক্তি লাভ করতে আগ্রহী তারা বিশ্ব ঐশীদর্শন কেন্দ্রীয় কার্যালয়-এর সাথে যোগাযোগ করে বইপত্র অধ্যয়ন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ এবং আধ্যাত্মিক সাধনার মাধ্যমে মুক্তি লাভের পথে অগ্রসর হতে পারেন।

Dhaka University Institutional Repository

৮. সংস্কৃতি বিভাগ

মানব জীবনের এক অপরিহার্য অঙ্গ হলো 'সংস্কৃতি'। সংস্কৃতি অর্থ উন্নততর জীবন বোধ, যা মানুষকে এক উচ্চতর জ্ঞান রাজ্যে, আনন্দ রাজ্যে, ভাবরাজ্যে, কল্যাণ ও মুক্তির রাজ্যে নিয়ে যায়। অর্থাৎ উচ্চতর সংস্কৃতির লক্ষ্য ঈশ্বরদর্শন। সংস্কৃতি বিভাগ আগ্রহী গ্রামবাসীদের নিয়ে একটি সাংস্কৃতিক সংঘ গড়ে তুলবে। এ সংঘ সাংস্কৃতিক কর্ম কাণ্ডের মাধ্যমে সৃষ্টি করবে গণচেতনা, ঐক্য, সমন্বয়, ভ্রাতৃত্ববন্ধন এবং মহৎ জীবন গঠনের প্রেরণা দিবে। এ সংঘ গ্রামের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত বয়সে যৌতুক বিহীন বিয়ের ব্যবস্থা করবে। এ বিভাগ গ্রাম ও দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য কৃষি শিক্ষা, অর্থ, স্বাস্থ্য-পরিবার-পরিকল্পনা, ধর্ম, শান্তি-শৃঙ্খলা, মননশীল সংস্কৃতি প্রভৃতি এবং সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড প্রচার ও বাস্তবায়নে সহযোগিতা করবে। উন্নয়নমূলক কাজের জন্য র‍্যালী, মিছিল, শোভাযাত্রা, সঙ্গীতানুষ্ঠান প্রভৃতির আয়োজন করবে এ প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ-জীবন গঠনকারী উচ্চতর সংস্কৃতি প্রচার এবং জীবন ধ্বংসকারী অপসংস্কৃতি রোধ করা। এখানে থাকবে গ্রন্থাগার, নাট্যমঞ্চ, শরীর চর্চা কেন্দ্র ও বিবাহ নিবন্ধন শাখা। সংস্কৃতি বিভাগের বিভিন্ন শাখায় বিবেকানন্দের পদচারণা ছিল। তিনি সংস্কৃতি ও নন্দনতত্ত্বের মাধ্যমে এক পরমানন্দ, পরমেশ্বরকে উপলব্ধি করেন।

'সঙ্গীত (সেই সঙ্গে নৃত্য ও বাদ্য), চিত্রকলা, স্থাপত্য শিল্প, ভাস্কর্য শিল্প, সাহিত্য (কাব্য, নাট্য, ভাব প্রকাশের ভাষা)। চারুকলার এইসব বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে চিন্তায় এবং স্বতন্ত্রভাবে অধ্যাত্মচিন্তায়ও বিধৃত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের নন্দনতত্ত্ব। তিনি কলা সঙ্গীত বা ভাস্কর্য ও কাব্য সম্বন্ধে চিন্তা করেননি, যাবতীয় চারুকলার অন্তস্তলে যে অব্যয় অক্ষয় শিল্পতত্ত্ব তিনি অনুভব করেছিলেন সে শিল্পতত্ত্ব কোন স্বয়ং প্রতিষ্ঠা স্বতন্ত্রতত্ত্ব নয়, 'একমেবা দ্বিতীয়ম্' সত্যের ও তত্ত্বের সঙ্গে সমার্থ।'[১০২] এক বলিষ্ঠ সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, যুগযুগান্তরের সর্বজনীন অমর সংস্কৃতির ধারক ও বাহক স্বামী বিবেকানন্দ। "স্বামী বিবেকানন্দের ছিল সর্বতোমুখী প্রতিভা। ধর্মচঞ্চল অথচ সংযত ও জ্ঞানানুসন্ধানী ছিল তাঁর জীবন। ইতিহাস, গণিত, কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে ক্রীড়া কৌতুক, নাটকানুষ্ঠান ও অভিনয়, রন্ধন বিদ্যা, দাবা খেলা, নৌকাচালনা, অসিচালনা, মুষ্টিযুদ্ধ প্রভৃতি বিষয়েও বিবেকানন্দ দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। মোট কথা, আবাল্য তিনি ছিলেন মেধাবী, তেজস্বী, প্রত্যুৎপন্নমতি, সহৃদয় ও সাহসী এবং তারই জন্য সকল কিছু শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার মতো সঙ্গীত বিদ্যায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মধ্যে সর্বতোমুখী প্রতিভা লক্ষ্য করেই শ্রীরামকৃষ্ণ দেব একবার বলেছিলেন, নরেনের মধ্যে আঠারটি শক্তি খেলা করছে। 'নরেন খুব ভাল, একাধারে অনেক গুণ-গাইতে, বাজাতে, লিখতে, পড়তে'।"[১০৩] এ কারণেই নরেনের দর্শন সকল যুগের, সকল মানুষের এবং সকল সমাজের আদর্শ।

গ্রন্থাগার

প্রতিটি গ্রামে গড়ে তুলতে হবে একটি করে গ্রন্থাগার। গ্রন্থাগার একটি নীরব জ্ঞান সমুদ্র, এর প্রতিটি তরঙ্গ যেন এক এক যুগের এক এক মানবীয় এক এক সংস্কৃতির প্রবাহ। গ্রন্থাগারে অধ্যয়ন করে অল্প মুহূর্তে জানা যায় বহু যুগের বহু মনীষীর, বহু সাধনার ফসল। গ্রামোন্নয়নের জন্য গ্রন্থাগার একটি অপরিহার্য বিষয়। জ্ঞান মানুষকে নম্র, শান্ত, দায়িত্বশীল ও কল্যাণকামী করে তোলে। সারা বিশ্বে রামকৃষ্ণ– বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচারের প্রতিটি কেন্দ্রেই রয়েছে গ্রন্থাগার। গ্রামীণ গ্রন্থাগার গ্রামের পরিবেশকে উন্নত করে। সেখানে সহজেই বিভিন্ন বয়সের ছাত্রছাত্রী ও নারীপুরষ অধ্যয়ন করতে পারবে। বিবেকানন্দ শৈশব হতেই অসাধারণ ধৈর্য ও একাগ্রতার সাথে অধ্যয়ন করেন। 'প্রায় পাঁচ বছর বয়সের পূর্বেই মুদ্ধ বোধ ব্যাকরণের সব সূত্রগুলি তিনি আবৃত্তি করিতে পারিতেন; ছয় বছর বয়সেই রামায়ণের সমগ্র পালা তাঁহার কণ্ঠস্থ হইয়াছিল।'[১০৪] বিবেকানন্দের অধ্যয়নের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই ছাত্র-ছাত্রীরা সফল হতে পারবে। গ্রন্থাগারে থাকবে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ধর্ম প্রচারক ও মনীষীদের লেখা বইপত্র। উচ্চতর সংস্কৃতির অঙ্গনে থাকবে ইতিহাস, ভূগোল, সাহিত্য, কাব্য-মহাকাব্য, কবিতা গল্প, নাটক, বিজ্ঞানদর্শন। এতে আরও থাকবে– কোরআন-হাদীস, বেদ-গীতা-উপনিষদ্, রামায়ণ-মহাভারত, ত্রিপিটক গ্রন্থসাহিব ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ। বিবেকানন্দ বিভিন্ন গ্রন্থ পাঠ করতেন। তিনি, 'এক এক সময় এক এক জাতীয় গ্রন্থ পাঠে তাঁহার আগ্রহ দেখা যাইত। প্রাথমিক পরীক্ষা দিবার পূর্বে তিনি ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি সবই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন। এফ.এ. পড়িবার সময় ন্যায় শাস্ত্রের যতরকম ইংরেজী পুস্তক ছিল, সবই আয়ত্ব করিয়াছিলেন। বি.এ. পড়িবার সময় ইংল্যাণ্ড এবং ইওরোপের অন্যান্য দেশের প্রাচীন ও বর্তমান ইতিহাস, সেই সঙ্গে ইংরেজী দর্শন গ্রন্থগুলি সবই পড়িয়া শেষ করিয়াছিলেন। তাছাড়া বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ক বহু গ্রন্থও তিনি ছাত্রজীবনেই পড়িয়াছিলেন। এই গ্রন্থ পাঠের অভ্যাস

Dhaka University Institutional Repository

তাঁহার বরাবরই ছিল।'[১০৫] গ্রন্থ পাঠে অল্প সময়ে জানা যায়, বহু মনীষীর, বহু যুগের বহু সাধনার জীবন গঠনের ইতিহাস।

গ্রন্থাগারে উন্নত ও মহৎ জীবন গঠনের শিক্ষামূলক গ্রন্থ থাকবে। নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, শরৎচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, প্রভাতকুমার, বিবেকানন্দ, জসীম উদ্দীন, ইয়াকুব আলী, মীর মোশাররফ হোসেন এছাড়াও খ্যাতনামা লেখকগণের রচনাবলী থাকবে গ্রন্থাগারে। শিক্ষায় মনোযোগ আকর্ষণের জন্য গ্রন্থাগারে থাকবে কবি-সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সমাজসেবক, জননেতা ও মহাপুরুষগণের ছবি। এছাড়াও থাকবে দেশ-বিদেশের ঐতিহাসিক, দর্শনীয় ও শিক্ষণীয় বিষয়ের চিত্র, শিক্ষার্থীদের আরও উজ্জীবিত করবে বিশ্বের মানচিত্র ভূগোলক বিভিন্ন শিল্প ভাস্কর্য প্রভৃতি। বৈদান্তিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ জগৎ জীবন ও জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় অন্বেষণ করেছেন ও উপলব্ধি করেছেন সেই এক পরম ব্রহ্ম। তাই তিনি বলেন, 'চারুকলা, বিজ্ঞান ও ধর্ম একই সত্যকে প্রকাশ করিবার তিনটি উপায়...।'[১০৬] তাঁর সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য হলো আধুনিক বিশ্বের মানব জীবনের সমস্যাকে সমাধান করে, মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করা। স্বামী বিবেকানন্দের বাংলা গদ্যে রচিত করাঙ্গুলি- গণনায় পাঁচখানা পুস্তিকা, 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা', 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', পত্রাবলী'র কিছু চিঠি।

কবিতা: আচার্য শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, স্বামী বিবেকানন্দ- এঁরা এই মানব উপলব্ধির প্রান্তিক সীমার কবি। তাঁদের কবিতায় নেই স্থান-কাল-পাত্রের কোন চিহ্ন। কবির্মনীষীদের অন্তর্বাণী অবলম্বন করে আত্মোপলব্ধির শিখা জ্বালিয়ে তোলে। বিবেকানন্দের বাণী হলো সর্ব জীবে পরম সত্যোপলব্ধি। যারা সংসার থেকে পালাতে চায় তাদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন,

'যতদূর যতদূর যাও, বুদ্ধি রথে করি আরোহণ
এই সেই সংসার-জলধি, দুঃখ সুখ করে আবর্তন।
পক্ষহীন শোন বিহঙ্গম, এ যে নহে পথ পালাবার।'[১০৭]

সংসার থেকে পালিয়ে নয়, সংসারধর্ম পালনের মাধ্যমেই ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়।

গ্রামবাসীর শারীরিক উন্নতির জন্য থাকবে খাদ্যনীতি, সচিত্র যোগব্যায়াম ও শারীর বিজ্ঞান প্রভৃতি। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য থাকবে কৃষি, পশুপালন, মৎস্যচাষ, নার্সারী, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রভৃতি। এসব গ্রন্থ থেকে গ্রামবাসী সহজে অর্থনৈতিক উন্নয়নের শিক্ষা ও প্রেরণা নিয়ে কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারবে।

নাট্যমঞ্চ: সাহিত্য মানব জীবনের দর্পণ। সাহিত্যের মাধ্যমে মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা প্রতিফলিত হয়। তাই বইপত্রের মত নাট্যমঞ্চ ও মানব জীবনের একটি দর্পণ। কারণ মঞ্চে অভিনয় করেই মানব জীবনের বাস্তব সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়। এ জন্য প্রতিটি সাংস্কৃতিক বিভাগে নাট্যমঞ্চ বা নাট্যগৃহ থাকবে। বিবেকানন্দ বাল্য জীবনেই নাট্যমঞ্চের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। নরেন্দ্র বাল্য জীবনে নিজেদের বাড়িতে একটি নাট্যগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই নাট্যগৃহে প্রবেশ মূল্য ছিল এক আনা। নাট্যমঞ্চে গ্রামবাসীর উন্নয়ন বিষয়ক আলোচনা বক্তৃতা, সেমিনার প্রভৃতির আয়োজন করা হবে। এছাড়া শিক্ষামূলক ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ হবে। বক্তৃতা, বিতর্ক, কবিতা আবৃত্তি, কৌতুক, অভিনয়, সঙ্গীত, বাদ্য নৃত্য, আলেখ্য, নাটক, যাত্রা প্রভৃতি অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। গ্রামোন্নয়নের জন্য বিনোদন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, ধর্ম, দর্শন প্রভৃতি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করবে। এছাড়া ধর্ম নৈতিকতা মনুষ্যত্ববোধ, দেশপ্রেম পরোপকার, মহত্ত্বতা প্রভৃতি শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানের প্রচারাভিযান চালাবে। এ সংস্কৃতি বিভাগ সমাজের অন্যায় অবিচার, শোষণ নির্যাতন, কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা প্রভৃতি সম্পর্কে গ্রামবাসীকে সচেতন করে তুলবে।

সঙ্গীত: আমাদের দেশে গ্রামবাংলার সমৃদ্ধ লোক সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান সঙ্গীত। আবহমানকাল থেকে এদেশের মানুষের প্রিয় জারী-সারি, মারফতী-মুর্শিদি, ভাওয়াইয়া, ছড়াগান- এসব মানুষকে উজ্জীবিত করে। গান-জ্ঞান-আনন্দ ও প্রশান্তি দেয়। এছাড়াও রয়েছে নজরুলগীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত, লালনগীতি, হামদ্-নাত ও বিভিন্ন ধর্মীয় সঙ্গীত। এসব মানুষকে দেয় উন্নয়নের পথ, শান্তি, কল্যাণ ও মুক্তির পথ। কঠিন জীবন সংগ্রামে দুঃখ-বেদনায় জর্জরিত দুঃখী মানুষের হৃদয় একটু শান্তির অন্বেষণ করে। আর এই পল্লী সংস্কৃতিতে রয়েছে হৃদয়ের অগ্নি নির্বাপক ও শান্তিদায়ক সঙ্গীত ও

Dhaka University Institutional Repository

সংস্কৃতি। গ্রাম-বাংলার সকল গানের অনুষ্ঠান মানুষকে শিক্ষা দেয় উদারতা সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িক চেতনা, মানবপ্রেম ও দেখায় প্রভুদর্শনের মুক্তির পথ। বিবেকানন্দও ছিলেন এই সঙ্গীত শিল্পের মধ্যমণি ও সঙ্গীতজ্ঞ। তাঁর সঙ্গীতে ইচ্ছা জ্ঞান ও ক্রিয়ার সমন্বয়ে মানব জীবন হয় সংহত, উন্নত ও কুসুমায়িত। 'আইন ব্যবসায়ীরূপে বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কিছুদিন অতিবাহিত করেছিলেন। মাঝে মাঝে কর্মোপলক্ষে লক্ষ্মৌ, দিল্লী, লাহোর, রাজপুতনা, ইন্দোর, রায়পুর, বিলাসপুর প্রভৃতি অঞ্চলে থাকার জন্য তিনি সেই সেই স্থানে খেয়াল, ঠুংরি, টপ্পা, গজল প্রভৃতি গান শেখার সুযোগ পেয়েছিলেন।'[১০৮] সঙ্গীত আমাদের জ্ঞান, আনন্দ ও পরম সত্তার সন্ধান দেয়।

শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে বিবেকানন্দের গভীর সম্পর্ক স্থাপনের মূলে ছিল সঙ্গীত। বিবেকানন্দ প্রথম ঠাকুরকে যে সঙ্গীত শুনিয়েছিলেন তা হলো, মন চল নিজ নিকেতনে...। বিবেকানন্দ শুধু সঙ্গীত পরিবেশন করেননি, তিনি সঙ্গীত বিষয়ক গ্রন্থ 'সঙ্গীত কল্পতরু'ও রচনা করেন। তিনি মাত্র ছয়টি সঙ্গীত রচনা করেন। তাঁর দুটি সঙ্গীত হলো,

(২) 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ,
নাহি শশাঙ্ক সুন্দর... (বাগীশ্বরী-আড়াঠেকা),
...(৬) শ্রীরামকৃষ্ণ আরত্রিক-গান
খন্ডন-ভব-বন্ধন-জগবন্দন, বন্দি তোমায়।
নিরঞ্জন, নররূপধর, নির্গুণ, গুণময়॥'[১০৯]

আমাদের দেশে বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। একতারা, দোতারা, ঢোল, বাঁশি, দব, তবলা, সেতারা বেহালা প্রভৃতি। বিবেকানন্দ শুধু গান গাইতে পারেননি, তিনি সুনিপুণ বাদ্যকারও ছিলেন। 'খেতড়ি রাজ সভাতে স্বামীজী দরবারী, কানাড়া, ইমন কল্যাণ ও বাগেশ্রী গেয়েছিলেন, মৃদঙ্গ বাজিয়েছিলেন।'[১১০] সঙ্গীতের তালে নৃত্য এক অপূর্ব হৃদয় গ্রাহী লোকসংস্কৃতি। সঙ্গীত ও নৃত্যে ফুটে উঠে ভাব-ভাষা-ছন্দ। নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্‌দীন এবং বিভিন্ন শিল্পীর সঙ্গীতের তালে নৃত্য দৃশ্য মনোরম। বিয়ের গান ও আঞ্চলিক গানের সাথে নৃত্য অপূর্ব ভাব ও জীবনের আনন্দ-বেদনা, প্রিয়জনের মিলন ও বিরহব্যথা ফুটে উঠে। নরেন্দ্রনাথ সঙ্গীতের মত নৃত্যেও পটু ছিলেন। '...যেমন গাহিতে পারিতেন তেমনি সুন্দর নাচিতেও পারিতেন।'[১১১] নাটক, যাত্রা, গীতি আলেখ্য প্রভৃতি জনপ্রিয় লোকসংস্কৃতি, তাইতো এসব গ্রামবাংলার বিভিন্ন স্থানে, রেডিও, টিভি, ভিসিডি বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচারিত হয়। দূরন্ত নরেন বাদ পড়েনি নাটক থিয়েটারে অভিনয় করতে। '...এই সঙ্গীত-নৃত্য পটু তরুণ সখের থিয়েটার করতে ভালবাসতেন।'[১১২] সাধক বিবেকানন্দের জীবন ছিল সংস্কৃতির পূর্ণ ভাণ্ডার। তাঁর জীবনদর্শন আধুনিক শিক্ষিত বিজ্ঞানমনস্ক মানুষের অনুসরণযোগ্য আদর্শ।

নন্দনতত্ত্ব

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ যখন দেশে দেশে ভ্রমণ করেন তখন তাঁর প্রদীপ্তমান তারুণ্যের সহজাত চারুকলা স্পৃহা সর্বদা জাগ্রত ছিল। এদেশের গ্রাম-বাংলার মানুষের বাঁশ, বেত, কাঠ প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা গৃহস্থালি পণ্যেও দৃষ্টি আকর্ষণীয় ঘর-দরজা, বেড়া, চেয়ার, টেবিল, খাট-পালঙ্ক, সিন্ধুক প্রভৃতিতে অপূর্ব কারুকাজ করেছে। মেয়েরা তৈরী করত নকশীকাঁথা, শিকা, মুসলিন কাপড়, ঘর দরজায় আঁকত আলপনা, সৃষ্টি করত সৌন্দর্যমণ্ডিত গৃহস্থালী পণ্য। সর্বজ্ঞ মহাপুরুষ বিবেকানন্দের দৃষ্টি এড়ায়নি শিল্পের অবনতি। তিনি চেয়েছেন শিল্পের উন্নতি। 'বিশেষ দুর্দশা হয়েছে শিল্পের। সেকেলে বুড়িরা ঘরদোর আলপনা দিত, দেয়ালে চিত্রবিচিত্র করত।...নূতন অবশ্য শিখতে হবে, করতে হবে, কিন্তু তা বলে কি পুরানো গুলো জলে ভাসিয়ে দিয়ে না কি? নূতন তো শিখেছ কচুপোড়া, খালি বাক্যি চচ্চড়ি!!'[১১৩] বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কারিগরি শিক্ষা, ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমাদের শিল্প উন্নয়নে প্রশিক্ষণ-নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে। এদেশের মৃৎ শিল্পের উন্নতি হয়েছে অনেক। বিভিন্ন খেলনা, হাড়ি পাতিল, ফুলদানী, আল্পনাচিত্র শোভা পাচ্ছে শহরের অভিজাত বাড়ীতে। বিভিন্ন মনোরম স্বর্ণালঙ্কার, পোশাক, কসমেটিক্স, আসবাবপত্র, থালা-বাসন, বাড়ী-গাড়ী প্রভৃতি শিল্পের অনেক উন্নতি হয়েছে। "মহৎ শিল্পের অনুকরণ নয়, তিনি চাইতেন মানুষ মৌলিকতার পরিচয় দিয়ে নিজে মহৎ সৃষ্টি করুক। ইন্দ্রিয়ের সীমা ছাড়িয়ে প্রকৃতির মৌন বাণী যখন শিল্পী বুঝতে পারছেন স্বামীজীর চোখে তখন সেই শিল্প 'সুন্দর' হয়ে দেখা গিয়েছে।"[১১৪]

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকানন্দ চেয়েছেন সুন্দরের অভিব্যক্তিতে লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন। নান্দনিক দৃষ্টিভঙ্গি স্বীকার করেই শিল্প সাহিত্য মানুষকে বড় হওয়ার, মহান করে তোলার তাগিদ দেয়। বিবেকানন্দের চিত্রকলার মত স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্প সম্পর্কেও সুদক্ষ ও গভীর জ্ঞান রয়েছে। 'হিন্দু সংস্কৃতিতে স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের অঙ্গাঙ্গি সম্পর্ক। মন্দির মানে কোন দেব-দেবীর মূর্তি সমৃদ্ধ গৃহ।'[১১৫] বিবেকানন্দ বিশ্বের বিভিন্ন মোহিত স্থাপত্য শিল্প দর্শন করে তাঁর মনের রঙতুলিতে চিত্রিত করেন এবং বাস্তব রূপ দেন "শ্রীরামকৃষ্ণ মন্দির", বেলুড়মঠ"। এটি বিশ্বের বিস্ময়। এদেশের বিভিন্ন মসজিদ, মন্দির, উপাসনালয় দেব গৃহ, বাড়ী, অফিস প্রভৃতিতে স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন রয়েছে। মানবপ্রেমই স্বামীজীর লোকশিল্পের উৎস। সহজ সরল মানুষের প্রাণের অভিব্যক্তি হৃদয়ের ভাষা একটি লোকশিল্প। "লোক শিল্প তাই তাঁর কাছে 'সুন্দর'। এই গভীর মানবপ্রেমেই তিনি চেয়েছিলেন কথ্য ভাষা হোক সাহিত্যের বাহন। বুদ্ধ, রামানুজ, শ্রীরামকৃষ্ণের কথ্য ভাষায় ধর্মোপদেশ তাই তাঁর কাছে 'সুন্দর'।"[১১৬] চিন্তা কথা ও কাজের মাধ্যমে পরম সত্তার সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটে।

বিবেকানন্দ গভীর ঐশ্বরিক প্রজ্ঞার মাধ্যমে নন্দনতত্ত্ব বা সৌন্দর্য তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। ইস্থেটিক্স শাস্ত্রের বা নন্দনতত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে সৌন্দর্যের ধারণা। সৌন্দর্য কি, কাকে বলি ও কেন বলি সুন্দর, সৌন্দর্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কি এবং কোথায়? বিবেকানন্দের সৌন্দর্যের ধারণা প্রকাশিত হয়েছে ভক্তিযোগের আলোচনায়। 'সমাজের মধ্যে যাহা কিছু সুন্দর ও মহৎ- সবই প্রেম প্রসূত; আবার কুৎসিত এবং পৈশাচিক ব্যাপারগুলিও সেই একই প্রেম শক্তির বিকার মাত্র।..."তুমি সুন্দর, আহা ! অতি সুন্দর, তুমি স্বয়ং সৌন্দর্য স্বরূপ!"– হৃদয়ের উচ্ছ্বাসে ভক্তেরা চিরকাল এইরূপ বলেন। ভক্তিযোগে আমাদের শুধু এইটুকু করিতে হইবে– সুন্দরের প্রতি আমাদের যে স্বাভাবিক আকর্ষণ, তাহা ভগবানের দিকে চালিত করিতে হইবে।...মানুষের মুখে, আকাশে, তারায় অথবা চন্দ্রে যে সৌন্দর্যের বিকাশ দেখা যায়, তাহা কোথা হইতে আসিল? উহা সেই ভগবানের সর্বব্যাপী সৌন্দর্যের আংশিক প্রকাশমাত্র।'[১১৭] সৌন্দর্য ঐশ্বরিক শক্তি। সকল জীব ও জড়ের সৌন্দর্য পরম স্রষ্টার সৌন্দর্য থেকে পাওয়া, ক্ষণিক আভাস মাত্র। কিন্তু বিবেকানন্দের সৌন্দর্য চিন্তা বিনাশশীল জড় জগতের বহু ঊর্ধ্বে, অক্ষয়, অব্যয় স্তরে উন্নীত হয়।

শরীর চর্চা কেন্দ্র

চিকিৎসা বিভাগের তত্ত্বাবধানে শরীর চর্চা কেন্দ্র স্কুল কলেজ, গণশিক্ষা কেন্দ্র, বিভিন্ন স্থানে চালু করবে। গ্রামের শিশু-কিশোর, যুবক-বৃদ্ধ বিভিন্ন বয়সের মানুষের জন্য শরীর-চর্চা, ব্যায়াম, খেলাধুলা প্রভৃতির আয়োজন করবে। এতে থাকবে দেশীয় খেলা, হা-ডু-ডু, দাড়িয়াবাঁধা, কানামাছি, বৌচি, গোল্লাছুট, লুকোচুরি প্রভৃতি এবং বিদেশী খেলা- ফুটবল, ক্রিকেট, ব্যাডমিন্টন, টেনিস, পিটি প্রভৃতি। শরীর চর্চায় দেহ ও মন ভাল থাকে, প্রতিবেশী, প্রতিযোগিদের সাথে সৃষ্টি হয় প্রীতি ও আন্তরিকতা। শরীর চর্চার উদ্দেশ্য একদিকে শরীর এবং অপর দিকে মন-প্রাণের মধ্যে ভারসাম্য আনয়ন। এ সম্পর্কে নিবেদিতা বলেন, 'যে প্রাণ শক্তিকে এতদিন দেহপীড়নে ব্যয় করা হয়েছে, তাকে বর্তমানের পরিপ্রেক্ষিতে পেশীর অনুশীলনেই নিয়োগ করা উচিত বলে স্বামীজীর ছিল ধারণা।'[১১৮] স্বামী বিবেকানন্দ, 'গীতবাদ্য, ব্যায়াম, অশ্বারোহণ, লাঠিখেলা, অসিচালনা প্রভৃতি শিক্ষায় তিনি বহু সময় ব্যয় করিতেন।'[১১৯] এখনও পল্লী গ্রামবাসীর, পল্লী সংস্কৃতি, নৌকা বাইচ, ঘোড়া-দৌড়, ষাঁড়ের লড়াই, মোরগ-যুদ্ধ, লাঠিবাড়ী খেলা, সার্কাস ও যাদু খেলা, পুতুল নাচ খুবই জনপ্রিয়। এগুলো আরও উন্নত করে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে খেলাধুলা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা যাতে প্রতিপক্ষের সাথে মনোমালিন্য, ঝগড়া-বিবাদ বা সম্পর্ক খারাপ না হয়।

বিবাহ নিবন্ধন বিভাগ

সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম পবিত্র দায়িত্ব গ্রামের যুবক-যুবতীদের উপযুক্ত বয়সে বিয়ের ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশে বিয়ের ব্যবস্থা একটি জটিল আকার ধারণ করেছে। কারণ এক দিকে বেকার যুবক-যুবতীদের বিয়ের বয়স পার হলেও যেমন বিয়ে হয় না, তেমনি শিক্ষিত কর্মজীবী যুবক-যুবতীদেরও বিয়ের বয়স পার হলেও বিয়ে হয় না। এমন জটিল অবস্থার উত্তরণ সম্ভব করতে পারে একমাত্র গ্রামের সংস্কৃতি বিভাগ। এ বিভাগ সরকার ঘোষিত ছেলেদের ২২ বৎসর এবং মেয়েদের ১৮ বৎসর বয়স হলে বিয়ের ব্যবস্থা করবে। বিবাহে আগ্রহী যুবক-যুবতীদের সংস্কৃতি বিভাগে প্রত্যেকের ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত জমা দিবে। প্রয়োজনে অফিসে একটি করে কপি থানা জেলা বিভাগ বা কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জমা দিবে। অভিভাবকগণ একই গ্রাম বা যে কোন গ্রাম বা শহরের সংস্কৃতি বিভাগ থেকে পছন্দমত পাত্র বা পাত্রী নির্বাচন করবে। পরে সংস্কৃতি বিভাগের তত্ত্বাবধানে যৌতুক বিহীন, টেকসই বিয়ের আয়োজন করবে। বিয়েতে কোন পক্ষকে সত্য গোপন করে, মিথ্যা তথ্য দিয়ে প্রতারণা করবে না। এভাবে কোন পক্ষকে ঠকিয়ে বিয়ের সম্পর্ক

Dhaka University Institutional Repository

গড়ে তুললে তা স্থায়ী ও সুখের হয় না। বরং উভয় পক্ষের অপূরণীয় ক্ষতি ও অশান্তি হয়। এ কারণে উভয় পক্ষ পরস্পরকে ভালভাবে দেখে শুনে বুঝে পরামর্শ করে পাত্র-পাত্রীর দোষগুণ আলোচনা করে রেজিষ্ট্রি করে বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করবে। এতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

এভাবে বিয়ে হলে বাল্য বিবাহ কমে যাবে ফলে বিধবা ও এতিম ছেলেমেয়ের সংখ্যা কমবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'লেখাপড়া শিখিয়ে একটু বয়স হলে বে দিলে সে মেয়েদের যে সন্তান-সন্ততি জন্মাবে, তাদের দ্বারা দেশের কল্যাণ হবে। তোদের যে ঘরে ঘরে এত বিধবা তার কারণ হচ্ছে– এই বাল্য বিবাহ। বাল্য বিবাহ কমে গেলে বিধবার সংখ্যাও কমে যাবে। আমার মত এই যে, বাল্য বিবাহের মূল তত্ত্বটিকে নষ্ট করিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া মেয়ে-পুরুষ সকলেরই বেশি বয়সে বিবাহ হওয়া উচিত। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা চাই; তাহা না হইলে অনাচার-ব্যাভিচার আরম্ভ হইবে।'[১২০] ছেলেমেয়েদের শিক্ষা দিয়ে উপযুক্ত বয়সে বিয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। তাহলেই সুখী সংসার ও শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে।

আত্মীয়তা সম্বন্ধ : বাঙালি সংস্কৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য আত্মীয়তা সম্বন্ধ। আমাদের সকলের উচিত আত্মীয়তা সম্বন্ধ রক্ষা করা। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন, 'আমাদের অতিদূরসম্পর্কীয় নিঃস্ব আত্মীয়দিগকেও পরের ভিক্ষার প্রত্যাশী করিয়া দূরে রাখি নাই, তাহাদিগকেও নিজের সন্তানদের সহিত সমান স্থান দিয়াছি; আমাদের বহুকষ্ট-অর্জিত অন্নও বহুদূর কুটুম্বদের সহিত ভাগ করিয়া খাওয়াটাকে আমরা একদিনের জন্যও অসামান্য ব্যাপার বলিয়া কল্পনা করি নাই– ।'[১২১] মানুষ একা বাঁচতে পারে না। বিপদে-আপদে একে অন্যের সহযোগিতা ও কল্যাণ সাধন করা মানুষের বড় ধর্ম।

অপসংস্কৃতি রোধ : সংস্কৃতি বিভাগের অন্যতম দায়িত্ব অপসংস্কৃতি রোধ করা। এজন্য প্রয়োজন আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় উচ্চতর সংস্কৃতি প্রচার করা। অপসংস্কৃতির প্রভাবে গ্রামে গ্রামে বিভিন্ন বয়সের মানুষ বিশেষ করে যুব সমাজকে দ্রুত ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে অশিক্ষা, কুশিক্ষা, বিকৃত রুচি ও মানসিকতা, নৈতিক অবক্ষয় প্রভৃতি। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতির অন্যতম কারণ এই অপসংস্কৃতি। ভিসিডি, টেলিভিশন, সিনেমা, যাত্রা, পর্ণগ্রাফি, বাজে বই ও অনুষ্ঠান প্রভৃতি ধ্বংস করছে মনুষ্যত্ব, মন ও মস্তিষ্ক। গ্রামের স্কুল পড়ুয়া কিশোর-কিশোরীরাও পড়াশুনা নষ্ট করে ঝুঁকে পড়েছে নৈতিক অবক্ষয় ও যৌন অপরাধে। তারা প্রচার মাধ্যমগুলোতে বিদেশী বা পাশ্চাত্যের অশালীন সংস্কৃতিগুলো দেখে শিক্ষা করে এবং তা অনুকরণ করার চেষ্টা করে। বিবেকানন্দ অপসংস্কৃতি ও অশালীন নভেল-নাটকের বিপক্ষে ছিলেন। "কাব্যের বাইরে অন্য সাহিত্যে তাঁর কোনও উৎসাহের প্রমাণ পাই না, 'পঁচা নভেল-নাটক' সম্বন্ধে অবজ্ঞাই ছিল।"[১২২] অপসংস্কৃতির প্রভাবে সমাজে সৃষ্টি হচ্ছে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, ভোগলিপ্সা, উগ্রতা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, বাল্য বিবাহ, ব্যভিচার, অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি। তাই সংস্কৃতি বিভাগ গ্রামবাসীকে অপসংস্কৃতির হাত থেকে রক্ষা করে শিক্ষামূলক, উন্নয়নমূলক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক সংস্কৃতি চর্চার শিক্ষা দিয়ে উচ্চতর সংস্কৃতি চর্চার পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

নির্মল পরিবেশ: বর্তমান সময়ে মানবকল্যাণের এক বিরাট অন্তরায় হলো পরিবেশ দূষণ। বায়ু দূষণ, পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, খাদ্য দূষণ প্রভৃতি জনজীবনে সৃষ্টি করছে অশান্তি, দূর্ভোগ, রোগ-ব্যাধি যা ক্রমান্বয়ে মানবসমাজকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাচ্ছে। তাই আমাদের সুস্থ, সুন্দর ও নির্মল পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। নির্মল, স্বচ্ছ, সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশেই গড়ে উঠে বিজ্ঞানী শিল্পী, কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক প্রভৃতি শ্রেণীর মনীষী। 'বিজ্ঞান ও শিল্পের মিলন বিভিন্ন কবিদের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। প্রকৃতির কবিরা পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনাকে যে সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে এবং যে বিস্তৃতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তার সাথে বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণের প্রায় কোন পার্থক্যই নেই। Wordsworth, Alexander Pope, James Thomson, Bryant, Emerson প্রমুখ সম্বন্ধে একথা বলাই যায় যে তাঁরা যখন প্রকৃতি সম্বন্ধে কাব্য রচনা করেছেন, প্রকৃতি সম্বন্ধে যে বিশদ পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁরা করেছেন, তা প্রকৃতি সম্বন্ধে একজন বৈজ্ঞানিকের বর্ণনার সমতুল্য।'[১২৩] সুন্দর ও বিশুদ্ধ পরিবেশেই মানুষ নিরোগ দেহে দীর্ঘজীবন লাভ করে। আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণ করতে হবে। নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্‌দীন প্রমুখ কবি-সাহিত্যিক প্রাকৃতিক পরিবেশেই প্রভাবিত হয়েছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

৯. মাদকাসক্তি নিরাময় বিভাগ

মাদকাসক্তির কারণে ধ্বংস হচ্ছে গ্রামের ও শহরের যুব সমাজ, বিচ্ছিন্ন হচ্ছে পরিবার, সৃষ্টি হচ্ছে জাতির অন্ধকার ভবিষ্যৎ। অথচ বিবেকানন্দ যুব সমাজকে নিয়ে কতই না দেশ গড়ার স্বপ্ন দেখেছেন। তাঁর জাতীয় আশা-আকাঙ্খা পূরণের সৈনিক হল যুব সমাজ। তিনি যুব সমাজকে নানা বাক্য, নানা উদাহরণ ও নানা কাজে শিক্ষামূলক উপদেশ দিয়ে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। '...বিবেকানন্দের কথাগুলি ছিল যেন 'ডিনামাইট'– সেই বিস্ফোরণে হচকিত হয়েছিল প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মানুষ। এই বিস্ফোরণে কিছু ধবংস হয়নি, হয়েছিল মানবাত্মার জাগরণ– তার জড়তা, মোহঘুম ও দুর্বলতায় প্রচন্ড আঘাত হেনে তার স্বরূপ উপলব্ধিতে সাহায্য করেছে।'[১২৪] এই মাদকাসক্ত, ধ্বংসোন্মুখ যুব সমাজকে জাগ্রত করতে হবে বিবেকানন্দের শক্তিদায়ক, চেতনাদায়ক বাণী দিয়ে। কারণ যুব সম্প্রদায়ই হবে দেশের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আজকের মাদকাসক্ত যুব সমাজ রূপান্তরিত হবে বলিষ্ঠ জাতীয় শক্তিতে। সাম্প্রতিক কালের প্রধান সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো মাদকদ্রব্যের ব্যবহার। এই মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সুদূর অতীত থেকে চলে এসেছে, এখন ধারণ করেছে ভয়ানক আকার। বর্তমান সময়ে অত্যন্ত ক্ষমতা সম্পন্ন মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সীমাহীনভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এর শিকার হচ্ছে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েরাও। যুবক-যুবতী এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও বিভিন্ন মাদকাসক্তির ধ্বংসের কবলে নিমজ্জিত।

মাদকাসক্তি কি ?

ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া, ঘন ঘন ভুলভাবে ঔষধের অপব্যবহারকে ড্রাগের ব্যবহার বলা যায়। 'ঔষধের অপব্যবহার মানুষকে মাদকাসক্ত করে তোলে এবং তখন সে শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে নির্দিষ্ট ড্রাগের উপর সম্পূর্ণ নির্ভারশীল হয়ে পড়ে। শরীরের অবস্থা ধীরে ধীরে এমন হয় যে ঐ নির্দিষ্ট ড্রাগ ছাড়া তার শারীরিক ক্রিয়াকলাপ যেন বন্ধ হবার উপক্রম হয়। অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা, মানসিক অবসাদ ইত্যাদি পেয়ে বসে। সাধারণ ভাবে আমরা তাদেরই ড্রাগে আসক্ত বলি যারা নিষিদ্ধ নেশার জিনিস মোটামুটি নিয়মিতভাবে ব্যবহার করে।'[১২৫] তামাক এবং তামাক থেকে সৃষ্ট– গুল জর্দ্দা পাতা, বিড়ি-সিগারেট ধুমপান-এসব দ্বারা বেশীরভাগ মানুষ আসক্ত। এছাড়া রয়েছে মদ, গাঁজা, আফিম, ভাঙ, মরফিন, প্যাথিডিন, হিরোইন, ব্রাউন সুগার, চরস, হাস্ক, হিস্ক, এল.এস.ডি প্রভৃতি। কোন কোন মাদক দ্রব্য মস্তিষ্কের কাজ দ্রুতগতি সম্পন্ন করে। কোনটি ধীরে ধীরে মস্তিষ্ককে অকেজো করে দেয়। কোন কোন ড্রাগ অনুভূতি, শ্রবণ ও দর্শন ক্ষমতাকেও হ্রাস করে।

লক্ষণ

মাদকাসক্ত ব্যক্তির লেখা পড়া, খেলাধুলা, বা যে কোন কাজে অনীহা সৃষ্টি হয়। ক্ষুধামন্দা দেখা দেয় ও ওজন হ্রাস হয়। বমি বমি ভাব, শরীর যন্ত্রণা এবং ঘুমের ব্যাঘাত হয়। মানসিক অবসন্নতা, ক্লান্তি ও আবেগ বর্জিত হয়। রক্ত চাপ বৃদ্ধি ত্বকে উপসর্গ, রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয় এবং পাকস্থলির স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হয়।

মাদকাসক্ত হওয়ার কারণ

১. প্রকৃত শিক্ষা ও ধৈর্যের অভাব: প্রকৃত শিক্ষা, জীবনবোধ, কঠোর জীবন সংগ্রাম, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য ও বিবেক এ সবের অভাবে মানুষ মাদকাসক্ত হয়। যারা সত্যের উপাসক তারা সত্যের জন্য প্রাণ ত্যাগ করতেও প্রস্তুত। তারা সামান্য ড্রাগে আসক্ত হয় না।

২. দারিদ্র্য: মানুষ কঠিন জীবন সংগ্রামে দুঃখ দারিদ্র্যের স্বীকার হয়ে অসামাজিক কাজ করে। মহাত্মাগান্ধী দারিদ্র্যের সীমা নির্দেশ করে বলেন, 'শাশ্বত বাধ্যতামূলক উপবাস।'[১২৬] এই উপবাস থেকে মুক্তির জন্য অন্ন সংস্থান বা জীবিকা নির্বাহ করতে অনেকে বাধ্য হয়ে মাদক দ্রব্যের ব্যবসা করে এবং পর্যায়ক্রমে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। দরিদ্র ছাড়াও মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত পরিবারের সদস্যরাও মাদকাসক্ত হয়।

৩. বিশৃঙ্খল পরিবার: পিতামাতা ও পরিবারের সদস্যদের আচার আচরণ ও শিক্ষার প্রভাবে ছেলেমেয়েদের চরিত্র বিভিন্নরকম হয়। 'শৃঙ্খলাহীন একটি পরিবারে একজন ব্যক্তি উদ্বেগের মধ্যে থাকতে বাধ্য হয়। এবং ক্রামাগত এই উদ্বেগ চলতে থাকলে সে তা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য মাদকদ্রব্য ব্যবহার সমেত নানা পথ অবলম্বন করতে পারে।'[১২৭] একটি শিশুর দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের চেয়েও মানসিক নিরাপত্তা ও মানসিক প্রশান্তি বেশি প্রয়োজন। দ্বন্দ্ব ও বিশৃঙ্খল পরিবারের শিশু জীবন যন্ত্রণায় দগ্ধ হয়ে বিভিন্নভাবে মুক্তির পথ খোঁজে। সে পরিবারে নিরাপত্তা ও শান্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে নেশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

Dhaka University Institutional Repository

৪. অসৎসঙ্গ: সাধারণত মানুষ বন্ধুবাৎসল্য। অনেকে অসৎ মাদকাসক্ত বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মাদকাসক্ত হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা সংঘবদ্ধ হয়ে ব্যবসা জোরদার করার জন্য বিভিন্নভাবে প্রলোভন দিয়ে অনেক সৎ সরল মানুষদের মাদকাসক্ত করে জীবন ধ্বংস করে।

৫. সাময়িক প্রশান্তি: অনেকে মজা করতে গিয়ে, বেকারত্বের যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে, প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ও কঠিন সমস্যায় মানসিক অশান্তি থেকে মুক্তির জন্য, সাময়িক প্রশান্তির জন্য অনেকে মাদকাসক্ত হয়।

মাদকাসক্তির কুফল

১. স্বাস্থ্য নষ্ট হয়: মাদকদ্রব্য সেবনে শরীর ক্রমে দূর্বল হয়, বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ক্ষয় হয় এবং ক্রমে মানসিক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, এক সময় মৃত্যু হয়। মাদকাসক্ত ব্যক্তি একদিকে মাদক অপর দিকে ঔষধ সেবনে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়।

২. অর্থ নষ্ট হয়: মাদকাসক্ত ব্যক্তির মাদক দ্রব্য ক্রয় করতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। আবার অসুস্থ হলে চিকিৎসা ও ঔষধ ক্রয়ের জন্য আরও অর্থ ব্যয় হয়। ফলে জীবন ও সংসারে দারিদ্র্য সৃষ্টি হয়।

৩. সময় নষ্ট হয়: মাদকাসক্ত ব্যক্তি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে মাদকদ্রব্য কোথায় পাবে তা অনুসন্ধান করে ক্রয় করতে অনেক সময় ব্যয় করে, এতে সংসারের ক্ষতি হয়। আবার অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্যও প্রচুর সময় দিতে হয়। এভাবে মাদকাসক্ত ব্যক্তির জীবনের মূল্যবান সময় চলে যায়।

কিশোর-কিশোরী, তরুণ-তরুণী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা মাদকাসক্ত হয়ে নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়। তারা ছিনতাইকারী, চাঁদাবাজী, চুরি-ডাকাতি, চোরাচালানী, ঘুষ-দুর্নীতি, অপহরণ, ধর্ষণ ও হত্যা করে। এসব কাজের অর্থ দিয়ে মাদকদ্রব্য ক্রয় করে। অনেক মহিলা চুরি, পরকীয়া, ব্যভিচার ও পতিতাবৃত্তি করে অর্থ সংগ্রহ করে ড্রাগ ক্রয় করে। এভাবে মাদকাসক্তি সামাজিক অবক্ষয় সৃষ্টি করে উন্নয়ন ও শান্তির পথ বিনষ্ট করে।

চিকিৎসা

ক. পিতা-মাতার কর্তব্য: মাদকাসক্ত ব্যক্তির যথেষ্ট যত্ন নিতে হবে। তার খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। পিতা-মাতার উচিত শৈশব থেকে কৈশোর যৌবন এবং শেষ পর্যন্ত যত দিন বাঁচে ততদিন বন্ধুর মত সন্তানদের পাশে থাকা। তরুণ-তরুণীরা অনেক কিছু জানতে চায়, করতে চায়, তাদের ধৈর্যের সঙ্গে খোলামেলাভাবে ভাল-মন্দ বুঝিয়ে, সঠিক দিক-নির্দেশনা দিবে। পিতামাতার উচিত সন্তানদের শিক্ষা ও কাজ কর্মে মনোযোগ ও আগ্রহ বৃদ্ধি করে দেওয়া এবং মহৎ জীবন গঠনে উৎসাহ ও পরামর্শ দেওয়া। মাতাপিতার সচ্চরিত্র অনুসরণ করে যাতে সন্তানরাও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী হতে পারে। পিতামাতা নেশামুক্ত হলে সন্তানও সহজেই নেশামুক্ত হয়। সন্তানদের শারীরিক ও মানসিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তা পুরণে সচেষ্ট হবে, বয়ঃসন্ধি ও অন্য সময়ে সু-পরামর্শ দিবে।

খ. চিকিৎসা: মাদকাসক্ত ছেলেমেয়েদের ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসা ও সেবা দিবে। প্রয়োজনে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র বা হাসপাতালে রেখে চিকিৎসা দিতে হবে।

গ. সৎসঙ্গ: মাদকাসক্তি কাটিয়ে উঠার অন্যতম উপায় সৎসঙ্গ। ভাল বন্ধু, আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীর চেষ্টায় এবং তাদের সৎসঙ্গের প্রভাবে মাদকাসক্ত ছেলেমেয়েদের ক্রমে সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনা সম্ভব।

ঘ. শিক্ষক: শিক্ষকগণ ছেলেমেয়েদের শৈশব থেকে সুশিক্ষা, উচ্চভাব ও মহৎ জীবন গঠনের প্রেরণা দিবে, তাদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা দিবে। শিক্ষক দূরত্ব বজায় রেখেও শিক্ষার্থীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলে তাদের সাথে মিশে সমস্যা জেনে সমাধানের সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, নৈরাশ্য ও মানসিক দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দিক-নির্দেশনা দিবে।

ঙ. শিক্ষার পাঠ্যসূচি: পাঠসূচিতে রাখতে হবে মাদকাসক্তির ভয়ানক পরিণাম, যাতে শিক্ষার্থীরা মাদকদ্রব্যের ভয়ানক ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন ও সাবধান হয়। শিক্ষক মাদকদ্রব্য ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি ও পরিবারের উদাহরণ মাঝে মাঝে গল্পাকারে বলবেন। সর্বোপরি শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা, খেলাধুলা, সেবামূলক কাজ ও সৎচিন্তা প্রভৃতি কাজের মধ্যে সর্বদা চাপে রাখতে হবে, যাতে কোন সময় অসৎ চিন্তা ও কাজে জড়িয়ে না পড়ে।

প্রতিকার

মাদকদ্রব্য উৎপাদনকারী, বিক্রেতা, ব্যবসায়ী ও গ্রহণকারী সকলেই অপরাধী। সরকার মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য জেল জরিমানা এবং মাদক দ্রব্য ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের অধিকার কেড়ে নেওয়া বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

রকমের শাস্তির বিধান দিয়েছে। এইসব বিধান কার্যকর করতে হলে মাদকাসক্তি নিরাময় বিভাগের পক্ষ থেকে গ্রামবাসীকে পুলিশ প্রশাসন বা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। জনগণের সহযোগিতার মাধ্যমে মাদক ব্যবসা রোধ করা সম্ভব। গ্রামে মাদকদ্রব্য চাষ, উৎপাদন বা সরবরাহ, ব্যবসা যেন কোন ক্রমেই হতে না পারে। সন্দেহ জনক কিছু হলেই আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী বা পুলিশকে জানাবে এবং যৌথভাবে প্রতিরোধ করবে। সামাজিক চাপ সৃষ্টি করে মাদকদ্রব্যের সকল প্রকার কার্যক্রম বন্ধ করে দিতে হবে।

পুনর্বাসন কেন্দ্র

গ্রামে মাদকাসক্তি নিরাময় বিভাগে একটি পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। সেখানে একটি কর্মশালার আলোচনা চক্রের আয়োজন করে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মাদক দ্রব্যের ভয়ানক কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করবে। 'চিকিৎসক ও মনোবিজ্ঞানীর সাহায্য নিয়ে এবং উপযুক্ত সূত্র থেকে তথ্যচিত্র, পোষ্টার, স্লাইড, পুস্তিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করে তার সাহায্যে আলোচনা চক্রগুলিকে প্রাণবন্ত ও কার্যকরীভাবে চালানো যেতে পারে।'[১২৮] মাদকাসক্ত ব্যক্তির সকল চিকিৎসা ব্যবস্থা কোথায় ও কিভাবে হয় এবং চিকিৎসার সঙ্গে ইমোশনাল সাপোর্ট দেওয়া প্রভৃতি বিষয় কর্মশালার অন্তর্ভুক্ত থাকবে। মাদকাসক্তদের কর্মসংস্থান করে সৎ, নৈতিক ও ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে মন-মস্তিষ্ক উন্নত করে সৎ কার্যের দিকে আকৃষ্ট করতে পারলে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসবে। নিরাময় বিভাগ গ্রামের মাদকদ্রব্যের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের শাস্তি ও জরিমানার আইন তৈরী করতে পারেন।

১০. বিচার বিভাগ

গ্রাম বা মহল্লায় জন্মগ্রহণ করে কল্যাণকামী মহামানব, আবার সেখানেই জন্মগ্রহণ করে অকল্যাণকারী কুখ্যাত মানব। সমাজকে অকল্যাণ থেকে রক্ষা করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য সামাজিক ন্যায়-বিচার খুবই প্রয়োজন। এ কারণে বিবেকানন্দ সামাজিক ন্যায়-বিচারের মাধ্যমে অপরাধী মানুষদের সংশোধন করতে বলেছেন। তিনি প্রকৃত শিক্ষা ও পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে অপরাধীদের মনুষ্যত্ব ও বিবেক জাগ্রত করার কথা বলেন। আর এই সামাজিক ন্যায়-বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের সহায়তায় গ্রামবাসী একটি বিচার বিভাগ গঠন করবে। গ্রামীণ আদালতে সকল দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও সংঘর্ষের বিচার বা অপরাধকারীদের অঙ্কুরেই বিনাশ করতে পারলে তা আর জটিল আকার ধারণ করে সরকারি আদালতে মামলা-মোকদ্দমার শিকার হয়ে অর্থ সময়, সম্মান ও জীবন নষ্ট হবে না, পরিবার ও সমাজ ধ্বংস হবে না। গ্রামই দেশের সুখ-শান্তি ও সমৃদ্ধির মূল কেন্দ্র। ন্যায় বিচার, উন্নয়ন ও কল্যাণের ভিত্তিতে গ্রামের মানুষদের তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়।

প্রথমতঃ কল্যাণকারী– এ শ্রেণীর মানুষ উন্নয়ন শান্তি ও কল্যাণের লক্ষ্যে কাজ করেন। গ্রামের এসব সৈনিকদের সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠায় রয়েছে জ্ঞান বিবেক ক্ষমা ও ধৈর্য। তাঁরা বিবেকবান, দায়িত্বশীল ও কর্তব্য পরায়ণ। তাঁরা সর্বদা সৎপথে চলেন এবং সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করেন। তাঁরা কখনও কারো ক্ষতি করেন না। তাঁরা সৎ জীবনযাপন করেন এবং সর্বদা মানুষের উপকার ও সেবা করেন। এই শ্রেণীর পূণ্যাত্মা ব্যক্তিগণ যুগ যুগ ধরে অত্যাচারী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে অনেক ত্যাগ, শ্রম এমনকি জীবনের বিনিময়ে সমাজে ন্যায়-বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁরা মানুষ্যত্ব সম্পন্ন, শ্রদ্ধার পাত্র, তাঁদের আদর্শ ও জীবনদর্শন সাধারণের শিক্ষণীয় বিষয়।

দ্বিতীয়তঃ নিরপেক্ষ কল্যাণকারী– এ শ্রেণীর মানুষ সমাজে ন্যায়, অন্যায় সম্পর্কে মনে মনে কিছু ভাবলেও প্রকাশ্যে কিছুই বলে না। এসব দুর্বলচিত্তের মানুষ মনে করে, কারো ভালো-মন্দ সম্পর্কে কিছু বললে অন্যের সাথে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়বে। তারা অনেক সময় অত্যাচারী ব্যক্তিদের দ্বারা কষ্ট পেলেও প্রতিবাদ করে না। এরা সমাজ বিচ্ছিন্ন, এদের যেন কোন দায়িত্ববোধ নেই। এরা অত্যাচারী ও অপরাধীদের বাধা দেয় না, অপরদিকে উন্নয়নমূলক কাজেও ঝাঁপিয়ে পড়ে না, অংশগ্রহণ করে না। প্রমাণস্বরূপ, এরা ভোট দেয় না, এ কারণেই শতকরা একশত ভাগ ভোট গৃহীত হয় না। কল্যাণকারী ও নিরপেক্ষ কল্যাণকারী উভয়ই অকল্যাণকারী অত্যাচারী ব্যক্তিদের দ্বারা শোষিত ও নির্যাতিত হয়। নিরপেক্ষ ব্যক্তিরা ন্যায়-অন্যায়ের ক্ষেত্রে নির্বাক নিষ্ক্রিয় পুতুলের মত দাঁড়িয়ে থাকে।

তৃতীয়তঃ অকল্যাণকারী– এ শ্রেণীর মানুষ সর্বদা সমাজের শান্তি-শৃঙ্খলা ও উন্নয়ন ব্যাহত করে। তারা সর্বদা কল্যাণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে। কেউ পরোক্ষভাবে, আবার কেউ প্রত্যক্ষভাবে সমাজের ক্ষতি করে। এরা

Dhaka University Institutional Repository

সংকীর্ণমনা, ক্ষুদ্রচেতা ও স্বার্থপর। এরা মুখে কল্যাণের কথা বললেও কাজে প্রমাণ করে না, অথবা লোক দেখান কাজ করে। অকল্যাণকারী মানুষ দু-প্রকার। যথা- (ক) স্বার্থপর মানুষ ও (খ) অত্যাচারী মানুষ।

(ক) স্বার্থপর মানুষ– এরা প্রথমে সহজ সরল ও সৎ জীবনযাপন করে। পরে প্রতিকূল পরিবেশে কঠিন জীবন সংগ্রামে ধৈর্য বিবেক ও মনুষ্যত্বের বাঁধ ভেঙ্গে ক্রমান্বয়ে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হয়। তারা বেঁচে থাকার স্বার্থে অন্যায় পথ অবলম্বন করে। স্বামী বিবেকানন্দ এমন শ্রেণীর স্বার্থপর মানুষ সম্পর্কে বলেন, 'আমি জানি নিজেকে সংযত করা কত কষ্টকর! বাধাবিপত্তিগুলি প্রচণ্ড; এবং আমাদের মধ্যে শতকরা নব্বই জন নিরাশ ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়ি; কালক্রমে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রে দুঃখবাদী হইয়া সাধুতা, প্রেম এবং জীবনে যাহা কিছু উদার ও মহৎ তাহাতে বিশ্বাস হারাই। সেই জন্য আমরা দেখিতে পাই যে-সকল ব্যক্তি জীবনের প্রথম অবস্থায় সরল দয়ালু, অকপট ও ক্ষমাশীল থাকেন, তাঁহারাই বার্ধক্যে সত্যের মুখোশ-পরা মিথ্যাচারীতে পরিণত হন। তাঁহাদের মন যেন স্তূপীকৃত জটিলতা। হয়তো বা তাহাদের মধ্যে অনেকটা বাহ্য বিচক্ষণতা থাকিতে পারে, তাঁহারা উগ্র মস্তিষ্ক নন; তাঁহারা বিশেষ কথা বলেন না, কাহাকেও অভিশাপ দেন না, ক্রুদ্ধও হন না...।'[১২৯] মানুষ কঠিন জীবনসংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে সত্য বিসর্জন দিয়ে স্বার্থপর ও অপরাধ প্রবণ হয়।

(খ) অত্যাচারী মানুষ– এ শ্রেণীর মানুষ অজ্ঞ, অসৎ, ধৈর্যহীন, কর্তব্যহীন, দায়িত্বহীন। এরা সরাসরি মানুষের ক্ষতি করে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। অজ্ঞতা ও অদূরদর্শীতা এদের মনুষ্যত্ব আচ্ছন্ন করে রাখে, তাই এরা সংকীর্ণমনা, গোঁড়া, ক্ষুদ্রচেতা, হিংসুক, পরশ্রীকাতর, স্বার্থপর, লোভী, কান্ডজ্ঞানহীন। এরা মনুষত্বহীন জ্ঞানপাপী। অনেকের মোহ-প্রভাব, প্রতিপত্তি ক্ষমতা নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক কর্তৃত্ব। এরা সৎ পথে নিজের উন্নতির চেয়ে সর্বদা অপরের ক্ষতি করার চিন্তাই বেশি করে।

অত্যাচারীদের অনেকেই বেকার, কর্মহীন, উপায়হীন, সর্বহারা। তাই তারা বাঁচার জন্য বিভিন্ন অবৈধ উপায় অবলম্বন করে। এ কারণে এরা হয়ে থাকে মিথ্যাবাদী, ঠগ, প্রতারক, দালাল, বাটপার, চোর-ডাকাত, লুটেরা, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, চোরাচালনকারী, অবৈধ ব্যবসায়ী, মাদক ব্যবসায়ী প্রভৃতি। এরা শোষণ, নির্যাতন, ঘুষ, দূর্নীতি এবং সমাজে বৈষম্য সৃষ্টি করে সাধারণ মানুষকে করে অবহেলিত, বঞ্চিত ও পদদলিত। এরা অবৈধভাবে অন্যের এবং দেশের অর্থ-সম্পদ লুট করে ও জমি দখল করে ভোগ করে, সাধারণ নিরীহ মানুষদের বঞ্চিত করে। চতুর দুর্বৃত্ত, জ্ঞানপাপীরা বড় ধরনের স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য কৌশল হিসেবে কিছু লোক দেখান কল্যাণমূলক কাজ করে মানুষের আস্থা অর্জন করে। তখন এরা উদার হৃদয় ও ত্যাগের পরিচয় দিয়ে স্বপক্ষে জনমত সৃষ্টি করে নেতৃত্ব গ্রহণ ও নির্বাচনে ক্ষমতা লাভ করে। শোষণ ও অত্যাচারই যাদের স্বভাব তারা সর্বদাই অসৎ চিন্তা করে, জনগণকে ধোকা দিয়ে, যাদুকরের খেলার মত মোহিত করে, নির্যাতন করে, এমনকি মানুষ হত্যা করে হলেও যে কোন মূল্যে ক্ষমতায় টিকে থেকে অর্থ সম্পদ প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে লুট করে থাকে।

অপরাধীচক্র লিপ্ত হয় বিভিন্ন অপরাধে। তারা হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা পারিবারিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব-কলহ, সংঘাত-সংঘর্ষ সৃষ্টি করে। কখনও তারা মামলা-মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ে, অনেকে আইনের ফাঁকে যে কোন কৌশলে বেরিয়ে আসে। থেমে থাকে না অপরাধীরা, সুযোগ পেলেই লিপ্ত হয় বিভিন্ন অপরাধে। তারা জড়িয়ে পড়ে শিশু ও নারী নির্যাতন, শিশু ও নারী পাচার, ব্যভিচার, শ্লীলতাহানী, অপহরণ, ধর্ষণ, হত্যা প্রভৃতি অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। যুগ যুগ ধরে অত্যাচারী মানুষের অত্যাচারে সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি ব্যাহত হয়ে বিশৃঙ্খল মানব সমাজ নরক কুণ্ডে পরিণত হয়। যুগের পর যুগ দগ্ধ হয়ে ক্রমে নিঃস্ব মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়।

বিচার-প্রক্রিয়া

বিবেকানন্দ অপরাধীর প্রতি করুণার দৃষ্টি দেন। অপরাধীকে হেয় বা নিচু করা নয়, পাপী বলে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা নয়, তাকে সংশোধন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই ছিল বিবেকানন্দের অভিপ্রায়। তিনি বলেন, 'জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব আছে– এই ভারতীয় ভাবটি ভারতের বাহিরে অন্য দেশেও নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে।'[১৩০] অজ্ঞানতার কারণে মানুষ ভুল করে অন্যায় করে। তবুও তার দেবত্ব প্রতিভা সুপ্ত থাকে। তাই সংশোধন করার সুযোগ দিলে পাপী মানুষও হয়ে উঠে দেবতা। বিচার বিভাগ অপরাধ প্রবণ ব্যক্তি বা সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করার সঙ্গে সঙ্গে সতর্ক করে দিবে। তার শারীরিক ও মানসিক সমস্যাগুলি ভালভাবে আন্তরিকতার সাথে বিবেচনা করে সৎপথ প্রদর্শন করতে হবে। অপরাধীদের হতাশা, ব্যর্থতা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠ থেকে রক্ষা করে সমস্যা

Dhaka University Institutional Repository

সমাধানের পথ দেখিয়ে মানসিক প্রশান্তি দিতে হবে। তাদের আত্মবিশ্বাস, সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন করে তোলার উৎসাহ দিবে। বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ এবং গান-বাজনা, খেলাধুলা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করবে। এছাড়া অপরাধী ব্যক্তিদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান, সামাজিক বন সৃজন, পরিচ্ছন্নতা অভিযান প্রভৃতি গঠনমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে আগ্রহী করে তুলবে যাতে জীবনের উপর প্রভাব পড়ে।

জবাবদিহিতা: বিচার বিভাগের নিকট অপরাধী ব্যক্তিরা জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে। অপরাধী এ ভয়ে অপরাধ কর্মকাণ্ড থেকে বিরত থাকবে। সামাজিক ঐক্য চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অপরাধ প্রবণতার সূত্রগুলিকে দুর্বল করে দিবে।

শিক্ষা: অপরাধীদের উদার নৈতিক ও উচ্চভাব শিক্ষা দিবে। নীতি ধর্ম দর্শন অধ্যয়ন করে বিবেক জাগ্রত হবে, মনুষত্ববোধ ফিরে পাবে। বিবেকের কল্যাণেই মানুষ ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ বিচার করে সঠিক সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করে। বিবেকহীন মানুষ যে কোন সময় অন্যায় করে বসে, মানবকল্যাণ ও শান্তি বিঘ্নিত করে। তাই বিবেকানন্দ অজ্ঞ, মূর্খ, ছোট-বড়, উঁচু-নীচু সকল শ্রেণীর মানুষকে বিবেক জাগ্রত করার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, বিবেক সম্পন্ন হলে মানুষের দুঃখ চলে যায়, পূর্ণ জ্ঞান লাভ করে, চিত্ত বিমুক্তি লাভ করে এবং অবশেষে ব্যক্তি স্ব-স্বরূপে অবস্থান করে।

শাস্তি: অপরাধীর বিবেক জাগ্রত না হলেও- যদি বিবেকহীন কাজ করে, তবে তাকে শাস্তি দিতে হবে। এক ঘরে করে রাখা, জরিমানা আদায় করা, বিভিন্ন প্রকার শারীরিক ও মানসিক শাস্তি দেওয়া এবং অপরাধীদের কারাগারে দেওয়া যায় সংশোধনের জন্য। বিবেকানন্দ বলেন, এখন কারাগারকে অনেক স্থানে 'সংশোধনাগার' বলা হয়। মানুষকে সংশোধনের সুযোগ দিলে তার সুপ্ত ব্রহ্ম জাগ্রত হবে। আমরা বৃহৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অধিকারী। বুদ্ধদেব শ্রীচৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণের মতো অবতারগণের কাছ থেকে আমরা শিখেছি শুধু নিজের জন্য আমরা বাঁচি না। আমি নয়-আমরা, এই আমাদের সংস্কৃতির মূল সুর। বিচ্ছিন্ন ভাবে বাঁচা নয়। আমরা সকলে পরস্পর মিলেমিশে সুশৃঙ্খল শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তুলে সবাই বাঁচতে চাই। গ্রামবাসীর আন্তরিকতা, ঐক্য ও প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে নির্মূল হতে বাধ্য হবে সকল অন্যায়, অবিচার ও অপসংস্কৃতি। পরিশেষে, প্রবাদের কথা বলতে হয়, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা। অসৎ কাজ করতে করতে বা অপরাধমূলক কাজ করতে করতে নেশা হয়ে দাঁড়ায়, বদ অভ্যাস সহজে ছাড়তে পারে না। অসৎ চিন্তা সর্বদা মাথায় ঘুরতে থাকে এবং সুযোগ পেলেই তা কার্যে রূপান্তর করে। তাই অপরাধীদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য প্রথমে সৎ ও ধর্মীয় শিক্ষা দিয়ে মনে মস্তিষ্কে সর্বদা সৎ চিন্তা ও সৎ কাজের নেশা সৃষ্টি করতে হবে। তবেই তারা সংশোধন হবে। অর্থাৎ সৎ কাজের নেশা দিয়ে অসৎ কাজের নেশা দূর করতে হবে।

বিচার বিভাগের সহায়তায় অভিভাবক-শিক্ষক-আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও গ্রামের অভিজ্ঞ দায়িত্বশীল বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিগণের সমবেত প্রচেষ্টায় ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে গ্রাম থেকে অন্যায় অবিচার দূর হয়ে বিবেকানন্দের শান্তিপূর্ণ গ্রাম বা দিব্য সমাজ (Divine Society) গড়ে উঠবে। বিবেকানন্দ অন্ধকার সমাজ থেকে নিষ্কৃতির উদ্দেশ্যে বলেন, 'এ সবের হাত হইতে আমাদের নিষ্কৃতি পাইতে হইবে। তাই বলি– আমাদের অসাধারণ ঐশী শক্তির প্রয়োজন।...একমাত্র ইহারই সাহায্যে আমরা সব জটিলতা অতিক্রম করিতে পারি– অক্ষত দেহে অজস্র দুঃখ রাশি উত্তীর্ণ হইতে পারি। আমরা খন্ড-বিখন্ড হইতে পারি, শতধা বিছিন্ন হইতে পারি; তথাপি এই শক্তির সহায়তায় আমাদের হৃদয় বৃত্তি সর্বদাই মহৎ হইতে মহত্তর হইয়া উঠিবে।'[১৩১] আধ্যাত্মিক শিক্ষা ও শক্তির ভিত্তিতে মুক্তির লক্ষ্যে গড়ে উঠবে সকল প্রকার অভাব মুক্ত দিব্য সমাজ।

তথ্যনির্দেশ

১। শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশানন্দজী মহারাজ, "গ্রামীণ পরিবেশকে বাঁচিয়ে গ্রামের উন্নতি করতে হবে", স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, সুবর্ণ জয়ন্তী (৫০ বর্ষ), পৃ. ১৯৪।

২। সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা (দ্বিতীয় সংস্কার), ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭৬।

৩। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৩৫৮।

৪। স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, ঐ, পৃ. ঙ।

Dhaka University Institutional Repository

৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "স্বদেশী সমাজ" সত্যেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত, *সমাজচিন্তা*, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, ১১ এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ: ৪ অগ্রহায়ণ, ১৩৯২, পৃ. ১১৯।

৬। আব্দুল আহাদ, *গণচীনে চব্বিশ দিন*, আর্ট প্রেস, ফিরিঙ্গী বাজার রোড, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ: পৌষ, ১৩৭৩, পৃ. ৯০।

৭। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অক্টোবর ১৯৮৮, পৃ. ৩৫০।

৮। *VIVEKANANDA HIS CALL TO THE NATION*, Advaita Ashrama (ed), 5 Dehi Entally Road, Kolkata, 40th Impression, February 2009, page- 7.

৯। শ্রীমৎ স্বামী ভূতেশ্বানন্দজী মহারাজ, "গ্রামীণ পরিবেশকে বাঁচিয়ে গ্রামের উন্নতি", ঐ, পৃ. ১৯৫।

১০। ঐ, পৃ. ১৯৫।

১১। স্বামী লোকেশ্বরানন্দ, "কাজের উৎসাহে গ্রামের মানুষকে পাগল করে তুলুন", স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, ঐ, পৃ. ১৯৮।

১২। ঐ, পৃ. ১৯৯।

১৩। ঐ, পৃ. ২০০।

১৪। ঐ, পৃ. ২০৪।

১৫। ঐ, পৃ. ২০৬।

১৬। নন্দদুলাল চক্রবর্তী, "লোকশিক্ষা পরিষদের গ্রাম সংগঠন মডেল", স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, ঐ, পৃ. ২৪১।

১৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বদেশী সমাজ*, ঐ, পৃ. ১২২।

১৮। ঐ, পৃ. ১২২।

১৯। ঐ, পৃ. ১২২।

২০। Swami Vireswarananda, *Youth of the India Arise*, *SRI RAMAKRISHNA MATH*, Mylapore, Chennai, 1985, Page- 17.

২১। সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ অক্টোবর, ১৯৮৮, পৃ. ৪১৬।

২২। ঐ, পৃ. ৪১৬।

২৩। ঐ, পৃ. ৪১৬।

২৪। ভক্তিভূষণ ভক্তা, "রবীন্দ্র ভাবনায় সমবায় আন্দোলন ও সমাজ উন্নয়ন", স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা* (৪৫বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা) রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০১, পৃ. ১৩।

২৫। ঐ, পৃ. ১৩।

২৬। স্বামী তেজসানন্দ, *রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ*, রামকৃষ্ণ মিশন সরদাপীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া, অষ্টম সংস্করণ- ২০০৫, পৃ. ১৮।

২৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বদেশী সমাজ*, ঐ, পৃ. ১২২।

২৮। ঐ, পৃ. ১২২।

২৯। ঐ, পৃ. ১২২।

৩০। স্বামী বিবেকানন্দ, *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, বিংশ পুনর্মুদ্রণ জ্যেষ্ঠ ১৪১৩, পৃ. ৭৯-৮০।

৩১। ঐ, পৃ. ৯৯।

৩২। ঐ, পৃ. ৯৯।

৩৩। ঐ, পৃ. ২৭।

৩৪। ঐ, পৃ. ২৭-২৮।

৩৫। ঐ, পৃ. ২২।

৩৬। ঐ, পৃ. ২১।

৩৭। ঐ, পৃ. ২৩।

৩৮। ঐ, পৃ. ৩০।

৩৯। ঐ, পৃ. ৮৫।

৪০। ঐ, পৃ. ১০।

৪১। ঐ, পৃ. ৯।

৪২। ঐ, পৃ. ১২০।

৪৩। ঐ, পৃ. ১২১।

Dhaka University Institutional Repository

৪৪। ঐ, পৃ. ৯৭-৯৮।
৪৫। উমা দাসগুপ্ত, *শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪০৪, পৃ. ৩- ৪-৫।
৪৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, ঐ, পৃ. ৯৯।
৪৭। ঐ, পৃ. ৬১।
৪৮। ঐ, পৃ. ৪৩।
৪৯। ঐ, পৃ. ৪৩।
৫০। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৩৫২।
৫১। ঐ, পৃ. ৩৪৫।
৫২। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, অষ্টম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, আশ্বিণ ১৪১৪, পৃ. ১৩৫।
৫৩। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বন্ধু বিবেকানন্দ*, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিমিটেড, ৫২ রাজা রামমোহন রায় সরণি, কলকাতা, তৃতীয় মুদ্রণ, মার্চ ২০০৮, পৃ. ৪৮।
৫৪। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা", ঐ, পৃ. ৩৪৭।
৫৫। ঐ, পৃ. ৩৪৭।
৫৬। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *বন্ধু বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৪৯।
৫৭। ঐ, পৃ. ৪৯-৫০।
৫৮। ঐ, পৃ. ৫০।
৫৯। ঐ, পৃ. ৫০।
৬০। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, ঐ, পৃ. ৬২-৬৩।
৬১। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা", ঐ, পৃ. ৩৪৯।
৬২। সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৪১২।
৬৩। ঐ, পৃ. ৪০৬।
৬৪। ঐ, পৃ. ৪১৩।
৬৫। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা", ঐ, ৩৪৯।
৬৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *পল্লীপ্রকৃতি*, বিশ্ব ভারতী গ্রন্থন বিভাগ, ৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলিকাতা, পুনর্মুদ্রণ- আশ্বিন ১৩৯৩, পৃ. ৭৮।
৬৭। প্রণবেশ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা", ঐ, পৃ. ৩৫১।
৬৮। যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী প্রণীত, *গুরুবাক্য বা যৌগিক পন্থা* (দ্বিতীয় ভাগ), ইউনাইটেড পাবলিশার্স, ৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা, অখন্ড সংস্করণ, পৌষ ১৪২৫, পৃ. ১।
৬৯। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনুদিত ও সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খন্ড, কামিনী প্রকাশালয়: ১১৫ অখিল মিস্ত্রি লেন, কলকাতা-৯, প্রথম কামিনী সংস্করণ, বৈশাখ ১৪০১, পৃ. ১৯।
৭০। ঐ, পৃ. ২০।
৭১। ঐ, পৃ. ১৭।
৭২। ঐ, পৃ. ২০।
৭৩। ঐ, পৃ. ১৬।
৭৪। ঐ, পৃ. ২০।
৭৫। ঐ, পৃ. ২০-২১।
৭৬। যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী প্রণীত, *গুরুবাক্য বা যৌগিকপন্থা*, প্রথম ভাগ, ঐ, পৃ. ৩-৪।
৭৭। শ্রীমৎ স্বামীশিবানন্দ সরস্বতী, *যোগ বলে রোগ-আরোগ্য*, উমাচল প্রকাশনী, ৫৮/১/৭-বি রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা-৬, দশম মুদ্রণ– দোল পূর্ণিমা, ১৩৭৯, পৃ. ৮-১১-১২।
৭৮। ঐ, পৃ. ১২-১৩।
৭৯। ঐ, পৃ. ১৬।
৮০। স্বামী বেদানন্দ, *ওঁ ব্রহ্মচর্য্যম্*, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, ২১১ রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা, পঞ্চবিংশতি সংস্করণ শুভরথযাত্রা, ১৪১২, পৃ. ১১।
৮১। যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী প্রণীত, *গুরুবাক্য বা যৌগিক পন্থা* (দ্বিতীয় ভাগ), ঐ, পৃ. ৩৬।
৮২। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনুদিত ও সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খন্ড, ঐ, পৃ. ২০।

Dhaka University Institutional Repository

৮৩। *VIVAKANANDA HIS CALL TO THE NATIOIN*, op.cit, page- 48.
৮৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, ঐ, পৃ. ১০০।
৮৫। ঐ, পৃ. ৯৯।
৮৬। ঐ, পৃ. ৯৯।
৮৭। যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী প্রণীত, *গুরুবাক্য বা যৌগিক পন্থা*, তৃতীয় ভাগ, ঐ, পৃ. ৫।
৮৮। ঐ, পৃ. ১০।
৮৯। ঐ, পৃ. ৬-৭।
৯০। ঐ, পৃ. ১৯।
৯১। ঐ, পৃ. ১৯-২০।
৯২। স্বামী বিবেকান্দ, *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, ঐ, পৃ. ৫৪।
৯৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলিকাতা, একত্রিংশ পুনর্মুদ্রণ, কার্ত্তিক ১৪০৫।
৯৪। স্বামী রঘুবরানন্দ সংকলিত, *গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলিকাতা একত্রিংশৎ পুনর্মুদ্রণ, জ্যেষ্ঠ ১৪১৪, পৃ. ১৬।
৯৫। শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, "স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৫২৪।
৯৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, ঐ, ভূমিকা- পৃ. ১০।
৯৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, ঐ, পৃ. ৫৮।
৯৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, ঐ, পৃ. ১।
৯৯। ঐ, পৃ. ২।
১০০। ঐ, পৃ. ৩।
১০১। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধ্যান ও মনের শক্তি*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৪, পৃ. ৩৪।
১০২। অমলেন্দু বসু, "স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নন্দন তত্ত্ব", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৫৭৮।
১০৩। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, "স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত ভাবনা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৫৬৬।
১০৪। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, অষ্টাত্রিংশৎ পুনর্মুদ্রণ ১৪১৫, পৃ. ১০।
১০৫। ঐ, পৃ. ১১।
১০৬। অমলেন্দু বসু, "স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নন্দনতত্ত্ব" ঐ, পৃ. ৫৭৬।
১০৭। প্রণবরঞ্জন ঘোষ, "স্বামী বিবেকানন্দঃ কবির্মনীষী", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৫৫৯।
১০৮। স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, "স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গীত ভাবনা", ঐ, পৃ. ৫৬৩-৬৪।
১০৯। ঐ, পৃ. ৫৬৮।
১১০। অমলেন্দু বসু, "স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নন্দনতত্ত্ব", ঐ, পৃ. ৫৭৭।
১১১। ঐ, পৃ. ৫৭৭।
১১২। ঐ, পৃ. ৫৭৭।
১১৩। ঐ, পৃ. ৫৭৮-৭৯।
১১৪। ঐ, পৃ. ৫৭৯।
১১৫। ঐ, পৃ. ৫৮২।
১১৬। ঐ, পৃ. ৫৭৯।
১১৭। ঐ, পৃ. ৫৯০।
১১৮। শান্তিলাল মুখোপাধ্যায়, "স্বামী বিবেকানন্দের শিক্ষাচিন্তা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৫২৬।
১১৯। স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ১১।
১২০। স্বামী বিবেকানন্দ, *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, ঐ, পৃ. ১০০-১০১।
১২১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বদেশী সমাজ*, ঐ, পৃ. ১০৬।
১২২। অমলেন্দু বসু, "স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে নন্দনতত্ত্ব", ঐ, পৃ. ৫৮৪।
১২৩। নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী, *পরিবেশ ও নৈতিকতা*, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৫ জুন ২০০২, পৃ. ৩৯।

Dhaka University Institutional Repository

১২৪। স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ, *চিরজাগ্রত বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১২, পৃ. ২৩।

১২৫। অজিত কুমার পতি, "ড্রাগে আসক্তি- একটি কালব্যাধি", স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *সমাজশিক্ষা*, ঐ, পৃ. ৪৬১।

১২৬। ঐ, পৃ. ৪৬২।

১২৭। ঐ, পৃ. ৪৬২।

১২৮। ঐ, পৃ. ৪৬৬।

১২৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ১ উদ্বোধন লেন, বাগবাজার, কলকাতা, ত্রয়োবিংশতি পুনর্মুদ্রাণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, পৃ. ১২২।

১৩০। নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, "আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ১২৪।

১৩১। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১২২।

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তম অধ্যায়

ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্র

অন্তহীন দুঃখের সমুদ্র এই পৃথিবী। তাই তো মহামতি গৌতমবুদ্ধ বলেছেন– এ জগৎ দুঃখময়। তবুও মানুষ এ দুঃখময় জগতে সুখ অন্বেষণ করে। পথ হারা হয়ে পথের সন্ধান করে, বন্দী হয়েও মুক্তির সন্ধান করে। এজগতে যারা শক্তিধর, যাদের জ্ঞান, অর্থ ও সামর্থ্য আছে, তারা সহজেই তৈরী করে নিতে পারে তাদের বাঁচার আশ্রয়, স্বস্তির ছায়া। কিন্তু এ জগতের অসংখ্য অসহায় দুর্বল শক্তিহীন মানুষ রয়েছে, যাদের নেই জ্ঞান, অর্থ ও সামর্থ্য। তারা ব্যর্থ হয় জীবন সংগ্রামে জয়ী হতে। তাই তারা এ পৃথিবীর সভ্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বাঁচার জন্য অনুসন্ধান করে একটু শান্তি, একটু আশ্রয়। কতটুকু আশ্রয় তাদের ভাগ্যে জোটে! অনেক মানুষ শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে জ্ঞান, অর্থ ও আশ্রয় হারিয়ে দ্বারে দ্বারে ঘুরে মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করে। এমন অবস্থায় অসহায় মানুষদের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশ এবং শিক্ষা বিজ্ঞানে উন্নত বিশ্বের বিবেকবান মানুষ কি কিছু করতে পারে না?

অনেক মানুষ বেকার, দরিদ্র, নদীভাঙ্গা ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে গৃহহীন, আশ্রয়হীন, আবার অনেকে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও যুদ্ধ বিধ্বস্ত হয়ে সর্বহারা ও উদ্বাস্তু হয়। অনেকে অঙ্গহীন হয়ে ভিক্ষা করে অসহ্য বেদনা বক্ষে ধারণ করে প্রতিকূল পরিবেশে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে। আবার অনেকে সহায় সম্বল হারিয়ে অপমানিত ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে। আবার অনেক সুস্থ কর্মক্ষম ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করে। ভিক্ষুকদের দুঃখময় জীবন সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'The beggar is never happy. The beggar only gets a dole with pity and scorn behind it, at least with the thought behind that the beggar is a low object. He never really enjoys what he gets.'[১] অনেক মহিলা, তরুণী, সঠিক শিক্ষা, সত্য পথ ও আশ্রয়ের অভাবে বেছে নেয় পতিতাবৃত্তির জীবন। এ সম্পর্কে দায়ী যুব সমাজের উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বলেন, "যখন অফুরন্ত নির্ঝর নিকটেই বহিয়া যাইতেছে, তখনই এই দরিদ্র হতভাগ্যগণই তৃষ্ণায় মরিবে কেন? প্রশ্ন এই: ইহাদের জন্য আমরা কি করিয়াছি? কেন তাহারা মুসলমান হইবে না? আমি ইংল্যাণ্ডে এক সরলা বালিকার সম্বন্ধে শুনিয়াছিলাম, সে অসৎ পথে পদার্পণ করিবার–বেশ্যাবৃত্তি অবলম্বন করিবার পূর্বে এক সম্ভ্রান্ত মহিলা তাহাকে উক্ত পথে যাইতে নিষেধ করেন। তাহাকে সেই বালিকা উত্তর দেয়, 'কেবল এই উপায়েই আমি লোকের সহানুভূতি পাইতে পারি। এখন আমায় কেহই সাহায্য করিবে না; কিন্তু আমি যদি পতিতা হই, তবে সেই দয়াবতী মহিলারা আসিয়া আমাকে তাঁহাদের গৃহে লইয়া যাইবেন, আমার জন্য সব করিবেন, কিন্তু এখন তাঁহারা কিছুই করিবেন না।' আমরা এখন তাহাদের জন্য কাঁদিতেছি, কিন্তু ইহার পূর্বে আমরা তাহাদের জন্য কি করিয়াছি? আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজ নিজ বুকে হাত রাখিয়া নিজেকে জিজ্ঞাসা করুক দেখি– আমরা কি করিয়াছি, আর নিজের হাতে জ্ঞানের মশাল লইয়া উহার আলোক বিস্তারে কতটা সহায়তা করিয়াছি? আমরা যে উহা করি নাই, তাহা আমাদেরই দোষ– আমাদেরই কর্ম। এজন্য অপর কাহাকেও দোষ দিও না, দোষ দাও নিজেদের কর্মকে।"[২] তথাকথিত সভ্য সমাজের মানুষ সরল মানুষদের বঞ্চিত করে পতিতাবৃত্তি টিকিয়ে রেখে অসভ্য সমাজ সৃষ্টি করে। এদেশের রাস্তা-ঘাটে দেখা যায় অনেক মানুষ প্রকৃতির নির্মম-নিষ্ঠুর আঘাতে, কঠিন শারীরিক যন্ত্রণা, রোগ-শোক ও বিকলাঙ্গ দেহ নিয়ে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে। আবার অনেকে বিভিন্ন কারণে, কঠিন বিপদে পড়ে হয় বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ তারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে এলোমেলো বকে। কে দিবে তাদের শান্ত্বনা? কে দিবে তাদের আশ্রয়? তাদের দুঃখ দেখে নির্মম ব্যক্তিরও মন কাঁদে। অনেক অসহায় ছিন্নমূল বঞ্চিত ও এতিম পথ শিশু আশ্রয়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়ায়। তারা বঞ্চিত হয় শিক্ষা ও সুন্দর আলোকিত জীবন থেকে। অনেক বেকার অভাবের তাড়নায়, অশিক্ষা বা লোভের তাড়নায় পথভ্রষ্ট হয়ে, অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয়। তারা ছিনতাইকারী, চোর-ডাকাত, দালাল, বাটপার হয়ে সমাজে কলঙ্কিত ও অপমানিত জীবন-যাপন করে। অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে ধ্বংস করে অর্থ-সম্পদ জীবন ও সমাজ।

মহাপ্রভুর অপার লীলা। তিনি সৃষ্টি করেছেন অভিশপ্ত একটি জাত হিজড়া। এরা পুরুষও নয়, মহিলাও নয়। তাদের নেই শিক্ষা, কর্মসংস্থান, নেই আশ্রয় ও নেই কোন সামাজিক অধিকার। তারা বাঁচার জন্য রাস্তা-ঘাটে পথিকদের নিকট থেকে ও দোকান থেকে সাহায্য তুলে জীবিকা নির্বাহ করে। এই সভ্য সমাজে কে দেবে তাদের আশ্রয় ? প্রকৃতির নির্মম করাল গ্রাসে মা-বাবার অত্যন্ত স্নেহের পুত্র-কন্যা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বহু দূরে। অনেক সন্তান অর্থ-সম্পদ, সুযোগ

Dhaka University Institutional Repository

ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মা-বাবার ভরণ-পোষণ করে না। অনেক সন্তান ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও সামর্থ্যের অভাবে মা বাবার সেবা করতে পারে না। অসহায় বৃদ্ধ পিতামাতা শক্তিহীন, কর্মহীন হয়ে অনাহারে বিনা চিকিৎসায় কঠিন জীবন সংগ্রামে ব্যর্থ হয়ে এক সময় করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেন। বিবেকানন্দ এসব সমাজিক সমস্যা মর্মে মর্মে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। দুঃখী মানুষের বিস্মৃত জীবন পশুপ্রায় হয়ে যায়। তাই তিনি বলেন, 'তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশুপ্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ– কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শত শতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে। তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ- অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ সমগ্র ভারত গগণ আচ্ছন্ন করিয়াছে।'[৩] এমন অসহায় মানুষের জন্য স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ কি একটা আশ্রম গড়ে তুলতে পারে না ? নিশ্চয়ই পারে।

অপরাজেয় সেবা সৈনিক

বিবেকানন্দ জানতেন যে, কোন মহৎ ও স্থায়ী কল্যাণমূলক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক ও বাস্তব জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত, উদ্দীপ্ত সেবাকর্মী। দেশের অসহায় ও পদদলিত মানুষের আশ্রয়ের জন্য কর্মী প্রস্তুত করা প্রয়োজন। কিন্তু কর্মী কোথায় পাওয়া যাবে? এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'উদীয়মান যুবসম্প্রদায়ের উপরই আমার বিশ্বাস। তাদের ভিতর থেকেই আমি কর্মী পাব। তারাই সিংহবিক্রমে দেশের যথার্থ উন্নতির জন্য সমস্ত সমস্যা পূরণ করবে। আমি ভাবটি তৈরী করে তার জন্য জীবন দিয়েছি।...তারা জায়গায় জায়গায় ছড়িয়ে পড়বে– যতদিন না আমারা সমস্ত ভারতকে ছেয়ে ফেলি।'[৪] উদীয়মান যুব-সমাজই আর্তমানবতার সেবায় সারা দেশে ছড়িয়ে পড়বে। বিবেকানন্দ সেবাকর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'লক্ষ লক্ষ নর-নারী পবিত্রতার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে, ভগবানে দৃঢ় বিশ্বাসরূপ বর্মে সজ্জিত হয়ে দরিদ্র, পতিত ও পদদলিতদের প্রতি সহানুভূতিজনিত সিংহবিক্রমে বুক বাঁধুক। মুক্তি, সেবা, সামাজিক উন্নয়ন ও সাম্যের মঙ্গলময়ী বার্তা দ্বারে দ্বারে বহন করে সমস্ত ভারত ভ্রমণ করুক।'[৫] আমাদের জাতীয় পুনর্জাগরণের জন্য, দেশ গঠনের জন্য চরিত্রবান দেশপ্রেমিক কর্মী পদদলিত মানুষদের সেবার মাধ্যমে এগিয়ে নিবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "চরিত্রবান আধ্যাত্মিকতাসম্পন্ন, আত্মবিশ্বাসী এবং সকলের প্রতি, বিশেষ করে 'দরিদ্র, অজ্ঞ, পদদলিতের' প্রতি প্রগাঢ় প্রেমসম্পন্ন তাকে হতে হবে। এ-কাজ নিঃসন্দেহে সুবিশাল, কিন্তু দৃঢ় ইচ্ছাশক্তির সামনে কোন বাধাই দাঁড়াতে পারে না।"[৬] দেশ গঠনের বিশাল কর্মে নিযুক্ত হবে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মানুষ। অজ্ঞ, দরিদ্র, পদদলিত মানুষের আত্মমর্যাদাবোধ ফিরিয়ে আনতে হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, মানুষ গড়ার সাধনের ভিত্তি ভূমির উপর দেশ গঠন করতে হবে। আমরা প্রায়ই আমাদের বস্তুগত দৈন্যের কথা বলি- কিন্তু সত্যিকারের দৈন্য আমাদের বস্তুগত নয়। এ দীনতা সংহত চরিত্রের নর-নারীর। দেশ গঠিত হয় মানুষ দিয়ে- যে মানুষের অন্তরে আত্মমর্যাদাবোধ আছে। আমাদের জাতীয় উন্নয়নের জন্য দরিদ্র ভিক্ষুকদের দাসসুলভ মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। অপরের দয়া, সহযোগিতা ও ভিক্ষা গ্রহণ করে করে- আমাদের হীন মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়েছে। শুধু তাই নয়, বৃটিশ রাজত্বের সময় আমাদের শিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যেও দাসসুলভ মনোবৃত্তি ঢুকে পড়েছে। যার ফলে আজও বিদেশী ভাব এবং আদর্শ মাত্রই অতি উপাদেয় এবং যা কিছু দেশীয় তা আমরা হেয় মনে করি। এ ভাব থেকে এখনও আমরা মুক্ত হতে পারিনি। আমাদের আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উচ্চতর জীবনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

বিবেকানন্দ সেবাকর্মীদের নিষ্কাম কর্মের রহস্য সম্পর্কে বলেন, 'কাজের ভিতরে যত কম আকর্ষণ বা কামনা থাকে, আমরা ততই সুন্দরভাবে কাজ করিতে সমর্থ হই। আমরা যতই শান্ত হই, ততই আমাদের নিজেদের মঙ্গল, ততই আমরা আরও বেশি কাজ করিতে পারি। যখন আমরা ভাবাবেগ সংযত করিতে পারি না, তখনই আমাদের শক্তির বিশেষ অপব্যয় হয়, আমাদের স্নায়ুমন্ডলী বিকৃত হয়, মন চঞ্চল হইয়া উঠে, কিন্তু কাজ কমই হয়। যে-শক্তি কার্যরূপে পরিণত হওয়া উচিত ছিল, তাহা শুধু হৃদয়াবেগেই পর্যবসিত হয়। মন যখন খুব শান্ত ও স্থির থাকে, কেবল তখনই আমাদের সমুদয় শক্তিটুকু সৎকার্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। যদি তোমরা জগতে বড় বড় কর্মকুশল ব্যক্তির জীবনী পাঠ কর, দেখিবে তাঁহারা অদ্ভুত শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন, কিছুই তাঁহাদের চিত্তের সমতা নষ্ট করিতে পারিত না। এইজন্য যে-ব্যক্তি সহজেই রাগিয়া যায়, সে বড় একটা কাজ করিতে পারে না, আর যে কিছুতেই রাগে না, সে সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করিতে পারে। যে-ব্যক্তি ক্রোধ, ঘৃণা বা কোন রিপুর বশীভূত হইয়া পড়ে, সে এ জগতে বড় কিছু করিতে পারে না, সে নিজেকেই যেন খন্ড খন্ড করিয়া ফেলে, সে বড় একটা কাজের লোক হয় না। কেবল শান্ত, ক্ষমাশীল, স্থিরচিত্ত ব্যক্তিই সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করিয়া থাকেন।'[৭] পুনর্বাসন কাজে দুর্বল ব্যক্তিদের বিবেকানন্দের উৎসাহ বাণী দিয়ে জাগ্রত ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন- 'সব শক্তি

Dhaka University Institutional Repository

তোমাতে আছে। তুমি সব করতে পার। এটি বিশ্বাস কর। কখনো নিজেকে দুর্বল ভেবো না।...তুমি নিজেই সব কিছু করতে পার। সব শক্তি তোমাতেই আছে। উঠে দাঁড়াও, নিজ দিব্যভাব বিকশিত কর। সাহসী হও, সাহসী হও, মানুষ একবারই মরে। আমার শিষ্যেরা যেন কখনো কাপুরুষ না হয়। কাপুরুষতাকে আমি ঘৃণা করি।...কেন কেঁদে মর, বন্ধু? তোমার মধ্যে সমস্ত শক্তি আছে। হে বীর, তোমার সর্বশক্তিমান সত্তাকে আহ্বান কর, জগৎ তোমার পদতলে পড়ে থাকবে।...শক্তিই জীবন, দুর্বলতাই মৃত্যু; তোমাদের শৈশব থেকে তোমাদের মধ্যে ইতিমূলক, বলপ্রদ, সাহায্যকারী চিন্তারাশি প্রবেশ করুক।'[৮] শৈশবের মহৎ ভাবরাশি বিকশিত হয়ে শিশুকে পরিণত করে মহাপ্রাণ ব্যক্তিরূপে।

স্বাধীন বাংলাদেশের তরুণ যুব সমাজ এবং বিবেক ও সামর্থ্যবান মানুষ অনুপ্রেরণা পেলে সহজেই গড়ে তুলতে পারে নিরাশ্রয় মানুষের জন্য একটি "ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্র"। এ মহতী উদ্যোগ বাস্তবায়নের জন্য প্রচার মাধ্যমে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগ্রহী যুব সমাজকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা প্রয়োজন। এই কমিটি প্রতিষ্ঠানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং অর্থ ও সম্পদ সংগ্রহ করবে। তারা সরকারের খাস জমির একটি বিরাট অংশ নিয়ে পর্যায়ক্রমে গড়ে তুলবে দর্শনীয়, শিক্ষণীয় এক শান্তির স্বর্গীয় আশ্রয়, ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্র। দুঃখী মানুষের সেবাই আমাদের ব্রত। বিবেকানন্দ এক সময় সমাধির আনন্দে ডুবে থাকতে চেয়েছিলেন, জগতের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তখন গুরুদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেন– 'ধিক্ তোকে। ভেবেছিলাম, কোথায় তুই বিশাল বটবৃক্ষের মতো হবি, কত লোক তোর ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে তৃপ্ত হবে, আর তুই কিনা নিজের মুক্তি খুঁজছিস!'[৯] শ্রীগুরুর ইচ্ছায় বিবেকানন্দ সত্যিই বিশাল বটবৃক্ষের মত হয়েছিলেন। তার শিক্ষা, সেবা ও আদর্শের ছায়ায় আশ্রয় নিয়েছে অসংখ্য মানুষ। তাঁর শিক্ষায় বাংলাদেশের দরিদ্র, ভিক্ষুক, পতিত ও সর্বহারা মানুষের জন্য গড়ে উঠবে "ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্র"। এটি হবে বিবেকানন্দের মানবকল্যাণ দর্শনের বিশাল বটবৃক্ষের ছায়ারূপ দুঃখী মানুষের আশ্রয় কেন্দ্র।

কেন্দ্র স্থাপনের শিক্ষা

দূরদর্শী বিবেকানন্দের মঠ স্থাপনের পরিকল্পনা থেকে আমরা "ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্র" স্থাপনের শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি। ১৮৯৬ সালে বিবেকানন্দ মঠ স্থাপনের জন্য লালা বদ্রী শাহ্‌কে এক পত্রে লিখেন, 'আলমোড়ার কাছে কোন সুবিধা মতো জায়গা আপনার জানা আছে কি, যেখানে বাগবাগিচাসহ আমাদের মঠ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? সঙ্গে বাগান, প্রকৃতি অবশ্যই থাকা চাই। একটা গোটা ছোট পাহাড় হলেই ঠিক আমার মনোমতো হয়।'[১০] বিবেকানন্দের উদ্যোগে যেমন অসংখ্য মঠ তৈরী হয়েছে, তেমনি তাঁর শিক্ষায় দেশের বিভিন্ন স্থানে পতিত মানুষের জন্য পুনর্বাসন কেন্দ্র তৈরী হবে। গরীব মানুষেরা কিভাবে অর্থ সংগ্রহ করে পুনর্বাসন কেন্দ্র স্থাপন করবে সে সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন– 'দেশে কি মানুষ আছে? ও শ্মশানপুরী। যদি lower class দের education (নিম্ন শ্রেণীদের শিক্ষা) দিতে পার, তাহলে উপায় হতে পারে। জ্ঞানবলের চেয়ে বল বড় আর কি আছে– বিদ্যা শেখাতে পার? বড়-মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরিবেরা করে। টাকা আসতে কতক্ষণ? মানুষ কই? দেশে কি মানুষ আছে? দেশের লোকগুলো বালক, ওদের সঙ্গে বালকের ন্যায় ব্যবহার করতে হবে। ওদের বুদ্ধিশুদ্ধি দশ বছরের মেয়ে বে করে খরচ হয়ে গেছে।'[১১] ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়। এ কারণে সেবাকর্মীদের প্রবল ইচ্ছাশক্তিতেই পুনর্বাসন কেন্দ্রের অর্থ সংগৃহীত হবে।

বিবেকানন্দ বলেন, মহাশক্তির উপলব্ধিতে সকল কাজ সম্পন্ন হয়। '...মহাশক্তি তোমাতে আসবে, ভয় নাই- Be pure, have faith be obedient (পবিত্র হও, বিশ্বাসী হও, আজ্ঞাবহ হও)।'[১২] ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্রের পরিচালনা কমিটি দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসহায়, নিরাশ্রয় মানুষদের সংগ্রহ করে কেন্দ্রে নিয়ে আসবে। জাতীয় উন্নয়নের জন্য এই কাজে বিভিন্ন বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠান, পুলিশ, প্রশাসন সাহায়তা করবে। কারণ এই অসহায় ছিন্নমূল মানুষ বৃহত্তর মানব সমাজের উন্নতি অগ্রগতি ও কল্যাণ ব্যাহত করে। এই আশ্রয় কেন্দ্রে স্থান পাবে উদ্বাস্তু, সর্বহারা, ভিক্ষুক, অঙ্গহীন, বিকলাঙ্গ, বিকৃত মস্তিষ্ক ও উন্মাদ। এ ছাড়াও অনেক পথশিশু, ছিনতাইকারী, চোর-ডাকাত, মাদকাসক্ত ব্যক্তি, চোরাকারবারী, শিশু ও নারী পাচারকারী, পতিতা ও হিজড়া প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষ এ প্রতিষ্ঠানে পুনর্বাসনের সুযোগ পাবে। কমিটি দুঃস্থ অসহায় মানুষদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিচার করে তাদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসনের জন্য বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করে কার্যক্রম পরিচালনা করবে। বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের জন্য থাকবে একটি স্বতন্ত্র "বৃদ্ধাশ্রম"।

Dhaka University Institutional Repository

পরিচালনা কমিটি পুনর্বাসন কেন্দ্রের অর্থ সংগ্রহের জন্য দেশ-বিদেশের বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংস্থা এবং বেসরকারি ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের দান, ত্রাণ, সাহায্য প্রভৃতি গ্রহণ করবে। বাংলাদেশের সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায় আল্লাহর নির্দেশ মত যদি যাকাত প্রদান করেন, তাহলে সহজেই যাকাতের অর্থ দিয়ে একটি বৃহৎ পুনর্বাসন কেন্দ্র গড়ে তোলা সম্ভব হবে। পুনর্বাসন কেন্দ্রের সকল সদস্যের জন্য বাধ্যতামূলক হবে কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। তাদের শিক্ষায় অন্তর্ভুক্ত হবে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, ধর্ম প্রভৃতি। অন্ধ, মূক, বধিরসহ প্রভৃতি শ্রেণীর সদস্যদের জন্য বিভিন্ন শিল্প ও কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। পুনর্বাসন কেন্দ্রটি একটি বৃহৎ শিল্পরূপ ধারণ করবে। এখানে সেলাই, পোশাক তৈরী, বাঁশ-বেত-কাঠ, মৃৎ, প্লাস্টিক, এমনকি লৌহশিল্প প্রতিষ্ঠিত হবে। সদস্যদের যারা কৃষি কাজে সামর্থ্য তারা কেন্দ্রের বিস্তৃর্ণ মাঠে কৃষি কাজ করবে। গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী পালন, মৎস্য চাষ, শাক-সব্জী, খাদ্যশস্য, ফল ও বৃক্ষ উৎপাদন করবে। এখানে কেউ বসে খেতে পারবে না, সামর্থ্য অনুযায়ী সবাইকে বাধ্যতামূলকভাবে কাজ করতে হবে। বিবেকানন্দ এসব পতিত ও দরিদ্র মানুষের সেবা সম্পর্কে ১৮৯৪ সালে বিবেকানন্দ অখণ্ডানন্দজীকে লিখেন– 'মাতৃদেবো ভব; 'পিতৃদেবো ভব', আমি বলি, "দরিদ্রদেবো ভব, মূর্খদেবো ভব"। দরিদ্র, অজ্ঞ, নিরক্ষর, পীড়িত– এঁরাই তোমাদের দেবতা হোন। এঁদের সেবাই তোমার সর্বোচ্চ ধর্ম বলে জানবে।'[১৩] অজ্ঞ দরিদ্র ও পীড়িত মানুষের সেবাই প্রকৃত ধর্ম। বিবেকানন্দ অসহায় দুঃখী মানুষের দুঃখ মুক্তির জন্য নানা পথ দেখিয়েছেন। তিনি নানা উৎসাহ বাক্য দিয়ে পতিত মানুষের হৃদয় জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন।

ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিবেকানন্দের শক্তিদায়ক বাণী দিয়ে দুর্বল পতিত মানুষদের জাগ্রত করতে হবে। দুঃখী-দরিদ্র, বেকার, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের দুঃখ-বেদনা সাময়িক। যেমন মেঘের আড়ালে সূর্য থাকে, তেমনি দুঃখের আড়ালে সুখ থাকে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'All the powers in the univers are already ours. ...Darkness never existed, weakness never existed. We who are fools cry that we are weak ; we who are fools cry, that we are impute.'[১৪] বৃথা ক্রন্দনে লাভ নেই। সঠিক কর্ম প্রচেষ্টার মাধ্যমে মানুষের সুখ-শান্তি ও কল্যাণ ফিরে আসে। অবহেলিত মানুষ যুগ যুগ ধরে মানবেতর জীবন-যাপন করে তাদের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে উঠেছে। এসব পতিত মানুষদের অসীম শক্তি ও সম্ভাবনার কথা স্মরণ করিয়ে বিবেকানন্দ বলেন, "Never say, 'no' never say, 'I cannot; for you are infinite. Even time and space are as nothing compared with your nature. You can do anything and everything, you are almighty."[১৫] ঐশীশক্তি বিকাশের ফলে মানুষ সব কিছুই করতে পারে, সে আর কখনও দুর্বল ও ছোট থাকে না।

দুঃখী-দরিদ্র মানুষদের তো একটি দেহ আছে। এই মানব দেহই তাদের মহামূল্যবান সম্পদ। মানুষ এই দেহকে অবলম্বন করেই এগিয়ে যেতে পারে উন্নতির দিকে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'This human body is the greatest body in the universe, and a human being the greatest being. Man is higher than all animals, than all angels; one is greater than man.'[১৬] বিভিন্ন প্রাণী ও দেবতার চেয়ে মানুষের স্থান উচ্চে। কারণ মানুষ ঈশ্বরের অংশ, একমাত্র মানুষই মুক্তি লাভে সক্ষম। বিবেকানন্দ দুর্বল পতিত মানুষদের স্নায়ু-পেশী শক্ত সবল করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে বলেন, 'Make your nerves strong. What we want is muscles of iron and nerves of steel. We have wept long enough. No more weeping, but stand on your feet and be men.'[১৭] এ জগতে দুঃখী মানুষ অনেক কেঁদেছে, তাদের আর কাঁদার প্রয়োজন নেই। মানুষ সুপ্ত ব্রহ্মকে জাগ্রত করে কল্যাণ ও মুক্তি লাভ করতে পারে। বাস্তববাদী দার্শনিক বিবেকানন্দ মানুষের দুঃখ মোচন ও অন্ন সংস্থানের কথা ভেবেছেন। তিনি বলেন, 'I do not believe in a religion or God which cannot wipe the widow's tear or bring a piece of bread to the orphan's mouth.'[১৮] শুধু কথা দিয়ে সান্ত্বনা দেওয়া যায় না। এমন ধর্ম প্রয়োজন যা বিধবার চোখের জল মোছাবে এবং অনাথ শিশুদের খাদ্যের ব্যবস্থা করবে।

দর্শনীয় ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্রের সদস্যগণের জন্য সুন্দর সুশৃঙ্খল পরিবেশে থাকবে বাসস্থান, বিশেষ পোশাক, সুষম খাদ্য ব্যবস্থা। প্রত্যেকের থাকবে কর্ম ব্যবস্থা এবং ধর্মানুশীলনের সুযোগ। সদস্যগণের জন্য থাকবে স্বাস্থ্যবিধি, যোগব্যায়াম, খেলাধুলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও চিকিৎসা ব্যবস্থা। তাঁদের শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য নিমজ্জিত অন্ধকারাচ্ছন্ন আত্মার জন্য থাকবে সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি উন্নত সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা। সদস্যগণের মানবিক চাহিদা

Dhaka University Institutional Repository

মেটানোর জন্য কেন্দ্রের আগ্রহী পুরুষ ও মহিলাদের বিয়ের ব্যবস্থা করা হবে। তারা যাপন করবে এক সুন্দর সুশৃঙ্খল সৎ নৈতিক ও ধর্মীয় জীবন। তাদের একমাত্র লক্ষ্যই হবে সেবা ও কর্মের মাধ্যমে আত্মার মুক্তি লাভ করা। কেউ স্বনির্ভর হলে, বাইরে কর্মসংস্থান করতে পারলে কেন্দ্র ছেড়ে চলে এসে সুশৃঙ্খল ধর্মীয় ও সামাজিক জীবন যাপন করতে পারবে। বিবেকানন্দের কোমল হৃদয় মানুষের দুঃখ দেখে বিচলিত হয়। তাই দুঃখী, দরিদ্র, অসহায় দেশবাসীর পুনরুদ্ধারে তাঁর সকরুণ আবেদন, 'আহা, দেশে গরীব-দুঃখীর জন্য কেউ ভাবে না রে! যারা জাতির মেরুদন্ড, যাদের পরিশ্রমে অন্ন জন্মাচ্ছে...তাদের সুখে-দুঃখে সান্ত্বনা দেয়, দেশে এমন কেউ নেই রে!...আমরা এদের অন্ন-বস্ত্রের সুবিধা যদি না করতে পারলুম, তবে আর কি হল?....সর্বাঙ্গে রক্ত সঞ্চার না হলে কোন দেশ কোনও কালে কোথায় উঠেছে দেখেছিস? একটা অঙ্গ পুড়ে গেলে, অন্য অঙ্গ সবল থাকলেও ঐ দেহ নিয়ে কোন বড় কাজ আর হবে না– এ নিশ্চয় জানবি।'[১৯] অসহায় মানুষদের অন্ন-বস্ত্র ও আশ্রয় দিয়ে তাদের আত্মনির্ভরশীল করতে পারলে তারা জাতির উন্নয়নে কাজ করতে সমর্থ হবে। অসহায় মানুষের দুঃখ ও সমস্যা দূর হলে, তারা দেশের মানব সম্পদ ও শক্তিতে পরিণত হবে।

আত্মহত্যা ও অনাকাঙ্খিত কর্মকান্ড প্রতিরোধ

ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্রের একটি অন্যতম দায়িত্ব হলো– অনাকাঙ্খিত, অসামাজিক, অন্যায় কর্মকাণ্ড এবং আত্মহত্যা প্রতিরোধ করা। মানুষ মুক্তির পথ না পেয়ে, প্রতিকূল অবস্থার চাপে, সহযোগী বন্ধুর অভাবে হতাশা ও মানসিক পীড়নে অন্যায় পথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়, শুধু তাই নয়– আত্মহত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না। বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবসের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, "সারা বিশ্বে প্রতিবছর প্রায় ১০ লাখ লোক আত্মহত্যা করে থাকে। যুদ্ধ কিংবা অন্য ধরনের সহিংসতায় মোট গড় মৃত্যুর চেয়ে এ সংখ্যাটি বেশি। আত্মহত্যা জনিত কারণে গড়ে প্রতিদিন তিন হাজার লোকের মৃত্যু ঘটছে। প্রতিটি 'সফল' আত্মহত্যার সঙ্গে গড়ে আরও ২০ জন লোক আত্মহত্যার উদ্যোগ নিয়ে থাকে।...মানসিক অস্থিরতার কারণে ৯০ শতাংশ আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। আত্মহত্যার পেছনে বড় দুটি কারণ হচ্ছে হতাশা ও মানসিক পীড়ন।"[২০] আর তাই মানবকল্যাণের সব অন্তরায় দূর করে, সকল সঙ্কট নিরসনের প্রকৃত বন্ধু প্রতীম মনোভাব নিয়ে সেবার হাত বাড়িয়ে দিবে "ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্র"। এই কাজে বিবেকানন্দের সেবাদর্শ মূল প্রেরণা উৎস হিসেবে কাজ করবে। স্বদেশ ও বিদেশের যে কোন ব্যক্তি যখন কোন সমস্যার সম্মুখীন হবেন, কোন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হওয়ার সম্ভাবনায় পড়বেন, এমনকি আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়ার আগে অবশ্যই অন্ততঃ একবার হলেও আপনার পরম বন্ধু মনে করে ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্রে যোগাযোগ করবেন। এ প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত সমস্যাগুলোর সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করবে।

১. যে কোন দুর্ঘটনা এড়াতে
২. সংঘর্ষ থেকে মুক্তি পেতে
৩. শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন এবং যে কোন সঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে
৪. অভাব অনটন ও আর্থিক সঙ্কট নিরসনে
৫. শত্রুর অত্যাচার থেকে রক্ষা পেতে
৬. অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড থেকে রক্ষা পেতে
৭. মাদকাসক্ত মুক্ত হতে
৮. অনৈতিক ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড পরিহার করতে
৯. দূর্নীতিমুক্ত হতে
১০. আত্মহত্যার প্রবণতা হতে রক্ষা পেতে।

বন্ধু, আর এক মুহূর্তও দেরী নয়। যে কোন সমস্যা ও সঙ্কটের সম্মুখীন হলে বা সম্ভাবনা দেখা মাত্রই ফোন করবেন।

এই ঠিকানায় যোগাযোগ করুন–

বন্ধু– ০০৮৮-০১৯১২-১৭৮৩৩৩

ঐশী পুনর্বাসন কেন্দ্র

মানুষ মানুষের সেবা করবে, বিপদ থেকে উদ্ধার করবে– এটাই মানুষের বড় ধর্ম। কারণ মানুষের মধ্যে যে সাক্ষাৎ নারায়ণ রয়েছে। সে নারায়ণের সেবাই বড় ধর্ম। তাই স্বামী বিবেকানন্দ অপরাধীর প্রতি করুণার দৃষ্টি দেন। অপরাধী বা বিপদগ্রস্ত মানুষকে হেয় করা নয়, পাপী বলে সমাজ থেকে উচ্ছেদ করা নয়, তাদের সংশোধন করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো বিবেকানন্দের অভিপ্রায়। তাই তিনি বলেন, 'এখন কারাগারকে অনেক স্থলে "সংশোধনাগার"

Dhaka University Institutional Repository

বলা হয়। সব বিষয়েই এরূপ ঘটিয়াছে। জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে প্রত্যেক ব্যক্তির ভিতরেই দেবত্ব আছে– এই ভারতীয় ভাবটি ভারতের বাহিরে অন্যান্য দেশেও নানাভাবে ব্যক্ত হইতেছে।'[২১] অজ্ঞানতার কারণে মানুষ ভুল করে পথভ্রষ্ট হয়, দুঃখগ্রস্ত হয়। তবুও তার দেবত্ব প্রতিভা সুপ্ত থাকে। তাই সংশোধন করার সুযোগ দিলে পাপী মানুষও দেবতা হয়ে ওঠে।

প্রার্থনা

প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও প্রার্থনায় ঈশ্বরের করুণা লাভ করে অসহায়, বিপদগ্রস্থ, পথভ্রষ্ট ও অসৎ মানুষও হয়ে উঠে সৎ, নৈতিক ও চরিত্রবান। এ কারণেই প্রার্থনার গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের উন্নত জীবনের জন্য এমন একটি প্রার্থনা করা প্রয়োজন। তা হলো– হে প্রভু, তুমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা। তুমিই আমার আরাধ্য। তুমিই আমার শক্তি। তুমিই আমার সর্বস্ব ধন। তোমার নির্দেশ অনুসারে জীবন-যাপন করতে চাই। কিন্তু আমাদের সমাজে আদর্শ জীবন-যাপন করা সুকঠিন। প্রতিকূল পরিবেশে নানা প্রলোভন এবং অবাঞ্ছিত চিন্তায় আমি পরিবৃত। তুমি কৃপা করে আমাকে অশুভ থেকে, সকল বাধা অতিক্রম করার শক্তি দাও। তা না হলে আমি অগ্রসর হতে পারব না। হে প্রভু, আমাকে কৃপা করে পথ দেখাও, সকল অশুভ থেকে মুক্তি দাও। কখনও কখনও আমার বিবেক উপলব্ধি করে– আমাকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের প্রলোভন থেকে মুক্ত হতে হবে। শুভ মুহূর্তে আমার মনে হয়– অসৎ সঙ্গ, নোংরা পরিবেশ, অসদালাপ, অপসংস্কৃতি ও অশালীন দৃশ্য আমাকে টেনে নীচে নামিয়ে দেয়– এসব বিষবৎ পরিত্যাগ করা উচিত। কিন্তু এসব অশুভ বিষয় পরিত্যাগ করার মতো উপযুক্ত শক্তি আমার নেই। তাই হে আমার প্রাণপ্রিয় প্রভু, আমাকে কৃপা কর, আমার প্রতি করুণা কর– যা কিছু আমাকে অধোগামী করে তা থেকে যেন দূরে থাকতে পারি। হে প্রভু, তোমার দর্শন দিয়ে আমাকে মুক্তি দাও।

তথ্যনির্দেশ

১। Swami Vivekananda, *THE COMPLETE WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA*, Mayavati Memorial Edition, VOLUME II, ADVAITA ASHRAMA, 5 DEHI ENTALLY ROAD, CALCUTTA, Thirteenth Edition, June 1976, page- 4.

২। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৪, পৃ. ৪৩।

৩। সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭৬।

৪। স্বামী গোকুলানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দ যুব-সমাজের আদর্শ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দশম পুনর্মুদ্রণ- জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, পৃ. ১৪।

৫। ঐ, পৃ. ১৫।

৬। ঐ. পৃ. ৩।

৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ঊনবিংশতি পুনর্মুদ্রণ অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ১৬৯।

৮। স্বামী গোকুলানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দ যুব সমাজের আদর্শ*, ঐ, পৃ. ৮-৯।

৯। ঐ, পৃ. ১০।

১০। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ শ্রাবণ ১৪১৪, পৃ. ২১০।

১১। ঐ, পৃ. ১৬৫।

১২। ঐ. পৃ. ১৫০।

১৩। স্বামী গোকুলানন্দ, *স্বামী বিবেকানন্দ যুব সমাজের আদর্শ*, ঐ, পৃ. ১১।

১৪। Swami Vivekananda, *Thoughts of Power*, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Kolkata, Twenty-eighth Impression, August 2006, page- 9.

১৫। op.cit, page- 36.

১৬। *VIVEKANANDA HIS CALL TO THE NATION*, Advaita Ashrama (ed), 5 Dehi Entally Road, Kolkata, 40th Impression, February 2009, page- 47.

১৭। Swami Vivekananda, *Thoughts of Power*, op,cit, page- 13.

১৮। op.cit, page- 20.

১৯। প্রণবেশ চক্রবর্তী, 'স্বামী বিবেকানন্দের কৃষিচিন্তা', স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, ঐ, পৃ. ৫৩৮।

২০। মতিউর রহমান সম্পাদিত, *দৈনিক প্রথম আলো*, বার্তা সম্পাদকীয় ও বাণিজ্য ঠিকানা, সি এ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা, শনিবার, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৯, পৃ. ৯, ।

২১। নবনীহরণ মুখোপাধ্যায়, 'আজকের পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী', স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ১২৪।

Dhaka University Institutional Repository

অষ্টম অধ্যায়

আন্তর্জাতিক কল্যাণ ভাবনা

প্রতিভাবান ব্যক্তি মাত্রই বিশ্বমনা। স্বদেশ ও স্বযুগের সঙ্কীর্ণ পরিধি মুক্ত হয়ে সর্ব যুগের সর্ব মানবের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন প্রতিভার অন্যতম ধর্ম। এমন এক প্রতিভাবান বিশ্বমনা ব্যক্তি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। এ মহামানবের পূণ্য জন্মক্ষণকে স্মরণ করে বিশ্ববাসী অনাবিল আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় দেশ কালের সীমাত্তীর্ণ এ প্রতিভা-ভাস্বর ব্যক্তিত্ব পৃথিবীর সকল দেশের মানুষের হৃদয়ে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। বিবেকানন্দ শুধু বাংলার নব জাগরণের বিশিষ্ট নায়ক কিংবা ভারতের ধর্ম জাগরণের মহান পুরোহিত নয়। তাঁর অনন্য প্রতিভার অম্লান দীপ্তি প্রমাণ করে তিনি বিশ্বমনা, বিশ্বকর্মা এবং বিশ্বনায়ক। তিনি বিশ্বমনে, ভাবের জগতে, জ্ঞানের জগতে যেমন প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করেন, তেমনি সৃষ্টিধর্মী কর্মাদর্শ স্থাপন করেন। বিবেকানন্দের মাদ্রাজে শক্তিময় আহ্বানেই জেগে উঠে সারাবিশ্ব। 'শক্তির এই বাণীর দ্বিবিধ অর্থ ছিলঃ একটি জাতীয়, অন্যটি বিশ্বজনীন। অদ্বৈতবাদী এই মহাসন্ন্যাসীর কাছে বিশ্বজনীন অর্থটিই বেশী প্রাধান্য লাভ করলেও অন্য অর্থটিই ভারতের পেশিগুলিকে পুনরায় সঞ্জীবিত করে তুলল।'[১] বিবেকানন্দ যেমন ছিলেন ভারতের, তেমনি ছিলেন সারা বিশ্বের মুক্তির অগ্রনায়ক।

বিবেকানন্দের অমানবীয় প্রতিভা সর্বকালের বিশ্ববাসীর সামনে একদিকে প্রতিষ্ঠিত করেছে ভাবময় অধ্যাত্ম জীবনের উচ্চতম আদর্শ, অপর দিকে তাঁর স্বার্থ বুদ্ধিহীন কর্ম প্রেরণা সর্ব যুগের সর্ব দেশের মানব মনকে আকর্ষণ করেছে মানব কল্যাণমূলক নিত্য নতুন কর্মের পথে। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে ভাবতন্ময় অধ্যাত্ম জীবনের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞানময় বাস্তব জীবনের সমন্বয়ে বিরাট কর্মযজ্ঞের পরিকল্পনা করেন। বর্তমান বিশ্বের সর্বগ্রাসী জড়বাদী, লোভ প্রবণতা, হিংসা জর্জরিত উন্মত্ততা ও সম্ভোগ প্রিয়তার পরিপ্রেক্ষিতে এক শ্রেণীর বিবেকবান মানুষ এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেন, আপাত সমৃদ্ধির অন্তরালে এ যুগের ধ্বংস পথ যাত্রীদের রক্ষা করতে পারে– একমাত্র বিবেকানন্দের মতো বিশ্বমানবের সমন্বয়ী চিন্তা ও কর্মের সুমহান আদর্শ। মোহমুক্ত দৃষ্টির সাহায্যে বিবেকানন্দ দেখতে পারেন বিজ্ঞান শক্তি ভোগ বিলাসের উপকরণ সম্ভার বাড়িয়ে পাশ্চাত্য দেশের জীবন দৃষ্টিকে ক'রে তুলেছে একান্তভাবে জড়বাদী। পাশ্চাত্য জড়বাদী সভ্যতা ক্রমশঃ প্রতীচ্য জীবন ইহজীবন সর্বস্ব করে তুলেছে। মননশীল বিবেকানন্দ বুঝতে পারেন ইহজীবন সর্বস্ব যে বহির্মুখী জীবন দৃষ্টি সংক্রামক রোগের প্রবলতার উৎসমুখে তার গতিবেগ প্রতিহত করতে না পারলে সমগ্র বিশ্ববাসী ভবিষ্যতে লোভী বস্তুর পর্যায়ে উন্নীত হবে। তাই বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ দুর্বার মানব প্রেমের প্রেরণায় পাশ্চাত্য সভ্যতার কেন্দ্রভূমিতে প্রচার করেন বেদান্তের সুমহান অধ্যাত্ম চেতনার আদর্শ। বিবেকানন্দ বিশ্বধর্ম সম্মেলনে ভারতীয় ভোগ বিমুক্ত জীবনের আদর্শ প্রচার করেই সক্রিয় মানবপ্রেম নিবৃত্তি লাভ করেনি- প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন স্থানে অধ্যাত্মদর্শন চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করে আধুনিক জড়বাদী-সভ্যতা-প্রভাবিত বিশ্ববাসীর মনকে জ্ঞান-কর্ম ও প্রেমময় জীবনাদর্শের দিকে আকর্ষণ করার প্রয়াস পেলেন। বিবেকানন্দ ধর্ম পথেই মানব মুক্তির পথ নির্দেশ করেন। 'Ramkrishna asked him further to get up a monastery to maintain the ideals which he had taught India's eternal ideals. These ideals are necessary not only for the sake of India, but also for the sake of the whole world.'[২] বিবেকানন্দ শুধু ভারতের নন, তিনি সারা বিশ্ব আন্দোলনের অগ্নিপুরুষ। 'মাদ্রাজ তখনই জাগবে, যখন তার হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ অন্ততঃ একশত শিক্ষিত যুবক সংসার থেকে একেবারে স্বতন্ত্র হয়ে কোমর বাঁধবে এবং দেশে দেশে সত্যের জন্য যুদ্ধ করতে প্রস্তুত হবে। ভারতের বাইরে এক ঘা দিতে পারলে সেই এক ঘা ভারতের ভিতরের লক্ষ আঘাতের তুল্য হয়।'[৩]

বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য আমেরিকা ভ্রমণ করেন। আমেরিকাবাসী বিবেকানন্দের সান্নিধ্য লাভের সুফল সম্পর্কে বলেন, 'Thus his first visit to America came to an end. All told, he had spent less than two and a half years on American soil – years that hundreds of Americans would never forget and that he himself had found particularly fruitful.'[৪] উন্নয়নের প্রথম শর্ত হলো যোগাযোগ, অর্থাৎ লেন-দেনের মাধ্যমেই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শান্তি-সমৃদ্ধি ও কল্যাণ সাধিত হয়। অন্যদের সাথে যোগাযোগের ফলে উৎসহ উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং সম্ভাবনাময় নতুন দ্বার খুলে যায়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Attachment is the source of all our pleasures now. We are attached to our

Dhaka University Institutional Repository

friends, to our relatives; we are attached to our intellectual and spiritual works; we are attached to external objects, so that we get pleasure from them.'[৫] মহামানব বিবেকানন্দের চিন্তায় ছিল আন্তর্জাতিক কল্যাণ সাধন করা। তিনি সারা বিশ্বের মানুষের দুঃখ-বেদনা দূর করতে নানা পথ নির্দেশ করেন।

বিবেকানন্দ বিশ্ব ইতিহাস মন্থন করে জেনেছিলেন- কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী যুবক বিশ্বমানবতার কল্যাণ সাধন করতে পারে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পৃথিবীর ইতিহাস কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী মানুষের ইতিহাস। সেই বিশ্বাসই ভিতরের দেবত্ব জাগ্রত করে। তুমি সব কিছু করতে পার।'[৬] বিবেকানন্দ আত্মবিশ্বাসী মহামানবগণ সম্পর্কে আরও বলেন, 'সমগ্র মানব জাতির ইতিহাসে মহাপ্রাণ নর-নারীদের মধ্যে যদি কোন প্রেরণা অধিকতর শক্তি সঞ্চার করিয়া থাকে, তাহা আত্মবিশ্বাস। তাঁহারা এই চেতনাসহ জন্মিয়াছিলেন যে, তাঁহারা মহৎ হইবেন, এবং তাঁহারা মহৎ হইয়াছিলেন।'[৭] বিবেকানন্দ বিশ্বাস করতেন মাত্র একশত জন বীর্যবান ও তেজস্বী যুবক সমগ্র জগতের কল্যাণ সাধন করতে পারে। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে। বীর্যবান, সম্পূর্ণ অকপট, তেজস্বী, বিশ্বাসী যুবক আবশ্যক। এইরূপ একশত যুবক হইলে সমগ্র জগতের ভাবস্রোত ফিরাইয়া দেওয়া যায়।'[৮] আন্তর্জাতিক সম্পর্ক উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনে নারীদের বিশেষ ভূমিকা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আন্তর্জাতিক মেলামেশার মতলবটা খুব ভাল- যে রকমে পারো, ওতে যোগ দাও; আর যদি তুমি মাঝ থেকে কয়েকটি ভারতীয় নারী-সমিতিকে এতে যোগ দেওয়াতে পারো, তবে আরও ভাল হয়।'[৯] বিবেকানন্দ বিশ্ব বিপ্লবের মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য কয়েকজন আত্মবিশ্বাসী যুবক চেয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'Give me a few men and women who are pure and selfless, and I shall shake the world.'[১০] জাতীয় উন্নয়নের সাথে ঘনিষ্টভাবে জড়িত রয়েছে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন।

আধ্যাত্মিক সত্য প্রচারের ফলে ভারতের সঙ্গে বহির্বিশ্বেরও উন্নতি সাধিত হবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'পৃথিবীতে অনেক বড় বড় দিগ্বিজয়ী জাতি আবির্ভূত হইয়াছে; আমরাও বারবার দিগ্বিজয়ী। ...আবার ভারতকে পৃথিবী জয় করিতে হইবে। ইহাই আমার জীবনস্বপ্ন; আর আমি ইচ্ছা করি- যাহারা আমার কথা শুনিতেছ, তাহাদের সকলের মনে এই কল্পনা জাগ্রত হউক; আর যতদিন না তোমরা উহা কাজে পরিণত করিতে পারিতেছ, ততদিন যেন তোমাদের কাজের বিরাম না হয়। লোকে তোমাকে প্রতিদিন বলিবে, আগে নিজের ঘর সামলাও, পরে বিদেশে প্রচারকার্যে যাইও। কিন্তু আমি তোমাদিগকে অতি স্পষ্ট ভাষায় বলিতেছি– যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ কর, তখনই তোমরা শ্রেষ্ঠ কাজ করিয়া থাকো। যখনই তোমরা অপরের জন্য কাজ করিয়া থাকো, বিদেশী ভাষায় সমুদ্রের পারে তোমাদের ভাববিস্তারের চেষ্টা কর, তখনই তোমরা নিজেদেরে জন্য শ্রেষ্ঠ কাজ করিতেছ,...। যদি আমি ভারতেই আমার কার্যক্ষেত্র সীমাবদ্ধ রাখিতাম, তাহা হইলেই ইংল্যাণ্ডে ও আমেরিকায় যাওয়ার দরুন যে ফল হইয়াছে, তাহার এক চতুর্থাংশও হইত না। ইহাই আমাদের সম্মুখে মহান-আদর্শ, আর প্রত্যেককেই ইহার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।...ওঠ ভারত, তোমার অধ্যাত্মিকতা দ্বারা জগৎ জয় কর।'[১১] বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক সত্য প্রচারের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পরিকল্পনা করেন। এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সারা বিশ্বে ভারতীয় আধ্যাত্মিক শিক্ষা প্রচার করবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'হে বন্ধুগণ, এই জন্য আমার সঙ্কল্প এই যে, ভারতে আমি কতকগুলি শিক্ষালয় স্থাপন করিব– তাহাতে আমাদের যুবকগণ ভারতে ও ভারত-বহির্ভূত দেশে আমাদের শাস্ত্র-নিহিত সত্যসমূহ প্রচার করিবার কাজে শিক্ষালাভ করিবে।...অন্য কিছু অপেক্ষা ইচ্ছাশক্তির প্রভাব অধিক। ইচ্ছাশক্তির কাছে আর সবই শক্তিহীন হইয়া যাইবে, কারণ ঐ ইচ্ছাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের নিকট হইতে আসিতেছে। বিশুদ্ধ ও দৃঢ় ইচ্ছার শক্তি অসীম। তোমরা কি ইহা বিশ্বাস কর না? সকলের নিকট তোমাদের ধর্মের মহান্ সত্যসমূহ প্রচার কর, প্রচার কর; জগৎ এই-সকল সত্যের জন্য অপেক্ষা করিতেছে।'[১২] আধুনিক পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতা মানুষকে শান্তি দিতে পারে না। এ কারণেই প্রকৃত শান্তি, কল্যাণ ও সভ্যতার জন্য বিশ্ববাসীর হৃদয় জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে আধ্যাত্মিক সত্য লাভের জন্য প্রতীক্ষা করছে।

ভারতের আধ্যাত্মিক সত্য বিশ্ববাসীর নতুন জীবনদর্শন প্রদান করবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমাদের এই মাতৃভূমিতে এখনও ধর্ম ও অধ্যাত্ম-বিদ্যারূপে যে নির্ঝরিণী বহিতেছে, এখনও তাহা হইতে মহাবন্যা প্রবাহিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে ভাসাইবে এবং রাজনীতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও প্রতিদিন নূতনভাবে সমাজ গঠনের চেষ্টায় প্রায় অর্ধমৃত হীনদশাগ্রস্ত পাশ্চাত্য ও অন্যান্য জাতিকে নূতন জীবন প্রদান করিবে।'[১৩] আধ্যাত্মিক শিক্ষার ভিত্তিতেই গড়ে উঠবে

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব সমাজের ভিত্তি। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আত্মবিজ্ঞান-প্রদত্ত সমাজ-জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তিই ভবিষ্যতে সারা পৃথিবীতে নূতন সমাজের ভিত্তি স্বরূপ হইবে।'[১৪] বিবেকানন্দের আশা তেজস্বী যুবকগণ নতুন সমাজের ভিত্তি স্থাপন করবে। কয়েকজন চিন্তাশীল ঈশ্বর প্রেমিক বিশ্ববাসীর কল্যাণ সাধনের ইতিহাস সৃষ্টি করবে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "জগৎ ব্যক্তির মধ্য দিয়া চিন্তাশক্তির বিকাশ প্রত্যক্ষ করিতে চায়। আমাদের গুরুদেব বলিতেন– তুমি তোমার নিজের হৃদয় পদ্ম প্রস্ফুটিত করিতেছ না কেন? অলিকূল আপনা হইতে আসিবে। জগতে এখন ভগবদ্‌ভাবে তন্ময় লোকের প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। প্রথমে নিজের উপর বিশ্বাসবান হও তাহা হইলেই ভগবানে বিশ্বাস আসিবে। জগতের ইতিহাস হইল– পবিত্র, গম্ভীর, চরিত্রবান্ এবং শ্রদ্ধাসম্পন্ন কয়েকটি মানুষের ইতিহাস।"[১৫] যুবকগণের ভগবদ প্রেমের অপরিসীম শক্তি জগতের কল্যাণ সাধন করবে।

বিবেকানন্দ প্রেমের মাধ্যমে সর্বজীবে বিশ্বাত্মার অধিষ্ঠান উপলব্ধির শিক্ষা দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'প্রেম- একমাত্র প্রেমই আমি প্রচার করিয়া থাকি; আর আমার এই উপদেশ বিশ্বাত্মার সর্বব্যাপিত্বও সমত্বরূপ বেদান্তের সেই মহান তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত।'[১৬] বিবেকানন্দ প্রেম ও সেবার মাধ্যমে প্রতিটি মানুষ ও জীবের কল্যাণ সাধনের শিক্ষা দেন। যুগে যুগে পাপী ও পূণ্যবানদের মধ্যে বিরোধ চলেছে। এ বিরোধের আঘাতে দুষ্ট স্বার্থপর মন বিশ্লিষ্ট হয়ে ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করে। 'সাধু পাপীকে ঘৃণা করে, আবার পাপীর বিদ্রোহ পূণ্যবানের বিরুদ্ধে। এই ভাবও অবশ্য তাহাকে আগাইয়া লইয়া যায়। বারংবার আঘাতে নিপিষ্ট হইয়া দুষ্ট স্বার্থপর মন মরিয়া যায়- তখন আমরা জাগিয়া উঠি এবং মায়ের সত্তা অনুভব করি।'[১৭] বিবেকানন্দের মতে পাপী ও পূণ্যবানদের বিরোধে মায়ের সত্তা অনুভূত হলে মানুষ জীবের কল্যাণ সাধনে আত্মনিয়োগ করে।

আন্তর্জাতিক কল্যাণ সাধনের অন্যতম শিক্ষা-বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য। বিশ্বস্রষ্টার অপার লীলা, তাঁর অপার সৃষ্টি রহস্য। তিনি বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-জাতির মানুষ ও প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। সবকিছুর মাঝেই ঈশ্বর রয়েছেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Unity in variety is the plan of the universe. We are all men, and yet we are all distinct from one another. ...As a man you are separate from the women; as a human being you are one with the women. As a man you are separate from the animal, but as living beings man, woman, animal, and plant are all one; and as existence you are one with the whole universe. That universal existence is God, the ultimate Unity in the universe. In Him we are all one.'[১৮] কেউ যদি জগতের সকল মানুষকে, সকল প্রাণীকে তার পছন্দমত একই ধর্মের নিয়ম অনুসারে চালাতে চেষ্টা করেন, তাহলে তিনি ব্যর্থ হবেন। এ কারণেই সকল ধর্ম-বর্ণ স্বীকার করে নিয়েই উদার চিত্তে মানবকল্যাণ সাধনে এগিয়ে আসতে হবে।

প্রেম মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, বিশ্বের সাথে একাত্ম অনুভব করতে সাহায্য করে। প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এ কারণেই প্রেমের প্রতিক্রিয়া প্রেম এবং ঘৃণার প্রতিক্রিয়া ঘৃণা। বিবেকানন্দ প্রেম দ্বারা বিশ্ববাসীর হৃদয় জয় করার শিক্ষা প্রচার করেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'প্রত্যেক মানুষকে বেদান্ত এই শিক্ষা দেয়– সে এই বিশ্ব সত্তার সহিত এক ও অভিন্ন; তাই যত আত্মা আছে, সব তোমারই আত্মা; যত জীবদেহ আছে, সব তোমারই দেহ; কাহাকেও আঘাত করার অর্থ নিজেকেই আঘাত করা এবং কাহাকেও ভালবাসার অর্থ নিজেকেই ভালবাসা। তোমার অন্তর হইতে ঘৃণারাশি বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র অপর কাহাকেও তাহা আঘাত করুক না কেন, তোমাকেই আঘাত করিবে নিশ্চয়। আবার তোমার অন্তর হইতে প্রেম নির্গত হইলে প্রতিদানে তুমি প্রেমই পাইবে, কারণ আমিই বিশ্ব-সমগ্র বিশ্ব আমারই দেহ। আমি অসীম, তবে সম্প্রতি আমার সে অনুভূতি নাই। কিন্তু আমি সেই অসীমতার অনুভূতির জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, এবং যখন আমাতে সেই অসীমতার পূর্ণ চেতনা জাগরিত হইবে, তখন আমার পূর্ণতা প্রাপ্তিও ঘটিবে।'[১৯] সাধনা দ্বারা আমাদের জ্ঞান ও চেতনার উদয় হলে আমরা নিজের মাঝে সর্বব্যাপী বিশ্বাত্মার উপলব্ধির মাধ্যমে পূর্ণতা লাভে সমর্থ্য হব। আত্মবিকাশে মানুষের ভেদ জ্ঞান দূর হয়, তখন মানুষ জাতি-ধর্ম-বর্ণে এক অভিন্ন ব্রহ্মসত্তা উপলব্ধি করে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'মানুষ যখন তাহার বিকাশের উচ্চতম স্তরে উপনীত হয়, যখন নর-নারীর ভেদ, লিঙ্গভেদ, মতভেদ, বর্ণভেদ, জাতিভেদ, প্রভৃতি কোন ভেদ তাহার নিকট প্রতিভাত হয় না, যখন সে এই-সকল ভেদবৈষম্যের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বমানবের মিলন ভূমি মহামানবতা বা একমাত্র ব্রহ্মসত্তার সাক্ষাৎকার লাভ করে, কেবল তখনই সে বিশ্বভ্রাতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়।'[২০]

Dhaka University Institutional Repository

আধ্যাত্মিক শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বাত্মার উপলব্ধিতেই গড়ে উঠবে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ। বিশ্বনায়ক বিবেকানন্দ সারা বিশ্বের মানুষের কল্যাণের পথ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মানবতাবাদী দর্শন জাতীয়তার বাধ ভেঙ্গে আন্তর্জাতিক বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি শুধু ঘরে বসেই বিশ্ববাসীর কথা ভাবেননি, প্রার্থনার মাধ্যমে কল্যাণ কামনা করেননি। তিনি গভীর মানব প্রেমের আকর্ষণে সকল প্রতিকূল অবস্থা ও সঙ্কট অতিক্রম করে বিশ্ব ভ্রমণ করেন, ঘরে ঘরে এ জাগতিক দুঃখময় জীবনে কল্যাণ লাভ ও আধ্যাত্মিক মুক্তি লাভের জন্য সারা বিশ্বে রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠ গড়ে তোলার বাস্তব পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁর আন্তর্জাতিক কল্যাণ ভাবনার স্পষ্ট রূপরেখা,ফুটে উঠে রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর মাধ্যমে। "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" নিজের মুক্তি সাধন ও জগতের কল্যাণ। ত্যাগ ও সেবা ; সকল মত ও পথের সমন্বয় সাধন। পূজাজ্ঞানে সকল কর্মের অনুষ্ঠান। জাতীয় চরিত্র গঠন ; শিবজ্ঞানে জীব সেবা (মানুষের সেবাকে ঈশ্বরের উপাসনা মনে করা)। শিক্ষাদান, শিল্প ও শ্রমোপজীবিকায় উৎসাহ বর্ধন, বিভিন্ন দুর্যোগের সময়ে ত্রাণ কার্য পরিচালনা। শ্রীরামকৃষ্ণ জীবনে ব্যাখ্যাত ধর্মভাবের প্রবর্তন দ্বারা মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতিকরণ এবং বিভিন্ন ধর্ম মতাবলম্বী মানুষের মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপন করা।'[২১] রামকৃষ্ণ মিশন একটি আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠান, যা সমাজ সেবার দায়বদ্ধতা স্বীকার করে। এ মিশন অসাম্প্রদায়িক, অরাজনৈতিক ও সর্বজনীন। এটির শিক্ষা ও কার্যক্রম জাতি, ধর্ম, বর্ণ সকলের নিকট উন্মুক্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ বৈষ্ণব, শাক্ত, খ্রীষ্ট ও ইসলাম সমস্ত ধর্মীয় সাধকগণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করে বার বছর বিভিন্ন মতে সাধনা করে- বিভিন্ন পথে একই ঈশ্বর লাভ করেন। তাঁর উপলব্ধ সত্য হলো, "*'ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য'। *'যত মত তত পথ'। *'শিব জ্ঞানে জীব সেবা'।"[২২] বিবেকানন্দ সারা বিশ্বে তাঁর উপলব্ধ সত্য প্রচার করেন।

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ মিশনের মাধ্যমে প্রচার করেন তাঁর আন্তর্জাতিক কল্যাণ ভাবনা। তাঁর শিক্ষা হলো 'BE AND MAKE- নিজে মানুষ হও এবং অপরকে মানুষ কর।'[২৩] বিবেকানন্দের বিশ্বজনীন ভাবনা, "Help and not fight", "Assimilation and not Destruction", "Harmony and peace and not dissension"- বিবাদ নয়, সহায়তা ; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মত বিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।"[২৪] তিনি বিশ্বজনীন কল্যাণ ভাবনা সম্পর্কে আরও বলেন,

'–আমরা যে কেবল অন্য ধর্মাবলীর মত সহ্য করি তাহা নহে,
সকল ধর্মকেই আমরা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি।'[২৫]

সকল ধর্মেই সত্য রয়েছে, কতকগুলো অভিন্ন মৌলিক নীতি রয়েছে।

সর্বজনীন ও বিশ্বজনীন রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশনে বিভিন্ন ধর্মের আলোচনা ও উৎসব পালন করা হয়। বেলুড় মঠ পরিচালিত পৃথিবীতে ১৮টি দেশে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মোট ১৪৮টি কেন্দ্র রয়েছে। ভারতবর্ষে কেন্দ্র সংখ্যা: ১১১টি এবং বাংলাদেশে ১১টি কেন্দ্র রয়েছে। এছাড়া বহির্ভারতে ২৭টি কেন্দ্র রয়েছে। সেগুলো হলো–

"আর্জেন্টিনা	ঃ ১	অষ্ট্রেলিয়া	ঃ ১	ফিজি	ঃ ১
ব্রাজিল	ঃ ১	কানাডা	ঃ ১	মালয়েশিয়া	ঃ ১
ফ্রান্স	ঃ ১	জাপান	ঃ ১	রাশিয়া	ঃ ১
মরিসাস	ঃ ১	নেদারল্যাণ্ড	ঃ ১	সুইজারল্যাণ্ড	ঃ ১
সিঙ্গাপুর	ঃ ১	শ্রীলঙ্কা	ঃ ১	ইউনাইটেড কিংডম	ঃ ১

ইউনাইটেড স্টেট্স অব আমেরিকা ঃ ১২'[২৬]

বিশ্বব্যাপী রামকৃষ্ণ মিশনের কেন্দ্রগুলো মানবকল্যাণ ও শান্তির উদ্দেশ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান, ধর্ম, সংস্কৃতি, কারিগরি, চিকিৎসা, ত্রাণ এবং বিভিন্ন সেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে।

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি

বিশ্ববিধাতার অপার লীলা। এক বিধাতা সৃষ্টি করেছেন বৈচিত্র্যময় বিশাল মহাবিশ্ব, এতে রয়েছে নানা ধর্ম-বর্ণ-জাতি ও নানা মতের মানুষ। বহুরূপী ঈশ্বর স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানবকল্যাণের মাধ্যমে তাঁকে জানার জন্য, চেনার জন্য সৃষ্টি করেছেন একই সত্য ধর্মের বিভিন্ন রূপ। এক ঈশ্বর, এক এই অনন্ত বিশ্বপ্রকৃতি। আর ধর্মের উদ্দেশ্য এক ঈশ্বর, অনন্ত জগৎ ও জীবনের ব্যাখ্যা করা, যাতে মানুষ রহস্য উদঘাটন করে সত্য জানতে ও আত্মার মুক্তি লাভ করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি স্থাপনের জন্য পৃথিবীর ধর্মীয় সংস্থাগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সাজানো আবশ্যক। তাহলে উগ্র ও গোঁড়া পন্থী ধার্মিকগণ ধর্ম নিয়ে বিরোধ সৃষ্টির সুযোগ পাবে না। শুধুমাত্র আমার ধর্মই সত্য এবং অন্য সব মিথ্যা- এ ধরনের চিন্তাকে পরিহার করতে হবে। অন্য যে কোন ধর্ম সম্পর্কে যে কোন বিশুদ্ধ গবেষণাই এ সত্য প্রমাণিত করবে যে, সে ধর্মই আমাদের ধর্মের মতই মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত। একারণেই বিশ্ব শান্তির জন্য, আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি বজায় রাখার জন্য সকল ধর্মের প্রতি সদ্ভাব পোষণ করা কর্তব্য। এ সম্পর্কে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে এস্থনী চিরাপন্নাথ বলেন, 'যখন জীবন পরিচালনার নীতি হিসেবে এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করা হয় তখন বিভেদ ভিত্তিক দ্বন্দ্বগুলি পৃথিবী থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়।'[২৭] তাই মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জীবন পরিচালনার ধর্মীয় নীতিগুলোকে সুশৃঙ্খলভাবে উপস্থাপন করতে হবে।

বিশ্বধর্মকে একটি হীরক খণ্ডের সাথে তুলনা করা যায়। 'একটি হীরকখণ্ড যেমন প্রতিটি কোণের মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রকাশ করে, সত্য হচ্ছে তেমনি একটি বহুমুখী হীরকখণ্ড। আমরা আমাদের অজ্ঞানতার জন্যই সত্যকে খণ্ড খণ্ড হিসেবে দেখি এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আমাদের সীমিত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আচরণ করি। আমরা যদি সত্যিকার অর্থেই আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি চাই, তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে, আমরা একটি বৃহৎ সত্তার অন্তর্ভূক্ত একটি বিশাল পরিবারের সদস্য হিসেবে বিভিন্ন ধরনের কাজ করছি এবং আমরা সকলেই ভালবাসা এবং সত্যের আত্মিক বাস্তবায়নের দিকে ধাবমান।'[২৮] স্বামী বিবেকানন্দ আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার এক বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৮৯৩ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্বধর্মসভায় ঐতিহাসিক বক্তব্য রাখেন। তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার কুফল সম্পর্কে বলেন, 'সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা এবং তাদের ভয়ানক ফল স্বরূপ ধর্মোন্মত্ততা এই সুন্দর পৃথিবীকে বহুকাল ধরে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সারা জগতে এরা মারাত্মক উপদ্রবের সৃষ্টি করেছে, বহুবার এ জগৎকে মানুষের রক্তে রঞ্জিত করেছে, সভ্যতা ধ্বংস করেছে এবং বিভিন্ন জাতিকে প্রায়শঃই হতাশায় নিমগ্ন করেছে। এ সকল পিশাচ যদি না থাকতো তা হলে মানব সমাজ আজ যে অবস্থায় রয়েছে তার চেয়ে অনেক বেশী উন্নত হতে পারতো।'[২৯] ধর্মান্ধ নরপিশাচ এই পৃথিবী অন্ধকারাচ্ছন্ন করে তুলেছে।

বিবেকানন্দ এ ধর্ম সভায় ধর্মোন্মত্ততার অবশ্যম্ভাবী ধ্বংস সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেন, 'কিন্তু আজ এর মৃত্যুকাল উপস্থিত হয়েছে এবং আমি আন্তরিকভাবে কামনা করি যে, এই ধর্ম সম্মেলনের সম্মানার্থেই আজ প্রাতে যে ঘন্টাধ্বনি বেজে উঠলো তা সব ধরনের ধর্মোন্মত্ততা, অসি বা মসি দ্বারা সৃষ্ট সর্ববিধ নির্যাতন এবং একই লক্ষ্যের দিকে ধাবমান ব্যক্তিগণের মধ্যে সব রকমের অসদ্ভাবের সম্পূর্ণ অবসানের বার্তা ঘোষণা করবে।'[৩০] একশ বছর পরেও বিবেকানন্দের এ শান্তির স্বপ্ন পূর্ণ হয়নি। সেই ধর্মান্ধ, ধর্মোন্মত্ত নরপিশাচের উত্তরসূরীরা ধর্মের নামে অধর্মে লিপ্ত। তারা মানুষের রক্তে রঞ্জিত করে চলেছে এ জগৎ। প্রশ্ন জাগে– শিকাগো শহরে অনুষ্ঠিত সেই ঐতিহাসিক ধর্মসভায় বিবেকানন্দের ভাষণের কি কোন প্রভাব পড়েনি একবিংশ শতাব্দীর মানুষের উপর? তাঁর জীবন ও বাণীর আবেদন অনস্বীকার্য। বর্তমান মারণাস্ত্র সজ্জিত ধ্বংসোন্মুখ পৃথিবীর উত্তরণের উপায় কি?

১৮৯৩ সনে বিশ্ব মহাধর্মসভা সারা পৃথিবীতে প্রচণ্ড প্রভাব ফেলেছিল। ফলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এ জাতীয় ধর্মসভার আয়োজন করে। 'Universal World Religious Alliance, World Parliament of Religions, Union of all Religions, World Congress of Faiths, Global Congress of the World Religions, Assembly of the World's Religions ইত্যাদি শিরোনামে আমেরিকাসহ এশিয়ার কয়েকটি দেশে অনেকগুলি ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৮৯৩ সনের ধর্মসভার শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষেও বহু ধর্মমহাসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে অনেক দেশে। আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে Comparative Religion বা Religious Studies এর উপর স্বতন্ত্র বিভাগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে পৃথিবীর অধিকাংশ প্রখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে।'[৩১] ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়ও গড়ে উঠেছে অনেক প্রতিষ্ঠান। স্বয়ং বিবেকানন্দের প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির জন্য কাজ করে যাচ্ছে পৃথিবীর বহু দেশে। জন্মাষ্টমী, মিলাদুন্নবী, বৌদ্ধপূর্ণিমা এবং বড় দিন সবই পালিত হচ্ছে রামকৃষ্ণ মিশনে। পোপ মহোদয়ের নির্দেশে এবং প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ক্যাথলিক মিশনগুলি হিংসা বিদ্বেষ দূর করে মৈত্রী ভাব প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় রত। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অন্তত এক হাজার সংগঠন বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন ভাবে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও মৈত্রীভাব প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করছে। অনেক ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্মীয় গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের বিবেক জাগ্রত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সম্প্রতি ভারতের ড. জাকির নায়েক বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

এভাবে একদিকে চলেছে সাম্প্রদায়িকতা নিধনের চেষ্টা, আবার অন্যদিকে চলেছে ধর্ম ব্যবসায়ী রাজনীতিবিদদের পৈশাচিক শক্তির ইন্ধন যোগানোর চেষ্টা। বিশ্বের কতিপয় ধনী দেশ এসব রাজনীতিবিদ ও প্রচার মাধ্যমগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করছে। এসব দেশ অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে বিভিন্ন দেশে বিশেষ করে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির নরপিশাচদের প্রতিপালিত সেবাদাস ও অনুচরদের মাধ্যমে ছলে-বলে-কৌশলে চাঙা করছে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামি, সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মোন্মত্ততা। বিবেকানন্দ ইংল্যাণ্ডে প্রদত্ত এক ভাষণে ধর্মের নামে প্রচলিত কল্যাণকর ও অকল্যাণকর কাজ সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, 'মানুষ যত প্রকার প্রেমের আস্বাদ পাইয়াছে, তন্মধ্যে তীব্রতম প্রেম লাভ হইয়াছে ধর্ম হইতে এবং মানুষ যত প্রকার পৈশাচিক ঘৃণার পরিচয় পাইয়াছে, তাহারও উদ্ভব হইয়াছে ধর্ম হইতে। জগৎ কোন কালে যে মহত্তম শান্তিবাণী শ্রবণ করিয়াছে, তাহা ধর্মরাজ্যের লোকদেরই মুখনিঃসৃত, এবং জগৎ কোন কালে যে তীব্রতম নিন্দা ও অভিশাপ শ্রবণ করিয়াছে, তাহাও ধর্মরাজ্যের লোকদের মুখেই উচ্চারিত হইয়াছে। কোন ধর্মের উদ্দেশ্য যত উচ্চতর এবং উহার কার্য-প্রণালী যত সুবিন্যস্ত, তাহার ক্রিয়াশীলতা ততই আশ্চর্য। ধর্মপ্রেরণায় মানুষ জগতে যে রক্তবন্যা প্রবাহিত করিয়াছে, মানুষ্যহৃদয়ের অপর কোন প্রেরণায় তাহা ঘটে নাই; আবার ধর্মপ্রেরণায় যত চিকিৎসালয় ও আতুরাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অন্য কিছুতেই তত হয় নাই। ধর্ম প্রেরণার ন্যায় মনুষ্য হৃদয়ের অপর কোন বৃত্তি তাহাকে শুধু মানব জাতির জন্য নয়, নিম্নতম প্রাণীগণের জন্য পর্যন্ত এতটা যত্ন লইতে প্রবৃত্ত করে নাই। ধর্মপ্রভাবে মানুষ যতটা নিষ্ঠুর হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না, আবার ধর্মপ্রভাবে মানুষ যত কোমল হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না।'[৩২] প্রকৃতপক্ষে ধর্ম বিশ্বাসীর জন্য হিতকর, কল্যাণকর। ধর্মের নামে অধর্ম করলে বৈধ হয় না। "খ্রিষ্টীয় পতিতালয়" নাম দিয়ে ব্যভিচার করলে তা যেমন খ্রিষ্টীয় হয় না, তেমনি "ইসলামী মদের দোকান" নাম দিলে সে মদের দোকানের মদ হালাল হয় না। অধর্মের উপর ধর্মের লেবেল লাগালেই তা ধর্মে রূপান্তরিত হয় না। পৃথিবীতে যত অকল্যাণকর কাজ হয়েছে, তা ধর্মের নামে হলেও সেখানে ছিল না ধর্ম, ছিল অধর্ম। ধর্মের দশটি লক্ষণ হলো সহিষ্ণুতা, ক্ষমা, চিত্ত সংযম, অস্তেয়, সুচিতা, ইন্দ্রিয় সংযম, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। তাই যেখানে ধর্ম রয়েছে সেখানে হিংসা, নিন্দা, ঘৃণা, দ্বেষ থাকতেই পারে না। তাহলে ধর্মের নামে অধর্ম সৃষ্টি হয় কিভাবে? ধর্ম-ব্যবসায়ী এবং ধর্ম-রাজনীতিবিদরা সাধারণ মানুষকে প্রতারিত করে ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ছড়িয়ে দিচ্ছে। তারা সুস্থ মানসিকতার পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এদের বড় হাতিয়ার ধর্ম সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতা এবং তার চেয়েও মারাত্মক ভ্রান্ত ধারণা।

'আজ সারা পৃথিবীতে যত ধর্ম আছে এবং সেসব ধর্মের যত অনুসারীরা আছে তাদের শতকরা ৯০ জনেরও অধিক নিজের ধর্ম সম্পর্কে পরিষ্কার কোন ধারণাই রাখে না। এদের মধ্যে শতকরা একজনও নেই যে অন্য ধর্ম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞানের অধিকারী। এ সুযোগটাই নিচ্ছে ধর্ম-রাজনীতিবিদগণ।'[৩৩] ধর্ম-রাজনীতিবিদরা স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য নিরীহ ধর্মপ্রাণ মানুষকে তৈরী করছে ধর্মান্ধ, অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিকে তৈরী করছে সাম্প্রদায়িক। তারা কিছু সুযোগ সুবিধা আর ধর্মীয় আবেগের সিরিঞ্জ দিয়ে নিষ্কলুষ মানুষের হৃদয়ে হিংসা-বিদ্বেষ আর ঘৃণার বীজ বপন করছে। ফলে অতীতের ন্যায় বর্তমান বিশ্বও মারাত্মক ধর্মীয় বিদ্বেষ-দ্বন্দ্ব ও ঘৃণায় পরিপূর্ণ, এতে অনেকেই ধর্মের প্রতি বীতশ্রদ্ধ।

সাম্প্রদায়িক সংকট থেকে উত্তরণের অন্যতম উপায় হলো, পারস্পরিক সংলাপ ও মত বিনিময়ের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা। প্রতিটি ধর্মের নৈতিক মূল্যই মানবজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে পারে। ছলনাহীন, অনুভূতিশীল ও আন্তরিক সংলাপের মাধ্যমেই ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্য বাস্তবায়ন হবে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় বর্তমান বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় গৃহীত পদ্ধতিগুলো বেশি পরিমাণে বিদ্রোহাত্মক ও সামরিক। এতে পৃথিবীতে শান্তির পরিবর্তে বয়ে চলেছে রক্ত বন্যা, একটি হৃদয়ও জয় করতে পারেনি। এতে যেটুকু শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা ব্যবহারিক ও সাময়িক। তাই বিশ্বশান্তির জন্য পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ না করে, সৃষ্টি করতে হবে এমন একটি পদ্ধতি যা মানব হৃদয়ে প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসা প্রবেশ করাতে সক্ষম। এ উপায়টি হলো পারস্পরিক সংলাপ ও সমঝোতা। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় পরিবার থেকে শুরু করে জাতিসংঘ পর্যন্ত শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়। কারণ সততা, আন্তরিকতা ও সহৃদয়তার অভাব। কারণ সহৃদপ্রাণ কখনও রক্ত ঝরাতে পারে না। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের ব্যক্তি চরিত্রের ন্যায় জাতীয় চরিত্রও ঘৃণা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা, অবিশ্বাস, ভণ্ডামী ও শত্রুতা ইত্যাদির জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে দৃঢ় পদক্ষেপে জন বিবেক জাগ্রত করতে হবে। ধর্ম ও শান্তি পরস্পরের পরিপূরক। যখন প্রত্যেকে উদার চিত্তে প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা করে, তখন শান্তি কোন অবস্থাতেই দূরে থাকতে পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মের অনুসারীগণ ধর্মীয় আদর্শ ও শান্তি অঙ্গীকারের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে। এ বিশ্বাস ঘাতকতা সংশোধনের এখন সময় এসেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পূর্বে অনুন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বিভিন্ন ধর্ম গণ্ডীবদ্ধ আচরণের ফলে পারস্পরিক সহযোগিতায় অক্ষম ছিল। কিন্তু এখন যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতির ফলে বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের একটি অংশ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছে, ধর্মানুসারীদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি না হলে অধার্মিক ও ধর্ম বিরোধী শক্তি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। এতে ধর্মান্ধ ব্যক্তি আরও সংকটের দিকে ঠেলে দিবে, পরিণামে ভবিষ্যৎ মানবসমাজের নৈতিক মেরুদণ্ড পঙ্গু করে ছাড়বে। তাই যে কোন মূল্যেই হোক আন্তঃধর্মীয় সংলাপের মাধ্যমে মানবসমাজের অবকাঠামোর নৈতিক দিকটাকে রক্ষা করতে হবে।

বিভক্ত ধর্মবিশ্বাসী

বিশ্বে ধর্ম বিশ্বাসী মানুষের সংখ্যা বেশী হলেও বিভক্ত ও নীরব। তাদের বিরোধ ও নীরবতা মানবকল্যাণের বিরুদ্ধে কাজ করছে। তাই আর.ডি. এ্যাবারনাথী বলেন, 'আমাদের মধ্যকার বিভেদ, ভীরুতা এবং নীরবতা জাতিবাদ, দারিদ্র্য এবং যুদ্ধের পথকে প্রশ্নাতীতভাবে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। আমাদের নীরবতার খেসারত দিচ্ছে লক্ষ লক্ষ মানুষ। যাদের বন্ধু হিসেবে আমাদের কথা বলা উচিৎ নয়।'[৩৪] এক সময় ধর্মানুসারীদের পরস্পরের প্রতি বিরোধিতাকেও ধর্মের অঙ্গ হিসেবে মনে করা হতো। এখন মানবসমাজের কল্যাণের জন্য সেই বিরোধিতার মনোভাব ছেড়ে সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে হবে। তাই নিক্যনিওয়ানো যথার্থই বলেন, 'চূড়ান্ত বিশ্লেষণে মানুষের সুখ ও শান্তির নিমিত্তে ধর্মের সকল শাখাকে অভিন্ন লক্ষ্যের মাধ্যমে একত্রিত হতে হবে।'[৩৫] বিশ্বশান্তির জন্য সংলাপ ও সমঝোতার কথা বেদ থেকে শুরু করে গ্রন্থসাহেব সব ধর্মগ্রন্থেই বলা হয়েছে। ঋগ্‌বেদ পরস্পর বিরোধিদের উদ্দেশ্যে নির্দেশ করে, 'সম্মিলিত হও, একত্রে বাক্যালাপে নিয়োজিত হও।...তোমাদের প্রার্থনা অভিন্ন হোক, এক হোক তোমাদের বাসনা ও উদ্দেশ্যে এবং অভিন্ন হোক তোমাদের সাফল্য। তোমাদের অভিন্ন প্রার্থনার কথা পুনরাবৃত্তি করছি এবং অভিন্ন নৈবেদ্যের প্রস্তাব করছি। তোমাদের অভিপ্রায় অভিন্ন হোক, অভিন্ন হোক তোমাদের হৃদয়, অভিন্ন হোক তোমাদের চিন্তা যার ফলে তোমাদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত হবে সর্বাঙ্গীন ঐক্য।'[৩৬] শ্রীমদ্‌ভগবত গীতা প্রকৃত ধার্মিক ভক্তের স্বরূপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন,

"অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিত মনোবুদ্ধির্যো মদভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

– অর্থাৎ যিনি সকল প্রাণীর প্রতি দ্বেষহীন, মিত্রভাবাপন্ন, দয়ালু, মমত্ববুদ্ধিশূন্য, নিরহংকার, সুখেদুঃখে সমভাবাপন্ন, ক্ষমাশীল, সর্বদা সন্তুষ্ট, সদা সমাহিত চিত্ত, সদা সংযতস্বভাব, সদা তত্ত্ব বিষয়ে দৃঢ় নিশ্চয় এবং মন ও বুদ্ধি আমাতে অর্পিত, তিনিই আমার প্রিয় ভক্ত।'[৩৭] হিন্দু ধর্মে শ্রীমৎভগবৎ গীতায় আরও উল্লেখ রয়েছে, 'যে প্রকারে আমার ভজনা করে আমি সেইভাবে তাকে অনুগৃহীত করি। সকলে সকল প্রকারে আমার পথের অনুসরণ করে।'[৩৮] সমকালীন পৃথিবীতে আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত জাপান। এদেশের মূলধর্ম শিন্তোইজমের উদার শিক্ষা, এতে বলা হয়েছে, 'All men are brothers; all receive the blessings of the same heaven.'[৩৯] শিন্তোইজম অখণ্ড ভ্রাতৃত্ববোধ প্রচার করে।

বর্তমান বিশ্বের ফিলিস্তিনে ইহুদীদের একটি অংশ সন্ত্রাস ও মুসলিম নিধনের সাথে জড়িত। সম্প্রতি প্রার্থনারত বহু মুসলিম হত্যা করে তাদের ধর্ম কলঙ্কিত করেছে। অথচ ইহুদী ধর্মে হযরত মুসা নবী ঈশ্বরের নিকট থেকে যে দশটি নির্দেশ পেয়েছেন, তার ছয় নম্বরটি হলো, 'কাউকে কোন অবস্থায় হত্যা করো না।'[৪০] চীন দেশে রয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচীন ধর্ম দর্শন গ্রন্থ তাও-তে-কিং (Tao-Te-King)। অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এ গ্রন্থে লাওযু (Lao Tsu) কয়েক বারই শান্তি ও সম্প্রীতির কথা বলেন, 'The goal of the way is peace.' 'To the good, I would be good, and to the bad I would be good; in that way all might become good.'[৪১]

খ্রীষ্ট ধর্ম মতে ঈশ্বরের পিতৃত্বই হলো বিশ্ব ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি। বাইবেলে বর্ণিত আছে, '...তোমরা তোমাদের শত্রুকে ভালবাস, যারা তোমাদের নির্যাতন করে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর। এভাবে তোমরা তোমাদের স্বর্গ নিবাসী পিতার প্রকৃত সন্তান হয়ে উঠবে। কারণ সৎ-অসৎ সকলের জন্য তিনি ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সূর্যের আলো, আর ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই উপর তিনি নামিয়ে আনেন তার বৃষ্টিধারা। যারা তোমাদের ভালবাসে, শুধু তাদেরই যদি ভালবাস, তবে তোমরা কি পুরষ্কারই বা আশা করতে পারো? কর গ্রাহকেরাও কি ঠিক তাই করে না? তেমনিভাবে তোমরা যদি শুধু নিজেদের ভাইদের সাথেই কুশল আলাপ কর, তবে কিইবা এমন করলে? বিধর্মীরা কি ঠিক তাই করে না? কাজেই

Dhaka University Institutional Repository

তোমাদের স্বর্গনিবাসী পিতা যেমন সম্পূর্ণ পবিত্র, তেমনি তোমাদের হতে হবে পবিত্র' (মথি ৫ঃ৪৩ঃ৪৮)। তোমাদেরকে আমি এই আদেশ দিচ্ছি, তোমরা পরস্পরকে ভালবাসবে' (যোহন ১৫ঃ১২)।'[৪২] যীশুখ্রীষ্ট প্রেম ও মানবকল্যাণ সাধনের শিক্ষা দেন।

ইসলাম বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের মধ্যে ঐক্য সমন্বয় সম্প্রীতি ও সম্মানের ভিত্তি স্থাপনে প্রয়াসী। ইসলাম ন্যায় পরায়ণতা ও বন্ধুত্বের হস্ত প্রসারিত করে। কোরআনে বলা হয়েছে, 'নিশ্চয়ই যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যারা ইহুদী ও ছাবেইন ও খ্রীষ্টান যে আল্লাহ ও পরকালের উপর বিশ্বাস স্থাপন ও সৎকর্ম করে বস্তুত পক্ষে তাদের কোন ভয় নাই এবং তারা দুঃখিত হবে না (৫ঃ৬৯)।'[৪৩] কোরআন বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের একটি মৌলিক নীতিতে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, 'তুমি বলো– হে গ্রন্থানুসারীগণ, আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে যে বাক্যে অভিন্নতা রয়েছে তার দিকে এসো– যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো উপাসনা না করি ও তাঁর কোন অংশীদার স্থির না করি এবং আল্লাহকে পরিত্যাগ করে আমরা পরস্পর কাউকে প্রভু রূপে গ্রহণ না করি...(৩ঃ৬৪)।'[৪৪] কোরআনের শিক্ষা হলো, আল্লাহ্ সব সময় সব দেশে সব যুগে সব জাতির জন্য প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছেন, বিশ্বের সমগ্র মানব জাতির কোন অংশই এই স্বর্গীয় নির্দেশনা থেকে বহির্ভূত নয়। Old Testament-এর অনেক প্রেরিত পুরুষের কথা কোরআনেও বলা হয়েছে। যীশুখ্রীষ্টসহ অন্যান্য প্রেরিত পুরুষগণ সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের নিকট ভক্তি ও শ্রদ্ধার পাত্র। 'তোমরা বল, আমরা আল্লাহ্র প্রতি এবং যা আমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং যা ইব্রাহিম, ইসমাইল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাদের বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছিল এবং অন্যান্য নবীগণকে তাদের প্রতিপালক থেকে যা প্রদত্ত হয়েছিল সে সব কিছুর উপর বিশ্বাস স্থাপন করছি, তাদের মধ্যে কাউকেই আমরা প্রভেদ করি না...(২:১৩৬)।'[৪৫] মুসলমানগণ অবশ্যই ভারত, চীন, পারস্য, আফ্রিকা, ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্বের যে কোন দেশে জন্ম প্রাপ্ত সকল প্রেরিত পুরুষকে বিশ্বাস করে। কেউ প্রেরিত পুরুষ হন বা না-ই হন অন্য ধর্মের মহাপুরুষদের সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করা, বিভেদ সৃষ্টি করা মুসলমানদের কাম্য নয়। ঐক্যবদ্ধ মানব সমাজ গঠনের জন্য কোরআনের দৃঢ় ঘোষণা হলো, 'তোমরা একযোগে আল্লাহ্র রজ্জু সুদৃঢ়রূপে ধরে রাখো এবং তোমরা বিভক্ত হয়ো না (৩ঃ১০৩)।'[৪৬] কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা সম্পর্কে কোরআনের হুশিয়ারী বাণী হলো, 'যে একজন মানুষকে হত্যা করেছে, সে যেন গোটা মানব জাতিকেই হত্যা করেছে, যে একজন মানুষকে রক্ষা করেছে সে যেন গোটা মানবজাতিকেই রক্ষা করেছে (৫ঃ৩৫)।'[৪৭] ইসলাম মানুষের প্রতিটি চিন্তা কথা ও কাজে সৎ এবং পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেয়।

শিখ ধর্ম একটি সমন্বয়ী ধর্ম। এ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক হিন্দু পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও অতি অল্প বয়সে সমস্ত কোরআন শরীফ মুখস্থ করেন। তিনি ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয়ে শিখ ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী মানুষের প্রার্থনার মর্মার্থের ক্ষেত্রে প্রকৃতপক্ষে কোন পার্থক্য নেই, প্রার্থনার বাক্যগুলো বিভিন্ন ভাষায় হলেও একই অর্থ প্রকাশ করে। তাই শিখদের দশম ও সর্বশেষ গুরু গোবিন্দ সিং বলেন, 'গীর্জা আর মসজিদ দুই-ই সমান; হিন্দুদের পূজা-অর্চনা আর মুসলমানদের নামাজ-রোজা উভয়ই অভিন্ন; সকল মানুষই এক, বিচারের বিভ্রান্তির জন্য এদেরকে ভিন্ন বলে মনে হয়। সকল মানুষের একই রকম চোখ, একই রকম কান, একই রকম দেহ, একই রকম আকার-ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুৎ-এর সংযোগ। কোন মানুষকে যেন ভাবতে দেয়া না হয় যে; মানুষের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে।'[৪৮] শিখ ধর্ম সম্প্রীতি ও অখণ্ড মানবতাবাদ প্রচার করে।

বহু ধর্মের এক পরম স্বরূপ সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "মানুষ চতুঃসীমার মধ্যে তাদের নিজ নিজ জমি পৃথকভাবে চিহ্নিত করে। কিন্তু মাথার উপরে পৃথিবীকে আলিঙ্গন করে থাকা বিস্তীর্ণ আকাশকে কেউ চতুঃসীমার দ্বারা পৃথক করতে পারে না। আদৃশ্য আকাশ সর্বত্র বিস্তৃত এবং সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করে রাখে। সুতরাং সাধারণ মানুষ বলে উঠে, 'আমার ধর্মই একমাত্র ধর্ম এবং আমার ধর্মই সর্বোৎকৃষ্ট।' কিন্তু যখন তার হৃদয় সত্যিকার জ্ঞান দ্বারা আলোকিত হয় তখন সে অনুধাবন করতে পারে যে, ধর্মীয় উপদল এবং সম্প্রদায়ের ভিতরকার দ্বন্দ্ব কলহের ঊর্ধ্বে রয়েছেন এক অবিভক্ত, সর্বজ্ঞ ও অবিনশ্বর পরমসত্তা।"[৪৯] স্বামী বিবেকানন্দ বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন, তাই তিনি শিকাগো ধর্ম মহাসভায় উপস্থিত বৌদ্ধদের উদ্দেশ্যে বলেন, 'হে বৌদ্ধগণ, বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া হিন্দু ধর্ম বাঁচতে পারে না, হিন্দুধর্ম ছেড়ে বৌদ্ধধর্মও বাঁচতে পারে না। অতএব, এটা উপলব্ধি করেন যে, আমাদের বর্তমান এ বিযুক্ত বিচ্ছিন্ন ভাব হতে ব্রাহ্মণের ধীশক্তি ও দর্শনশাস্ত্রের সাহায্য না নিয়ে বৌদ্ধরা দাঁড়াতে পারে না এবং ব্রাহ্মণও বৌদ্ধদের হৃদয় না পেলে দাঁড়াতে পারে না, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের এ বিচ্ছেদই ভারতের অবনতির কারণ।'[৫০] বিভিন্ন ধর্মের সমন্বয়ী শিক্ষা ও আদর্শ মানুষকে পূর্ণ করে তোলে।

Dhaka University Institutional Repository

অন্তঃধর্মীয় সংলাপের উদ্দেশ্য হচ্ছে– একাত্মতা নয় বরং ঐক্য ও উপলব্ধি, কর্তৃত্ব বা প্রভুত্ব নয় বরং উন্নয়ন। সংলাপের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রতিটি ব্যক্তি হৃদয়ে অন্য সকলের জন্য কিছু জায়গা সৃষ্টি করা এবং সহানুভূতির উন্মেষ ঘটানো। সারা বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের খ্যাতনামা ধর্মতত্ত্ববিদগণ তাদের লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্মান্ধতা, গোঁড়ামী, ভণ্ডামী ইত্যাদি দূর করার চেষ্টায় নিয়োজিত। এদের মধ্যে রয়েছেন বাংলাদেশের ডঃ মহানাম ব্রত ব্রহ্মচারী, স্বামী অক্ষরানন্দ, সিস্টার ইউজিনিয়া, অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, ভারতের ডঃ রাইমুণ্ড পানিকর, ডঃ এন. এস. এস. বমন, ইংল্যান্ডের ডঃ কিনেথ ক্রাগ, ডঃ ফ্রান্সিস ক্লার্ক, জাপানের নাকোমেরা হাজিমি, জার্মানীর ডঃ সি ডব্লিউ টল, ইটালির ডঃ ফ্রান্সিস হান্নিমি, আমেরিকার ডঃ মোঃ আয়ুব-এর নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। আন্তঃধর্মীয় সংলাপের কিছু গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত রয়েছে। নিজ ধর্ম বা অন্য ধর্ম সম্পর্কে কোন হঠকারী মন্তব্য করা অনুচিত। বিভিন্ন ধর্মের ভিতরে যে মিল ও গরমিল আছে তা গুরুত্ব সহকারে মেনে নিতে হবে। শুধু মিলগুলির উপর জোর দিলে প্রতিটি ধর্মের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিঘ্নিত হবে। পানিকরের সাথে একমত হয়ে বলা যায়, '...বিভিন্ন ধর্মানুসারীদের সংলাপের উদ্দেশ্য কোন ধর্মকে জয় করা নয়, কাউকে হেয় প্রতিপন্ন করা নয়, বা সামগ্রিক চুক্তি সম্পাদন বা সর্বজনীন ধর্ম প্রতিষ্ঠাও নয়; বরং বিশ্বের বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যকার পারস্পরিক অজ্ঞানতা ও ভ্রান্ত ধারণার ফলে সৃষ্ট বিশাল শূন্যতার ক্ষেত্রে একটা সেতু নির্মাণ করে বিভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করার ব্যবস্থা করা।'[৫১] প্রকৃতপক্ষে আন্তঃধর্মীয় সংলাপের প্রধান উদ্দেশ্য হলো প্রত্যেককে তার নিজের কথা বলতে দেয়া এবং নিজস্ব উক্তির মাধ্যমে স্ব স্ব অন্তর্দৃষ্টি বা মর্মকথা প্রবেশ করতে দেয়া। আমরা বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় স্বামী বিবেকানন্দের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি, স্বামী বিবেকানন্দের ন্যায় জগদ্‌বাসীকে নতুন করে আবার আহ্বান জানাই, 'বিবাদ নয় সহায়তা; বিনাশ নয় পরস্পরের ভাব গ্রহণ; মত বিরোধ নয় সমন্বয় ও শান্তি'।

একটি সর্বজনীন ধর্ম

ধর্ম এক প্রকার বিজ্ঞান। তাই বিবেকানন্দ তাঁর *"রাজযোগ"* গ্রন্থকে 'ধর্ম বিজ্ঞান' নামে অভিহিত করেন। বিভিন্ন বিজ্ঞান নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে অপার অসীম এই বৈচিত্র্যময় বিশাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ব্যাখ্যা করে, তেমনি ধর্ম ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগৎ ও জীবনের উৎপত্তি, প্রকৃতি, পরিণতি, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মানুষের অবস্থান, জীবনের লক্ষ্য অর্জনের উপায়, আত্মার মুক্তি ও ঈশ্বরদর্শন প্রভৃতি বিষয়ে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে। পরিবর্তনশীল জগতে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এই ব্যাখ্যা ভিন্ন হতে পারে। এ কারণেই একটি ধর্ম, অপরাপর ধর্ম থেকে পৃথক। কিন্তু যাঁরা সত্য দর্শন করেন তাঁরা উপলব্ধি করেন এক ঈশ্বর, এক জগৎ এবং একই মানবজাতি– প্রত্যেকে সেবা ও সাধনার মাধ্যমে একই ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায়। দৃষ্টিহীন মানুষ যেমন হাতির কোন বিশেষ অঙ্গ স্পর্শ করে জানতে পারে কিন্তু সম্পূর্ণ হাতিটিকে দেখতে পায় না, তেমনি খণ্ড জ্ঞানের অধিকারী ব্যক্তিও এই বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের বা ধর্ম রাজ্যের খণ্ডিত জ্ঞান লাভ করে, ফলে তারা প্রকৃত সত্য উপলব্ধি করতে পারে না। আবার যেমন দিব্য দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড বা ধর্ম রাজ্যের জ্ঞান সম্পূর্ণ উপলব্ধি করতে পারেন। ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষগণের মতে- এক ঈশ্বর, এক জগৎ, একই মানব প্রকৃতি। প্রতিটি ধর্মের সাধারণ নিয়মগুলো নিয়ে যদি একটি সর্বজনীন ধর্ম সৃষ্টি হতো, তাহলে সমাজের বিভেদ বৈষম্য সাম্প্রদায়িকতা ও যুদ্ধ বন্ধ হয়ে অনেকটা মানবকল্যাণ সাধনের পথ সুগম হত। তাই বিবেকানন্দ বলেন, 'যদি এক সর্বজনীন ধর্মের উদয় হত'।

মহামতি বিবেকানন্দ মানবকল্যাণের জন্য একটি সর্বজনীন ধর্মের কথা চিন্তা করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, '...কিন্তু যদি কখনও একটি সর্বজনীন ধর্মের উদ্ভব হয়, তবে তাহা কখনও কোন দেশে বা কালে সীমাবদ্ধ হইবে না; যে অসীম ভগবানের বিষয় ঐ ধর্মে প্রচারিত হইবে, ঐ ধর্মকে তাহারই মতো অসীম হইতে হইবে; সেই ধর্মের সূর্য কৃষ্ণভক্ত খ্রীষ্টভক্ত, সাধু, অসাধু- সকলের উপর সমভাবে স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিবে; সেই ধর্ম শুধু ব্রাহ্মণ্য বা বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান বা মুসলমান হইবে না, পরন্তু সকল ধর্মের সমষ্টিস্বরূপ হইবে, অথচ তাহাতে উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকিবে; স্বীয় উদারতাবশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হস্তে পৃথিবীর সকল নরনারীকে সাদরে আলিঙ্গন করিবে, পশুতুল্য অতি হীন বর্বর মানুষ হইতে শুরু করিয়া হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশির জন্য যাঁহারা সমগ্র মানবজাতির ঊর্ধ্বে স্থান পাইয়াছেন, সমাজ যাঁহাদিগকে সাধারণ মানুষ বলিতে সাহস না করিয়া সশ্রদ্ধ সভয় দৃষ্টিতে দেখেন– সেই-সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দিবে। সেই ধর্মের নীতিতে কাহারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকিবে না; উহাতে প্রত্যেক নর-নারীর দেবস্বভাব স্বীকৃত হইবে এবং উহার সমগ্র শক্তি মনুষ্যজাতিকে দেব-স্বভাব উপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকিবে।'[৫২] বিবেকানন্দের নির্দেশিত সর্বজনীন ধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ:

১. দেশ বা কালে সীমাবদ্ধ হবে না।

Dhaka University Institutional Repository

২. অসীম ভগবানের মত অসীম ধর্ম হবে।
৩. বিশ্বধর্মের সূর্য কিরণ জাল বিস্তার করবে-কৃষ্ণভক্ত, খ্রীষ্টভক্ত, সাধু অসাধু সকলের উপর।
৪. বিশ্বধর্ম-ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ও মুসলমান- সকল ধর্মের সমষ্টি স্বরূপ হবে।
৫. বিশ্ব ধর্মানুসারীদের উন্নতির সীমাহীন অবকাশ থাকবে।
৬. স্বীয় উদারতা বশতঃ সেই ধর্ম অসংখ্য প্রসারিত হাতে পৃথিবীর সকল নর-নারীকে সাদরে আলিঙ্গন করবে।
৭. পশুতুল্য অতিহীন বর্বর মানুষ হতে শুরু করে হৃদয় ও মস্তিষ্কের গুণরাশির জন্য যারা সমগ্র মানব জাতির ঊর্ধ্বে স্থান পেয়েছেন, সমাজ যাঁদের সাধারণ মানুষ বলতে সাহস না করে সশ্রদ্ধ সভয় দৃষ্টিতে দেখেন- সে সকল শ্রেষ্ঠ মানব পর্যন্ত সকলকেই স্বীয় অঙ্কে স্থান দিবে।
৮. সে ধর্মের নীতিতে কারও প্রতি বিদ্বেষ বা উৎপীড়নের স্থান থাকবে না।
৯. এতে প্রত্যেক নর-নারীর দেব স্বভাব স্বীকৃত হবে।
১০. সে ধর্মের সমগ্র শক্তি মানব জাতিকে দেব স্বভাব উপলব্ধি করতে সহায়তা করার জন্যই সতত নিযুক্ত থাকবে।

আন্তঃধর্মীয় ভাবনা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'এইরূপ ধর্ম উপস্থাপিত কর, সকল জাতিই তোমার অনুবর্তী হইবে। অশোকের ধর্মসভা কেবল বৌদ্ধধর্মের জন্য হইয়াছিল। আকবরের ধর্মসভা ঐ উদ্দেশ্যের নিকটবর্তী হইলেও উহা বৈঠকী আলোচনা মাত্র। প্রত্যেক ধর্মের ঈশ্বর আছেন- সমগ্র জগতে এ-কথা ঘোষণা করিবার ভার আমেরিকার জন্যই সংরক্ষিত ছিল।'[৫৩] সাধনায় আত্মবিকাশে মানুষের ঈশ্বরদর্শন লাভ হলে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠে। আর এই বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধই মানবকল্যাণ সাধনের প্রেরণা দেয়। প্রকৃত ধর্মগুলো নিয়ে নেই কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত, মতবিরোধ ও যুদ্ধ। কারণ বিবেকানন্দ বলেন, প্রত্যেকটি ধর্ম প্রেম, পবিত্রতা ও সাধনার– একই মৌলিক নীতির কথা বলে। 'Religion is the consummation of all virtues! Purity, chastity, compassion, devotion, sincerity, loyalty, kindness, truthfulness, guilelessness, selflessness, innocence, benevolence, uprightness, righteousness, piety, humility, awareness, steadfastness, faith, strength, dispassion, sense of proportion, perseverance, common sense, love, self-control- all these form part and parcel of religion. Now, we should patiently feel at heart the import and impact of these words on our minds.'[৫৪] প্রকৃত ধার্মিক অপর ব্যক্তিকে প্রেম, আন্তরিকতা ও সেবা দিয়ে কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করতে সচেষ্ট থাকে।

বিবেকানন্দ প্রবর্তিত রামকৃষ্ণ মিশন কোন একটি ধর্ম সম্প্রদায় নয়, এ মিশন হলো একটি সংঘবদ্ধ আন্দোলনের প্রচেষ্টা, যে আন্দোলন সারা বিশ্বের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মনৈতিক প্রভৃতি উন্নতির প্রেরণা। বিবেকানন্দ এক সমন্বিত শিক্ষার মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে বলেন– 'আমরা মানব জাতিকে সেখানে নিয়ে যেতে চাই, যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই, অথচ সে কাজ করতে হবে বেদ বাইবেল কোরানকে সমন্বিত করেই।'[৫৫] আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, খ্রীষ্টানকে হিন্দু বা বৌদ্ধ হতে হবে না, অথবা হিন্দু ও বৌদ্ধকে খ্রীষ্টান হতে হবে না, কিন্তু প্রত্যেক ধর্মই অন্যান্য ধর্মের সার ভাগগুলো গ্রহণ করে পুষ্টিলাভ করবে এবং নিজের বিশেষত্ব বজায় রেখে নিজের প্রকৃতি অনুসারে বেড়ে উঠবে। বিবেকানন্দের এই নতুন মতবাদ বা বিবেকানন্দবাদ আজ পৃথিবীর অনেক দেশেই গ্রাহ্য হয়েছে। এমনকি নিরীশ্বরবাদীদের দেশেও তাঁর মতবাদ গৃহীত হয়েছে। 'সেই শ্রীরামকৃষ্ণ-কথিত সপ্তর্ষি মণ্ডলের ঋষি 'নরেন'।'[৫৬] তিনি মহাকাশের উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় তাঁর সর্বজনীন মানবতাবাদী দর্শনের জ্ঞানালোকে সারা বিশ্ব উজ্জ্বল করেছেন।

তথ্যনির্দেশ

১। স্বামী বিবেকানন্দ, "বিবেকানন্দ বাণী– বিমূর্ত শব্দব্রহ্ম", স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *আমাদের কথা*, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ৯ মার্চ ২০০৮, পৃ. ১৬৯।
২। Swami Prabhananda, *SWAMIJI'S RETURN TO INDIA*, The Ramkrishna Mission Institute of Culture, Golpark, Kolkata, Fifth print, August 2003, p. 1.
৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, সপ্তম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ- শ্রাবণ ১৪১৪, পৃ. ২২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৪। MARIE LOUSIE BURKE, *SWAMI VIVEKANANDA IN THE WEST*, NEW DISCOVERIES, THE WORLD TEACHER, Part two, ADVAITA ASHRAMA, 5 DEHI ENTALLY ROAD, CALCUTTA, 1987, Page- 565.
৫। Swami Vivekananda, *THE COMPLETE WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA*, Mayavati Memorial, Edition Volume II, ADVAITA ASHRAMA, 5 DEHI ENTALLY ROAD, CALCUTTA, Thirteenth Edition, June 1976, Page- 2.
৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, উনবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ১৩।
৭। ঐ, পৃ. ৭।
৮। ঐ, পৃ. ১২।
৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *নারী জাগরণের পথ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৩, পৃ. ৪৩-৪৪।
১০। *VIVEKANANDA HIS CALL TO THE NATION*, Advaita Ashrama (ed), 5 Dehi Entally Road, Kolkata, 40th Impression, February 2009, page- 7.
১১। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, পঞ্চম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৪, পৃ. ১৩১-৩২।
১২। ঐ, পৃ. ৮৭।
১৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ, পৃ. ৩৯।
১৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, পঞ্চম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৪১।
১৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৪, পৃ. ২৬৮।
১৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *শক্তিদায়ী ভাবনা*, ঐ, পৃ. ১৭।
১৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩২৪।
১৮। Swami Vivekananda, *Bold Message for World Peace*, Sri Ramakrishna Math, Mylapore, Chennai, 2006, Page- 18.
১৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৪, পৃ. ২৪২-৪৩।
২০। ঐ, পৃ. ২৪৪।
২১। স্বামী পরদেবানন্দ সম্পাদিত, *অর্ঘ্য*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট- বাংলাদেশ। প্রকাশকালঃ ৫ নভেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৩৯।
২২। ঐ, পৃ. ৪০।
২৩। ঐ, পৃ. ৪০।
২৪। ঐ, পৃ. ৪০।
২৫। ঐ, পৃ. ৪১।
২৬। ঐ, পৃ. ৪৩।
২৭। ড. কাজী নূরুল ইসলাম, "আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি", স্বামী অক্ষরানন্দ সম্পাদিত, *উদ্দীপন*, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা, প্রকাশকালঃ ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৩।
২৮। ঐ, পৃ. ২৫৩।
২৯। ঐ, পৃ. ২৪১।
৩০। ঐ, পৃ. ২৪১।
৩১। ঐ, পৃ. ২৪২।
৩২। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধর্ম সমীক্ষা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, মাঘ ১৪০৯, পৃ. ৪৫-৪৬।
৩৩। ড. কাজী নূরুল ইসলাম, "আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতি", ঐ, পৃ. ২৪৩-৪৪।
৩৪। ঐ, পৃ. ২৪৫। Ralph David Abernathy Appeal to the Religions People of the world and to all Men of Good will, 'Religion for peace (proceedings of the Kyoto conference of Religions and peace. Homer A. Jack (ed). Gandhi peace Foundation, New Delhi, 1973, p. 124.
৩৫। ঐ, পৃ. ২৪৫।
৩৬। ঐ, পৃ. ২৪৬। *ঋগবেদ*- ১০, ১৮৭, ২-৪।
৩৭। ঐ, পৃ. ২৪৬।
৩৮। ঐ, পৃ. ২৪৬। *শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা*- ১২ ঃ ১৩ - ১৪
৩৯। ঐ, পৃ. ২৪৭।
৪০। ঐ, পৃ. ২৪৭।

Dhaka University Institutional Repository

৪১। ঐ, পৃ. ২৪৭।
৪২। ঐ, পৃ. ২৪৮।
৪৩। ঐ, পৃ. ২৪৮।
৪৪। ঐ, পৃ. ২৪৮।
৪৫। ঐ, পৃ. ২৪৯।
৪৬। ঐ, পৃ. ২৪৯।
৪৭। ঐ, পৃ. ২৪৯।
৪৮। ঐ, পৃ. ২৫০।
৪৯। ঐ, পৃ. ২৫০।
৫০। ঐ, পৃ. ২৫১।
৫১। ঐ, পৃ. ২৫২।
৫২। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা, ত্রয়োবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, পৃ. ২২।
৫৩। ঐ, পৃ. ২২।
৫৪। Swami Vivekananda, *Bold Message For World Peace*, op.cit, Page- 3.
৫৫। বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে ভবিষ্যৎ ভারত, স্বামী অসক্তানন্দ সম্পাদিত, *আমাদের কথা*, ঐ, পৃ. ১৪৩।
৫৬। ঐ, পৃ. ১৪১।

Dhaka University Institutional Repository

নবম অধ্যায়

ঈশ্বরদর্শন

সর্ব ধর্মের বহু মত ও পথের মাঝে ঈশ্বরদর্শনের প্রকৃত ধর্ম আজ দিশেহারা। আমাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য সঠিক পথের অনুসন্ধান আজ খুবই জরুরী। অন্তহীন জগতের কোথা থেকে আমরা এসেছি? আবার কোথায় যাবো? কিভাবে যাবো? এ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে মানুষের অবস্থান কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধান করতে গিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হচ্ছে। ক্রমেই অশান্ত হয়ে উঠছে পৃথিবী। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গে যেমন নৌকার পাল ঠিক রাখা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়, তেমনি আজ পৃথিবীতেও সত্য ও কল্যাণের হাল ধরে রাখা মানুষের পক্ষে কঠিন।

প্রাচীন কাল থেকেই চিন্তাশীল মানুষ এই বিশ্ব জগতের স্রষ্টা মহান ঈশ্বরকে খুঁজে ফিরছেন। কি তাঁর পরিচয়? তিনি কিভাবে ও কি উদ্দেশ্যে এই বিশ্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন? সহস্র বাঁধা-বিঘ্ন সত্ত্বেও অশান্ত মানব মন ধর্ম-দর্শন, বিজ্ঞান মানুষ ও প্রকৃতির মাঝে অনুসন্ধান করছেন ঈশ্বরকে। মানুষ কখনও জ্ঞান তৃষ্ণা ও কৌতুহল বশতঃ আবার কখনও প্রতিকূল পরিবেশে হতাশা, ব্যর্থতা, ও দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তির জন্য ঈশ্বরদর্শন লাভের চেষ্টা করে। তাই তো দার্শনিক কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যাকুল প্রাণে প্রভুকে অন্বেষণ করেছেন। তাঁর সঙ্গীতে প্রভুর জন্য ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। "আমি যুগ যুগ ধরে প্রভুরে খুঁজিয়া বেড়াই রে"। কোথায় সেই প্রভু? আর কিভাবে তাঁর দর্শন পাওয়া যায়? প্রভু দর্শনের উদ্দেশ্য কি ? ঈশ্বর এক বড় শিশুর মত স্বাধীনভাবে সৃষ্টি-ধ্বংস উত্থান-পতনের খেলা করছেন। এ প্রসঙ্গে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'প্রভু এ বিশ্বালয়ে খেলিছ খেলা বিরাট শিশু আনমনে'। আমরা প্রভুর নিকট থেকে এসেছি, আবার তাঁর নিকট ফিরে যাব। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "আমরা ইচ্ছা করি বা না করি, আমাদিগকে আমাদের সেই আদিতে- পরমসত্ত্বা ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। আমরা ঈশ্বর হইতে আসিয়াছি, আমাদিগকে পুনরায় ঈশ্বরে ফিরিয়া যাইতে হইবে। তাঁহাকে যে নামেই ডাক না কেন- তাঁহাকে 'গড' বা 'ঈশ্বর' বল, নির্বিশেষ বা পরম সত্ত্বা বল, আর প্রকৃতিই বল, উহা সেই একই বস্তু। যাঁহা হইতে এই বিশ্বজগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহাতে সমুদয় প্রাণী অবস্থান করিতেছে ও যাঁহাতে আবার সব কিছু ফিরিয়া যাইবে।"[১]

বহুরূপী এক ঈশ্বরের অপারলীলা। তিনি সাকার আবার নিরাকার। এ প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'সাকার নিরাকার আরো কত কি। এখানকার অনুভূতি বেদ বেদান্ত ছাড়িয়ে গেছে।'[২] তিনি বহুরূপী, তাঁর রূপের অন্ত নেই। ঈশ্বরের স্বরূপ কি? 'যাঁহা দ্বারা জন্ম, স্থিতি ও লয় হইতেছে' তিনি ঈশ্বর-অনন্ত, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত, সর্বশক্তিমান, সর্বজ্ঞ, পরম কারুণিক, গুরুর গুরু। আর সকলের উপর তিনি অনির্বচনীয় প্রেমস্বরূপ?'[৩] তিনি একাধারে স্বগুণ ও নির্গুণ। নির্গুণ স্বরূপ অতি সূক্ষ্ম। তাই তিনি প্রেম ও উপাসনার পাত্র হতে পারেন না। এ কারণেই ভক্তগণ ব্রহ্মের সগুণ ভাবকেই উপাস্য রূপে নির্বাচন করেন। পরমেশ্বর জগৎ নিয়ন্ত্রণের কর্তা। বেদের ঘোষণা ঃ "বৎস, আদিতে একমেবা দ্বিতীয়ম্ ছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন আমি বহু সৃষ্টি করিব। তিনি তেজ সৃজন করিলেন। কেবল ব্রহ্মই আদিতে ছিলেন। তিনি পরিণত হইলেন। তিনি ক্ষত্র নামে এক সুন্দর রূপ সৃজন করিলেন। বরুণ, সোম, রুদ্র, পুর্জন্য, যম , মৃত্যু, ঈশান এই-সকল দেবতাই ক্ষত্র। 'আদিতে আত্মাই ছিলেন। ক্রিয়াশীল আর কিছুই ছিলেন না। তিনি আলোচনা করিলেন, আমি জগৎ সৃষ্টি করিব–পরে তিনি এই জগৎ সৃজন করিলেন।'[৪] একটি উপমা দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যাখ্যা করা হলো ঃ ব্রহ্ম হলো মাটি বা এমন প্রকার উপাদান যা দিয়ে বিভিন্ন আকৃতির অনেক বস্তু তৈরী করা হয়েছে। বস্তুগুলির প্রকৃত উপাদান এক-মাটি। কিন্তু বিভিন্ন আকৃতি বস্তুগুলিকে পৃথক করেছে। বস্তুগুলি সৃষ্টির আগে মাটি অব্যক্ত ভাবে ছিল। বস্তুগুলির রূপ যতদিন ভিন্ন থাকে তত দিন সেগুলি পৃথক থাকে। কারণ মাটির ইঁদুর কখনও মাটির হাতি হতে পারে না। কারণ আকার ধারণ করলেই বিশেষ বস্তুর পরিচয় বহন করে। বিশেষ আকৃতিহীন অবস্থায় মাটি হিসেবে বস্তুগুলি একই। এভাবেই নিরাকার একেশ্বর– সাকার ও বহুরূপী। ব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে বেদ ঘোষণা করে- কতকগুলি ক্ষমাহীন ভয়াবহ নিয়মাবলীর সমাবেশ আমাদের নিয়ন্তা নয়। কার্যকারণের কারা বন্ধন আমাদের নিয়ন্তা নয়। এসব নিয়মের ঊর্ধ্বে প্রতিটি পরমাণু ও শক্তির মধ্যে অনুস্যূত রয়েছেন এক বিরাট পুরুষ। 'যাঁহার আদেশে বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে, মেঘ বারি বর্ষণ করিতেছে এবং মৃত্যু জগত পরিভ্রমণ করিতেছে।'[৫] ব্রহ্ম হলেন শুদ্ধ নিরাকার সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান। তাঁর করুণা সকলের উপর।

Dhaka University Institutional Repository

আত্মা

আত্মা এক প্রকার অদৃশ্য শক্তি, যার উপস্থিতিতে জীব দেহে বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়া ও বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। আত্মাই ঈশ্বর। এক বিশ্বাত্মা সর্বজীবে সর্বভূতে এবং সর্বস্থানে বিরাজমান। আদিতে এক ঈশ্বর ছিলেন, তখন আর কিছুই ছিল না। তিনি ইচ্ছা করিলেন, আমি বহু সৃষ্টি করবো। বেদের ঘোষণা, 'বৎস, আদিতে একমেবা দ্বিতীয়ম্ ছিলেন। তিনি আলোচনা করিলেন আমি বহু সৃষ্টি করিব। তিনি তেজ সৃজন করিলেন। কেবল ব্রহ্মাই আদিতে ছিলেন। তিনি পরিণত হইলেন। তিনি ক্ষত্র নামে এক সুন্দর রূপ সৃজন করিলেন। বরুণ, সোম, রুদ্র, পুর্জন্য, যম, মৃত্যু, ইশান এই-সকল দেবতাই ক্ষত্র।'[৬] এভাবে ঈশ্বর বহু আত্মা সৃষ্টি করেন। এক ঈশ্বর বহুরূপ ধারণ করেন, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেন। বিবেকানন্দ এক ঈশ্বরের বহু আত্মা সৃষ্টি সম্পর্কে বলেন, "সূর্য এক কিন্তু এর প্রতিবিম্ব সূর্য বহু। মানবাত্মার প্রকৃত স্বরূপ এক কিন্তু নানা দেহে প্রতিবিম্ব আত্মা বহু। প্রতিটি আত্মা ঈশ্বরের অংশ। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ প্রমাণ উপস্থাপন করেন, "কারণই কার্যরূপে পরিণত হইয়াছে। যেখানে কার্য দেখিতে পাওয়া যায়, সেখানেই বিশ্লেষণ করিলে কারণ পাওয়া যায়; কারণই নিজেকে কার্যরূপে প্রকাশ করে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর যদি এই বিশ্বের কারণ হন, এবং এই বিশ্ব যদি কার্য হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরই এই বিশ্বরূপে পরিণত হইয়াছেন। আত্মাসমূহ যদি কার্য হয় এবং ঈশ্বর যদি কারণ হন, তাহা হইলে ঈশ্বরই আত্মা-রূপে প্রকাশিত হইয়াছেন। সুতরাং প্রতি আত্মাই ঈশ্বরের অংশ। 'একই অগ্নি হইতে যেমন অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, ঠিক তেমনই সেই শাশ্বত 'এক' হইতেই বিশ্বের সকল আত্মা বাহির হইয়াছে।"[৭] স্বাধীন আত্মাই প্রকৃত মানুষ। এ সম্পর্ক বিবেকানন্দ বলেন, মানুষ মন নয়, আত্মা। এই আত্মা সর্বদা মুক্ত সীমাহীন ও চিরন্তন।

জীবাত্মা ও পরমাত্মা

মাঝি ছাড়া যেমন নৌকা চলতে পারে না। তেমনি আত্মা ছাড়া দেহ চলতে পারে না। আত্মার উপস্থিতিতে মানুষ বা জীব সব কাজ করে। একটি আত্মার দুটি দিক রয়েছে-জীবাত্মা ও পরমাত্মা। 'হিন্দু ধর্মে ব্যক্তি আত্মাকে বলা হয় জীবাত্মা আর ঈশ্বরকে বলা হয় পরমাত্মা। ঋগ্বেদ (২.৩.১৭) এবং মুন্ডক উপনিষদ (৩.১.১) ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে (৪.৬.) দুটি পাখি রূপকের মাধ্যমে জীবাত্মা ও পরমাত্মার স্বরূপ বুঝানো হয়েছে। এ পাখি দুটি সদা সম্মিলিত এবং পরস্পরের সহচর। তাদের মধ্যে একটি বৃক্ষের ফল ভোগ করছে আর অন্যটি ভোগ না করে কেবল সাক্ষিরূপে দর্শন করে। দুটি পাখির প্রথমটি হলো জীবাত্মা আর দ্বিতীয়টি হলো পরমাত্মা। এখানে জীব দেহকে একটি বৃক্ষের সাথে তুলনা করা হয়েছে।'[৮] জীবাত্মার প্রকাশ ঘটে জৈবিক বৈশিষ্ট্যের মধ্য দিয়ে। যেমন খাওয়া-দাওয়া, চলা-ফেরা, বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি জীবাত্মার ক্রিয়া। জীবাত্মার জন্যই মানুষ অন্যান্য জীবের মত আচরণ করে। পরমাত্মা স্বয়ং ব্রহ্ম। তিনি মানুষের মাঝেই রয়েছেন। পরমাত্মা দেহে নিরপেক্ষ থাকে এবং জীবাত্মা সব কাজ করে। বৃক্ষ যেমন ক্ষণস্থায়ী মানব দেহও তেমনি ক্ষণস্থায়ী। বৃক্ষে যেমন পাখি বাস করে তেমনি মানব দেহরূপ বৃক্ষে জীবাত্মা ও পরমাত্মা রূপী দুটি পাখি বাস করে। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সব সময় এক সঙ্গে যুক্ত। যেমন একটি মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। ঈশ্বর ছাড়া জীব একা স্বাধীনভাবে চলতে পারে না। অপর দিকে ঈশ্বরও সব সময় জীবের সাথে সংযুক্ত থাকে। জীব ও ঈশ্বর পরস্পর সখ্য বন্ধনে আবদ্ধ। 'আত্মা এক অবিনাশী সত্তা দিব্য জ্যোতি বিন্দু স্বরূপ। অবিনাশী আত্মা মানব দেহের ভ্রূ-যুগলের মধ্যে অবস্থান করে। রাত্রির আকাশে তারাকে যেমন ঝিকমিক করা বিন্দুর মত দেখায়, ঠিক তেমনি দিব্য দৃষ্টির দ্বারা আত্মাকেও একটি তারার মত দেখায়।'[৯] আত্মার কোন লিঙ্গভেদ নেই। আত্মা প্রকৃতি রূপের শরীরে স্ত্রী পুরুষ রূপে অভিনয় করে। আত্মা দেহ ছাড়া কর্ম করতে পারে না। আত্মা কর্মানুসারে, পাপ-পূণ্যের ফল অনুসারে বার বার পুরাতন দেহ ত্যাগ করে নতুন দেহ ধারণ করে। আত্মা সৎকর্মানুসারে সুস্থ সুন্দর দেহ পেতে পারে, আবার অসৎ কর্মের ফলে অন্ধ বোবা ও বিকলাঙ্গ দেহও গঠন করতে পারে। দেহ সৃষ্টি হয় আগুন, পানি, মাটি, বাতাস ও আকাশ এ পাঁচটি প্রাকৃতিক উপাদান দ্বারা। 'প্রত্যেক আত্মার নির্দিষ্ট শরীর মাতাদের গর্ভে নিশ্চিত হয়ে থাকে। গর্ভে দেহ তৈরীর পাঁচ মাস পরে গিয়ে আত্মা মায়ের গর্ভে প্রবেশ করে।'[১০] মাতৃগর্ভে সাধারণত নির্দিষ্ট সময়ে পূর্ণাঙ্গ দেহ তৈরী হলে শিশুর জন্ম হয়। রোগীর শরীর আত্মার জন্য কারা গৃহ আর নিরোগীর শরীর রাজমহল। 'আত্মার সম্বন্ধ মস্তিষ্কের সঙ্গে এবং মস্তিষ্কের সম্বন্ধ সমগ্র শরীরে পরিব্যাপ্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয় সমূহের সহিত। আত্মার মধ্যেই প্রথম সংকল্প উৎপন্ন হয়। পরে তা মস্তিষ্ক তথা স্নায়ুমন্ডলের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়।'[১১] আত্মা কোন জড় বস্তু নয়। জড় তত্ত্বে আত্মার কোন অবস্থিতি নেই (অংশ)। আত্মা স্বয়ং নিত্য, চেতন শক্তি, অবিভাজ্য, অবিনাশী যার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব আছে। আত্মাতে রয়েছে জ্ঞান স্মৃতি সংকল্প বিশ্লেষণ ও পরখ শক্তি। আত্মাতে আরও রয়েছে প্রেম, আনন্দ-বেদনা, দয়া, করুণা, শান্তি, তৃপ্তি, কামনা-বাসনা, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি জৈবিক বৃত্তি। আত্মার দেহ অভিমানই সকল দুঃখের মূল কারণ।

Dhaka University Institutional Repository

জীব অজ্ঞানতার কারণে ঈশ্বর থেকে নিজেকে আলাদা ভাবে। জীব মনে করে, আমি কর্তা এই অভিমান করে সংসারের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত হয়। তখন সে আসক্তিজনিত কাজের ফল স্বরূপ দুঃখ ভোগ করে। জীব মোহে আচ্ছন্ন হওয়ার কারণে নিজেকে মনে করে আমি ক্ষুদ্র, আমি দীন, শক্তি হীন। এরকম চিন্তার ফলে সব সময় তার অভাবের অনুভূতি হয়। এই অভাববোধ থেকেই জীবের চিত্তে কামনা-বাসনা জন্মে। আর এই কামনা বাসনা পূরণ না হলেই সে শোকে দুঃখে মলিন ও হতাশ হয়ে পড়ে। 'কিন্তু যে ঈশ্বরকে ভুলে গেছে সেই ঈশ্বরের অনুগ্রহে যদি সে জ্ঞান লাভ করে তবে সে দেখতে পায় যে, সে আর দেহ বিশিষ্ট ক্ষুদ্র জীব নয়, সে ঈশ্বরেরই স্বরূপ এবং তারই অনুপ্রকাশ। তখন তার সমস্ত দৈন্য ঘুচে যায়, সে তার নিজের মহিমা উপলব্ধি করতে সমর্থ হয়, তার কোন অভাব বোধ থাকে না এবং সকল কামনা বাসনা দূর হয়। ফলে শোক দুঃখ আর তাকে স্পর্শ করতে পারে না।'[১২] ঈশ্বর উপলব্ধি ক্রমান্বয়ে মুক্তির পথে নিয়ে যায়। 'এইভাবে আত্মা শরীরে প্রবেশ করে শরীরের মাধ্যমে সমস্ত ক্রিয়া করে এবং কর্মের ফলও সে নিজেই ভোগ করে। একেই পাপ-পূণ্য বলে এবং সংস্কার তথা কর্মফলও বলে। কর্মফল পাওয়ার জন্য তাকে জন্ম-মরণের চক্রে ঘুরতে হয়। এই ধারণকৃত শরীর যদি রোগে বৃদ্ধ অবস্থাতে অথবা দুর্ঘটনাতে মরে যায় তাহলে ঐ শরীরে থাকা অসংখ্য কোশিকা জড় রূপ ধারণ করে ফেলে। শরীরে থাকা কোশিকার অংশ পুনঃ পাঁচ তত্ত্বের (ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও বোম) রূপে বিভাজিত হয়; কিন্তু আত্মা অনাদি, অবিনাশী।'[১৩] এভাবে আত্মা দেহ ছেড়ে চলে যায়। আবার সৃষ্ট পদার্থ আগুন, পানি, মাটি, বাতাস ও আকাশ এ পঞ্চভূতে মিশে যায়। কর্মফল অনুসারে মুক্তি লাভ না হওয়া পর্যন্ত আত্মা বার বার দেহ ধারণ করে। দেহ আত্মার পোশাক। আমরা যেমন পুরাতন পোশাক ছিঁড়ে নষ্ট হলে, নতুন পোশাক পরিধান করি, তেমনি এক দেহ নষ্ট হলে আত্মা আবার নতুন দেহ ধারণ করে। প্রকৃতি আত্মাকে এই দেহ পোশাক উপহার দেয়।

ব্যক্তিত্বের বিভিন্ন স্তর

আত্মদর্শনের জন্য দেহে ও আত্মার বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক জানা প্রয়োজন। "মানুষের এই স্থূল অংশ, যাহাতে বহিরিন্দ্রিয়সমূহ অবস্থিত, তাহাকে বলে 'স্থূলদেহ' বা 'স্থূলশরীর'। তারপর আসে প্রথমে ইন্দ্রিয়, তারপর মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার। এইসব এবং প্রাণশক্তিসমূহ মিলিয়া যে যৌগিক সত্তা গড়িয়া ওঠে তাহাকে বলে 'সূক্ষ্মদেহ' বা 'সূক্ষ্মশরীর'। এই শক্তিসমূহ কতকগুলি সূক্ষ্ম উপাদানে গঠিত; সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, স্থূলদেহের কোন ক্ষতিই সেগুলিকে ধ্বংস করিতে পারে না; দেহের সর্বপ্রকার আঘাত অতিক্রম করিয়া সেগুলি বাঁচিয়া থাকে। যে স্থূলশরীর আমরা দেখিতে পাই, তাহা স্থূল পদার্থ দিয়া গঠিত, কাজেই তাহা নিত্য নূতন হইতেছে, নিয়ত পরিবর্তিত হইতেছে। কিন্তু অন্তরিন্দ্রিয়সমূহ- মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার সূক্ষ্মতম পদার্থ দ্বারা গঠিত, কাজেই যুগ যুগ ধরিয়া তাহারা অক্ষুন্ন থাকিবে। সেগুলি এত সূক্ষ্ম যে, কোন কিছুর দ্বারা তাহাদের বাধা দেওয়া যায় না; যে কোন বাধা তাহারা অতিক্রম করিতে পারে। স্থূলদেহ যেমন অচেতন, সূক্ষ্মদেহও তাই, কারণ তাহা সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত। যদিও তাহার এক অংশকে 'মন', অপর অংশকে, 'বুদ্ধি' এবং তৃতীয় অংশকে বলে 'অহঙ্কার', তথাপি একনিমেষেই আমরা বুঝিতে পারি যে, উহাদের কোনটিই 'জ্ঞাতা' হইতে পারে না–অনুভবের কর্তা হইতে পারে না; সর্বকর্মের সাক্ষী বা সর্বকর্মের লক্ষ্যও হইতে পারে না। মন, বুদ্ধি বা অহঙ্কারের সকল কর্মই এতদতিরিক্ত কাহারও জন্য হইতে বাধ্য। এই সবকিছুই সূক্ষ্ম পদার্থ দ্বারা গঠিত বলিয়া কখনও স্বপ্রকাশ হইতে পারে না। এগুলির দীপ্তি নিজেদের ভিতের থাকিতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, এই টেবিলটির প্রকাশ কোন বাহ্য বস্তুর জন্য হইতে পারে না। সুতরাং উহাদের সকলের পশ্চাতে নিশ্চয় এমন একজন আছেন, যিনি প্রকৃত প্রকাশক, প্রকৃত দ্রষ্টা, প্রকৃত ভোক্তা; সংস্কৃতে তাঁহাকেই বলা হয় 'আত্মা'– মানুষের আত্মা, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ।

শরীর প্রতি মুহূর্তে মরিতেছে, মন নিয়ত পরিবর্তনশীল। শরীর একটি যৌগিক পদার্থ, মনও তাই; অতএব তাহারা কখনও পরিবর্তনশীলতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কিন্তু এই স্থূল জড়বস্তুর ক্ষণিক আবরণের ঊর্ধ্বে, এমন কি মনের সূক্ষ্মতর আবরণেরও ঊর্ধ্বে, সেই আত্মা বিরাজমান, যাহা মানুষের প্রকৃত সত্তা, যাহা চিরস্থায়ী ও চিরমুক্ত। তাহারই মুক্ত স্বভাব মানুষের চিন্তা ও বস্তুর স্তরের মধ্য দিয়া অনুস্যূত (প্রকাশিত) হইতেছে এবং নামরূপে রঞ্জিত হওয়া সত্ত্বেও স্বীয় বন্ধনহীন মস্তিষ্ক ঘোষণা করিতেছে। অজ্ঞানের ঘনীভূত স্তরের আবরণ সত্ত্বেও তাঁহারই অমরত্ব, তাঁহারই পরমানন্দ, তাঁহারই শান্তি, তাঁহারই ঐশ্বর্য উদ্ভাসিত হইয়া স্বীয় অস্তিত্বের সাক্ষ্য দিতেছে। এই ভয়শূন্য, মৃত্যুহীন, মুক্ত আত্মাই প্রকৃত মানুষ। যখন কোন বহিঃশক্তি কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না, কোনও পরিবর্তন ঘটাইতে পারে না, তখনই স্বাধীনতা বা মুক্তি সম্ভব। মুক্তি শুধু তাহারই পক্ষে সম্ভব, যে সর্বপ্রকার বন্ধনের–সমস্ত নিয়মের এবং কার্য কারণের নিয়ন্ত্রণের অতীত। অর্থাৎ...যে অবিকারী, সেই শুধু মুক্ত এবং সেইজন্যই সে অমর হইতে পারে। মুক্ত

Dhaka University Institutional Repository

অবিকারী ও বন্ধনহীন– এই যে জীবাত্মা, এই যে মানবাত্মা, ইহাই মানুষের প্রকৃত স্বরূপ; ইহার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই।

প্রত্যেক মানুষেরই ব্যক্তিত্বকে একটি কাঁচের গোলকের সঙ্গে তুলনা করিতে পারা যায়। প্রত্যেকটির কেন্দ্রে একই শুভ্র জ্যোতি, ঐশী সত্তার একই প্রকার বিচ্ছুরণ; কিন্তু কাঁচের আবরণের বর্ণ ও ঘনত্বের পার্থক্যে রশ্মিনিঃসরণে বৈচিত্র্য ও বিভিন্নতা ঘটিতেছে। কেন্দ্রে অবস্থিত শিখাটির দীপ্তি ও সৌন্দর্য সমান, কিন্তু যে জাগতিক যন্ত্রের মাধ্যমে তাহার প্রকাশ হয়, কেবল তাহারই অপূর্ণতাবশত তারতম্যে প্রতীতি ঘটে। বিকাশের মানদণ্ড অনুসারে আমরা যতই উচ্চে আরোহণ করিতে থাকিব, ততই প্রকাশযন্ত্র স্বচ্ছ হইতে স্বচ্ছতর হইতে থাকিবে।'[১৪] আধ্যাত্মিক সাধনায় ক্রমেই ঐশী জ্যোতি তীব্রতর হয়।

ঈশ্বরের নিকট ফিরে যাওয়া এক উচ্চতর অবস্থা। বিভিন্ন ধর্মের ধর্মাবতার ও মহাপুরুষগণের শিক্ষা ঈশ্বরদর্শন হলেই এ বিশ্ব জগতের নিম্নস্তরের দুঃখ-কষ্ট থেকে আত্মা মুক্তি পেয়ে ঊর্ধ্বলোকে চলে যায়। এ সম্পর্কে যোগীগণ বলেন, 'মানুষের বর্তমান অবস্থা একটি অধঃপতিত অবস্থা। জগতে এমন কোন ধর্ম নাই, যাহা বলে-মানুষ পূর্বে যাহা ছিল তদপেক্ষা উন্নত হইয়াছে। ভাবটি এই যে, আদিতে মানুষ শুদ্ধ ও পূর্ণ ছিল, পরে ক্রমাগত অবনত হইতে থাকে, এতদূর নিচে যায়, যাহার নিচে সে আর যাইতে পারে না।'[১৫] জন্ম-মৃত্যুর চক্র ছিন্ন করে মুক্তি লাভের আকাঙ্খা মানুষের সহজাত বৃত্তি। তাই তো মানুষ জ্ঞাত সারে বা অজ্ঞাত সারে মুক্তির পথ সন্ধান করে। বিবেকানন্দ মানুষের মুক্তি সম্পর্কে বলেন, 'প্রত্যেকেই-অণু হইতে নক্ষত্র পর্যন্ত-মুক্তির জন্য সংগ্রাম করিতেছে। অজ্ঞ ব্যক্তি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে মুক্তি পাইলে-ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিলে সন্তুষ্ট হয়। কিন্তু জ্ঞানী অনুভব করেন, তাঁহাকে আরও দৃঢ়তর বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে হইবে। তিনি রেড ইন্ডিয়ানের স্বাধীনতাকে মোটেই স্বাধীনতা বলিয়া মনে করেন না।'[১৬] তাহলে মুক্তি লাভের উপায় কি ? ধর্মানুশীলন ও অধ্যাত্ম সাধনা বলে আত্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন লাভ হলে আত্মা জন্ম মৃত্যুর চক্র থেকে অনন্তকালের জন্য মুক্ত হয়ে যায়। তাহলে জগতের সকল ধর্মের স্বরূপ বা উদ্দেশ্য কি ? এ সম্পর্কে সর্বধর্ম সমন্বয়াচার্য শ্রীরামকৃষ্ণ জগতে প্রচার করেন 'যত মত তত পথ'। সকল ধর্মানুশীলনের মূলে একেশ্বর প্রমাণ করে তিনি বলেন, 'আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল- হিন্দু, মুসলিম, খ্রীস্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদান্ত, -এসব পথ দিয়েও আসতে হয়েছে। দেখলাম সেই এক ঈশ্বর-তাঁর কাছে সকলেই আসছে, ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।'[১৭] শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমাণ করেন সব ধর্মই সত্য, আন্তরিক নিষ্ঠা ও কঠোর সাধনার মাধ্যমে সব ধর্মের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরদর্শন লাভ করা যায়। বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের ঈশ্বরদর্শনের শিক্ষা জগতে প্রচার করেন। মাষ্টার ঈশ্বর দর্শন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রশ্ন করেন, 'মাষ্টার-ঈশ্বরকে কি দর্শন করা যায় ? শ্রীরামকৃষ্ণ- হ্যাঁ, অবশ্যই করা যায়। মাঝে মাঝে নির্জন বাস; তাঁর নাম গুণগান, বস্তুবিচার; এই সব উপায় অবলম্বন করতে হয়।'[১৮] ঈশ্বরদর্শন লাভ হলে ধর্ম বা ঈশ্বর নিয়ে আর কোন দ্বন্দ্ব-সংঘাত, সংঘর্ষ ও যুদ্ধের অবকাশ থাকে না। ধর্মের প্রত্যক্ষানুভূতি বর্জিত লোকেরাই ধর্ম নিয়ে সংঘাত সৃষ্টি করে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Vain are your fights and your quarrels; have you seen God whom you want to preach? If you have not seen, vain is your preaching; you do not know what you say; and if you have seen God, you will not quarrel, your very face will shine...When you have known God, your very face will be changed, your voice will be changed, your whole appearance will be changed. You will be a blessing to mankind.'[১৯] ঈশ্বরদর্শন লাভ হলে মানুষ হৃদয়ে অনন্ত জ্ঞানের সন্ধান লাভ করে। তাঁর নিকট বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টি রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়, ফলে তাঁর নিকট আর কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অজ্ঞতা থাকে না। কারণ তিনি পূর্ণ জ্ঞানী।

গুরুদর্শন

আধ্যাত্মিক সাধনার জগতে গুরু পরম বন্ধু, মুক্তির দিশারী। ঈশ্বরদর্শন লাভের জন্য একজন সদ্‌গুরুর শিক্ষা গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। সাধক বিবেকানন্দ ঈশ্বর দর্শনের জন্য ধর্ম এবং প্রকৃত ধর্ম গুরুর প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, 'ধর্ম-সর্বোচ্চ জ্ঞান স্বরূপ যে ধর্ম, তাহা ধন-বিনিময়ে কিনিবার জিনিস নয়, গ্রন্থ হইতেও তাহা পাওয়া যায় না। জগতের সর্বত্র ঘুরিয়া আসিতে পারো, হিমালয়, আল্পস্, ককেসস্ প্রভৃতি অন্বেষণ করিতে পারো, সমুদ্রের তলদেশ আলোড়ন করিতে পারো, তিব্বতের চারিকোণে অথবা গোবি-মরুর চতুর্দিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে পারো, কিন্তু যতদিন না তোমার হৃদয় ধর্ম গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইতেছে এবং যতদিন না তুমি গুরু

Dhaka University Institutional Repository

লাভ করিতেছ, কোথাও ধর্ম খুঁজিয়া পাইবে না। বিধাতৃ নির্দিষ্ট এই গুরু যখনই লাভ করিবে, অমনি বালকবৎ বিশ্বাস ও সরলতা লইয়া তাঁহার সেবা কর, তাঁহার নিকট প্রাণ খুলিয়া দাও, তাঁহাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর-রূপে দেখ। যাহারা এই রূপ প্রেম ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সত্যানুসন্ধান করে, তাঁহাদের নিকট সত্যের ভগবান্ সত্য শিব ও সুন্দরের অতি আশ্চর্য তত্ত্বসমূহ প্রকাশ করেন।'[২০]

গুরুর সান্নিধ্য ছাড়া কখনও পূর্ণতা লাভ করা যায় না। গুরুর জ্যোতির্ময় আত্মার দীপ্তিতে আলোকিত হয় শিষ্যের অন্ধকার আত্মা। ' "গু"- শব্দের অর্থ– অন্ধকার, "রু"- শব্দের অর্থ- তাহার (সেই অন্ধকারের) নিরোধক (নাশক)। অন্ধকারকে নিরোধ (নিবারণ) করেন বলিয়া তাঁহাকে "গুরু" বলা হয়।'[২১] অর্থাৎ গুরু শিষ্যকে জ্ঞান শিক্ষা দিয়ে অজ্ঞানান্ধকার দূর করে আত্মা আলোকিত করেন। গুরু শিষ্যের অন্ধকার আত্মাকে জ্যোতির্ময় করে তোলেন। "যে ব্যক্তির আত্মা হইতে অপর আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাঁহাকে 'গুরু' বলে; এবং যে ব্যক্তির আত্মায় শক্তি সঞ্চারিত হয়, তাহাকে শিষ্য বলে।"[২২] গুরু হতে হলে শিষ্যের মাঝে আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করার শক্তি থাকতে হবে, আবার শিষ্যকেও ঐ শক্তি গ্রহণ করার সামর্থ্য থাকতে হবে। গুরু ও শিষ্য উভয়ই অসাধারণ হলে আশ্চর্য আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়, ধর্মের অপূর্ব বিকাশ ঘটে। এছাড়া অন্য লোকেরা ধর্ম নিয়ে কেবল ছেলে-খেলা করছে। বিবেকানন্দ বলেন, 'জীবাত্মা মাত্রেই পূর্ণতা লাভ করিবেই করিবে– শেষ পর্যন্ত সকলেই সিদ্ধাবস্থা লাভ করিবে।'[২৩] আর এই সিদ্ধাবস্থা লাভের জন্য কিভাবে গুরুর সন্ধান পাবে ? বিশ্ব প্রভুর অপার লীলা, তার সৃষ্টি রহস্য বিজ্ঞানময়, সুশৃঙ্খল ও সামঞ্জস্যপূর্ণ। ঐশী জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রেও রয়েছে এক সুশৃঙ্খল প্রাকৃতিক নিয়ম। তাই সাধক বিবেকানন্দ প্রাকৃতিক নিয়মে গুরুদর্শন সম্পর্কে বলেন, 'আর প্রকৃতির এই বিচিত্র নিয়ম যে, যখনই ক্ষেত্র উপযুক্ত হয় তখনই বীজ নিশ্চয়ই আসিবে-আসিয়াও থাকে। যখনই আত্মার ধর্ম লাভের আগ্রহ প্রবল হয়, তখনই ধর্ম শক্তি-সঞ্চারক পুরুষ সেই আত্মার সহায়তার জন্য অবশ্যই আসিবেন, আসিয়াও থাকেন।'[২৪] ঈশ্বরপ্রেমে হৃদয়ের তীব্র ব্যাকুলতা ও প্রবল আকাঙ্খা সৃষ্টি হলে গুরু দর্শন লাভ হয়। গুরুগীতা শিক্ষাদানের ভিত্তিতে গুরু বা আচার্যকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। 'আচার্য (গুরু) তিন প্রকার। ধর্মোপদেশ দিয়ে শিষ্যের আর কোন খবর লয় না সে আচার্য অধম। যিনি শিষ্যের মঙ্গলের জন্য তাদের বার বার বোঝান, যাতে তারা উপদেশগুলি ধারণ করতে পারে, অনেক অনুনয় বিনয় করেন, ভালবাসা দেখান- তিনি মধ্যম আচার্য। আর যখন শিষ্যেরা কোন মতে শুনছে না দেখে জোর পর্যন্ত করেন, তাঁকে বলে উত্তম আচার্য।'[২৫] উত্তম আচার্য নিজের সুখ বিসর্জন দিয়ে শিষ্যকে শাসন করে হলেও মানুষ করার চেষ্টা করেন।

ঈশ্বর সদ্‌গুরুকে উচ্চতর আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দান করেন। একারণেই গুরুর কৃপা হলে হাজার বছরের জন্ম-জন্মান্তরের অন্ধকার অষ্টপাশবন্ধন একমুহূর্তে আলোকিত হয়। এসম্পর্কে গুরুগীতা বলেন, 'ভেল্কীবাজী করে, দেখছ? অনেক গেরো দেওয়া দড়ি। এক ধার একটা জায়গায় বাঁধে, আর এক ধার নিজের হাতে ধ'রে দড়িটাকে দুই একবার নাড়া দেয়। নাড়াও দেওয়া, আর সব গেরো খুলে যাওয়া। কিন্তু অনেক লোক সেই গেরো প্রাণপণ চেষ্টা করেও খুলতে পারে না। গুরুর কৃপা হ'লে সব গেরো এক মুহূর্তে খুলে যায়। গুরুর কৃপায় জ্ঞান লাভের পরেও সংসারে জীবন্মুক্ত হ'য়ে থাকা যায়।'[২৬] বিবেকানন্দ প্রকৃত জ্ঞানী গুরুর তিনটি লক্ষণ উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ 'গুরুর সম্বন্ধে এইটুকু দেখিতেই হবে, তিনি যেন শাস্ত্রের মর্মজ্ঞ হন। ...দ্বিতীয়তঃ নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক। ...তৃতীয়তঃ দেখা আবশ্যক গুরুর উদ্দেশ্য কি ? গুরু যেন অর্থ, নাম, যশ বা কোন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ধর্ম শিক্ষাদানে প্রবৃত্ত না হন-সমগ্র মানব জাতির প্রতি শুদ্ধ প্রেমই যেন তাঁহার কার্যের নিয়ামক হয়। ...যিনি বিদ্বান্ নিষ্পাপ ও কামগন্ধহীন, যিনি শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মবিৎ; তিনিই প্রকৃত সদ্‌গুরু।'[২৭] ব্রহ্মদর্শন প্রাপ্ত প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তি হবেন সদ্‌গুরু।

গুরুহীন ব্যক্তি অন্ধের মত চলে। মহান গুরুর ঋণ অপরিশোধ্য, তাঁর ভালবাসার প্রতিদান অসম্ভব। তাই শিষ্যের উচিত গুরুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন করা। প্রেমে নিষ্ঠায় কতর্ব্যে গুরুর সাথে শিষ্য হবে একাত্ম। গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও আন্তরিকতা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'গুরুর প্রতি বিশ্বাস, বিনম্র আচরণ, তাঁহার নিকট শরণ গ্রহণ ও তাঁহার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে আমাদের হৃদয়ে ধর্মের বিকাশ হইতে পারে না। আর ইহাও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, যে-সব দেশে গুরু শিষ্যের এরূপ সম্বন্ধ আছে, কেবল সেই-সবদেশেই অসাধারণ ধর্মবীরগণ জন্মিয়াছেন; আর যে-সব দেশে গুরু শিষ্যের এ সম্বন্ধ রক্ষা করা হয় নাই, সেসব দেশে ধর্মের শিক্ষক কেবল বক্তা মাত্র।'[২৮] গুরু শিষ্যের গভীর আন্তরিকতা ও প্রেম সম্পর্কের প্রকৃষ্ট উদাহরণ শ্রীগুরুরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনদর্শন। এ শিক্ষা বিশ্ববাসীর গ্রহণযোগ্য, অনুসরণযোগ্য। বিবেকানন্দ অবতার সম্পর্কে বলেন, 'ইঁহারা গুরুরও গুরু, মানুষের ভিতর ভগবানের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি; আমরা তাঁহাদের ভিতর দিয়া ব্যতীত অন্য উপায়ে ভগবানকে দেখিতে পারি না। মানুষ তাঁহাদিগকে

Dhaka University Institutional Repository

উপাসনা না করিয়া থাকিতে পারে না।'[২৯] সাধারণ গুরু শ্রেণীর চেয়েও আর এক উন্নততর শ্রেণীর গুরু আছেন- তাঁদের বলা হয় ঈশ্বরের অবতার। তাঁদের ইচ্ছায় এক মুহূর্তে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিও সাধু হয়ে যায়।

অবতারগণ গুরুরও গুরু। তাঁদের চরিত্র ও স্বরূপের ভিতর দিয়েই ঈশ্বরকে দেখা যায়। এছাড়া ঈশ্বরকে দেখার অন্য কোন উপায় নেই। মানুষ তাঁদের উপাসনা না করে থাকতে পারে না। স্বয়ং ঈশ্বর মানবরূপে অবতার হয়ে মানব কল্যাণ ও মুক্তির পথ প্রদর্শন করতে জগতে আসেন। শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অবতার সম্পর্কে ঘোষণা করেন, ভগবান মানুষের দুর্বলতা বুঝেন, এবং মানুষের হিতের জন্যই মানুষ রূপে অবতীর্ণ হন। 'যখনই ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি নিজেকে সৃজন করি। সাধুদের রক্ষা, পপিগণের দুষ্কৃতিনাশ ও ধর্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করি। জগতের ঈশ্বর আমি,– আমার প্রকৃত স্বরূপ না জানিয়া অজ্ঞ ব্যক্তিরা মনুষ্য রূপধারী আমাকে উপহাস করে।'[৩০] আর তাই তো হতভাগা কতিপয় ব্যক্তি ছাড়া সকলেই যুগ যুগ ধরে আচার্যগণের শিক্ষা অনুশীলন করেন, তাঁদের স্মরণ ও পূজা করেন।

মুক্তিতত্ত্ব

মানব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জটিল রহস্যময় ও আনন্দঘন বিষয় মুক্তিতত্ত্ব। এই মোক্ষ বা মুক্তিই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। চার্বাক ভিন্ন সকল ভারতীয় দর্শন মুক্তিতত্ত্বে বিশ্বাসী। কিসের মুক্তি এবং কোথা থেকে মুক্তি ? আত্মার মুক্তি। আত্মা কর্মফল অনুসারে বার বার এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে। 'মানব-শরীর হচ্ছে এক অপূর্ব যন্ত্র, যাকে অবলম্বন করে অমারা নিত্য জীবন প্রাপ্ত হতে পারি। ভব সমুদ্র পার হওয়ার এটি হচ্ছে এক অত্যন্ত দুর্লভ এবং অত্যন্ত সুন্দর একটি তরণি। এই তরণিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করার জন্য একজন সুদক্ষ কাণ্ডারির প্রয়োজন। সেই কাণ্ডারিই হচ্ছেন শ্রীগুরুদেব। তাঁর কৃপারূপী অনুকূল বাতাসে সেই নৌকা ভেসে চলে। এই সমস্ত মঙ্গলজনক সম্ভাবনাগুলি থাকা সত্ত্বেও কে এই ভবসমুদ্র পার হওয়ার এই সুন্দর সুযোগ গ্রহণ করবে না; এই সুবর্ণ সুযোগ কেউ যদি হেলায় হারায়, তা হলে বুঝতে হবে যে সে আত্মহত্যা করছে।'[৩১] মানবাত্মার এমন অধঃপতন থেকে উদ্ধার প্রয়োজন। মানুষকে কঠোর আধ্যাত্মিক সাধনার মধ্য দিয়ে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে হয়। বিবেকানন্দ মানবাত্মার ঈশ্বরদর্শনের মাধ্যমে মুক্তির পথ সম্পর্কে বলেন, 'মানুষ যত নিচেই নামিয়া যাক না কেন, শেষ পর্যন্ত তাহাকে উর্ধ্বগতি লাভ করিয়া আদি কারণ ভগবানে ফিরিয়া যাইতে হইবে।'[৩২]

এই মুক্তির জন্য মানুষকে ঘর ছেড়ে জঙ্গলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। মানুষ এ সংসারে নিত্য দিনের কর্মের মাঝে ঘরে বসেই মুক্তি লাভ করতে পারে। এ সম্পর্কে ঈশ্বরের অবতার শ্রীকৃষ্ণ বলেন, 'মানুষ পদ্মপত্রের মতো সংসারে বাস করিবে। পদ্মপত্র জলে থাকে, কিন্তু তাহাতে জল লাগে না, মানুষ তেমনি এই সংসারে থাকিবে, ঈশ্বরে হৃদয় সমর্পণ করিয়া হাতে কাজ করিবে।'[৩৩] সাধারণ ধার্মিক দু'একটা বন্ধনে আবদ্ধ, কিন্তু মুক্তি পথের যাত্রী সহস্র বন্ধনে আবদ্ধ। কারণ তাঁর সমগ্র জীবন সাধনার প্রতিটি পদক্ষেপে, চিন্তা কথা ও কাজে থাকবে ত্যাগ সংযম, সততা ও পবিত্রতা। তিনি সর্বদা থাকবেন নিষ্পাপ ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী, কখনও যেন পাপ-পঙ্কিলতা তাকে স্পর্শ করতে না পারে। বেদ এই চির মুক্তির কথা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, 'হে অমৃতের পুত্রগণ, হে দিব্যধাম নিবাসিগণ, শ্রবণ কর-আমি এই অজ্ঞানান্ধকার হইতে আলোকে যাইবার পথ পাইয়াছি, যিনি সকল তমসার পারে, তাঁহাকে জানিতে পারিলেই সেখানে যাওয়া যায়- মুক্তির আর কোন উপায় নাই।'[৩৪]

ঈশ্বরকে জানার ৩টি স্তর

সকল ধর্মের অনুসারীগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। তারা তিনটি পর্যায়ে ঈশ্বরদর্শন লাভ করে থাকে।

প্রথম পর্যায়: এ পর্যায়ে রয়েছে সাধারণ ধার্মিক ব্যক্তি। তারা অন্যের নিকট শুনে, ধর্মগ্রন্থ ও বিভিন্ন বই পড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ঈশ্বরের কিছু ধারণা অর্জন করে। এ কারণে তাঁরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে যে, তারা ঈশ্বর লাভের সঠিক পথ অনুসরণ করে ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেছে। কিন্তু ঈশ্বরের সামান্য ধারণা অর্জন করলেই ঈশ্বর লাভ করা যায় না। কারণ ঈশ্বরের ধারণা ও ঈশ্বর এক নয়। সাধারণ ধার্মিকের জ্ঞান এ স্তরেই সীমাবদ্ধ থাকে। তারা এর বাইরে আর কিছু জানতে ও স্বীকার করতে চায় না। এ পর্যায়ের একটি দৃষ্টান্ত হলো-মানুষ গোলাপ ফুল সম্পর্কে অন্যের নিকট শুনে, পড়ে দূর থেকে শুধু ধারণা অর্জন করতে পারে, ফুলকে নয়। ফুল ও ফুলের ধারণা এক নয়। এ স্তরের ধার্মিকগণ হয় প্রচণ্ড ধর্মান্ধ, গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক। এ পর্যায়ের ভক্তদের মানসিক অবস্থা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'নিম্ন স্তরের ভক্তি অনেক সময়ে ভয়ানক গোঁড়ামির আকার ধারণ করে। হিন্দু-মুসলমান ও খ্রীষ্ট-ধর্মান্তর্গত গোঁড়ার দল–এই নিম্ন

Dhaka University Institutional Repository

স্তরের ভক্তি সাধকগণের মধ্যেই সর্বদা বিশেষভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। যে ইষ্টনিষ্ঠা ব্যাতীত প্রকৃত প্রেম জন্মে না, সেই ইষ্টনিষ্ঠাই আবার অনেক সময় অন্য সকল মতের উপর তীব্র আক্রমণ ও দোষারোপের কারণ।'[৩৫]

<u>দ্বিতীয় পর্যায়:</u> এ পর্যায়ে রয়েছে চিন্তাশীল ধার্মিক ব্যক্তিগণ। তাঁরা জগৎ জীবন ও ঈশ্বর সম্পর্কে প্রত্যক্ষ ধারণা অর্জন করে। এ পর্যায়ে চিন্তাশীল মানুষ বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা, সৃষ্টি-রহস্য, কার্যকারণ সম্পর্ক, কর্মফল, ন্যায়-অন্যায় বা পাপ-পূণ্যের বিচার ও পরিণতি প্রভৃতি বিষয় দেখে-শুনে বিচার-বিশ্লেষণ করে- এতে তারা আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করে, পরমানন্দ লাভ করেন। এ পর্যায়ে ভক্তগণ ভাবেন 'ঈশ্বর লাভ করেছি'। তাঁদের মতে ঈশ্বরকে এর চেয়ে অতিরিক্ত জানা সম্ভব নয় এবং জানার প্রয়োজনও নেই। তাঁদের সৃষ্টি রহস্য জানার কৌতুহল এ পর্যায়েই সীমাবদ্ধ। দৃষ্টান্ত স্বরূপ- এ পর্যায়ে মানুষ দূর থেকে বাগানে গোলাপ ফুল দেখতে পায়। কিন্তু ফুলে হাতে নিতে পারে না, অর্থাৎ পূর্ণভাবে লাভ করতে পারে না। গোলাপ ফুল লাভ করার জন্য আরও অগ্রসর হতে হবে। এ পর্যায়ে মানুষ অপেক্ষাকৃত উদার, বিজ্ঞ ও সহনশীল হয়, ফলে তাঁরা গোড়ামী ও সংকীর্ণতা মুক্ত। তাঁরা সকল ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীর মানুষকে ভালবাসেন। তাঁদের রয়েছে যুক্তি প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা।

<u>তৃতীয় পর্যায়:</u> এ পর্যায়ে রয়েছেন আধ্যাত্মিক সাধকগণ। কৌতুহলী মানুষ ঈশ্বরদর্শনের উদ্দেশ্যে প্রথম দুটি পর্যায় অতিক্রম করে তৃতীয় পর্যায়ে উপনীত হন। তাঁরা বাহ্যিক অভিজ্ঞতা ও স্বজ্ঞার মাধ্যমে অন্তর্দর্শন লাভ করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা দেখে শুনে বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রত্যক্ষভাবে আত্মা ও ঈশ্বরের স্বরূপ উপলব্ধি করেন। সাধকগণ এ পর্যায়ে যুক্তি প্রজ্ঞার সীমা অতিক্রম করে আধ্যাত্মিক সাধনায় স্বজ্ঞার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করেন। সাধকগণ এ পর্যায়ে সাধনার এক উচ্চতর অবস্থায় নিজ হৃদয়ে ঈশ্বরের দিব্য জ্ঞান (Divine Knowledge) ও দিব্য জ্যোতি (Divine Light) প্রত্যক্ষ করে এক পরমানন্দানুভূতি লাভ করেন। এ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরেরদর্শন সম্পর্কে সাধক বিবেকানন্দ জ্ঞানী হিন্দুগণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, 'আমি আত্মাকে দর্শন করিয়া, ঈশ্বরকে দর্শন করিয়াছি।'[৩৬] দৃষ্টান্ত স্বরূপ সাধকগণ এ পর্যায়ে গোলাপ ফুল নিজ হাতে তুলে নেন। তাঁরা সৃষ্টির সর্বত্র স্রষ্টার উপলব্ধি করেন। তাঁরা বিশাল বিচিত্র বিশ্বের মাঝে উপলব্ধি করেন এক সুশৃঙ্খল ঐক্য। শিশু যেমন দামী ও সুন্দর দোলনার চেয়ে মায়ের কোলে অনেক বেশি পরমানন্দ ও তৃপ্তি লাভ করে, তেমনি সাধক পরপারে স্বর্গ সুখের চেয়ে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষানুভূতি অর্জনের মাধ্যমে অনন্তগুণ শান্তি, তৃপ্তি ও পরমানন্দ লাভ করেন। তাঁরা সর্বভূতে সর্ব ধর্মে ও সর্ব মানবে- ঈশ্বরদর্শন করেন।

ঈশ্বর দর্শনের তিনটি মূলনীতি

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম-দর্শন গবেষণা ও অনুসন্ধান করে ঈশ্বরদর্শনের জন্য একই রকম তিনটি মূল নীতি পাওয়া যায়। সেগুলো হলো প্রেম, পবিত্রতা ও সাধনা। মূলনীতিগুলো অনুশীলনে সাধকের আত্মজ্ঞানের উদয় হয় এবং গৌণী ভক্তি থেকে পরাভক্তির স্তরে উপনীত হয়। জ্ঞানের মাধ্যমেই মহাজ্ঞানী ঈশ্বরের পরিচয় পাওয়া যায়। বিবেকানন্দের যোগ সমন্বয় ও অনুশীলনের মাধ্যমে প্রেম পবিত্রতা ও সাধনার অপূর্ব বিকাশ ঘটে। তিনি যোগ সমন্বয়ের মাধ্যমে সাধনায় সিদ্ধি লাভ সম্পর্কে বলেন, 'আমরা জানি যে– যে-চরিত্রে জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ সমন্বিত হইয়াছে, সেই চরিত্রই সর্বাপেক্ষা মহৎ। উড়িবার জন্য পাখির তিনটি জিনিসের আবশ্যক- দুইটি পক্ষ ও চালাইবার হালস্বরূপ একটি পুচ্ছ। জ্ঞান ও ভক্তি দুইটি পক্ষ, সামঞ্জস্য রাখিবার জন্য যোগ উহার পুচ্ছ। যাঁহারা এই তিন প্রকার সাধন প্রণালী এক সঙ্গে সামঞ্জস্যের সহিত অনুষ্ঠান করিতে পারেন তাঁহারা সহজেই ঈশ্বরদর্শন লাভ করিতে পারেন।'[৩৭] সাধক বিবেকানন্দ ঈশ্বরদর্শনের জন্য জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগ অনুশীলনের পথ নির্দেশ করেন। প্রতিটি যোগ স্বতন্ত্রভাবে অনুশীলনে মুক্তি লাভ সম্ভব। কিন্তু চারটি যোগ সমন্বয় ও অনুশীলনের ফলে সহজেই জ্ঞান ও প্রেম বৃদ্ধি পেয়ে অজ্ঞানতা দূর হয় এবং অনন্ত জ্ঞানের খনি আত্মদর্শন লাভ হয়।

১. প্রেম (Love)

মহান ঈশ্বরের এক অপূর্ব সৃষ্টি প্রেম। আর সকল ধর্মেই ঈশ্বরদর্শনের প্রথম শিক্ষা হলো প্রেম। প্রেমে জ্ঞান হয়। আর এই জ্ঞানই মানুষকে ঈশ্বরের দিকে চালিত করে। তাঁর সাথে গড়ে তোলে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। দুঃখ-যন্ত্রণাপূর্ণ এই জগতে আশ্রয়হীন মানুষ ধর্মের সুশীতল ছায়া তলে আশ্রয় গ্রহণ করে। ব্যথিত মানুষ শান্তির জন্য, মনের দুঃখ সঞ্চার ও লাঘব করার জন্য পরমেশ্বরের সাথে বন্ধুত্ব করে। বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ প্রেম সম্পর্কে বলেন, 'কোন্ শক্তিবলে অণু অণুর সহিত, পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলিত হইতেছে, গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরের দিকে আবর্তিত হইতেছে? কোন্ শক্তি নরকে

Dhaka University Institutional Repository

নারীর প্রতি, নারীকে নরের প্রতি, মানুষকে মানুষের প্রতি, জীব-জন্তুদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে– যেন সমুদয় জগৎকে এক কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে? ইহাকেই "প্রেম" বলে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত আব্রহ্মস্তব্ধ এই প্রেমের প্রকাশ– এই প্রেম সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। চেতন-অচেতন, ব্যষ্টি-সমষ্টি-সকলের মধ্যেই এই ভগবৎ প্রেম আকর্ষণী শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে।'[৩৮] এই অপূর্ব প্রেমের শক্তিতেই মানুষের সাথে ঈশ্বরের মিলন ঘটে। অবতার শ্রীকৃষ্ণ প্রার্থনার মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রেম-তত্ত্ব শিক্ষা দেন। 'প্রভু! আমি তোমার নিকট ধন, সন্তান বা বিদ্যা চাই না। যদি তোমার ইচ্ছা হয় আমি শত বিপদের মধ্য দিয়া যাইব; কিন্তু আমার শুধু এই ইচ্ছা পূর্ণ করিও, কোন পুরস্কারের আশায় নয়, নিঃস্বার্থভাবে শুধু ভালবাসার জন্যই যেন তোমাকে ভালবাসতে পারি।'[৩৯] প্রেম বিনে কি প্রিয়তমার দর্শন লাভ হয়? কখনও না। এই প্রেমই তিল তিল করে মহাপ্রভুর অনন্ত পথে দুঃখ-বেদনা, রোগ-যাতনা, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে প্রেমিককে নিয়ে যায় তার যুগ-যুগান্তরের, জন্ম-জন্মান্তরের প্রতীক্ষিত প্রিয়জনের কাছে। ঈশ্বর প্রেমের তিনটি দিক রয়েছে। যথা- ক. ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, খ. মানুষের প্রতি প্রেম, গ. জীবের প্রতি প্রেম- অর্থাৎ প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রতি প্রেম। নিম্নে প্রেমের দিকগুলো সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করা হলো।

ক. ঈশ্বরের প্রতি প্রেম

জগৎ ও জীবনের যথার্থ ধারণা থেকে স্পষ্ট হয় মুক্তি লাভের ধারণা। কখনও জ্ঞাতসারে আবার কখনও অজ্ঞাতসারে মানুষ ধাবিত হয় ঈশ্বরের দিকে। সে অদৃশ্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করে, ভালবাসে, প্রার্থনা করে আবেগে বিরহ ব্যথায় চোখের জল ফেলে। প্রেমই পথ ভ্রষ্ট দিশেহারা, বিপদগ্রস্থ দুঃখ-যন্ত্রণা-কাতর মানুষকে ঈশ্বরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই বিবেকানন্দ দুঃখ নাশকারী প্রেমের ঐক্যশক্তি সম্পর্কে বলেন, 'সকল ধর্মের মহাপুরুষগণ যে প্রেম মদিরা প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহারা নিজেদের হৃদয়-শোণিত মিশ্রিত করিয়াছেন, যাহার উপর নিষ্কাম ভক্তগণের সমগ্র মন প্রাণ নিবদ্ধ, তাহারা সেই প্রেমের পেয়ালা পান করিতে চান। তাঁহারা এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই চান না– প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরস্কার, এবং কি অপূর্ব এই পুরস্কার, ইহাই একমাত্র বস্তু, যাহা দ্বারা সকল দুঃখ দূরীভূত হয়; ইহাই একমাত্র পানপাত্র, যাহা পান করিলে ভবব্যাধি অন্তর্হিত হয়, তখন মানুষ ঈশ্বরপ্রেমে মত্ত হইয়া যায় এবং ভুলিয়া যায় যে, সে মানুষ।'[৪০] পিতা ও পুত্রের গভীর প্রেম সম্পর্কের মতই মানুষ ও ঈশ্বরের মাঝে গভীর প্রেম সম্পর্ক। কারণ বিশ্ব পিতাই আমাদের আশ্রয় দাতা, মুক্তিদাতা। তাঁর প্রতি প্রেম বিনে ভক্তের মুক্তি নেই। তাই ভগবানের নিকট মুক্তির জন্য বিবেকানন্দের আবেগ ঘন সকরুণ নিবেদন। 'তুমি আমাদের পিতা, তুমি আমাদের মাতা, তুমি আমাদের প্রেমাস্পদ সখা বন্ধু, তুমি সমস্ত শক্তির মূল, তুমি আমাদের শক্তি দাও, তুমি বিশ্বজগতের ভার ধারণ করিয়া আছ; এই ক্ষুদ্র জীবনের ভার বহন করিতে আমায় সাহায্য কর...।'[৪১] এভাবে বৈদিক ঋষিগণ ঈশ্বরকে ভালবাসেন, তাঁর গুণকীর্তণ করেন। ঈশ্বর দর্শনের জন্য প্রীতি ভালবাসা দিয়ে প্রেমাস্পদ রূপে পূজা করবে। ঈশ্বরকে ইহলোকের ও পরলোকের সকল প্রিয় ব্যক্তি ও বস্তুর চেয়েও প্রিয়তর রূপে পূজা করতে হয়। প্রেম গভীর হলেই প্রিয়তমের জন্য সৃষ্টি হয় বিরহ, বেদনা ও হৃদয়ে গভীর ব্যাকুলতা। তাই ঈশ্বরদর্শন সম্পর্কে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় বলেন, 'খুব ব্যাকুল হয়ে কাঁদলে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্য লোকে এক ঘটি কাঁদে; টাকার জন্য লোকে কেঁদে ভাসিয়ে দেয়, কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাদঁছে? ডাকার মত ডাকতে হয়। এই বলিয়া ঠাকুর গান ধরিলেন-

ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমনে শ্যামা থাকতে পারে।
কেমনে শ্যামা থাকতে পারে, কেমনে কালী থাকতে পারে।
মন যদি একান্ত হও, জবা বিল্বদল লও,
ভক্তি চন্দন মিশাইয়ে (মার) পদে পুষ্পাঞ্জলি দাও ॥

ব্যাকুলতা হ'লেই অরুণ উদয় হ'ল। তারপর সূর্য দেখা দিবেন। ব্যাকুলতার পরই ঈশ্বর দর্শন। তিন টান একত্র হ'লে তবে তিনি দেখা দেন– বিষয়ীর বিষয়ের উপর মায়ের সন্তানের উপর আর সতীর পতির উপর টান। এই তিন টান যদি কারও এক সঙ্গে হয়, সেই টানের জোরে ঈশ্বরকে লাভ করতে পারে।'[৪২] ঈশ্বর প্রেমেরে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সর্বদা তাঁকে স্মরণ করা বা ডাকা। আমরা যেমন কারও সাক্ষাৎ না পাওয়া পর্যন্ত ডাকতে থাকি। তেমনি ব্যাকুল হয়ে ঈশ্বরকে ডাকতে হয়, তবেই তাঁর দর্শন লাভ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

খ. মানুষের প্রতি প্রেম

বিবেকানন্দের দর্শন চিন্তার মধ্যমণি মানবপ্রেম। কারণ মানুষের মধ্যে ঈশ্বর রয়েছেন। তাই মানবপ্রেমের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়। বিবেকানন্দ বলেন, প্রত্যেককে আমি কেন ভালবাসব? কারণ তারা সকলে এবং আমি যে এক। তিনি মানুষের ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক উল্লেখ করতে গিয়ে মানুষকে বিশ্বপিতার সন্তান হিসেবে আখ্যায়িত করেন। '...আরও দৃঢ়তর বন্ধন মানুষকে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে, কারণ সকলেই ঈশ্বর প্রেম হইতে সঞ্জাত। মানুষের ভ্রাতৃত্ব ঈশ্বরের পিতৃত্বেরই যুক্তিগত সিদ্ধান্ত।'[৪৩] তিনি আরও বলেন, ধর্ম বলে, জগতে যত প্রাণী আছে সবাই তোমার আত্মারই বহুরূপ মাত্র। বিবেকানন্দের বাণীতে গভীর মানবপ্রেমের চিত্র ফুটে উঠেছে। কারণ মানুষের মাঝেই তিনি ঈশ্বর দর্শন করেছেন। তাই তিনি বলেন, 'তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ যে, কোটি কোটি দেব ও ঋষির বংশধর পশু-প্রায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে ? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছ– কোটি কোটি লোক অনাহারে মরিতেছে, কোটি কোটি লোক শতশতাব্দী ধরিয়া অর্ধাশনে কাটাইতেছে? তোমরা কি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছ অজ্ঞানের কৃষ্ণমেঘ ভারতগগণ আচ্ছন্ন করিয়াছে?'[৪৪]

ঈশ্বর দর্শনের এক অপরিহার্য অধ্যায় মানবপ্রেম ও মানব-কল্যাণ সাধন। এতে মানুষ নিঃস্বার্থ দায়িত্বশীল এবং ঈশ্বরাভিমুখী হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ ভক্তিযোগে ক্রিয়া পঞ্চমহাযজ্ঞ-এর কথা উল্লেখ করেন। "স্বার্থপর ব্যক্তির হৃদয়ে ঈশ্বর চিন্তা আসিবে না। যতই আমরা পরের কল্যাণ সাধনে চেষ্টা করিব, ততই আমাদের হৃদয় শুদ্ধ হইবে; এবং সেই হৃদয়ে ঈশ্বর বাস করিবেন। আমাদের শাস্ত্রমতে ক্রিয়া বা কর্ম পঞ্চবিধ– উহাদিগকে 'পঞ্চমহাযজ্ঞ' বলে। প্রথমঃ ব্রহ্মযজ্ঞ অর্থাৎ স্বাধ্যায়-প্রত্যহ শুভ ও পবিত্র-ভাবোদ্দীপক কিছু কিছু পাঠ করিতে হইবে। দ্বিতীয়ঃ দেবযজ্ঞ-ঈশ্বর, দেবতা বা সাধুগণের পূজা বা উপাসনা। তৃতীয়ঃ পিতৃযজ্ঞ– আমাদের পূর্বপুরুষগণ সম্বন্ধে আমাদের কর্তব্য। চতুর্থঃ নৃযজ্ঞ– মনুষ্যজাতির প্রতি আমাদের কর্তব্য। মানুষ যদি দরিদ্র বা অভাবগ্রস্তদের জন্য গৃহ নির্মাণ না করে, তবে তার নিজের গৃহে বাস করিবার অধিকার নাই। যে কেহ দরিদ্র ও দুঃখী, তাহারই জন্য যেন গৃহীর গৃহ উন্মুক্ত থাকে, তবেই সে যথার্থ গৃহী।...কোন ব্যক্তির নিজের জন্য কিছু রন্ধন করিবার অধিকার নাই, পরের জন্যই তাহাকে রন্ধন করিতে হইবে- পরের সেবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতেই তাহার অধিকার।"[৪৫] বাজারে আম কূল প্রভৃতি নতুন নতুন জিনিস উঠলে সেগুলো কিনে গরীবদের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হয়। দীন-দুঃখী, দরিদ্রগণ সবাই ঈশ্বরের প্রতিনিধি। তাদের যত্ন নিতে হয়। যে পরকে না দিয়ে খায় সে পাপ ভোজন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, 'যত জীব তত শিব'। বিবেকানন্দ এ শিক্ষা হতে প্রতিটি জীবের মাঝে শিব বা ব্রহ্মকে দেখতে পান। তাই শোষিত, নির্যাতিত মানুষের প্রতি বিবেকানন্দ গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বলেন, 'ভারতের চির পদদলিত শ্রমজীবী তোমাকে প্রণাম করি'।

গ. জীবের প্রতি প্রেম

জীবের প্রতি প্রেম ঈশ্বর প্রেমকে গভীরতর করে তোলে। কারণ জীবের মাঝে ঈশ্বর রয়েছেন। এসম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, আমি এত তপস্যা করে এই সার বুঝেছি যে, জীবে জীবে তিনি অধিষ্ঠান হয়ে আছেন; তাছাড়া ঈশ্বর-ফিশ্বর কিছুই আর নেই। বহুরূপী ঈশ্বর জীবজন্তু, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি রূপে বিশ্ব মাঝে বিরাজ করেন। তিনি বৈচিত্র্যের মাঝে- এক। জীবকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়।-যথা-প্রাণী ও উদ্ভিদ। কারণ এদের উভয়েরই প্রাণ আছে, এদের ভালবাসতে হয়। বিবেকানন্দের বহুল প্রচারিত "সখার প্রতি" কবিতায় জীবের প্রতি অপূর্ব প্রেমের ভাব ফুটে উঠেছে।

বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর ?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।

কোন কীট-পতঙ্গ পিঁপীলিকা হত্যা করা অন্যায়। এমন কি গাছের একটি পাতা ছিঁড়লেও গাছ ব্যথা পায়। অপরের গাছের একটি পাতা ছেঁড়াও অন্যায়। কর্তব্য পালনের মধ্যমে প্রেম সুদৃঢ় হয়। বিবেকানন্দ ভূত যজ্ঞে নিম্নতর প্রাণীর প্রতি আমাদের কর্তব্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। 'ভূত যজ্ঞ অর্থাৎ নিম্নতর প্রাণীদের প্রতি আমাদের কর্তব্য। সকল জীবজন্তুকে মানুষ মারিয়া ফেলিবে, তাহাদিগকে লইয়া যাহা খুশি করিবে, এইজন্যই তাহাদের সৃষ্টি হইয়াছে-এ-কথা বলা মহাপাপ। যে শাস্ত্রে এই কথা বলে, তাহা শয়তানের শাস্ত্র, ঈশ্বরের নয়। শরীরের কোন অংশে স্নায়ু বিশেষ নড়িতেছে কিনা, দেখিবার জন্য একটি প্রাণীকে কাটিয়া দেখা-কি বীভৎস ব্যাপার ভাবুন দেখি ! এমন সময় আসিবে, যখন সকল দেশেই যে ব্যক্তি এরূপ করিবে, সে দন্ডনীয় হইবে।...যাহা হউক, গৃহে রান্না-করা আহারের এক ভাগ পশুদেরও প্রাপ্য। তাহাদিগকে প্রত্যহ খাদ্য দিতে হইবে। এদেশের প্রত্যেক শহরে অন্ধ খঞ্জ বা আতুর, ঘোড়া, গরু, কুকুর বিড়ালের জন্যও হাসপাতাল থাকা প্রয়োজন-তাহাদিগকে খাওয়াইতে হইবে এবং যত্ন করিতে হইবে।'[৪৬]

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকানন্দ মর্মে মর্মে অনুভব করেন মানবেতর প্রাণীর ব্যথা। একটি ক্ষুদ্র কীটের মধ্যেও যে সেই পরম ব্রহ্মের শক্তি নিহিত রয়েছে তাও তিনি ব্যাখ্যা করেছেন। তাই ঈশ্বরের সৃষ্ট সকল জীব-জগৎ ও প্রকৃতিকে ভালবাসার মধ্য দিয়ে তাঁকে লাভ করা যায়।

প্রেমের লক্ষণ

বিজ্ঞ বিবেকানন্দ যথাযথ উপলব্ধি করেন প্রকৃত গভীর ও নিঃস্বার্থ প্রেমের বন্ধনেই মহান বিশ্ব বিধাতাকে আবদ্ধ করা যায়। তাই তিনি ভগবৎ প্রেমের প্রকৃতি ফুটিয়ে তোলেন প্রেমের তিনটি লক্ষণের মাধ্যমে।

প্রথম লক্ষণ: '...প্রেমের প্রথম লক্ষণ এই-উহাতে কোন রূপ আদান-প্রদান নাই, প্রেম সর্বদা দিয়াই যায়। প্রেম চিরকালই দাতা-গ্রহীতা নয়। ভগবানের প্রকৃত সন্তান বলে, ভগবান যদি চান, তবে আমি তাঁহাকে আমার সর্বস্ব দিতে পারি, কিন্তু তাঁহার নিকট হইতে আমি কিছুই চাই না, এই জগতের কোন জিনিসই আমি চাই না। তাঁহাকে ভালবাসিতে চাই বলিয়াই আমি তাঁহাকে ভালবাসি, পরিবর্তে তাঁহার নিকট কোন অনুগ্রহ ভিক্ষা করি না।...তিনি প্রেমের ভগবান্-এটুকু জানিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট। আমি আর কিছুই জানিতে চাই না।'[৪৭] নিঃস্বার্থ প্রেমেই ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়।

প্রেমের দ্বিতীয় লক্ষণ: 'প্রেমে কোন রূপ ভয় নাই। ...দাস প্রভুকে ভালবাসে?...উহা ভানমাত্র বুঝিতে হইবে। যতদিন মানুষ ভগবান্‌কে মেঘের উপর আসীন, এক হাতে পুরস্কার ও অপর হাতে দণ্ড দিতেছেন বলিয়া চিন্তা করে, ততদিন কোন ভালবাসা সম্ভব নয়। ভালবাসার সহিত কখনও ভয়ের ভাব থাকিবে না। ভাবিয়া দেখুন– একজন তরুণী জননী রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন এবং একটা কুকুর তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া চিৎকার করিতেছে– অমনি তিনি সামনের বাড়ীতে আশ্রয় লইলেন। মনে করুন, পরদিনও তিনি রাস্তায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন-সঙ্গে তাঁহার শিশু সন্তান। আরও মনে করুন, একটা সিংহ আসিয়া শিশুটিকে আক্রমণ করিল; তখন তিনি কোথায় থাকিবেন, বলুন দেখি? তখন তাঁহার শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য তিনি সিংহের মুখেই যাইবেন। এখানে প্রেম ভয়কে জয় করিয়াছে। ভগবৎপ্রেম সম্বন্ধেও এইরূপ।'[৪৮] একজন বিচারপতিকে তাঁর পত্নী তাঁকে বিচারপতি বা পুরস্কার দাতা বা শাস্তি দাতা রূপে দেখেন না, তাঁকে প্রেমাস্পদ স্বামী রূপেই দেখেন। তেমনি ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে দূরত্ব কমাতে ভগবানের প্রতি ভয় ত্যাগ করে পরম বন্ধু সখা বা আপনজন ভাবতে হয়।

প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ– 'প্রেমের তৃতীয় লক্ষণ আরও উচ্চতর। প্রেম সর্বদাই উচ্চতম আদর্শ। যখন মানুষ এই দুই সোপান অতিক্রম করে, যখন সে দোকানদারি ও ভয়ের ভাব ছাড়িয়া দেয়, তখন সে উপলব্ধি করিতে থাকে যে, প্রেমই সর্বদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শ ছিল। আমরা এই জগতে কতই তো দেখিতে পাই, পরমা সুন্দরী অতি কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসিতেছে !...যে নারী কুৎসিত পুরুষকে ভালবাসে, সে তাহার নিজের মনের মধ্যে সৌন্দর্যের যে আদর্শ আছে তাহাই লইয়া যেন ঐ কুৎসিত পুরুষের উপর প্রক্ষেপ করে, সে যে ঐ কুৎসিত পুরুষকে পূজা করিতেছে ও ভালবাসিতেছে তাহা নয়, সে তাহার নিজ আদর্শেরই পূজা করিতেছে। সেই পুরুষটি যেন উপলক্ষ্যমাত্র... !...যিনি পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইহাতে ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই দর্শন করেন না। সুতরাং আমরা সর্বদাই আমাদের উচ্চতম আদর্শের উপাসনা করিয়া থাকি... ।'[৪৯] গভীর প্রেমই প্রেমাস্পদকে লাভের হাতিয়ার। প্রেম এক আত্মিক সম্পর্ক। দুটি আত্মার মিলন বা যোগসূত্র হলো প্রেম। পার্থিব কোন ব্যক্তি আত্মাকে সহজেই প্রেমের মাধ্যমে লাভ করা যায়, কিন্তু অদৃশ্য মহান পরমাত্মাকে লাভের জন্য পার্থিব বাসনা মুক্ত হৃদয়ে গভীর প্রেমে ব্যাকুল হয়ে তাঁর প্রার্থনায় বিভোর হলে অবশেষে একদিন স্বীয় করুণায় ভক্তকে সাক্ষাৎ দান করেন। তাই সকল ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ঈশ্বরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম।

জার্মান খ্রীষ্টান অতীন্দ্রিয় ভাববাদী বিখ্যাত সাধক মেস্টার একহার্ট (Eckhert) ঈশ্বরদর্শনের পূর্বে আত্মার প্রস্তুতি সম্পর্কে বলেন, 'ঈশ্বরের নিভৃত বাণী প্রবেশ করবার আগে আত্মায় অবশ্যই একটি নিথর-নীরবতা বিরাজ করবে এবং দিব্যজ্যোতিতে আত্মা দীপ্তিমান ও ঈশ্বরীয় সত্ত্বায় রূপান্তরিত হয়ে উঠবে। সমস্ত রিপুরাও পার্থিব বাসনা-কামনা যখন শান্ত হয় তখনই আত্মায় ঈশ্বরের বাণী শোনা যায়।'[৫০] এই নিরবতা শুধু বাহ্যিক ও পার্থিব কোলাহল মুক্ত শান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ নয়, এটি পার্থিব কামনা-বাসনা দ্বারা সৃষ্ট চঞ্চল চিত্তেরও প্রশান্ত অবস্থা। দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশে সর্বদা শত সহস্র পার্থিব চিন্তা ভাবনা রক্ত মাংসের দেহ ও মনের কামনা-বাসনা, দুঃখ-বেদনা প্রভৃতিতে আমাদের মন এমন ভাবে পূর্ণ থাকে, যে মনের নিভৃত অংশে বিন্দু পরিমাণ স্থানও খালি থাকে না। তাহলে এমন কোলাহলপূর্ণ ঘন সংবদ্ধ হৃদয় নিকেতনে সেই মহান দিব্য অতিথি ঈশ্বরকে আমরা কিভাবে আমন্ত্রণ জানাব?

Dhaka University Institutional Repository

'তবু যদি কখনও প্রেমময় ঈশ্বর করুণা ক'রে নিজে এসে আমাদের এই কামনাপূর্ণ হৃদয় প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করে, তবে তাঁর বসার মতো একটুখানি স্থানও তিনি খুঁজে পাবেন না, সুতরাং তিনি ফিরে যেতে বাধ্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে, ঈশ্বরের বসার জন্য আমাদের হৃদয়ে কোন স্থান নেই।'[৫১] আমরা এক মুহূর্তও ভেবে দেখি না যে, যদি ঈশ্বর আসেন, তবে আমরা তাঁকে কোথায় বসাব? আমরা কি তাঁকে অভ্যর্থনা করে হৃদয়ে বসানোর জন্য অন্তর-প্রকোষ্ঠ শূন্য করে রেখেছি? জীবনের অসংখ্য ভুলগুলো কি মার্জনা করে রেখেছি? আমরা তো কখনও এসবকথা চিন্তাও করি না। আমাদের প্রজ্ঞাদৃষ্টি অন্ধ, তাই আমরা সমস্যাগুলো চিহ্নিত করতে পারি না। মহান দিব্য অতিথিকে আমন্ত্রণ জানানোর পূর্বে আমাদের যে সব শর্ত পালন করতে হবে আমরা তাও বুঝতে পারি না।

ইংরেজীতে একটি প্রাকৃতিক নিয়মের কথা আছে, 'Nature abhors vacuum- অর্থাৎ প্রকৃতি শূন্যতা সহ্য করতে পারে না।'[৫২] তেমনি আমাদের জীবাত্মার অন্তর প্রকোষ্ঠ যদি সকল প্রকার পার্থিব চিন্তা ও বিষয় বাসনা মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ শূন্য হয়ে যায়, তখন শীঘ্রই পরম দিব্যসত্তা এসে বাসনা শূন্য হৃদয়ে সিংহাসন পেতে বসেন। সেই দিব্য সত্তা পরম পুরুষ কেবল শূন্য হৃদয় পূর্ণ করার জন্যই আসেন। তার পূর্বে নয়। কারণ শূন্য স্থান না পেলে তিনি কোথায় আসন গ্রহণ করবেন ? ঈশ্বরের দিব্যানুভূতি লাভের জন্য সর্ব প্রথম ধর্মানুশীলন দিয়ে পাপ-পঙ্কিলতাপূর্ণ হৃদয় মন্দির ধুয়ে মুছে পবিত্র করতে হবে। অন্তরে দীর্ঘ দিনের পুঞ্জীভূত সকল কামনা-বাসনা ধুলি মালিন্য দূর করে হৃদয় সম্পূর্ণ শূন্য করে নিতে হবে। মা সারদা দেবী বাসনা শূন্য হৃদয় সম্পর্কে বলেন, 'বাসনা হতেই তো দেহ, যে জন্মে মন বাসনা শূন্য হয়, সেটিই শেষ জন্ম।'[৫৩] প্রতিকূল পরিবেশে জীবন সংগ্রামের কঠিন বাস্তবতায় আমরা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যে সব ভুল ও অন্যায় কর্ম করেছি- এ সবের জন্য অনুতাপের অশ্রু বিসর্জন দিতে হবে, সেই অনুতাপ অশ্রুতে হৃদয় মন ধৌত ও মার্জিত করে পবিত্র করতে হবে। অন্তরে সৎ ও পবিত্র চিন্তা এবং বিশুদ্ধভাবের স্পন্দন সৃষ্টি করে হৃদয় মনকে নিষ্কলুষ করে হৃদয় মন্দিরে অপূর্ব স্বর্গীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। হৃদয় মন্দিরের দ্বারে সর্বদা বিবেকরূপ অতন্দ্রপ্রহরীকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে কখনও কোন ক্রমেই অশুদ্ধ, অশুভ ও অপবিত্রভাব পবিত্র হৃদয় মন্দিরের দ্বারপ্রান্ত অতিক্রম করতে না পারে। পার্থিব বাসনাপূর্ণ চিত্তে কখনও ঈশ্বরদর্শন লাভ হয় না। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Drinking the cup of desire, the world becomes mad. Day and night never come together, so desire and the Lord can never come together. Give up desire.'[৫৪] কেবল পার্থিব কামনা-বাসনা মুক্ত চিত্তে ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়। সাধকের নিকট আর কোন বিষয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত ও অজ্ঞতা থাকে না। কারণ তিনি পূর্ণ জ্ঞানী। সকল ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্য মানুষকে ঈশ্বরের সাথে পুনর্মিলিত করে। 'The ultimate goal of all mankind, the aim and end of all religions, is but one-reunion with God.'[৫৫]

শিশু সুলভ হৃদয়ের সরলতা, ব্যাকুলতা, পবিত্রতা ও সাধুতা সহকারে ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করতে হয়। গভীর আগ্রহ ও একাগ্রচিত্তে ঈশ্বরকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য দিবারাত্রি প্রতি মুহূর্তেই তাঁর আগমনের পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করতে হয়। ঈশ্বর যেন আমাদের হৃদয় মন্দির অধিকার করে বসেন। ঈশ্বরের প্রতি গভীর প্রেম যেন প্রকৃত প্রণয়ী তার প্রেমাস্পদের সুদীর্ঘ অনুপস্থিতির পর নিশ্চিত আগমনের প্রত্যাশায় অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে। প্রকৃত প্রণয়ীর প্রেমাস্পদের সাথে মিলনের তীব্র আকাঙ্খা ও ব্যাকুলতা তাকে অসহিষ্ণু করে তোলে এবং তার মনের বিক্ষিপ্ত চিন্তা ও শক্তিসমূহ যেন নিরবিচ্ছিন্ন একটি শ্রোত ধারার মতো প্রেমাস্পদের দিকে ধাবিত হয়। তেমনি প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিককে তার বিক্ষিপ্ত মনের বিচ্ছিন্ন চিন্তাধারাকে একটি শক্তিতে কেন্দ্রীভূত করে ঈশ্বরের দিব্যানুভূতির আদর্শের দিকে প্রবাহিত করতে হয়। তখন কোন পার্থিব প্রলোভন তার স্পৃহা দমন করতে পারবে না। যখন এমন প্রবল স্পৃহা জাগ্রত হয় তখনই ঈশ্বর খুব নিকটে চলে আসে। স্পৃহা যত দৃঢ়তর হয় উপলব্ধিও তত দৃঢ়তর হয়। এমন ঈশ্বর প্রেম ও সমাধি অত্যন্ত বিরল। অথচ এটিই ঈশ্বর উপলব্ধির একমাত্র অবস্থা।

২. পবিত্রতা (Purity)

ঈশ্বরদর্শনের অন্যতম শর্ত পবিত্রতা। প্রতিটি ধর্ম বলে 'পবিত্র হও'। পবিত্র অর্থ নিষ্কলুষ ও বিশুদ্ধ চরিত্রের অধিকারী। বিবেকানন্দ বলেন, 'পবিত্রতাই সর্ব প্রকার ধর্ম ও নীতির ভিত্তি'। পবিত্র হৃদয়েই ঐশী জ্যোতির প্রতিফলন ঘটে। পবিত্রতা ও চিত্তশুদ্ধি সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'পরের সেবা শুভকর্ম। এই সৎকর্মবলে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সকলের অভ্যন্তরে যে শিব রহিয়াছেন, তিনি প্রকাশিত হন। তিনি সকলের হৃদয়ে বিরাজ করিতেছেন। যদি দর্পণের উপর ধূলি ও ময়লা থাকে, তবে তাহাতে আমরা আমাদের মূর্তি দেখিতে পাই না। আমাদের হৃদয়দর্পণেও এইরূপ অজ্ঞান ও

Dhaka University Institutional Repository

পাপের ময়লা রহিয়াছে। সর্বাপেক্ষা প্রধান পাপই স্বার্থপরতা– আগে নিজের ভাবনা ভাবা।'[৫৬] আত্মশুদ্ধি, নৈতিকশৃঙ্খলা, ত্যাগ, সাধনা সংযম ও মানবিক গুণাবলী অর্জন দ্বারা আত্মা পবিত্র হয়। দেহ ও আত্মার সমন্বয়ে হয় মানুষ। একারণে পবিত্রতার দুটি দিক রয়েছে। যথা (১) দৈহিক পবিত্রতা ও (২) আত্মিক পবিত্রতা।

দেহ ও আত্মা পরস্পর নির্ভরশীল। একটি অপরটিকে প্রভাবিত করে। দেহ সুস্থ ও পবিত্র হলে মন বা আত্মাও সুস্থ ও পবিত্র হয়। দেহ ও আত্মার পবিত্রতার জন্য দুটি কর্তব্য রয়েছে। (ক) সর্বদা চিন্তা, কথা ও কাজে সৎ থাকা এবং সকল অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকা, (খ) সৎ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা। প্রদীপ যেমন অপরিচ্ছন্ন অস্বচ্ছ কাঁচের ভিতর দিয়ে বাইরে আলো বিকিরণ করতে পারে না, তেমনি দেহ ও মন পবিত্র না হলে আত্মার জ্যোতি প্রস্ফুটিত হয় না। ঋষিগণ মুক্তির উদ্দেশ্যে পবিত্রতা, শুদ্ধি বা শৌচ সম্পর্কে বলেন, "শৌচ দ্বিবিধ-বাহ্য ও আভ্যন্তর। মৃত্তিকা, জল অথবা অন্যান্য দ্রব্য দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকে 'বাহ্য শৌচ' বলে; যথা স্নানাদি। সত্য ও অন্যান্য ধর্মানুশীলন দ্বারা মনের শুদ্ধিকে 'আভ্যন্তর শৌচ' বলে। বাহ্য ও আভ্যন্তর-উভয় শুদ্ধিই আবশ্যক। কেবল ভিতরে শুচি থাকিয়া বাহিরে অশুচি থাকিলে শৌচ যথেষ্ট হইল না। যখন উভয় প্রকার শুদ্ধি কার্যে পরিণত করা সম্ভব না হয়, তখন কেবল আভ্যন্তর শৌচ অবলম্বনই শ্রেয়স্কর। কিন্তু এই উভয় প্রকার শৌচ না থাকিলে কেহই যোগী হইতে পারেন না।"[৫৭]

সৎ উপার্জন ও খাদ্য গ্রহণ

সৎ ও অসৎ উপার্জনের মধ্যে এক বিরাট মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক পাথর্ক্য রয়েছে। কোন অর্থ-সম্পদ দেখে বলার উপায় নেই-তা সৎ না অসৎ। অর্থ-সম্পদ অর্জনের উপায়ের উপর ভিত্তি করে নৈতিক বিচারে বলা হয় তা সৎ বা অসৎ। অসৎ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করলে দেহ ও মন কলুষিত হয়ে ঈশ্বরদর্শনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে। অপর দিকে সৎ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা হলে দেহ ও মন পবিত্র হয়ে আত্মজ্ঞানের উদয় হয়, ফলে ঈশ্বর দর্শন লাভের পথ প্রশস্ত হয়। একারণেই বিভিন্ন ধর্মে সৎ উপার্জনের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমিকগণ সহস্র দুঃখ কষ্ট, অভাব-অনটন, ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের মাঝেও সততা রক্ষার জন্য আজীবন প্রাণপণ সংগ্রাম করেন। তাই বিবেকানন্দ বলেন, সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা চলে, কিন্তু কোন কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা চলে না। বিবেকানন্দ সৎ জীবিকা অর্জন সম্পর্কে বলেন, 'গৃহস্থের প্রধান কর্তব্য জীবিকার্জন, কিন্তু তাঁহাকে বিশেষ লক্ষ রাখিতে হইবে, মিথ্যা কথা বলিয়া, প্রতারণা দ্বারা অথবা চুরি করিয়া যেন উহা সংগ্রহ না করেন। আর তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে হইবে, তাহার জীবন ঈশ্বরের সেবার জন্য, দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের সেবার জন্য।'[৫৮]

খাদ্য দেহ ও মন গঠন করে। ঈশ্বরের প্রতি প্রবল অনুরাগ বা ভক্তি লাভের জন্য খাদ্যাখাদ্যের বিচার অপরিহার্য। বিবেকানন্দ ঈশ্বরদর্শন লাভের জন্য খাদ্য সম্পর্কে রামানুজাচার্যের মত উল্লেখ করেন। "যে-সকল উপাদানে দেহ ও মনের বিভিন্ন শক্তি গঠিত হয়, খাদ্যের মধ্যে সেইগুলি বিদ্যমান; প্রথমতঃ 'বিবেক'। বিবেক অর্থ 'খাদ্যাখাদ্যের বিচার'। আমি এখন যে রূপ শক্তি প্রকাশ করিতেছি, তাহার সবই আমার ভুক্ত খাদ্যের মধ্যে ছিল; আমার দেহমনের ভিতর উহা পরিবর্তিত, সঞ্চিত ও নূতনদিকে চালিত হইয়াছে মাত্র। কিন্তু ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যের সহিত আমার দেহ মনের স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। বহির্জগতে জড়বস্তু ও শক্তি আমাদের ভিতর দেহ ও মনের আকার ধারণ করে, দেহ মন এবং খাদ্যের মধ্যে প্রভেদ কেবল প্রকাশের তারতম্যে।"[৫৯] বিশেষ প্রকার খাদ্য মনে বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টি করে। যে সব খাদ্য শরীরে পরিবর্তন সাধন করে পরিণামে সে সব খাদ্য মনকেও প্রবল ভাবে প্রভাবিত করে। 'ইহা একটি বিশেষ শিক্ষণীয় তত্ত্ব; আমরা যত দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি, তাহার অধিকাংশই আমাদের আহার হইতে জাত।'[৬০] আমরা দেখতে পাই, অতিরিক্ত ও গুরুপাক ভোজনের পর মনকে সংযত করা বড়ই কঠিন, তখন মন অবিরত ছুটতে থাকে। অধিক পরিমাণে সুরা বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য পান করলে মানুষ বুঝতে পারে, মনকে আর সংযত রাখা যাবে না। মন তার আয়ত্ত্বের বাইরে চলে যায়। রামানুজাচার্যের মতে খাদ্য গ্রহণের সময় তিনটি দোষ পরিহার করা কর্তব্য।

প্রথমত: জাতি দোষ– অর্থাৎ খাদ্যের প্রকৃতিগত দোষ। যথা- রসুন, পেঁয়াজ প্রভৃতি স্বভাবতঃ দুর্গন্ধ ও অশুচি খাদ্যের যে দোষ। 'সর্ব প্রকার উত্তেজক খাদ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে, যথা- মাংস। মাংসাহার ত্যাগ করিতে হইবে, কারণ উহা স্বভাবতই অপবিত্র। অন্যের প্রাণনাশ করিয়া তবেই মাংস পাইতে পারি।...আবার সেই হত্যা কার্যের জন্য সমাজ তাহাদিগকে ঘৃণা করে।...ইংলন্ডে কসাই কখনও জুরির আসন গ্রহণ করিতে পারে না– ভাবটা এই যে, কসাই স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর।'[৬১]

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয়তঃ আশ্রয়দোষ– আশ্রয়দোষ হলো পতিত ও অভিশপ্ত ব্যক্তির হাতে খেলে যে দোষ। অর্থাৎ 'যে ব্যক্তির নিকট হইতে খাদ্য আসিতেছে, তাহার সংস্পর্শে খাদ্যে যে দোষ জন্মে।...ইহার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক ব্যক্তির দেহের চতুর্দিকে এক প্রকার জ্যোতি রহিয়াছে। ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাতেই যেন তাহার প্রভাব, তাহার মনের তাহার চরিত্রের বা ভাবের কিছু অংশ লাগিয়া থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তির দেহ হইতে তাহার শক্তির মতো চরিত্র বৈশিষ্ট্যও যেন বহির্গত হইতেছে, আর ঐ ব্যক্তি যাহা কিছু স্পর্শ করে, তাহাই তাহা দ্বারা প্রভাবিত হয়। অতএব রন্ধনের সময় কে আমাদের খাদ্য স্পর্শ করিল, সে-দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। কোন দুশ্চরিত্র বা মন্দ ব্যক্তি যেন উহা স্পর্শ না করে। যিনি ভক্ত হইতে চান, তিনি যাহাদিগকে অসচ্চরিত্র বলিয়া জানেন, তাহাদের সহিত একসঙ্গে খাইতে বসিবেন না, কারণ খাদ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার ভিতর অসদ্ভাব সংক্রমিত হইবে।'[৬২]

তৃতীয়তঃ নিমিত্ত দোষ– অর্থাৎ কোন অশুচি বস্তুর, যথা- কেশ ধুলি আদি সংস্পর্শজনিত যে দোষ। 'খাদ্যে ধূলি প্রভৃতি সংস্পর্শ যেন কখনও না হয়। বাজার হইতে রাজ্যের ধূলিযুক্ত খাবার আনিয়া, উত্তমরূপে পরিষ্কার না করিয়া টেবিলের উপর রাখা ঠিক নয়। থুতু, লালা প্রভৃতি হইতেও সাবধান হইতে হইবে। ...শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি (mucous membrane) শরীরের মধ্যে অতি কোমলাংশ, এগুলি হইতে নিঃসৃত লালা দ্বারা অতি সহজে সমুদয় ভাব সংক্রমিত হয়। কোন দ্রব্যে লালার স্পর্শ-শুধু দোষাবহ নয়, বিপজ্জনক।'[৬৩] অপরের রেখে দেওয়া উচ্ছিষ্ট খাদ্য গ্রহণ করবে না।

খাদ্যের দোষগুলি বর্জন করলে খাদ্য শুদ্ধ হয়। খাদ্য শুদ্ধ হলে মনও শুদ্ধ হয়। আর মন শুদ্ধ হলে সর্বদা ঈশ্বরের স্মৃতি অব্যাহত থাকে। এ সম্পর্কে শ্রুতি বলেন, 'আহার শুদ্ধ করিলে চিত্ত শুদ্ধ হয়, চিত্ত শুদ্ধ হইলে ভাগবান্‌কে সর্বদা স্মরণ করিতে পারা যায়।'[৬৪] বিবেকানন্দ বিশুদ্ধ ভোজন সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, 'মাতা, পিতা, পুত্র, পত্নী, ভ্রাতা, অতিথিকে ভোজন না করাইয়া যে গৃহী ব্যক্তি নিজের উদরপূরণ করে, সে পাপ করিতেছে।'[৬৫]

আত্মিক পবিত্রতা: সর্বদা সৎ চিন্তা, সত্য বাক্য ও সৎ কাজ অনুশীলনে আত্মিক পবিত্রতা লাভ হয়। সৎ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করা হলে দেহ ও মন পবিত্র হয়। শঙ্করাচার্যের মতে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সমূহই আহার। আহার শুদ্ধির প্রকৃত অর্থ- ইন্দ্রিয় বিষয়ে আসক্ত না হওয়া। তিনি বলেন, "...যাহা আহৃত হয়, তাহাই আহার। শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান ভোক্তার অর্থাৎ আত্মার উপভোগের জন্য ভিতরে আহৃত হয়। এই বিষয়ানুভূতিরূপ জ্ঞানের শুদ্ধিকেই 'আহার শুদ্ধি' বলে। সুতরাং আহারশুদ্ধি অর্থে আসক্তি-দ্বেষ-বা মোহ-শূন্য হইয়া বিষয়ের জ্ঞান আহরণ। সুতরাং এইরূপে জ্ঞান বা 'আহার' শুদ্ধ হইলে এইরূপ ব্যক্তির সত্ত্ব অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ হইয়া যাইবে। সত্ত্বশুদ্ধি হইলে অনন্ত পুরুষের যথার্থ স্বরূপজ্ঞান ও অবিচ্ছিন্ন স্মৃতি আসিবে।"[৬৬] জ্ঞান আত্মার আহার। আসক্তি শূন্য সৎ জ্ঞানার্জনে আত্মবিকাশ ঘটে, ফলে আত্মার স্বরূপ দর্শন লাভ হয়।

ঈশ্বরদর্শনের জন্য একমাত্র পবিত্রতারূপ ভিত্তির উপর ভক্তি প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাহ্য শৌচ এবং খাদ্যাখাদ্য বিচার এ দুটি কাজ সহজ, কিন্তু আত্মশুদ্ধি ছাড়া এ দুটো কাজের কোন মূল্য নেই। কল্যাণ অর্থ পবিত্রতা। বিবেকানন্দ আত্মিক পবিত্রতা বা কল্যাণ সম্পর্কে বলেন, "নিম্ন লিখিত গুণগুলি কল্যাণ-শব্দবাচ্যঃ
১ম, সত্য; যিনি সত্যনিষ্ঠ, তাঁহার নিকট সত্যের ঈশ্বর প্রকাশিত হন-কায়মনো বাক্যে সম্পূর্ণরূপে সত্যসাধন করিতে হইবে। ২য়, আর্জব-অকপট ভাব, সরলতা-হৃদয়ের মধ্যে কোনরূপ কুটিলতা থাকিবে না, মন মুখ এক করিতে হইবে; যদিও একটু কর্কশ ব্যবহার করিতে হয়, তথাপি কুটিলতা ছাড়িয়া সরল সহজ পথে চলা উচিত। ৩য়, দয়া। ৪র্থ, অহিংসা অর্থাৎ কায়মনোবাক্যে কোন প্রাণীর অনিষ্ঠাচরণ না করা। ৫ম, দান। দান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম আর নাই।...হস্ত নির্মিত হইয়াছে-কেবল দিবার জন্য। উপবাসে মরিতে হয় তাহাও শ্রেয়ঃ, রুটির শেষ টুকরাটি পর্যন্ত দান করুন; পরকে খাদ্য দিতে গিয়া যদি আপনার অনাহারে মৃত্যু হয়, তবে আপনি এক মুহূর্তেই মুক্ত হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি পূর্ণ হইয়া যাইবেন, তৎক্ষণাৎ আপনি ঈশ্বর হইয়া যাইবেন।...জগতে কি যথেষ্ট ছেলে মেয়ে নাই ? স্বার্থপরতাবশেই লোকে বলিয়া থাকে, আমার নিজের একটি সন্তান চাই। ৬ষ্ঠ, অনভিধ্যা- পরের দ্রব্যে লোভ পরিত্যাগ বা নিস্ফল চিন্তা পরিত্যাগ বা পরকৃত অপরাধ সম্বন্ধে চিন্তা পরিত্যাগ।"[৬৭] বিবেকানন্দের মতে, আত্মিক পবিত্রতা অর্জনের জন্য সত্য নিষ্ঠা, সরলতা-দয়া-অহিংসা দান ও নির্লোভ হওয়া প্রভৃতি সদ্‌গুণ অনুশীলন প্রয়োজন। তিনি ঈশ্বরদর্শনের জন্য পবিত্র হৃদয় সম্পর্কে বলেন, 'ঈশ্বরের কৃপা হইলেই এই বন্ধন ঘুচিয়া যাইতে পারে এবং পবিত্র-হৃদয় মানুষের উপরই তাঁহার কৃপা হয়। অতএব পবিত্রতাই তাঁহার কৃপা লাভের উপায়ে। কিভাবে তাঁহার করুণা কাজ করে? শুদ্ধ বা পবিত্র হৃদয়েই

Dhaka University Institutional Repository

তিনি নিজেকে প্রকাশিত করেন। নির্মল বিশুদ্ধ মানুষ ইহজীবনেই ঈশ্বরের দর্শন লাভ করেন। তখনই–কেবল তখনই হৃদয়ের সকল কুটিলতা সরল হইয়া যায়, সকল সন্দেহ বিদূরিত হয়।'[৬৮]

৩. সাধনা (Meditation)

কোন অভীষ্ট বিষয়ে সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টাই হলো সাধনা। ঈশ্বরদর্শনের কষ্টসাধ্য অথচ জ্ঞান ঘন ও আনন্দঘন অনুশীলন হলো আধ্যাত্মিক সাধনা। ঈশ্বরদর্শনের সাধনায় সিদ্ধি লাভের উপায় হলো বিভিন্ন দৈহিক ও মাসনিক প্রক্রিয়ায় ধ্যান, জপ, প্রার্থনা প্রভৃতি অনুশীলন করা। মুক্তিকামী সাধককে প্রবল ইচ্ছাশক্তি, একাগ্রতা, সত্য, সংযম ও অধ্যবসায়ের সাথে নিয়মিত অধ্যাত্ম সাধনা করতে হয়। বিবেকানন্দ বলেন, সাধনায় অলৌকিক বিষয় দর্শন হলে অবিশ্বাসী লোকও বিশ্বাস প্রবণ হয়ে উঠে।

মন নিয়ন্ত্রণ

সাধনার সবচেয়ে কঠিন কাজ হলো চঞ্চল মনকে স্থির ও নিয়ন্ত্রণ করা। যত দিন না মন নিয়ন্ত্রণ হয় তত দিন হাজার চেষ্টাতেও ঈশ্বরদর্শন হয় না। কারণ মনের চক্ষু, অন্তর চক্ষু বা স্বজ্ঞার মাধ্যমেই ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়। পার্থিব প্রতিকূল পরিবেশের জীবন সংগ্রামে আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয় ও মন সর্বদা বহির্মূখী চিন্তায় নিমজ্জিত। কিন্তু অন্তর্যামীকে জানতে হলে ইন্দ্রিয় ও মন নিয়ন্ত্রণ করে অন্তর্মূখী চিন্তা করতে হয়। সাধনায় সিদ্ধি লাভের জন্য মনের বিভিন্ন শক্তি যেমন- ইচ্ছাশক্তি, একাগ্রতা, সূক্ষ্ম অনুভূতি, গভীর উপলব্ধি ক্ষমতা প্রভৃতি মানসিক শক্তিগুলো অনুশীলন ক্রমান্বয়ে যত তীব্র ও গভীর হয় ততই বেশি দিব্যানুভূতি লাভ হয়। শারীরিক, মানসিক, বৈষয়িক সকল পার্থিব ও আধ্যত্মিক কাজে সাফল্যের মূলে রয়েছে মনের প্রবল ইচ্ছাশক্তি। প্রবল ইচ্ছা শক্তিই বড় বড় কাজের জনক। দুর্বল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি কখনও সফলতা লাভ করতে পারে না। কারণ তার মনে কাজের ফল সম্পর্কে প্রথম থেকেই থাকে সংশয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস। '...ইচ্ছাশক্তিকে হৃদয়ের গভীরতম আকাঙ্খা বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যে আকাঙ্খার পূর্ণত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে বিন্দু মাত্রও মনে অবিশ্বাস বা সন্দেহ নাই, অর্থাৎ যাহা নিশ্চিত রূপে পূর্ণ হইবে বলিয়া প্রাণে স্থির বিশ্বাস আছে, তাহাই ইচ্ছাশক্তি। মানুষ যাহা ইচ্ছা করে তাহাই লাভ করিতে পারে, যদি তাহার আকাঙ্খা প্রবল হয়। বাস্তবিক প্রখর ইচ্ছাশক্তিশালী ব্যক্তির অপ্রাপ্য বস্তু সংসারে কিছুই নাই।'[৬৯] ঈশ্বরদর্শনের প্রবল ইচ্ছা পোষণ করলে দেহ মনে এক তীব্র ব্যাকুলতা সৃষ্টি হয়, ফলে কাঙ্খিত বিষয়ে সাফল্য লাভ হয়। মানবাত্মা এক বিশাল রহস্য সমুদ্র ও অনন্ত জ্ঞানের খনি। আত্মার বিভিন্ন রহস্য সাধকের নিকট বহন করে নিয়ে আসে মন। এই মনেরও বিভিন্ন প্রকার শক্তি রয়েছে। 'যেমন, দিব্যদৃষ্টি (Clairvoyance), দিব্যশ্রুতি (Clairaudience), দিব্যানুভূতি (Psychometry), রোগারোগ্যের শক্তি (Healing power) ইত্যাদি। উহাদিগকে একত্রিত ভাবে "মনঃশক্তি" (mind-power) বলে। "ইচ্ছাশক্তি" মনঃশক্তিরই একটি বিশেষ রূপ।'[৭০] মনের বিভিন্ন প্রকার শক্তির মধ্যে ইচ্ছাশক্তি প্রধান। কারণ ইচ্ছাশক্তি ছাড়া অন্যান্য শক্তি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না। শীতল, উষ্ণতা, বায়ুপ্রবাহ, বিভিন্ন প্রকার ঘ্রাণ প্রভৃতি সূক্ষ্ম ক্রিয়াগুলো সূক্ষ্ম মন দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। তেমনি যার অনুভূতি যত সূক্ষ্ম হয়, সে তত মনের অভ্যন্তরে কোন শক্তি, আভাস বা জ্যোতি দর্শন বেশি উপলব্ধি করতে পারে। বিবেকানন্দ অনুভূতি ও উপলব্ধির এক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলেন, "এই যে সেদিন বৈদ্যনাথ দেওঘরে প্রিয় মুখুজ্যের বাড়ি গিয়েছিলুম, সেখানে এমন হাঁপ ধরল যে প্রাণ যায়। ভেতর থেকে কিন্তু শ্বাসে শ্বাসে গভীর ধ্বনি উঠতে লাগ– 'সোহহং সোহহং'...।"[৭১] বিবেকানন্দ জানতে পারলেন যে, 'সোহহং'– তুমিই সেই আত্মা (ঈশ্বর)।

বানররূপী মন

সাধনার ক্ষেত্রে দুরন্ত মনকে সংযত ও শান্ত করা একান্ত প্রয়োজন। বিবেকানন্দ মনকে দুরন্ত ও চঞ্চল বানরের সঙ্গে তুলনা করে বলেন, 'মন সংযত করা কি কঠিন ! ইহাকে যে উন্মত্ত বানরের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে। এক বানর ছিল, স্বভাবতই চঞ্চল-যেমন সব বানর হইয়া থাকে। যেন ঐ স্বাভাবিক অস্থিরতা যথেষ্ট ছিল না, তাই এক ব্যক্তি উহাকে অনেকটা মদ খাওয়াইয়া দিল, তাহাতে সে আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। তারপর তাহাকে এক বৃশ্চিক দংশন করিল। তোমরা অবশ্যই জান, কাহাকেও বৃশ্চিক দংশন করিলে সে সারাদিনই চারিদিকে কেবল ছটফট করিয়া বেড়ায়। সুতরাং ঐ বানর-বেচারার দুরবস্থার চূড়ান্ত হইল। পরে যেন তাহার দুঃখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্যই এক ভূত তাহার ভিতরে প্রবেশ করিল। এই অবস্থায় বানরটির যে দুর্দমনীয় চঞ্চলতা দেখা দিল, তাহা কোন ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মনুষ্য-মন ঐ বানরের তুল্য, স্বভাবতই অবিরত ক্রীয়াশীল, আবার বাসনারূপ মদিরাপানে মত্ত

Dhaka University Institutional Repository

হইলে উহার অস্থিরতা বৃদ্ধি পায়। যখন বাসনা আসিয়া মনকে অধিকার করে, তখন অপরের সফলতা-দর্শনে ঈর্ষারূপ বৃশ্চিক তাহাকে দংশন করিতে থাকে। শেষে আবার যখন অহঙ্কাররূপ পিশাচ তাহার ভিতরে প্রবেশ করে, তখন সে নিজেকেই বড় বলিয়া মনে করে। এই রূপ মনকে সংযত করা কি কঠিন!'[৭২] শান্ত স্থির ও একাগ্র মনের সাধনায় ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়।

মন সংযম

সাধনায় মনই মনকে পর্যবেক্ষণ করে। মনের এমন একটি ক্ষমতা আছে, যা দ্বারা তার নিজের ভিতরটি দেখতে পায়। এটিকে মনের অন্তঃপর্যবেক্ষণ শক্তি বলে। যেমন, আমি কারও সাথে কথা বলছি, আবার ঐ সময়েই আমি যেন আর একজন লোক বাইরে দাঁড়িয়ে রয়েছি, যা করছি তা জানছি ও শুনছি। মনের সকল শক্তি একত্র করে মনের উপর প্রয়োগ করতে হয়। মন সংযমের জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থাকা ও মনকে নিজের ভাবে চলতে দেওয়া হয়। মন সদা চঞ্চল। মন বানর যত ইচ্ছা লম্ফ-ঝম্ফ করুক ক্ষতি নেই। শান্তভাবে অপেক্ষা করে মনের গতি লক্ষ্য করে যাবে। জ্ঞানই শক্তি। যতক্ষণ না জানতে পারবে-মন কি করছে, ততক্ষণ মনকে সংযত করা যাবে না। মনকে যথা ইচ্ছা বিচরণ করতে দিবে, অনেক বীভৎস চিন্তা হয়তো মনে উঠবে। প্রথম কয়েকমাস দেখবে অসংখ্য চিন্তা আসছে, ক্রমে চিন্তা কিছুটা কমেছে। অবশেষে মন সম্পূর্ণরূপে বশীভূত হবে। প্রতিদিনই ধৈর্য্যের সাথে অভ্যাস করবে। ক্রমে অনেক বৎসর অভ্যাস করলে কৃতকার্য হওয়া যায়। তখন দেখা যায় মন কিছুরই অধীন নয়। এভাবে মন সংযত করে ইন্দ্রিয় কেন্দ্রের সাথে যুক্ত হতে না দেওয়াই প্রত্যাহার।

ক্ষণস্থায়ী পার্থিব প্রতিকূল পরিবেশে কিভাবে মন নিয়ন্ত্রণ করে আমরা ঈশ্বরদর্শনের দিকে চালিত করে মুক্তি লাভ করতে পারি। এ সম্পর্কে উপনিষদের এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হলো, "কঠ-উপনিষদে দেহকে রথ, মনকে লাগাম, বুদ্ধিকে সারথি, ইন্দ্রিয়গুলিকে ঘোড়া এবং ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়গুলিকে রাস্তার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। রথী আত্মা ও সারথি বুদ্ধি সেই রথে বসে আছেন। সারথি যদি বুদ্ধিরূপ ঘোড়াকে সংযত করতে না পারে, তা হ'লে কখনও লক্ষ্যে পৌঁছতে পারবে না, দুষ্ট ঘোড়ার মতো ইন্দ্রিয়গুলি রথকে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে গিয়ে রথীকে ধ্বংস করেও ফেলতে পারে। কিন্তু এই দুটি শক্তি-প্রবাহ (ঈড়া ও পিঙ্গলা) দুষ্ট অশ্বকে দমন করবার জন্য সারথির হাতে লাগামের মতো; এ দুটি (লাগাম) আয়ত্তে রেখে সারথি ওগুলিকে (অশ্ব) নিয়ন্ত্রণ করবে। নীতিপরায়ণ হবার শক্তি আমাদের লাভ করতে হবে, তা না হ'লে আমাদের কর্মগুলিকে আমরা কিছুতেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারব না। নীতিশিক্ষাগুলি কি ক'রে কর্মে পরিণত করতে পারা যায়, যোগ সেই শিক্ষা দেয়। নীতি পরায়ণ হওয়াই যোগের উদ্দেশ্য।

জগতের বড় বড় আচার্যমাত্রেই যোগী ছিলেন এবং প্রত্যেক শক্তি প্রবাহকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে বশে এনেছিলেন। এই প্রবাহ-দুটিকে যোগীরা মেরুর নিম্নভাগে (মূলাধারে) সংযত ক'রে মেরুদণ্ডের ভেতর দিয়ে চালিত করেন, আর তখনই তা জ্ঞান প্রবাহে পরিণত হয়, এ শুধু যোগীর মধ্যেই বর্তমান।'[৭৩] কঠোর অনুশীলনের মাধ্যমে ইন্দ্রিয় সংযম ও মন নিয়ন্ত্রণ করেই আত্মদর্শন লাভ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ক্রমান্বয়ে মনের একাগ্রতা সাধন প্রক্রিয়া

বিবেকানন্দ বিক্ষিপ্ত মনের কেন্দ্রীভূত শক্তি সম্পর্কে বলেন, 'মনের শক্তিসমূহ ইতস্ততোবিক্ষিপ্ত আলোকরশ্মি সদৃশ। উহারা কেন্দ্রীভূত হইলেই সব কিছু আলোকিত করে, ইহাই আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উপায়।'[৭৪]

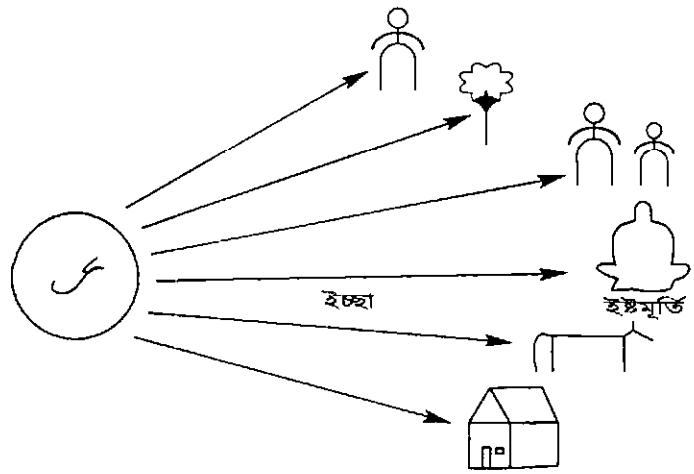

বিক্ষিপ্তমন (ইচ্ছা বিভিন্ন বস্তুতে ছড়িয়ে আছে)

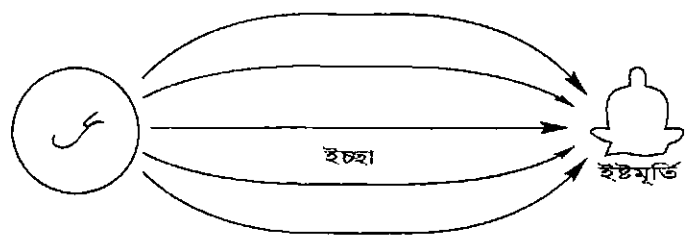

প্রার্থনারত মন (ইচ্ছার শক্তিসমূহ ইষ্টাভিমুখী হয়েছে)

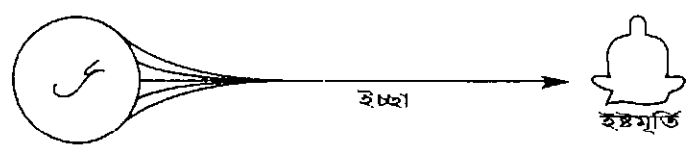

'সূর্যের তীক্ষ্ণ রশ্মির নিকট অতি অন্ধকার কোণগুলিও যেমন তাহাদের গুপ্ত তথ্য প্রকাশ করিয়া দেয়, তেমনি এই একাগ্র মন নিজের অতি অন্তরতম রহস্যগুলি প্রকাশ করিয়া দিবে।...তখনই আমরা অনুভব করিব- আত্মা আছে কিনা, জীবন ক্ষণস্থায়ী না অনন্তকালব্যাপী, বুঝিব– জগতে ঈশ্বর বলিয়া কেহ আছেন কিনা। সবই আমাদের সমক্ষে উদ্ঘাটিত হইবে।'[৭৫] একাগ্র মনের সাধানায় আত্মদর্শন লাভ হয়।

একাগ্রতা সাধন হলে ঈশ্বর দর্শন লাভ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ শুকদেবের ঘটনা উল্লেখ করা হলো। বেদান্ত সূত্রের লেখক মহর্ষি ব্যাস পুত্র শুক দেবকে শিক্ষার জন্য বিদেহ জনক রাজার নিকট পাঠালেন। 'রাজা জানিতেন যে, ব্যাসের পুত্র তাঁহার নিকট তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা করিবার জন্য আসিতেছেন, সুতরাং তিনি পূর্ব হইতেই কতকগুলি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। যখন এই বালক গিয়া রাজপ্রাসাদের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, তখন প্রহরিগণ তাঁহার কোন খবরই লইল না। তাঁহারা কেবল তাঁহাকে বসিবার জন্য একটি আসন দিল। সেখানে তিনি তিন দিন তিন রাত্রি বসিয়া রহিলেন, কেহ তাঁহার সঙ্গে কথাই কহিতেছে না; তিনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন– কেহই কিছু জিজ্ঞাসা করিল না ! তিনি এত বড় একজন ঋষির পুত্র, তাঁহার পিতা সমগ্র দেশে সম্মানিত, তিনি নিজেও একজন মাননীয় ব্যক্তি, তথাপি সামান্য প্রহরিগণও তাঁহার দিকে ভ্রূক্ষেপ করিতেছে না। অতঃপর সহসা রাজার মন্ত্রিগণ এবং বড় বড় কর্মচারীরা আসিয়া তাঁহাকে অতিশয় সম্মানের সহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে ভিতরে এক সুশোভিত গৃহে লইয়া গেলেন,

Dhaka University Institutional Repository

সুগন্ধি জলে স্নান করাইলেন, খুব ভাল ভাল পোশাক পরিতে দিলেন, আট দিন ধরিয়া তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিলাসের ভিতর রাখিয়া দিলেন।

কিন্তু এই ব্যবহারের পরিবর্তনে শুকের শান্ত গম্ভীর মুখে এতটুকু পরিবর্তন ঘটিল না। দ্বারে অপেক্ষা করিবার সময় তিনি যেরূপ ছিলেন, এই-সকল বিলাসের মধ্যেও তিনি ঠিক সেইরূপই রহিলেন। তখন তাঁহাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইল। রাজা সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, নৃত্য-গীত-বাদ্য ও অন্যান্য আদোম-প্রমোদ চলিতেছিল। রাজা তাঁহাকে কানায়-কানায় পূর্ণ এক বাটি দুধ দিয়া বলিলেন, 'এই দুধের বাটিটি লইয়া সাতবার রাজসভা প্রদক্ষিণ করিয়া এস; সাবধান, যেন এক ফোঁটা দুধও না পড়ে।' বালক ও সেই বাটিটি লইয়া এইসব গীতবাদ্য ও সুন্দরী রমণীগণের মধ্য দিয়া সাতবার সভা প্রদক্ষিণ করিলেন, এক ফোঁটা দুধও পড়িল না। সেই বালকের মনের উপর এমন ক্ষমতা ছিল যে, যতক্ষণ না তিনি ইচ্ছা করিবেন, ততক্ষণ তাঁহার মন কিছু দ্বারাই আকৃষ্ট হইবে না। বালক সেই পাত্রটি রাজার নিকট লইয়া আসিলে রাজা তাঁহাকে বলিলেন, 'তোমার পিতা তোমাকে যাহা শিখাইয়াছেন এবং তুমি নিজে যাহা শিখিয়াছ, আমি তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতে পারি, তুমি সত্য উপলব্ধি করিয়াছ; এখন গৃহে গমন কর।"[৭৬] এ শিক্ষায় প্রমাণিত হয়, যে নিজের মন নিয়ন্ত্রণ করেছে সে কোন কিছুর দাসত্ব করে না। তাঁর মন মুক্ত এবং ঈশ্বরদর্শনে সমর্থ।

সাধনার দুটি স্তর

প্রতিটি ধর্মের দুটি স্তর রয়েছে। যথা– আনুষ্ঠানিকতা ও আধ্যাত্মিক সাধনা। মানুষ এ দুটি স্তর অতিক্রম করেই ঈশ্বরদর্শন লাভ করে।

প্রথম স্তরঃ আনুষ্ঠানিকতা- ইসলাম ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকগুলো যেমন– নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, দান, ঈদ, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা। তেমনি সনাতন ধর্মের আনুষ্ঠানিক দিকগুলো হলো পূজা, কীর্তন, উপবাস, যজ্ঞ বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও আলোচনা সভা। ধর্মের এসব আনুষ্ঠানিক দিকগুলো ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনকে সুন্দর-সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ করে তোলার অনুশীলন শিক্ষা দেয়। কিন্তু ঈশ্বরদর্শনের ক্ষেত্রে আনুষ্ঠানিক দিকগুলো প্রথম বা নিম্ন স্তরের সোপান। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, '(ঈশ্বরদর্শন) সেজন্য প্রথমে বাইরের পূজা, তারপরে জপ, তারপর ধ্যান। এই বাইরের পূজা সব থেকে নিম্ন স্তরের সোপান।'[৭৭] আধুনিক যান্ত্রিক ও বস্তুবাদী বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রভাবে মানুষ ক্রমান্বয়ে নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক ও জড়বৎ হয়ে পড়েছে। তেমনি বিপরীত দিকে ধর্মীয় শক্তি মানুষের সুপ্ত আধ্যাত্মিক প্রতিভা জাগিয়ে তোলার সংগ্রামে নিয়োজিত। পূজা, কীর্তন, প্রার্থনা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বড় দিন, নামাজ, ঈদ প্রভৃতি অনুষ্ঠান বৃহত্তর মানব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে, আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি করে, ত্যাগ সংযম প্রেম ও দায়িত্ববোধ শিক্ষা দিয়ে অবিচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধন গড়ে তোলে। আর এসব আনুষ্ঠানিকতা মনুষ্যত্ব অর্জন করে মানবকল্যাণ সাধনের মধ্য দিয়ে সাধকের ঈশ্বরদর্শনের পরবর্তী আধ্যাত্মিক সাধনার ভিত্তি সুদৃঢ় করে।

ঈশ্বরদর্শনের জন্য আনুষ্ঠানিক ব্রত পালনের উর্ধ্বে আধ্যত্মিক জ্ঞানার্জন প্রয়োজন। এ সম্পর্কে স্বামী বীরেশ্বরানন্দ বলেন, 'আমরা ব্রত পালন করছি, তীর্থভ্রমণ করছি, দান করছি। দান করা, তীর্থে যাওয়া, মন্দিরে ঘুরে আসা, প্রণামী দেওয়া বা ব্রত পালন করা-এ-সমস্ত হলো সাধারণ ব্যাপার। শঙ্করাচার্য বলে গেছেন, এ সবের দ্বারা কিছু হবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞান লাভ না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত মুক্তি নেই।'[৭৮] বিবেকানন্দ সংকীর্ণ লোকাচারে ধর্মের আনুষ্ঠানিকতা সম্পর্কে বলেন, 'এখনকার গির্জার ধর্ম সেনানিবাসে সৈন্যগণের কসরতের মতো হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বন্দুক কাঁধে তোল, হাঁটু গাড়ো, বই হাতে কর-সব ধরাবাঁধা। দু-মিনিট ভাবভক্তি, দু-মিনিট জ্ঞানবিচার, দু-মিনিট প্রার্থনা-সব পূর্ব হইতেই ঠিক করা। এ অতি ভয়াবহ ব্যাপার- গোড়া হইতেই এ-বিষয়ে সাবধান হইতে হইবে। এই-সব ধর্মের বিকৃত অনুকরণ ও হাস্যকর অনুষ্ঠান এখন আসল ধর্মকে বিতাড়িত করিয়া বসিয়া আছে।'[৭৯] তাই প্রকৃত প্রার্থনা সম্পর্কে যীশুখ্রীষ্ট বলেন, 'প্রার্থনার সময় তোমরা নিভৃত কক্ষে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ কর, এবং গোপনে বিরাজমান তোমার স্বর্গীয় পিতার নিকট প্রার্থনা কর।'[৮০] ঈশ্বরদর্শন যে প্রকৃত ধর্ম সে সম্পর্কে শ্রীশ্রী ঠাকুর বলেন, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবদ্দর্শন আর সেটাই ধর্ম। আর এই ভগবদ্দর্শনের জন্য আধ্যাত্মিক সাধনা প্রয়োজন।

দ্বিতীয় স্তরঃ আধ্যাত্মিক সাধনা– গুরু প্রদত্ত শিক্ষা ও মন্ত্র জপ করে ধারণা ধ্যান ও সমাধির স্তরে উপনীত হয়ে স্বজ্ঞার মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ঈশ্বরদর্শন লাভের যে প্রচেষ্টা-তাই হলো আধ্যাত্মিক সাধনা। যিনি কখনও আধ্যাত্মিক সাধনা করেননি, তিনি নিজেকে দুর্লভ মানব জীবনের এক অতুলনীয় পরমানন্দ থেকে বঞ্চিত করেছেন। ঈশ্বর প্রেমিকগণ সাধনা করে

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরদর্শনের পরমানন্দ লাভ করেন। বিবেকানন্দ ধ্যান সম্পর্কে বলেন, 'Religion is realization'– ধর্ম হচ্ছে অনুভূতি।...বাইরের প্রকৃতি ও অন্তরের প্রকৃতিকে দমন করে সুপ্ত ব্রহ্মকে ব্যক্ত করাই হচ্ছে ধর্ম। ...জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি এবং রাজযোগ। এর যে-কোন একটার দ্বারা, না হয় একটার সঙ্গে আরেকটা মিশিয়ে, না হয় সবগুলি মিশিয়ে আমরা ব্রহ্মকে– আত্মাকে ব্যক্ত করতে পারি।'[৮১] আর আত্মদর্শন হলেই মুক্তি লাভ হয়– এটাই ধর্ম সাধনার উদ্দেশ্য। এ স্তরে গুরু প্রদত্ত মন্ত্র জপ করতে করতে, ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণ করতে করতে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় দিব্যদৃষ্টি বা স্বজ্ঞা লাভ হলে সরাসরি ব্রহ্মদর্শন হয়। আধ্যাত্মিক সাধনার তিনটি ধাপ রয়েছে। যথা-ধারণা, ধ্যান ও সমাধি।

১. ধারণা: ধারণা অর্থ- একাগ্রতা। মনকে একটি বিষয়ে ধরে রাখাই ধারণা। অর্থাৎ 'একটি বস্তুর উপরে, একাগ্রতা-অভ্যাস। এই গ্লাসটির উপর আমার মন একাগ্র করিতে চেষ্টা করিতেছি। এই গ্লাসটি ছাড়া অপর সকল বিষয় মন হইতে তাড়াইয়া দিয়া শুধু ইহারই উপর মনঃসংযোগ করিতে চেষ্টা করিতে হইবে। কিন্তু মন চঞ্চল।'[৮২]

২. ধ্যান: ভগবান রামানুজ অথাতো ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা সূত্রে ধ্যানে স্মরণ থেকে দর্শন লাভ সম্পর্কে বলেন, 'এক পাত্র হইতে অপর পাত্রে নিক্ষিপ্ত অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় প্রবাহিত ধ্যেয় বস্তুর নিরন্তর স্মরণের নাম ধ্যান। যখন ভগবৎ-সম্বন্ধে এইরূপ অবিচ্ছিন্ন স্মৃতির অবস্থালব্ধ হয়, তখন সকল বন্ধন নাশ হয়।...যিনি সন্নিহিত, তাঁহাকে দর্শন করা যাইতে পারে; কিন্তু যিনি দূরবর্তী, তাঁহাকে কেবল স্মরণ করা যাইতে পারে; তথাপি শাস্ত্র আমাদিগকে সন্নিহিত ও দূরস্থ উভয়কেই দর্শন করিতে বলিতেছেন, সুতরাং ঐরূপ স্মরণ ও দর্শন এক পর্যায়ের কার্য বলিয়া সূচিত হইল। এই স্মৃতি প্রগাঢ় হইলে দর্শনের তুল্য হইয়া পড়ে।'[৮৩] মন এক বিষয়ে একাগ্র করতে পারলে সেই মন যে কোন বিষয়ে হোক না কেন, একাগ্র করতে পারা যায়। বিভিন্ন প্রকার প্রলোভন থেকে মনকে ফিরিয়ে এনে কোন এক বিষয়ে নিবিষ্ট করাই ধ্যান। এক মুহূর্ত ধ্যানের ফলে এই প্রকৃতিতেই পরিবর্তন আনা যায়, এটি হল ধ্যানের শক্তি। '...ধ্যানের শক্তি–চিন্তার গভীরতা। ইহারা নিজ নিজ আত্মাকে মন্থন করেন। মহান সত্যসমূহ উপরিভাগে আসিয়া প্রতিভাত হয়। অতএব ধ্যানাভ্যাসই জ্ঞান লাভের বিজ্ঞান সম্মত পন্থা। ধ্যানের শক্তি ব্যতীত জ্ঞান হয় না।'[৮৪]

৩. সমাধি: সাধনার সর্বোচ্চ পর্যায় সমাধি। ধ্যানের শক্তি যখন এত বৃদ্ধি পায় সাধক অনুভবের বহির্ভাগ বর্জন করে শুধু উহার অন্তর্ভাগটির অর্থাৎ অর্থের ধ্যানই করেন, তখন সেই অবস্থার নাম সমাধি। সমাধিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক ও অভিন্ন হয়ে যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, '...যখন গ্লাসটি ও আমার মধ্যে পার্থক্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় (সমাধি বা পরিপূর্ণ তন্ময়তা)। তখন মন ও গ্লাসটি অভিন্ন হইয়া যায়। উভয়ের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখি না। তখন সকল ইন্দ্রিয় কর্মবিরত হয় এবং যে-সকল শক্তি অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের মধ্য দিয়া ভিন্ন ভিন্ন পথে ক্রিয়া করে, সেগুলি মনেতেই কেন্দ্রীভূত হয়। তখন গ্লাসটি পুরোপুরিভাবে মনঃশক্তির অধীনে আসিয়াছে। ইহা উপলব্ধি করিতে হইবে। যোগিগণের অনুষ্ঠিত ইহা একটি প্রচণ্ড শক্তির খেলা।'[৮৫] ধ্যানে জ্ঞানের তত্ত্ব বুঝতে হয়। যেমন একটি শব্দ হলে সেটির কম্পন সৃষ্টি হয়। তারপর সেটি স্নায়বীয় গতি ও মস্তিষ্কে গতির মাধ্যমে মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, ফলে বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হয়। যোগ শাস্ত্রে এ তিনটিকে- শব্দ অর্থ ও জ্ঞান বলে। এ তিনটি প্রক্রিয়া ভিন্ন হলেও এমনভাবে মিশে, ফলে এগুলোর প্রভেদ খুব অস্পষ্ট। এগুলোকে পৃথক করতে না পেরে সম্মিলিত ফল অনুভব করে বাহ্য বস্তু বলা হয়। কিন্তু ধ্যানে প্রত্যেক অনুভব ক্রিয়ার শব্দ অর্থ ও জ্ঞানকে পৃথকভাবে জানতে হবে। প্রথমে স্থূল বস্তু পরে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর বিষয় নিয়ে ধ্যান করতে হয়, শেষে বিষয় শূন্য ধ্যানে পরিণত হয়।

'মনকে প্রথমে অনুভূতির বাহ্য কারণগুলি, পরে স্নায়ু মধ্যস্থ গতি, তারপর নিজের প্রতিক্রিয়াগুলিকে অনুভব করিবার জন্য নিযুক্ত করিতে হইবে। মন যখন বেদনা বা অনুভূতির বাহ্য কারণগুলি পৃথক্‌ভাবে জানিতে পারিবে, তখন মনের সমুদয় সূক্ষ্ম-জড় পদার্থ, সমুদয় সূক্ষ্মশরীর ও সূক্ষ্মরূপ অনুভব করিবার ক্ষমতা হইবে। মন যখন অভ্যন্তরীণ গতিগুলিকে পৃথক্‌ভাবে জানিতে পারিবে, তখন নিজের ও অপরের মানসিক তরঙ্গগুলি জড়-শক্তিরূপে পরিণত হইবার পূর্বেই মন ঐগুলি নিয়ন্ত্রিত করিবার ক্ষমতা লাভ করিবে। যখন মন মানসিক প্রতিক্রিয়াগুলিকে পৃথকভাবে অনুভব করিবে, তখন যোগী সবকিছুর জ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন; কারণ অনুভবযোগ্য প্রতিটি বস্তু, প্রতিটি চিন্তা এই মানসিক প্রতিক্রিয়ার ফল। এরূপ অবস্থা লাভ হইলে যোগী নিজ মনের ভিত্তি পর্যন্ত অনুভব করিবেন এবং মন তখন তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্বে আসিবে। যোগীর তখন নানা প্রকার অলৌকিক শক্তি লাভ হয়; যদি তিনি এই সকল শক্তির কোন একটি দ্বারা প্রলুব্ধ হইয়া পড়েন, তবে তাঁহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। ভোগের পশ্চাতে ধাবমান হইলে এই অনিষ্ট হয়।

Dhaka University Institutional Repository

কিন্তু যদি এই-সকল অলৌকিক শক্তি পর্যন্ত ত্যাগ করিবার ক্ষমতা তাঁহার থাকে, তবে তিনি মন-সমুদ্রে বৃত্তি-তরঙ্গ সম্পূর্ণ নিরোধ-করা-রূপ যোগের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইতে পারেন। তখনই মনের নানাপ্রকার বিক্ষেপ ও শরীরের নানাবিধ গতি দ্বারা বিচলিত না হইয়া আত্মার মহিমা নিজ পূর্ণ জ্যোতিতে প্রকাশিত হইবে। তখন যোগী তাঁহার শাশ্বত স্বরূপ উপলব্ধি করিবেন, বুঝিবেন-তিনি জ্ঞানঘন, অবিনাশী ও সর্বব্যাপী।'[৮৬] ধ্যানাবস্থা মানব জীবনের সর্বোচ্চ অবস্থা। বাসনাহীন ব্যক্তির নিকট প্রকৃতির বিচিত্র পরিবর্তন সুন্দর ও মহান ভাবের এক অফুরন্ত চিত্রপট। 'ইতর প্রাণীর সুখ ইন্দ্রিয়ে, মানুষের সুখ বুদ্ধিতে, আর দেবমানব আধ্যাত্মিক ধ্যানেই আনন্দ লাভ করেন।'[৮৭]

সাধনার স্থান

আধ্যাত্মিক সাধনা এক প্রকার সার্বক্ষণিক ও মানসিক অনুশীলন। গৃহীরা চলাফেরা ও কর্মক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় সাধনায় মনোনিবেশ করতে পারেন। বিবেকানন্দ বলেন, 'সংসারী অপেক্ষা সংসার ত্যাগী মহত্তর, এ-কথা বলা বৃথা। সংসার হইতে স্বতন্ত্র থাকিয়া স্বাধীন সহজ জীবনযাপন অপেক্ষা সংসারে থাকিয়া ঈশ্বরের উপাসনা করা অনেক কঠিন কাজ।'[৮৮] তবে উচ্চতর সাফল্যের জন্য নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে সাধনা করা উচিত। এ কারণে বিবেকানন্দ সাধনার জন্য একটি স্বতন্ত্র ঘরের কথা বলেন, 'এই ঘর শয়নের জন্য ব্যবহার করিও না, ইহা পবিত্র রাখিতে হইবে। স্নান না করিয়া ও শরীর মন শুদ্ধ না করিয়া এ-ঘরে প্রবেশ করিও না। এ-ঘরে সর্বদা পুষ্প রাখিবে; যোগীর পক্ষে এরূপ পরিবেশ অতি উত্তম। সুন্দর চিত্রও রাখিতে পার। প্রাতে ও সায়াহ্নে সেখানে ধূপ-ধুনা প্রজ্বলিত করিবে। ঐ গৃহে কোন প্রকার কলহ ক্রোধ বা অপবিত্র চিন্তা করিও না। তোমাদের সহিত যাহাদের ভাবে মেলে, কেবল তাহাদিগকেই ঐ ঘরে প্রবেশ করিতে দিবে। এইরূপ করিলে ক্রমে ঘরটি পবিত্রভাবে ভরিয়া উঠিবে। এমন কি, যখন কোন প্রকার দুঃখ বা সংশয় আসিবে অথবা মন চঞ্চল হইবে, তখন কেবল ঐ ঘরে প্রবেশ করিবা মাত্র তোমার মনে শান্তি আসিবে। ইহাই ছিল মন্দির গীর্জা প্রভৃতির প্রকৃত উদ্দেশ্য।...চতুর্দিকে পবিত্র চিন্তা সর্বদা স্পন্দিত হইতে থাকিলে সেই স্থানটি পবিত্র জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া থাকে।'[৮৯] এমন শান্ত ও পবিত্র স্থানে একাগ্রচিত্তে সাধনা করতে হয়। যারা স্বতন্ত্র কোন গৃহের ব্যবস্থা করতে পারবে না, তারা যেখানে ইচ্ছা বসে সাধনা করতে পারে। সাধনায় সোজা হয়ে বসে পবিত্র চিন্তা ও জগতের কল্যাণ কামনা করবে। 'জগতের সকলেই সুখী হউক; সকলেই শান্তি লাভ করুক; সকলেই আনন্দ লাভ করুক।'[৯০] তারপর ভাববে, আমার দেহ দৃঢ় সবল ও সুস্থ। এই দেহ নিয়েই জীবন-সমুদ্র উত্তীর্ণ হব। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেন, "প্রত্যহ একাকী ধ্যান করবি। সব আপনা-আপনি খুলে যাবে। বিদ্যারূপিণী মহামায়া ভেতরে ঘুমিয়ে রয়েছেন, ...'জাগো মা'। ধীরে ধীরে এ-সব অভ্যাস করতে হয়। Emotional side-টা (ভাবপ্রবণতা) ধ্যানের কালে একেবারে দাবিয়ে দিবি।"[৯১] যোগী হতে হলে নির্জনে একাগ্রচিত্তে সাধনা করতে হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'If you want to be a Yogi, you must be free and place yourself in circumstances where you are alone and free from all anxiety.'[৯২] যোগ সাধনায় প্রথমে আসে জ্ঞান এবং জ্ঞান থেকে আসে প্রেম এবং প্রেমেই ঈশ্বরদর্শন লাভ হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'Through practice comes Yoga, through Yoga comes knowledge, through knowledge love, and through love bliss.'[৯৩]

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন

একই মানবাত্মার দুটি দিক রয়েছে। যথা- জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা হলো মানবাত্মা আর পরমাত্মা হলো ঈশ্বর। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন একটি রূপক গল্পের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হলো। বৃক্ষের শীর্ষ দেশে নিরপেক্ষভাবে অবস্থান করছে পরমাত্মা এবং নিম্নদেশে বিভিন্ন কর্ম করছে জীবাত্মা। বিবেকানন্দ মুন্ডক উপনিষদের শিক্ষাটি এভাবে বর্ণনা করেন। 'দুইটি পক্ষী একই বৃক্ষে অবস্থান করিতেছে- একটি শীর্ষদেশে, অপরটি নিম্নে। উভয়ই বিচিত্র বর্ণের; একটি ফল ভক্ষণ করে, কিন্তু অপরটি শান্ত, মহিমময় হইয়া নিজ গৌরবে অবস্থান করিতেছে। নিম্নতর পক্ষীটি ডালে ডালে ভাল ও মন্দ ফল ভক্ষণ করিতেছে- ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর পশ্চাতে ছুটিতেছে। যখনই সে একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করে, তখনই ঊর্ধ্বগামী হয়; ঊর্ধ্বে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখে, অপর পক্ষীটি সেখানে শান্ত সংযত হইয়া অবস্থান করিতেছে; ভাল বা মন্দ কোন ফলেরই আকাঙ্খা না করিয়া, কোনপ্রকার ইন্দ্রিয়তৃপ্তির অনুসন্ধান না করিয়া সে আত্মস্থ হইয়া অবস্থান করিতেছে। নিম্নস্থ পক্ষীটি ঊর্ধ্বে অবস্থানকারী পক্ষীটিকে দেখিয়া ক্রমশঃ উহার সমীপবর্তী হইবার চেষ্টা করে। একটু ঊর্ধ্বে উঠিতেছে, কিন্তু পূর্ব পূর্ব সংস্কারসমূহ বলবৎ থাকায় সে একই ফল আবার ভক্ষণ করে। আবার এক সময়ে একটি অত্যন্ত তিক্ত ফল খাইয়া মর্মাহত হয় এবং ঊর্ধ্বে নিরীক্ষণ করে। সেখানে সেই শান্ত সংযত পক্ষীটিকে আবার দেখে। সে উহার নিকটবর্তী হইবার চেষ্টা করে, কিন্তু পূর্বসংস্কার-প্রভাবে পুনঃপুনঃ নিম্নগামী হইয়া স্বাদু এবং তিক্ত ফল

Dhaka University Institutional Repository

ভক্ষণ করিতে থাকে। আবার একটি তিক্ত ফল ভক্ষণ করিয়া সে ঊর্ধ্বে চাহিয়া দেখে এবং ঐ পক্ষীটির আরও সমীপবর্তী হয়। এইরূপে যতই সে নিকটে যায়, ততই অপর পক্ষীটির দেহ-বিচ্ছুরিত আলোক তাহার উপর পড়িতে থাকে। উহার নিজের পালকগুলি যেন খসিয়া পড়িতে থাকে। যখন সে আরও নিকটবর্তী হয়, তখন সমস্ত দৃশ্যটি পরিবর্তিত হইয়া যায়। বস্তুতঃ নিম্নের পক্ষীটি কোন দিনই ছিল না; যাহা ছিল, তাহা শুধু ঐ ঊর্ধ্বের পক্ষীটি; নিম্নের পক্ষী বলিয়া যাহা এতক্ষণ মনে হইয়াছিল, তাহা উহার এক সামান্য প্রতিবিম্ব মাত্র।'[৯৪]

জীবাত্মা ক্ষণস্থায়ী পার্থিব ইন্দ্রিয় সুখের পিছনে ছুটাছুটি করে। সে পশুর মত স্নায়ুর সাময়িক উত্তেজনার পিছনে ধাবিত হয়। মানুষ সংসারে ভাল-মন্দ সব কাজ করে। যখনই তিক্ত ফলরূপ কোন মন্দ কাজ করে তখন মনে আঘাত আসে, ফলে সঙ্গে সঙ্গে তার মাথা ঘুরতে থাকে এবং সবকিছু এলোমেলো হয়ে যায়। মানুষ পৃথিবীর কাজ ও জীবনটা যত সহজ মনে করে, আঘাতের পর তত সহজ মনে হয় না। মানুষ আঘাতের ফলে সৃষ্ট দুঃখ-বেদনা সহ্য করতে না পেরে মনের গভীরে ঊর্ধ্ব জগতে নিরীক্ষণ করে অনন্ত ঈশ্বরকে দেখে, সে কিছুক্ষণ পরমেশ্বরের অনুভূতি লাভ করে, কিছুটা তাঁর নিকটবর্তী হয়। মানুষ অভ্যাসবশতঃ অতীত কর্ম ফলের সংস্কারে অধঃপতিত হয়ে ঈশ্বর থেকে দূরে সরে যায়। এরপর দৈনন্দিন কাজের মাঝে হঠাৎ এমন একটি মন্দ কাজ করে, যার প্রচণ্ড আঘাতে মন দুঃখ যন্ত্রণার চাপ সহ্য করতে না পেরে সমাধান ও শান্তির জন্য ঈশ্বরের স্মরণ করে এবং আবার আগের চেয়ে ঈশ্বরের নিকটবর্তী হয়। এভাবে বার বার যতই মানুষ ঈশ্বরের নিকট থেকে নিকটবর্তী হয় ততই তার হৃদয় ঐশী জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হয়। এতে সে ক্রমান্বয়ে দেখতে পায় তার ব্যক্তিত্ব হলো হীন নিকৃষ্ট এবং অত্যন্ত স্বার্থপূর্ণ। সে ক্ষণস্থায়ী জৈবিক বৃত্তি চরিতার্থ ও ইন্দ্রিয় সুখ লাভের জন্য সত্যকে ত্যাগ করে হীন অধম ও পাশবিক কাজ করতে তৎপর ছিল। তার পার্থিব আশা -আকাঙ্খা ক্রমান্বয়ে বিলোপ হয়। এভাবে জীবাত্মা যতই পরমাত্মার নিকটবর্তী হয়, ততই দেহ ও প্রকৃতির বন্ধন মুক্ত হতে থাকে। এভাবে জীবাত্মা যখন পূর্ণভাবে পরমাত্মার সাথে মিলিত হয়, তখন সমগ্র পট পরিবর্তন হয়, সে দেখতে পায় অপর পাখিরূপ পরমাত্মাটি-সেই অনন্ত সত্তা। যাকে সে এত দিন দূর থেকে জেনেছে এবং অপূর্ব মহিমা ও গৌরবের আভাস পেয়েছে, তা প্রকৃতপক্ষে তার আত্মা। এত দিন সে ছিল পরমাত্মারূপ পাখিটির ছায়া, এখন সে আর ছায়া নয় স্বয়ং পরমাত্মা। যিনি প্রতিটি অণুতে বিরাজিত ও সর্বত্র প্রকাশিত যা সকল বস্তুর মূল সত্তা- যিনি এই বিশ্ব চরাচরের ঈশ্বর। জীবাত্মা তখন তাঁকেই খুঁজে পায়। "জান 'তত্ত্বমসি'– তুমি সেই; জান- তুমি মুক্ত।"[৯৫]

মিলনের ভিত্তি

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের ভিত্তি হলো আত্মশুদ্ধি, নৈতিক শৃঙ্খলা ও মানবিক গুণাবলী। এসব অনুশীলন দ্বারা বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করেই ব্রহ্ম লাভ হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, বাহ্য ও অন্তঃপ্রকৃতি বশীভূত করে আত্মার এই ব্রহ্ম ভাব ব্যক্ত করাই জীবের চরম লক্ষ্য। চিন্তা, কথা ও কাজে সৎ পবিত্র ও নীতিবান আদর্শ মানুষই পরমাত্মা বিকাশের ভিত্তি বা আধার। বিবেকানন্দ বলেন, 'স্বর্গে ও মর্ত্যে পবিত্রতাই সবচেয়ে মহৎ ও দিব্যশক্তি'।[৯৬] ক্ষমা সহিষ্ণুতা ধৈর্য প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী মানব হৃদয়কে ঐশী জ্ঞানের ধারক, বাহক বা পাত্র রূপে গড়ে তোলে।

শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জিত জ্ঞান

অজ্ঞানতা ও পাপের ফলে জীবাত্মা কলুষিত হয়ে পাশবিক বৃত্তি প্রাধান্য লাভ করে। পরমাত্মা পূর্ণ পবিত্র ও মহাজ্ঞানী। অপরদিকে জীবাত্মা অপূর্ণ ও অপবিত্র। পরমাত্মার কোন প্রকার জ্ঞানের অভাব নেই। জ্ঞান ও গুণের যত অভাব তাহলো জীবাত্মার। আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন রকম শিক্ষা গ্রহণের ফলে জীবাত্মার অজ্ঞানতা, পাপ-পঙ্কিলতা ক্রমে দূর হয়ে স্বচ্ছ পবিত্র ও জ্ঞানী হয়ে ওঠে। শিশুর জ্ঞান ও শক্তির উৎস কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ বলেন, '...শিশুর আত্মার মধ্যেই তার জ্ঞান, তার শক্তি প্রথম থেকেই বিদ্যমান। এই শক্তি এই পবিত্রতা এবং এই ক্ষমতা তার আত্মাতে ছিল- অবিকশিত অবস্থায় ছিল, তাই এখন বিকশিত...।' বিভিন্ন বিষয় দেখে, শুনে, বুঝে পড়ে জ্ঞানার্জনের ফলে আত্ম বিকাশ ঘটে। বিবেকানন্দ শিক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, 'শিক্ষা হচ্ছে, মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম হতেই বর্তমান তারই প্রকাশ।'[৯৭] শিক্ষার ফলে জীবাত্মার অজ্ঞানতার আবরণ উন্মোচন হয়ে আত্মবিকাশ ঘটে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'ঐ আবরণসমূহ দূর হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ভিতরের অনন্ত জ্ঞান ও অসীম শক্তি শত-সহস্র মুখে প্রবাহিত হইতে থাকিয়া তাহাকে ক্রমে সর্বজ্ঞ এবং জগৎ সৃষ্টি-কর্তৃত্ব ভিন্ন অন্য সর্বপ্রকার শক্তিতে ভূষিত করিয়া তোলে। অতএব ঐ আবরণ সমূহ দূরীভূত করিবার বিশিষ্ট উপায়সকলই শিক্ষা নামে অভিহিত করিবার যোগ্য।'[৯৮] এভাবে শিক্ষণের মাধ্যমে অজ্ঞানান্ধকার কলুষিত জীবাত্মা দৃঢ় স্বচ্ছ ও আলোকিত হয়। অপরদিকে সাধনালব্ধ ঐশী জ্ঞান পরমাত্মা থেকে জীবাত্মায় প্রতিফলিত হয়। এতে শিক্ষণের মাধ্যমে বাহ্যিক ও সাধনালব্ধ আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার জ্ঞানের সংযোগ, সমন্বয় ও উপলব্ধির ফলে ক্রমে পরমাত্মা দর্শন লাভ হয়।

Dhaka University Institutional Repository

জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন

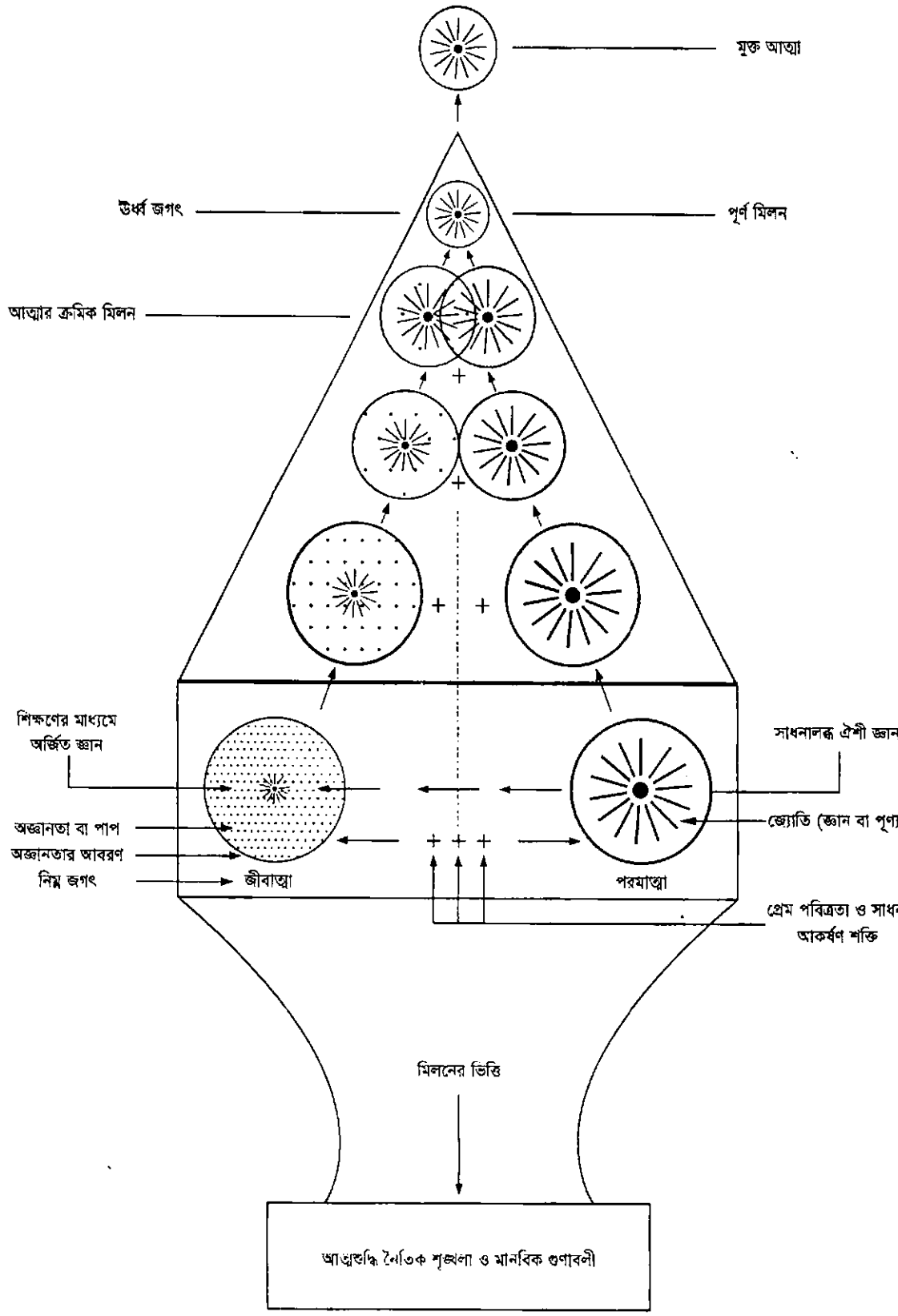

Dhaka University Institutional Repository

সাধনালব্ধ ঐশী জ্ঞান

সাধনালব্ধ ঐশী জ্ঞানই প্রত্যক্ষ ঈশ্বরদর্শনের উচ্চতর সাধনা। সদ্‌গুরুর শিক্ষা, ধ্যান ও জপের ফলে স্বজ্ঞা লাভ হয়ে ক্রমে ঐশী জ্ঞানালোক ও জ্যোতিতে জীবাত্মা আলোকিত ও বিকশিত হতে থাকে। প্রদীপ অস্বচ্ছ ও ময়লাযুক্ত কাঁচের ভিতর দিয়ে যেমন আলো বিকিরণ করতে পারে না, তেমনি জীবাত্মার অজ্ঞানতা ও পাপ-পঙ্কিলতার আবরণ ভেদ করে পরমাত্মার জ্যোতি বিকশিত হতে পারে না। ফলে ঐশী সাধনা বলে অজ্ঞানতার আবরণ দূর হয়ে পরম জ্যোতির বিচ্ছুরণ ঘটে।

মন্ত্র

বিভিন্ন ধর্মে মন্ত্র বা গূঢ় জ্ঞানের (Esoteric) ভাবার্থ হলো, প্রার্থিত বিষয়, গুণ বা শক্তি লাভের জন্য বার বার কামনা করা। গুরু মন্ত্র দ্বারা শিষ্যগণের ভেতর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বীজ বপন করেন। মন্ত্র হলো- সমগ্র জগৎ নাম রূপাত্মক। নাম হলো কোন বস্তুর অন্তর্নিহিত শস্য বা শক্তি আর রূপ হলো বাইরের আবরণ। ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ডরূপ মানব চিত্তে নাম ও রূপ ছাড়া কোন চিন্তা তরঙ্গ নেই। অর্থাৎ মনে যে সব বিষয়ের নাম আসে, সাথে সাথে তার একটি রূপ ভাব আকার বা ধারণা আসে। ঈশ্বর প্রথমে নিজেকে সমগ্র জগৎ অভিব্যক্তির কারণ 'শব্দ ব্রহ্ম' বা স্ফোটরূপে পরিণত করে স্বয়ং এই স্থূল পরিদৃশ্যমান জগৎ রূপে বিকশিত হন। এই স্ফোটের একটি মাত্র বাচক শব্দ হলো-'ওঁ'। আমরা কোন প্রকার বিশ্লেষণ দ্বারা ভাব থেকে শব্দকে পৃথক করতে পারি না। ফলে ওঙ্কার ও নিত্যস্ফোট অবিভাজ্য রূপে থাকে। একারণে শ্রুতি বলেন, 'সমুদয় নাম রূপের উৎস-ওঙ্কার-রূপ এই পবিত্রতম শব্দ হইতে এই স্থূল জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে।...একমাত্র 'অখন্ড সচ্চিদানন্দ' ব্রহ্মকে যেমন অপূর্ণ জীবাত্মাগণ বিশেষ বিশেষ ভাবে ও বিশেষ বিশেষ গুণযুক্ত রূপে চিন্তা করিতে পারে, তেমনি তাঁহার দেহরূপ এই জগৎকেও সাধনের মনোভাব অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্নরূপে চিন্তা করিতে হইবে। ...মহাপুরুষদের গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইতে উত্থিত এই বাচক শব্দসমূহ যথাসম্ভব ভগবান্ ও জগতের এই বিশেষ বিশেষ খন্ডভাব প্রকাশ করে। ওঙ্কার যেমন অখন্ডব্রহ্মের বাচক, অন্যান্য মন্ত্রগুলিও সেইরূপ পরমপুরুষের খণ্ড-ভাবগুলির বাচক। ঐ সবগুলিই ঈশ্বরধ্যানেরও প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়ক।'[৯৯] ঈশ্বরের বিভিন্ন নাম বা মন্ত্রর জপ করে সাধক নিজ হৃদয়ে ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণ বা শক্তি প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করে। প্রকৃতি সর্বত্র এক নিয়মে গঠিত। শ্রুতি বলেন, 'যেমন একটি মৃৎ পিন্ডকে জানিলে আর সমস্ত মৃত্তিকাকেই জানিতে পারা যায়।'[১০০] তেমনি এই ক্ষুদ্র দেহ ব্রহ্মাণ্ডকে জানতে পারলে বিরাট ব্রহ্মাণ্ডকেও জানা যায়।

স্বজ্ঞা

স্বজ্ঞা বা অন্তর্দর্শনের ক্ষমতা আমাদের মাঝে সুপ্ত রয়েছে, একে জাগিয়ে তুলতে হবে। স্বজ্ঞার মাধ্যমেই উচ্চতর সত্তার আভাস আসে। স্বজ্ঞার উচ্চতর ক্ষমতা গড়ে তোলার জন্য মনের জ্ঞানাতীত অবস্থা সম্পর্কে ধারণা অর্জন আবশ্যক। ধ্যানের সময় নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যবর্তী তন্দ্রা অবস্থার মতো মনে ছায়ার মত এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি হয়। এ অবস্থাই হলো স্বজ্ঞা। আমরা কিভাবে নিদ্রা যাই এবং কিভাবে নিদ্রা ভাঙ্গে- এ থেকে স্বজ্ঞার ধারণা স্পষ্ট হবে। নিদ্রার সময় প্রথমে ইন্দ্রিয়গুলো মনে সংযত, স্থির (প্রত্যাহৃত) হয়। তারপর চিন্তারাশি লুপ্ত হয় এবং মাত্র একটু অস্পষ্ট 'অহং'- চেতনা থাকে। শেষে এই অহং চেতনাও গভীর নিদ্রায় লীন হয়ে যায়। আবার নিদ্রা ভঙ্গের সময় বিপরীত পদ্ধতি ঘটতে থাকে। অর্থাৎ প্রথমে 'অহং' চেতনার প্রকাশ ঘটে, তারপর অহং-এর সাথে যুক্ত হয় মনের বিভিন্ন চিন্তা। তারপর পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও বিভিন্ন বস্তু বিষয় ও ঘটনার সাথে যুক্ত হয়। "ঘুম ভাঙ্গার ঠিক পরেই একটি আবছা অন্তর্বর্তীকাল থাকে যখন মুহূর্তের জন্য তুমি শুদ্ধ 'অহং'-চেতনাকে ধরে রাখ। ঠিক সেই মুহূর্তে জগৎকে ছায়ার মতো দেখায়; তখনো আমাদের কাছে জাগতিক বস্তু বাস্তব সত্তা লাভ করেনি। এই শুদ্ধ সচেতনতার কিছুটা জাগ্রৎ অবস্থায় সচেতনভাবে আমাদের লাভ করা উচিত। সাধকের সামনে এইটিই হলো আসল কাজ। সেই স্তরে আমাদের উঠতে হবে, যেখানে আলো ও অন্ধকারের মধ্যে ব্যবধান অত্যন্ত পাতলা।"[১০১] সাধনা দ্বারা নিদ্রা ও জাগ্রত অবস্থার মধ্যবর্তী শুদ্ধ সচেতন অবস্থায় ঐশীজ্ঞান লাভের উপায়ই হলো স্বজ্ঞা। স্বজ্ঞার মাধ্যমে সাধকের হৃদয়ে আত্মার জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে রাজা জনক প্রবীণঋষি যাজ্ঞ বল্ক্যকে প্রশ্ন করেন, "মানবের পক্ষে কোন্‌টি আলোকের কাজ করে?' ঋষির উত্তর হলো ঃ 'সূর্যের আলোক'। '...যখন সূর্য অস্ত যায় তখন কোন্ বস্তু আলোকের কাজ করে?' 'চন্দ্র'। 'যখন চন্দ্র থাকে না?' 'অগ্নি'। 'যখন অগ্নি থাকে না?' 'শব্দ'। 'যখন শব্দ থেমে যায়?' এই রকম প্রশ্ন করতে করতে তিনি পৌঁছে যান তাঁর পেছনে অবস্থিত নিজ আত্মার কাছে।"[১০২] মনই বাহ্যবস্তু সকল চিনতে পারে। কারণ মনের পিছনে রয়েছে দীপ্তিমান আত্মা। আত্মা স্বয়ং জ্যোতি। আত্মার জ্যোতিতে আমরা স্বপ্নে অন্তরস্থ বিভিন্ন বিষয় দেখতে পাই। আত্মা বাহ্যবস্তুকে আবার অন্তরস্থ মনোগত বিভিন্ন বস্তুর প্রতিবিম্বকেও দেখায়। আবার

Dhaka University Institutional Repository

মনে যখন কোন বিষয় বা বিষয়ের চিন্তা থাকে না, তখন স্বয়ং জ্যোতি বা আত্মা একাই বিভাসিত হয়ে থাকে। জাগ্রত ও সুষুপ্তি বা গভীর নিদ্রা এ দুয়ের মধ্যবর্তী অবস্থায় কয়েক মুহূর্ত আত্মা শুদ্ধরূপে অবস্থান করে। সাধকের করণীয় হলো জাগ্রত অবস্থায় আত্মার ঐ শুদ্ধ অবস্থানকে স্থায়ীভাবে আয়ত্ব করা। তাহলে সে শুদ্ধ অবস্থা কখনও হারিয়ে যায় না।

বিশুদ্ধ পবিত্র ও একাগ্রচিত্তে কঠোর সাধনায় নিমগ্ন হলে স্বজ্ঞা লাভ হয়। আমাদের অন্তরস্থ বিস্মৃত স্বজ্ঞা বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার জন্য মনের বুদ্ধি বৃত্তি, অনুভূতি ও ইচ্ছা শক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার প্রয়োজন। স্বজ্ঞা লাভের জন্য প্রবল ইচ্ছা শক্তি, আত্মশুদ্ধি, পবিত্রতা ও সৎকর্মের দ্বারা পূর্ব অভিজ্ঞতার সংস্কার দূর করা প্রয়োজন। 'কতকগুলি সংস্কারকে নিয়মিত জপ ও ধ্যানের মাধ্যমে পরিবর্তিত বা জয় করা যায়। ধ্যানের সাহায্যে নানা প্রতিভার মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও তাদের একীকরণ সম্ভব হয়। যখন অনুভূতি, ইচ্ছা ও চিন্তা এই তিন বৃত্তির পবিত্রীকরণ, একীকরণ ও কেন্দ্রীকরণ ব্যবস্থায় সফল হওয়া যায়, তখনই স্বজ্ঞাবৃত্তির সন্ধান পাওয়া যায়। আত্মজ্যোতি বিভাসিত হতে থাকে প্রথমে ঝলকে ঝলকে, কিন্তু পরে স্থির আলোকচ্ছটার মতো।'[১০৩] আত্মার জ্যোতি দেহ ও ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রস্ফুটিত হয়। এ প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ গুরুরূপী দক্ষিণামূর্তি স্তোত্রে শ্রীশঙ্কর বলেন, 'যেমন বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ঘটের মধ্যে উজ্জ্বল দীপ রাখলে তার আলোকচ্ছটা ছিদ্রগুলির ভেতর দিয়ে বিচ্ছুরিত হয়, তেমনি আত্মসত্তা চক্ষু ও অন্য ইন্দ্রিয়াদির মাধ্যমে প্রকাশিত হয়ে 'আমি জানি' এই বোধ সৃষ্টি করে। আত্মসত্ত্বা প্রকাশ করলেই প্রত্যেকটি বস্তু বিভাসিত হয় (অর্থাৎ জানা যায়)।'[১০৪]

সাধনায় স্বজ্ঞার মাধ্যমে দিব্যানুভূতি লাভ হয়ে ক্রমান্বয়ে জীবাত্মা ঐশী জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে ওঠে। একাগ্রচিত্তে গুরু মন্ত্র জপ করতে করতে স্বজ্ঞা লাভের দ্বার খুলে যায়, মানস চক্ষে প্রত্যক্ষগোচর হয় এক অপূর্ব আনন্দঘন জ্ঞান রাজ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ মন্ত্র জপের ফল সম্পর্কে বলেন– 'জপ করা কি না নির্জনে নিঃশব্দে তাঁর নাম করা। একমনে নাম করতে করতে– জপ করতে করতে– তাঁর রূপদর্শন হয়– তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। শিকলে বাঁধা কড়িকাঠ গঙ্গার গর্ভে ডুবান আছে– শিকলের আর-একদিক তীরে বাধাঁ আছে। শিকলের এক-একটি পাব (Link) ধরে ধরে গিয়ে ক্রমে ডুব মেরে শিকল ধরে যেতে যেতে ওই কড়ি-কাঠ স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ করতে করতে মগ্ন হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।'[১০৫] পৃথিবীর প্রতিকূল পরিবেশে দুঃখ-কষ্ট এমন কি ঝড়-বিপদে পড়লেও ঈশ্বর লাভের শিকলরূপ মন্ত্র ধরে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করতে হয়। জপের ফলে পাপীদেরও মুক্তি লাভ হয়। এ সম্পর্কে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলেন, 'ঈশ্বরের নাম জপের শরণ নিয়ে বহু পাপী শুদ্ধ, মুক্ত ও দেবভাবাপন্ন হয়েছে।'[১০৬] ঈশ্বরের নামের প্রচণ্ড শক্তি রয়েছে। নাম জপের এই শক্তিতে শত সহস্র লোকের আধ্যাত্মিক উন্নতি হয়েছে। শীঘ্র বা দেরীতে হোক এই শক্তি দ্বারা মানুষ প্রভাবিত হবেই।

অলৌকিক দর্শন

অধ্যাত্ম সাধনার জগতে অলৌকিক দর্শন এক বিস্ময়কর অধ্যায়। প্রতিটি কর্মের ফল আত্মায় সঞ্চিত হয়। সৎ কর্মের ফল জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অলৌকিক দর্শন সৃষ্টি করে। এ অলৌকিক দর্শনের দুটি দিক রয়েছে। জন্মলব্ধ অধ্যাত্ম প্রতিভা ও সাধনালব্ধ অধ্যাত্ম প্রতিভা।

জন্মলব্ধ অধ্যাত্ম প্রতিভা

বর্তমান জীবনে কোন রকম অধ্যাত্ম সাধনা ছাড়া যে অলৌক দর্শন হয়, তাই জন্মলব্ধ অধ্যাত্ম প্রতিভা। অতীত জন্মের প্রতিটি সৎ-অসৎ কর্মফল সংস্কার হয়ে আত্মায় সঞ্চিত থাকে। আর এ সংস্কারের প্রভাবে অনেকেই শৈশব হতে কোন বিষয়ের পূর্বাভাস, দিব্যশ্রুতি, দিব্যদর্শন প্রভৃতি অলৌকিক বিষয় দর্শন করেন। জন্মলব্ধ অধ্যাত্ম প্রতিভার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো- শৈশব হতেই অত্যধিক জ্ঞানী বিচক্ষণ, চিন্তাশীল, সত্যান্বেষী, অত্যন্ত সৎ, পবিত্র ও মহৎ, চরিত্রবান, পরদুঃখকাতর মানবতাবাদী ও কল্যাণকামী। বিশ্ব ইতিহাসে দেখা যায় মহাপুরুষগণ জন্মলব্ধ অধ্যাত্ম প্রতিভা নিয়ে পৃথিবীতে এসেছেন। তাঁদের শৈশবের জ্ঞান বৃদ্ধদেরও হার মানায়। এমন ঘটনার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে মহাপুরুষগণের জীবনীতে। 'মহান ধর্মগুরুরা যেমন বুদ্ধ, কৃষ্ণ, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ এবং আরও অনেকে যাঁরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাঁরা সকলেই নিজ নিজ আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা, নিজ নিজ অনুসৃত পথ এবং সেইসব পথের সম্ভাব্য বাধাবিঘ্ন ইত্যাদি বর্ণনা ক'রে পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে সাহায্য ক'রে গেছেন। ওইসব মহাপুরুষরা তাঁদের একটি জন্মকালের মধ্যেই যে অমূল্য বস্তু এবং যে অপূর্ব দিব্যাবস্থা লাভ করেছিলেন, সাধারণ ক্রমবিকাশের সাহায্যে তা লাভ করতে শত শত জন্ম এবং সহস্র সহস্র বৎসর অপেক্ষা করতে হয়।'[১০৭]

Dhaka University Institutional Repository

বিবেকানন্দ শৈশবে স্কুলে পড়ার সময় দিব্যদর্শন লাভ করেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'স্কুলে পড়বার সময় একদিন রাত্রে দোর বন্ধ করে ধ্যান করতে করতে মন বেশ তন্ময় হয়েছিল।...ধ্যান শেষ হলে, তখনো বসে আছি, এমন সময় ঐ ঘরের দক্ষিণ দেওয়াল ভেদ করে এক জ্যোতির্ময় মূর্তি বাহির হয়ে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তাঁর মুখে এক অদ্ভুত জ্যোতিঃ অথচ যেন কোন ভাব নাই। মহাশান্ত সন্ন্যাসী-মূর্তি-মুণ্ডিত মস্তক, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু। আমার প্রতি একদৃষ্টে খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন, যেন আমায় কিছু বলবেন– এরূপ ভাব। আমিও অবাক হয়ে তাঁর পানে চেয়েছিলাম। তারপর মনে কেমন একটা ভয় এল, তাড়াতাড়ি দোর খুলে ঘরের বাইরে গেলাম। পরে মনে হলো, কেন এমন নির্বোধের মতো ভয়ে পালালুম, হয়তো তিনি কিছু বলতেন। আর কিন্তু সে মূর্তির কখনো দেখা পাইনি। কতদিন মনে হয়েছে- যদি ফের তাঁর দেখা পাই তো এবার আর ভয় করব না- তাঁর সঙ্গে কথা কইব।...এখন বোধ হয়, ভগবান বুদ্ধদেবকে দেখেছিলুম।'[১০৮] বিবেকানন্দের মত এমন দিব্যদর্শন এখনও অনেক শিশুরা দেখে থাকে। তাদের অধিকাংশের অধ্যাত্ম প্রতিভার বিকাশ হয় না। কারণ প্রতিকূল পরিবেশে শিশুদের আত্মার কথা, ধর্ম ও দর্শনের কথা শুনতে দেওয়া হয় না। সকলের উচিত মূল্যবান অধ্যাত্ম প্রতিভার লালন করা।

অধ্যাত্মিক জগৎ

ঐশী জ্ঞান লাভের প্রক্রিয়া

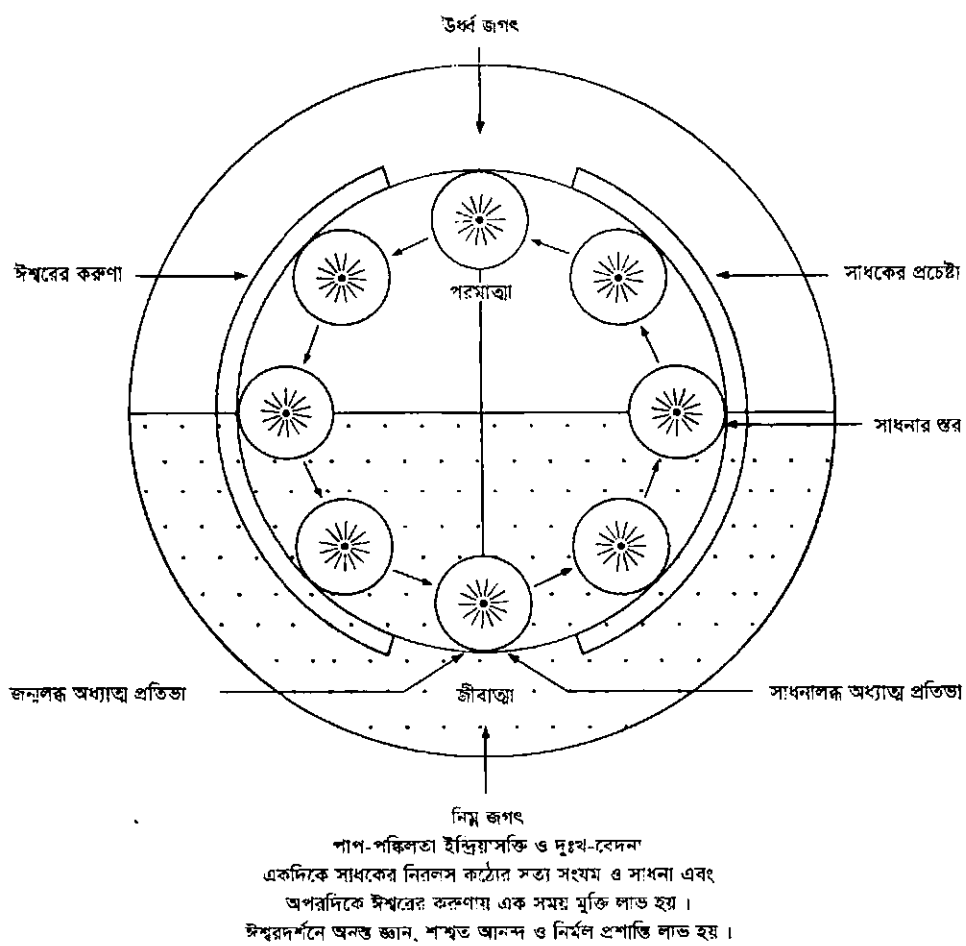

Dhaka University Institutional Repository

সাধনালব্ধ অধ্যাত্ম প্রতিভা

আধ্যাত্মিক সাধনায় অলৌকিক বিষয় দর্শন লাভ হয়। আর এই অলৌকিক বিষয় ব্যাখ্যা করেই পাওয়া যায় ঐশীজ্ঞান বা অধ্যাত্মজ্ঞান। বিবেকানন্দ বলেন, অল্প সাধন করেও মহৎ ফল লাভ করা যায়। এতে মানুষের নানাবিধ কল্যাণ সাধিত হয়। কঠোর সাধনায় উচ্চতর ফল লাভ হয়। 'কখনো কখনো দূর হইতে যেন ঘন্টাধ্বনির মতো শব্দ শুনা যাইবে– যেন অনেকগুলি ঘন্টা দূরে বাজিতেছে, এবং সেই সকল শব্দ একত্রে মিলিয়া কর্ণে অবিচ্ছিন্ন শব্দপ্রবাহ আসিতেছে। কখনো কখনো নানা বস্তু দেখা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোককণা যেন শূন্যে ভাসিতেছে, ক্রমশঃ একটু একটু করিয়া বড় হইতেছে। যখন এই সকল ব্যাপার ঘটিতে থাকিবে, তখন জানিও তুমি খুব দ্রুত উন্নতির পথে চলিতেছ।'[১০৯] অধ্যাত্ম সাধনায় সাধকের নিকট পূর্ব জন্মের স্মৃতি দর্শন হয়। "অতুল বাবু স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি রাজযোগে বলেছ যে পূর্বজন্মের কথা সমস্ত জানতে পারা যায়। তুমি নিজে জানতে পার ? স্বামীজী। হ্যাঁ, পারি। অতুল বাবু। কি জানতে পার, বলবার বাধা আছে? স্বামীজী। জানতে পারি– জানি-ও, কিন্তু details (খুঁটিনাটি) বলব না।"[১১০] অন্তর্যামী সাধক বিবেকানন্দ মানুষের অন্তরের কথা বলতে পারতেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আমেরিকায় অবস্থানকালে আমার কতকগুলি অদ্ভুত শক্তির স্ফুরণ হয়েছিল। লোকের চোখের ভেতর দেখে তার মনের ভেতরটা সব বুঝতে পারতুম মুহূর্তের মধ্যে। কে কি ভাবছে না ভাবছে 'করামলকবৎ' প্রত্যক্ষ হয়ে যেত। কারুকে কারুকে বলে দিতুম। যাদের যাদের বলতুম, তাদের মধ্যে অনেকে আবার চেলা হয়ে যেত; আর যারা কোনরূপ মতলব পাকিয়ে আমার সঙ্গে মিশতে আসত, তারা ঐশক্তির পরিচয় পেয়ে আর আমার দিকেও মাড়াত না।'[১১১]

বিবেকানন্দ পাশ্চাত্যে যে দর্শনে বক্তৃতা দেন তা তাঁর ব্রহ্মচর্য সাধনের এক অলৌকিক ক্ষমতা। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'ও-ক্ষমতা সকলের হতে পারে। যে ভগবানের জন্য বার বছর পর্যন্ত ব্রহ্মচর্য করবে, তারই ও-ক্ষমতা হবে। আমি ঐরূপ করেছি, তাই আমার মাথার ভেতর একটা পর্দা খুলে গিয়েছে। তাই আর আমাকে দর্শনের মতো জটিল বিষয়ের বক্তৃতা ভেবে বার করতে হয় না। মনে কর, কাল বক্তৃতা দিতে হবে, যা বক্তৃতা দেব তার সমস্ত ছবি আজ রাত্রে পর পর চোখের সামনে দিয়ে যেতে থাকে। পরদিন বক্তৃতার সময় সেই-সব বলি। অতএব বুঝলি তো, এটা আমার নিজস্ব শক্তি নয়। যে অভ্যাস করবে, তারই হবে। তুই কর, তোরও হবে। অমুকের হবে আর অমুকের হবে না– আমাদের শাস্ত্রে এ কথা বলে না।'[১১২] পার্থিব ও সাধারণ অলৌকিক জ্ঞান ঈশ্বরদর্শনের পথে এক আলোকচ্ছটা। যেমন আমরা গাড়ীতে দর্শনীয় স্থানে যাওয়ার পথে সাধারণ দৃশ্য দেখে অনেক সময় বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়ে পড়ি। কিন্তু এর চেয়েও যে পরম সুন্দর, আনন্দঘন ও দর্শনীয় বিষয় রয়েছে আমাদের গন্তব্য স্থলে আত্মদর্শনে সেখানেই পৌঁছতে হবে। বিবেকানন্দ আধ্যাত্মিক সাধনায় ঈশ্বরদর্শন সম্পর্কে বলেন, "মন শুদ্ধ হলে, কামকাঞ্চনে বীতস্পৃহা হলে কত vision (দিব্যদর্শন) দেখা যায়– অদ্ভুত অদ্ভুত! তবে ওতে খেয়াল রাখতে নেই। ঐ সকলে দিনরাত মন থাকলে সাধক আর অগ্রসর হতে পারে না। শুনিসনি, ঠাকুর বলতেন,– 'কত মণি পড়ে আছে (আমার) চিন্তামণির নাচদুয়ারে!' আত্মাকে সাক্ষাৎ করতে হবে– ও-সব খেয়ালে মন দিয়ে কি হবে ?"[১১৩] রাস্তায় থেমে গেলে লক্ষ্যে পৌঁছবে কিভাবে? তাই সাধনায় অলৌকিক পথ অতিক্রম করে পরমেশ্বরের দর্শন লাভ হয়।

ঈশ্বর দর্শনের অদৃশ্য পথ: এক অগ্নিপরীক্ষা

সাধক এক অন্তহীন অদৃশ্য অনন্ত পথের যাত্রী। তাঁর গন্তব্য পরমেশ্বর দর্শন। আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতা বস্তুবাদী ও ভোগবাদীর যুগে পার্থিব প্রতিকূল পরিবেশের সকল বাধা অতিক্রম করে সাধকের অধ্যাত্ম সাধনার পথে অগ্রসর হওয়া এক জটিল বিষয়। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পার্থিব বিষয়ে সহজেই সাফল্য লাভ করা যায়, কিন্তু অদৃশ্য ঈশ্বরের পথে বিশ্বাস ও সাফল্য লাভ করা অত্যন্ত কঠিন বিষয়। অদৃশ্য অতিন্দ্রীয় পথই ঈশ্বরদর্শনের একমাত্র পথ। আর এ অদৃশ্য পথ যিনি চিনে ঈশ্বরদর্শন লাভ করেছেন এমন সদ্‌গুরুর শিক্ষা প্রয়োজন। এ সম্পর্কে গুরুগীতা বলেন, 'যেমন অচেনা জায়গায় যেতে হ'লে– যে জানে এমন একজনের কথামত চলতে হয়। অনেককে জিজ্ঞাসা করলে পথ গোল হ'য়ে যায়। সেই রকম ঈশ্বরের নিকট যেতে গেলে গুরুর কথামত চলতে হয়। এমনি একজন গুরুর দরকার।'[১১৪]

সুরাসুরের সংগ্রাম: জগৎ সৃষ্টির প্রথম থেকেই চলে এসেছে সুরাসুরের সংগ্রাম। মানুষের মাঝে সুপ্ত সুর-মনুষত্ব ও দেবতা একবার তাকে সৎপথে পরিচালিত করে, আবার তার ভিতরের অসুর-কুপ্রবৃত্তি অসৎ পথে পরিচালিত করে। এভাবে পরমাত্মার শক্তিতে একবার দেবত্বের বিকাশ ঘটে আবার জীবাত্মার শক্তিতে কুপ্রবৃত্তির বিকাশ ঘটে। সাধকের এভাবে সুরাসুরের সংগ্রাম চলতে দিয়ে কালক্ষেপণ করা উচিত নয়। তাই তিনি সদ্‌গুরুর শিক্ষা নিয়ে অসুরকে দমন

Dhaka University Institutional Repository

করে, সুরের ঐশী শক্তির বিকাশ ঘটান। বিপথ গমনের ফল সম্পর্কে গুরুগীতা বলেন, 'সকলেরই মুক্তি হবে, তবে গুরুর উপদেশ অনুসারে চলতে হয়। বাঁকা পথে গেলে ফিরে আসতে কষ্ট হয়। মুক্তি অনেক দেরিতে হয়। হয় তো এ জন্মে হ'ল না, আবার হয় তো অনেক জন্মের পর হ'ল। গুরুর কাছে সন্ধান নিতে হয়।'[১১৫]

অনাসক্তি: সাধক অনেক ত্যাগ সংযম ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে সাধনা করে দিব্যজ্ঞান ও অলৌকিক বিষয় দর্শন করে, তখনও তার পার্থিব ভোগ্য বিষয়ে আসক্তি হতে পারে। জীবন একটি কঠিন পরীক্ষা ক্ষেত্র। এ পরীক্ষায় সাধক মনকে সংযত করতে না পারলে আত্মার অবনতি হয়। তাই বিবেকানন্দ এ সম্পর্কে সতর্ক করে বলেন, 'যখন মানুষ ইন্দ্রিয়াতীত পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বাহিরে অবস্থিত- কোন সত্য অনুভব করে, তখনও তাহার আসক্তি থাকিতে পারে, তবে উহাকে বিষয়ে আবদ্ধ না রাখিয়া সেই ইন্দ্রিয়াতীত বস্তু-ঈশ্বরের প্রতি প্রয়োগ করিতে হইবে।'[১১৬] সাধককে সর্বদা প্রফুল্ল চিত্ত থাকতে হয়। বিবেকানন্দ চিত্ত সংযম সম্পর্কে বলেন, '...অতিরিক্ত আমোদ-প্রমোদ, উহা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ ঐ অবস্থায় মন কখনই শান্ত হয় না, চঞ্চল হইয়া থাকে, আর পরিণামে সর্বদা দুঃখই আসিয়া থাকে।'[১১৭] সাধক হবেন সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল। তিনি দুঃখ কষ্টে ভেঙ্গে না পড়ে আত্মশক্তিতে দুঃখ জয় করবেন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "আমি বড় দুঃখী!'–এরূপ বলা ধার্মিকের লক্ষণ নয়, ইহা শয়তানি। প্রত্যেককেই নিজ নিজ দুঃখের বোঝা বহন করিতে হয়।...আপনাকে শক্ত সবল হইতে হইবে– অনন্ত শক্তি আপনার ভিতরে। নতুবা কোন কিছু জয় করিবেন কি রূপে ? ঈশ্বর লাভ করিবেন কিরূপে ?"[১১৮]

পৃথিবী একটি কঠিন পরীক্ষা ক্ষেত্র। আমাদের দেহ ও মন সর্বদা ভোগ বিলাস ও আরাম-আয়েসে থাকতে চায়- এসব প্রভুদর্শনের পথে বিঘ্ন ঘটায়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ সরল রাজযোগে বলেন, 'যে বেশী খায় বা যে অনাহারী, যে বেশী ঘুমোয় বা যে খুব কম ঘুমোয়, সে যোগী হ'তে পারে না। অজ্ঞান, চঞ্চলতা, ঈর্ষা, আলস্য ও তীব্র আসক্তি– এই ক-টি যোগাভ্যাসের পরম শত্রু।'[১১৯] সাধকের পক্ষে কাম শক্তি দমন করা এক কঠিন পরীক্ষা। কখনও কখনও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে দেহ মন কাম প্রবৃত্তির ভোগ লিপ্সায় ব্যগ্র ও উন্মাদ হয়ে উঠে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ সাবধান করে বলেন, 'ঐটেই বড় ভয়। যারা বড় emotional (ভাবপ্রবণ) তাদের কুণ্ডলিনী ফড়ফড় করে ওপরে ওঠে বটে, কিন্তু উঠতেও যতক্ষণ নাবতেও ততক্ষণ। যখন নাবেন তখন একেবারে সাধককে অধঃপাতে নিয়ে গিয়ে ছাড়েন। এজন্য ভাব সাধনার সহায় কীর্তন-ফীর্তনের একটা ভয়ানক দোষ আছে। নেচে কুঁদে সাময়িক উচ্ছ্বাসে ঐ শক্তির ঊর্ধ্বগতি হয় বটে, কিন্তু স্থায়ী হয় না, নিম্নগামিনী হবার কালে জীবের ভয়ানক কামবৃত্তির আধিক্য হয়।'[১২০] এ কারণে কামরিপু দমনের জন্য সর্বদা সতর্ক থাকতে হয়।

মস্তিষ্ক বিকৃতি: সাধককে সাধনায় ক্রমান্বয়ে সিদ্ধি লাভের পথে অগ্রসর হতে হয়। হঠাৎ অধিক সাধনায় মাত্রাতিরিক্ত ঐশী প্রভাব বা অলৌকিক দর্শন হলে তা সাধারণ অসহিষ্ণু হৃদয় মন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'যোগীরা বলেন, এই অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়ায় এক ঘোর বিপদের আশঙ্কা আছে। অনেক স্থলেই মস্তিষ্ক একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবার সম্ভাবনা। সচরাচর দেখিবে, যে-সব ব্যক্তি হঠাৎ এই অতীন্দ্রিয়জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, অথচ ইহার বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বুঝেন নাই, তাঁহারা যত বড়ই হউন না কেন, তাঁহারা অন্ধকারে হাতড়াইয়াছেন এবং তাঁহাদের সেই জ্ঞানের সহিত সাধারণতঃ কিছু না কিছু কিম্ভূতকিমাকার কুসংস্কার মিশ্রিত থাকিয়া যায়। তাঁহারা অনেক অলীক দৃশ্য দেখিয়াছেন ও উহার প্রশ্রয় দিয়া গিয়াছেন।'[১২১] অনভিজ্ঞ সাধক অলৌকিক ঘটনার বিজ্ঞান না বুঝে কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়, তারা সমাজেও কুসংস্কার প্রচার করে। সাধক বিবেকানন্দ প্রতিকূল পরিবেশের কঠিন জীবন সংগ্রামে সাধককে লক্ষ্যে পৌঁছার জন্য ধৈর্য ধারণের শিক্ষা দেন। তিনি বলেন, 'প্রথম প্রথম অনেক আশ্চর্য দর্শনাদি হবে, তারপর সে-সব বন্ধ হয়ে যাবে। এইটিই হচ্ছে সবচেয়ে কঠিন সময়, কিন্তু ধরে থাকা চাই; ধৈর্য থাকলে শেষে সত্য লাভ হবেই।'[১২২] সম্পদে ও বিপদে, স্বাস্থ্যে-রোগে সব সময়ে যোগ অভ্যাস করতে হয়; এক দিনও যেন বাদ না যায়।

প্রেমই ঈশ্বরদর্শনের প্রধান উপায়। হৃদয়ে প্রেম সৃষ্টি না হলে ঈশ্বরদর্শন লাভ হয় না। তাই প্রেম ও অনুরাগ জাগ্রত না হওয়ার জন্য বিবেকানন্দ নিজেকে ধিক্কার দিয়ে বলেন, 'তোমার প্রতি অন্তরাত্মার ঐকান্তিক অনুরাগ থাকিলে তোমাকে ডাকিবার কোন নির্দিষ্ট কাল নাই। তোমার নিকট এত সহজে যাওয়া যায়, কিন্তু আমার দুর্দৈব– তোমার প্রতি অনুরাগ জন্মিল না।'[১২৩] কারণ প্রেম ও অনুরাগ সম্পর্কে স্বয়ং ভগবান বলেন, 'যাহারা নিরন্তর আমাতে আসক্ত এবং প্রেমের সহিত আমাকে উপাসনা করে, আমি তাহাদিগের বুদ্ধি এমনভাবে চালিত করি, যাহাতে তাহারা আমাকে লাভ

Dhaka University Institutional Repository

করে।'[১২৪] ভগবানের প্রতি যাঁর গভীর প্রেম প্রত্যক্ষ অনুভাবাত্মক স্মৃতি অতি প্রিয় ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। তাঁর দ্বারাই পরমাত্মা লব্ধ হন। এমন নিরন্তর স্মরণ, প্রেমই হলো ভক্তি। সাধনার পথে সহস্র বিপদ এলেও ধৈর্যের সাথে নিরন্তর ঈশ্বরের দিকে অগ্রসর হতে হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'হৃদয়টাকে সমুদ্রের মত মহান্ করে ফেল, জগতের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবসকলের পারে চলে যাও এমন কি অশুভ এলেও আনন্দে উন্মত্ত হয়ে যেও, জগৎটাকে একটা ছবির মত দেখো। এইটি যেন মনে থাকে যে জগতে কোন কিছুই তোমায় বিচলিত করতে না পারে। আর এইটি জেনে জগতের সৌন্দর্য সম্ভোগ কর।'[১২৫]

আত্মার ক্রমিক মিলন

প্রাকৃতিক নিয়মগুলো সর্বদা ত্রুটিমুক্ত ও স্বয়ং সম্পূর্ণ। এ নিয়ম প্রকৃতিতে সর্বদা সমভাবে প্রযোজ্য, এর কোন ব্যতিক্রম হয় না। মধ্যাকর্ষণের নিয়ম ক্ষুদ্র অণু-পরমাণুর মধ্যে যেমন বৃহত্তর সৌরজগতেও তেমনি কাজ করে। যেখানেই বিদ্যুৎ থাকে, সেখানেই উত্তাপ, আলো ও গতি সঞ্চারের ক্ষমতা থাকে। অবস্থা ভেদে ক্ষমতার প্রকাশ বিভিন্ন প্রকার হয়। 'ব্যষ্টি-আত্মা সকল অথবা এই নিখিল বিশ্বে যে সকল নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নিয়মাবলী বিরাজিত সেগুলিও প্রাকৃতিক শক্তি সমূহের মধ্যে নিহিত নিয়মাবলীর মতো নিখুঁত ও সম্পূর্ণ (Perfect)। দৈহিক ও মানসিক পূর্ণতা বলতে বোঝায় জীবাত্মার মধ্যে যে সকল দৈহিক ও নৈতিক শক্তি অন্তর্নিহিত রয়েছে, সেই শক্তিগুলির সম্যক্-বিকাশ।'[১২৬]

জীবাত্মার দৈহিক ও মানসিক সুপ্ত শক্তিগুলো সর্বদা পূর্ণভাবে বিকাশের চেষ্টা করে, কিন্তু পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে বিকাশের তারতম্য ঘটে। প্রতিকূল পরিবেশে অসম্পূর্ণ বিকাশ হয়। যখন কতকগুলো শক্তি অপর কতকগুলো শক্তিকে সংযত বা দমন করে সেগুলো সাময়িকভাবে চাপা পড়ে। "বিবর্তনের পরিক্রমণ পথে যখন পাশবিক শক্তিগুলি স্ফুরিত হয়, তখন নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিগুলি সুপ্ত থাকে। একমাত্র মানুষের মধ্যেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিগুলির পূর্ণ বিকাশ সম্ভবপর;...'যে-সকল মানুষ পাশবিক বৃত্তিগুলিকে জয় করতে পেরেছেন, তাঁরাই অধ্যাত্ম জ্ঞান সম্পন্ন দিব্যপুরুষ ব'লে পরিগণিত হন।"[১২৭] একারণে অশুভ ভাবাপন্ন ব্যক্তির মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখা যায় না। কোন ব্যক্তির পাশবিক বৃত্তি নিয়ন্ত্রণ করার শক্তি অনেক বেশি, আবার কারও তার চেয়েও বেশি। এভাবে বিভিন্ন স্তরের সাধক রয়েছে। কিন্তু যে পশু প্রকৃতির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করতে পারে সে-ই সম্পূর্ণভাবে দিব্য ভূমিতে আরোহণ করে।

১. এক শ্রেণীর মানুষ মুক্তি লাভের কথা শুনে ভয় পায় যে, এ জন্মে তাদের সফল হবার আশা নেই। আসলে তাদের মুক্তি লাভের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। তারা পূর্ণতার অন্বেষণও করে না। ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক বিষয়গুলি এতো মধুর ও চিত্তাকর্ষক যে, ঐগুলির আকর্ষণ থেকে বেরিয়ে আসার কোন ক্ষমতা তাদের থাকে না।
২. 'আবার সেই ধরনের ধর্ম-কর্মই তাদের সহ্য হয় যা তাদের ইন্দ্রিয় পরায়ণতার সঙ্গে কোন সংঘাত সৃষ্টি করে না। দিনের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে মাত্র পাঁচ মিনিট ধর্মানুশীলন করাই তারা শ্রেয় মনে করে এবং বাদবাকী সময় তারা আনন্দ ও স্ফুর্তি ক'রে কাটায়।'[১২৮]
৩. কিছু লোক সাময়িকভাবে ধর্মানুশীলন শুরু করে। কিছুদিনের জন্য তাদের ধর্ম কর্ম ভাল লাগে। কারণ এ থেকে তারা কিছুটা আনন্দ ও সুখ পায়, তারপর ছেড়ে দেয়।
৪. এমন শ্রেণীর লোকও দেখা যায়, যারা আত্মপ্রবঞ্চনা বশতঃ নিজেদের আধ্যাত্মিক দিক থেকে এত উন্নত মনে করে যে, অপরের নিকট থেকে তাদের কিছু শোনার ও শিক্ষার নেই।
৫. শীঘ্রই হোক আর বিলম্বেই হোক প্রতিটি মানুষ পূর্ণতার জন্য সংগ্রাম করতে বাধ্য হয়। কারণ কোন ব্যক্তিই নিজের বর্তমান অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে পারে না। মানুষ বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়ে উচ্চতর অবস্থার সন্ধান করে। 'এইসব ব্যক্তিকে বরং পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করতে হয় এবং যেসব আসক্তি তাদের হীন পশুস্তরে আবদ্ধ রেখেছে, সেইসব আসক্তি থেকে মুক্তি পাবার জন্য তাদের কঠিন সংগ্রাম করতে হয়।'[১২৯]

মুক্তির স্পৃহা, অন্বেষণ ও ঈশ্বর প্রেমের ব্যাকুলতা সাধককে নিয়ে যায় অমৃতের পারে। সাধনার ঊর্ধ্ব জগতে যাত্রা পথের বিভিন্ন স্তরে ইন্দ্রিয়াসক্তি বা নৈতিক স্খলন ঘটলে আত্মার অবনতি হয়। আবার কঠোর সাধনা দ্বারা অবনতি অবস্থার উন্নতি হয়। সাধক উত্থান-পতনের দূর্গম পথ অতিক্রম করে আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে অধিকতর সচেতন হয়ে ক্রমিক মিলনের মাধ্যমে পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "সমুদ্রের উপরিভাগে উত্তাল তরঙ্গমালা নৃত্য করিতে পারে, প্রবল জটিকা গর্জন করিতে পারে, কিন্তু উহার গভীরতম প্রদেশে অনন্ত স্থিরতা, অনন্ত শান্তি, অনন্ত আনন্দ বিরাজমান। 'শোকার্তেরা ধন্য, কারণ তাহারা সান্ত্বনা পাইবে; কারণ ঐ মহা বিপদের দিনে যখন

Dhaka University Institutional Repository

পিতামাতার কাতর ক্রন্দনে উদাসীন করাল কালের পেষণে হৃদয় বিদীয়র্ণ হইতে থাকে, যখন গভীর দুঃখ ও নিরাশায় পৃথিবী অন্ধকার বোধ হয়,তখনই আমাদের অন্তরের চক্ষু উন্মীলিত হয়। যখন দুঃখ বিপদ নৈরাশ্যের ঘনান্ধকারে চারিদিক একেবারে আচ্ছন্ন বোধ হয়, তখনই যেন সেই নিবিড় অন্ধকারের মধ্য হইতে হঠাৎ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে, স্বপ্ন যেন ভাঙিয়া যায়, আর তখন আমরা প্রকৃতির মহান্ রহস্য সেই অনন্ত সত্তাকে দিব্যচক্ষে দেখিতে থাকি। যখন জীবন ভার এত দুর্বহ হয় যে, তাহাতে অনেক ক্ষুদ্রকায় তরী ডুবাইয়া দিতে পারে, তখনই প্রতিভাবান্ বীরহৃদয় ব্যক্তি সেই অনন্তপূর্ণ নিত্যানন্দময় সত্তামাত্র-স্বরূপকে দেখে, যে অনন্ত পুরুষ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে অভিহিত ও পূজিত; তখনই যে শৃঙ্খল তাহাকে এই দুঃখময় কারায় আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তাহা যেন ক্ষণকালের জন্য ভাঙিয়া যায়। তখন সেই বন্ধনমুক্ত আত্মা ক্রমাগত উচ্চ হইতে উচ্চতর ভূমিতে আরোহণ করিয়া শেষে সেই প্রভুর সিংহাসনের সমীপবর্তী হয়, 'যেখানে অত্যাচারীর উৎপীড়ন সহ্য করিতে হয় না, যেখানে পরিশ্রান্ত ব্যক্তি বিশ্রাম লাভ করে'। ভ্রাতঃ! দিবারাত্র তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিতে ভুলিও না; দিবারাত্র বলিতে ভুলিও না, 'তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।'

'কেন' প্রশ্নে আমাদের নাই অধিকার।
কাজ কর, ক'রে মর- এই হয় সার ॥

হে প্রভো ! তোমার নাম– তোমার পবিত্র নাম ধন্য হউক এবং তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক। হে প্রভো ! আমরা জানি যে, আমাদিগকে তোমার ইচ্ছার অধীনে চলিতে হইবে– জানি প্রভো, মায়ের হাতেই মার খাইতেছি; কিন্তু মন বুঝিলেও প্রাণ যে বুঝে না! হে প্রেমময় পিতঃ ! তুমি যে একান্ত আত্মসমর্পণ শিক্ষা দিতেছ, হৃদয়ের জ্বালা তো তাহা করিতে দিতেছে না। হে প্রভো ! তুমি তোমার চক্ষের সমক্ষে তোমার সব আত্মীয়-স্বজনকে মরিতে দেখিয়াছিলে এবং শান্তচিত্তে বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া নিশ্চিতভাবে বসিয়াছিলে; তুমি আমাদিগকে বল দাও। এসো প্রভো, এসো হে আচার্যচূড়ামণি ! তুমি আমাদিগকে শিখাইয়াছ, সৈনিককে কেবল আজ্ঞাপালন করিতে হইবে, তাহার কথা কহিবার অধিকার নাই। এসো প্রভো, এস হে পার্থসারথি! অর্জুনকে তুমি যেমন এক সময় শিখাইয়াছিলে যে, তোমার শরণ লওয়াই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্য, তেমনি আমাকেও শিক্ষাও– যেন প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের সহিত আমিও দৃঢ়তা ও শরণাগতির সহিত বলিতে পারি 'ওঁ শ্রীকৃষ্ণার্পমস্তু'। প্রভু আপনার হৃদয়ে শান্তি দিন, ইহাই দিবারাত্র সচ্চিদানন্দের প্রার্থনা।"[১৩০]

পূর্ণ মিলন

পূর্ণ মিলন বা জীবের 'পূর্ণতা' শব্দটির অর্থ হলো জীবের এমন একটি অবস্থা-যখন জীবের পূর্ণ স্বরূপ বিকশিত হয়ে নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত ও অমৃত স্বরূপ হয়ে দিব্যভাব প্রাপ্ত হয়। এ অবস্থায় জীব বিশ্বাত্মা বা পরমাত্মার সাথে একাত্মতা লাভ করে। জীবের পূর্ণতা লাভ হলেই দীর্ঘ দিনের পূর্ণতা অর্জনের সংগ্রামের অবসান হয়। পূর্ণতা প্রাপ্তি ও ব্রাহ্মোপলব্ধি এ দুটি অবস্থা এক ও অভিন্ন। বেদান্তের শিক্ষা, 'নির্গুণ-ব্রহ্মের সম্যক্ উপলব্ধি হ'লে মানুষ পূর্ণতা লাভ করে বা পূর্ণ হয়।'[১৩১] যিনি ব্রহ্ম পূর্ণভাব লাভ করেছেন তাঁকে পূর্ণ মানব বলা হয়। যিনি পূর্ণতার স্তরে আরোহণ করেন, তিনি আর নৈতিক, মানসিক ও জাগতিক স্তরের নিয়মাবলীর অধীন থাকেন না। সেই মহাত্মা দৈহিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক সকল স্তরের উপর পূর্ণ আধিপত্য লাভ করেন। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয়ের প্রতি আর কোন আকর্ষণ থাকে না। কারণ তাঁরা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুর স্বরূপ জানেন, সেগুলো ক্ষণস্থায়ী বা অনিত্য, তাই এগুলো তাদের মুগ্ধ করতে ও মায়াজাল বিস্তার করতে পারে না। বেদান্তদর্শনে জীবাত্মার সাথে পরমাত্মার পূর্ণ মিলন বা পূর্ণতা লাভের উচ্চতর অবস্থাকে বলা হয় 'সমাধি'। সমাধি হলো গভীর প্রেম ও আবেগ ঘন, পূর্ণ জ্ঞানাতীত এবং বাহ্যিক চেতনা শূন্য এক মানসিক অবস্থা। "আধুনিককালের শ্রেষ্ঠ চিন্তাশীল ব্যক্তিরাও অশরীরী আত্মার সাহায্যে আবিষ্ট হওয়ার পুরানো ভাবধারাকে এখন আর উপহাস ও অস্বীকার করেন না। তাঁরা কেবলমাত্র যে এটি স্বীকার করেন তাই নয়, পরন্তু সমর্থন করেন যে, দেহধারী জীবের পক্ষে এই দেহ ত্যাগ ক'রে অধ্যাত্ম-জগৎ ভ্রমণ করাও সম্ভব, তখন তার ভৌতিক দেহটা সম্মোহিত ব্যক্তির মতো অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে থাকে। এই অবস্থায় আত্মার অনুভূতি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ভূমিতে জড় জগতের বস্তুতেই সীমাবদ্ধ থাকে না; বিশেষ ক'রে এই সমস্তকে অতিক্রম ক'রে অধ্যাত্মজগতের প্রত্যক্ষ অনুভূতি লাভ করে। দ্রষ্টা তখন পার্থিব স্তরের দৃষ্ট যা-কিছু তার চেয়েও ঊর্ধ্বতর রাজ্যে প্রবেশ করে। জীবাত্মার ভৌতিক জড় দেহ থেকে অধ্যাত্ম জগতে এই পর্যটন ও তার আধ্যাত্মিক অনুভূতিই 'সমাধি' নামে অভিহিত।"[১৩২]

Dhaka University Institutional Repository

সমাধির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

সাধক বিবেকানন্দ সমাধির মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে, মানুষের মন তিনটি অবস্থায় কাজ করতে পারে। তাহলো সজ্ঞান, নির্জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা। এ সম্পর্কে নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. **সজ্ঞান অবস্থা:** মন যে জাগ্রত বা চেতন অবস্থায় বিভিন্ন কাজকর্ম করে তাহলো সজ্ঞান অবস্থা। যেমন- খাদ্য গ্রহণ, চলাফেরা ও বিভিন্ন কাজকর্ম সজ্ঞান অবস্থায় সম্পন্ন হয়। উচ্চতর প্রাণীর মধ্যে সজ্ঞান অবস্থায় কাজগুলো প্রবল হয়।

২. **নির্জ্ঞান বা অজ্ঞান অবস্থা:** মন যে নিদ্রা, অচেতন বা অজ্ঞান অবস্থায় বিভিন্ন কাজকর্ম করে তা হলো নির্জ্ঞান অবস্থা। যেমন- আমাদের ভুক্ত খাদ্য-দ্রব্য থেকে রক্ত ও শক্তি উৎপন্ন হয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুস্থ ও সবল হয়। এ সব ক্রিয়া আমাদের অজ্ঞাতসারে হয়ে থাকে। নিম্নশ্রেণীর প্রাণীর অজ্ঞান অবস্থায় কাজগুলোকে সহজাত বৃত্তি বলা হয়।

বিবেকানন্দ স্বজ্ঞান ও নির্জ্ঞান অবস্থার কাজ সম্পর্কে বলেন, "মনুষ্য-মন দুই স্তরে কাজ করিতে পারে। প্রথম অবস্থাকে সজ্ঞান-ভূমি বলা যাইতে পারে; এখানে সকল কাজ করিবার সময় সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় আমি করিতেছি, আর অপর একটি ভূমির নাম নির্জ্ঞান-ভূমি (বা অজ্ঞান-ভূমি) বলা যাইতে পারে, এখানকার কাজের সহিত 'আমি'-বোধ থাকে না। আমাদের মানস কার্য-কলাপের যে অংশে 'অহং' ভাব থাকে না, তাহা অজ্ঞানভূমির ক্রিয়া, আর যে অংশে অহংভাব থাকে, তাহা জ্ঞান পূর্বক ক্রিয়া। নিম্নজাতীয় জীবজন্তুতে এই অজ্ঞানভূমির কার্যগুলিকে সহজাত বৃত্তি (instinct) বলে উচ্চতর জীবে ও উচ্চতম জীব মনুষ্যে জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়াই প্রবল।"[১৩৩]

৩. **জ্ঞানাতীত অবস্থা:** আধ্যাত্মিক সাধনা বলে মন যে তন্দ্রা বা স্বপ্নের মত এক বিশেষ মানসিক অবস্থায় স্বজ্ঞা লাভ করে, এই স্বজ্ঞালব্ধ অবস্থাই হলো জ্ঞানাতীত অবস্থা। অর্থাৎ জ্ঞানাতীত অবস্থা হলো মন জ্ঞানের অতীত আরও এক উচ্চতর অবস্থায় কাজ করতে পারে। এ উচ্চতর জ্ঞানাতীত অবস্থা সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'মন জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইতে পারে। অজ্ঞান ভূমিতে কৃতকার্য যেমন জ্ঞানের নিম্নভূমিতে ঘটে, ঠিক সেইরূপ আর এক প্রকার কাজ জ্ঞানাতীত ভূমি হইতে হইয়া থাকে। উহাতেও কোনরূপ অহংভাব থাকে না। এই অহংবুদ্ধি কেবল মধ্যস্তরেই থাকে। যখন মন এই স্তরের ঊর্ধ্বে বা নিম্নে থাকে, তখন আমি-রূপ কোন বোধ থাকে না, কিন্তু তখনও মনের ক্রিয়া চলিতে থাকে। যখন মন এই অহংবোধের সীমা অতিক্রম করিয়া যায়, তখন তাহাকে সমাধি বা জ্ঞানাতীত অবস্থা বলে।...নিদ্রা যাইবার পূর্বে তাহার যতখানি জ্ঞান ছিল, নিদ্রাভঙ্গের পরও ঠিক তাহাই থাকে; উহার কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় না। তাহার হৃদয় কোন নূতন আলোকে উদ্ভাসিত হয় না। কিন্তু যখন মানুষ সমাধিস্থ হয়-মূর্খ-ও যদি সমাধিস্থ হয়-সমাধি ভঙ্গের পর সে মহাজ্ঞানী হইয়া উঠিয়া আসে।'[১৩৪] সমাধি অবস্থায় লব্ধজ্ঞান, নির্জ্ঞান অবস্থার অনুভূতি অপেক্ষা উচ্চতর এবং সজ্ঞানভূমিতে যুক্তিবিচার লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষাও অনেক উচ্চতর। কারণ সমাধি অবশ্যই জ্ঞানাতীত অবস্থা। বিবেকানন্দের মতে এটি সমাধিতত্ত্ব।

ঐশী জ্ঞানের উৎস সমাধি

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজকর্ম বিচার বুদ্ধির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। মানুষ বিচার বুদ্ধির বৃত্তের বাইরে যাবার চেষ্টাও করে না। কিন্তু মানব জীবনের মূল্যবান বিষয়গুলো আসে যুক্তি বিচারের সীমানা পেরিয়ে এক জ্ঞানাতীত অবস্থা থেকে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "অথচ মানুষ যাহা অতিশয় মূল্যবান্ বলিয়া মনে করে, তাহা ঐ যুক্তি বিচারের বাহিরেই অবস্থিত। অবিনাশী আত্মা আছে কি না, ঈশ্বর আছেন কিনা, এই জগতের নিয়ন্তা পরমচৈতন্যস্বরূপ কেহ আছেন কিনা-এ-সকল প্রশ্ন যুক্তির এলাকার বাহিরে। যুক্তি কখনও এই-সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না।...যুক্তি বলে ঃ আমি অজ্ঞেয়বাদী আমি 'হাঁ' বা 'না' কিছুই জানি না।"[১৩৫] কিন্তু আমাদের এসব অতি প্রয়োজনীয় প্রশ্নগুলোর যথাযথ উত্তর না পেলে মানব জীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে পড়ে।

বিশ্বের ইতিহাস অধ্যয়নে জানা যায় মহান ধর্মাচার্যগণ বলেন, জগতের বাহির হতে ঐশী সত্য লাভ করেছেন। ধর্মাচার্যগণের অনেকে জানেন না এই সত্যের উৎস কোথায়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "কেহ হয়তো বলিলেন, এক স্বর্গীয় দূত পক্ষযুক্ত মনুষ্যাকারে আসিয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন, 'ওহে মানব, শোন, আমি স্বর্গ হইতে এই সুসমাচার আনয়ন করিয়াছি, গ্রহণ কর।' দ্বিতীয় ব্যক্তি বলিলেন, এক জ্যোতির্ময় দেবতা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আর একজন বলিলেন, স্বপ্নে তিনি দেখিয়াছেন, তাঁহার পিতৃপুরুষ আসিয়া তাঁহাকে কতকগুলি তত্ত্ব উপদেশ দিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইহার অতিরিক্ত তিনি আর কিছুই জানেন না। এইরূপে বিভিন্ন উপায়ে তত্ত্বলাভের কথা বলিলেও ইঁহারা সকলেই এই বিষয়ে একমত যে, যুক্তিতর্কের দ্বারা তাঁহারা এই জ্ঞান লাভ করেন নাই, উহার অতীত প্রদেশ হইতে তাঁহারা উহা লাভ করিয়াছেন। এ-বিষয়ে যোগ শাস্ত্র কি বলে? যোগশাস্ত্র বলে, যুক্তিবিচারের অতীত প্রদেশ হইতে তাঁহারা যে ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের এ কথা ঠিক। প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের নিজেদের ভিতর হইতেই ঐ জ্ঞান আসিয়াছে।"[১৩৬] যোগীগণ বলেন, যুক্তি বিচারের অতীত মনের এক উচ্চতর অবস্থায় এই পারমার্থিক বা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ হয়। কখন স্বাভাবিক মানব স্বভাব অতিক্রম করে আকস্মিকভাবে এই সত্য লাভ হতে পারে। তিনি এই ঘটনার বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ থাকতে পারেন, ফলে তিনি মনে করেন বাহির হতে ঐ জ্ঞান লাভ হয়েছে। কারও নিকট মনে হয় দেব দূত হতে, কারও নিকট দেব বিশেষ হতে, আবার কারও নিকট সাক্ষাৎ ভগবান হতে প্রাপ্ত নির্দেশ বলে মনে হয়। 'ইহার অর্থ মন নিজ স্বভাব অনুযায়ী নিজের ভিতর হইতেই ঐ জ্ঞান লাভ করিয়াছে। কিন্তু যিনি উহা লাভ করিয়াছেন, তিনি নিজ শিক্ষা ও বিশ্বাস অনুসারে ঐ জ্ঞান কিরূপে লাভ হইল, তাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রকৃত কথা এই যে, ইঁহারা সকলেই ঐ জ্ঞানাতীত অবস্থায় হঠাৎ আসিয়া পড়িয়াছেন।'[১৩৭]

সর্বজনীন সমাধির মূলে গভীর প্রেম

অধ্যাত্মচেতনায় সর্বজনীনভাবে স্বীকৃত সমাধি কিভাবে লাভ করা যায়? এ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে- বেদান্ত, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ধর্মের সাধক ঋষিগণের অনন্ত সত্তার উপলব্ধিকে বিশ্লেষণ করে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম মতে সাধকগণের পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা, চিন্তাধারা ও সত্য লাভের মাধ্যম অনুসারে সমাধি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত। এদের প্রতিটি নিয়মকে বেদান্তে যোগ বা পথ বলে অভিহিত করা হয়েছে। ভক্তিযোগে প্রেম ও ভক্তির পথই ঈশ্বর দর্শনের সবচেয়ে সহজ পথ। 'প্রেম ও ভক্তি দু'টি পক্ষ বিশেষ, যার মাধ্যমে আত্মরূপ পাখিটি দেহপিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে অনন্তসত্তার অধ্যাত্মপরিবেশে উড্ডীন হয় এবং চিদানন্দ অনুভব করে। বিভিন্ন দেশের মহান দ্রষ্টা পুরুষরা,– যাঁরা এই সমাধি-অবস্থা লাভ করেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই এই পথ অনুসরণ করেছিলেন।...প্রেম এবং ভক্তিই তাঁদের মূলীভূত কারণ। প্রকৃত প্রেম ও ঈশ্বরানুরাগের বহ্নি সমস্ত পার্থিব বন্ধন দগ্ধ করে এবং ভক্তের নিজস্ব বলতে যা-কিছু সবই গ্রাস করে। প্রচণ্ড এই দাহিকাশক্তি। সম্ভবতঃ একান্ত অল্পসংখ্যক মানুষই উপলব্ধি করেছে প্রকৃত প্রেমের দাহিকাশক্তি কি রকম। উচ্চতাপের মতো এটি দেহযন্ত্রে ক্রিয়াশীল জিভ শুকিয়ে আসে, দেহে প্রদাহ ও উত্তাপ তৈরী করে যা কোন পার্থিব বস্তুর দ্বারাই নিবারিত হয় না। প্রেমের সর্বগ্রাসী প্রদাহ সমাধির পূর্বে সাধকের ঘুম নষ্ট করে। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বারো বৎসর বিনিদ্র-রজনী যাপন করেছিলেন, তখন তাঁর সমস্ত সত্তা প্রেমপ্রদাহে দগ্ধ হয়েছিল। এক সময়ে কয়েক মাস যাবৎ তিনি সমস্ত দেহে এক অসহ্য প্রেম প্রদাহ অনুভব করেছিলেন। তিনি কয়েক ঘন্টা গঙ্গায় ডুবে থাকতেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় গঙ্গার শীতল জলও তাঁর হৃদয়কন্দরের এই প্রেম-প্রদাহ নির্বাপিত করতে পারেনি।'[১৩৮] ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে বর্ণিত সমাধির সব অবস্থাই নিজের জীবনে অনুভব করেন। সমাধি অবস্থায় দিব্যজ্ঞান ও দৈববাণী লাভের জন্য ঈশ্বরের আগমনের জন্য হৃদয়ে বিশেষ আসন তৈরি করতে হয়। তাই তো সাধকের জীবনের সার্বক্ষণিক প্রস্তুতি।

সমাধির যুক্তিসঙ্গত বিজ্ঞান ভিত্তিক প্রাণবন্ত দৃষ্টান্ত হলো শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনদর্শন। "যখন তাঁর বয়স ছয়-সাত বছর সেইসময়ে তিনি গ্রীষ্মকালীন ঘনকৃষ্ণ মেঘের কোলে তুষার-ধবল বলাকাশ্রেণী দর্শনে প্রথম সমাধি অবস্থা লাভ করেন। তাঁর দেহ নিশ্চল হয়ে পড়ে এবং সেই অনুভূতি তিনি তাঁর জীবদ্দশায় কখনও ভোলেননি। তিনি প্রায়ই ঐ অবস্থার কথা উল্লেখ করতেন এবং যখন কেউ জিজ্ঞাসা করতেন সমাধি কিরকম তখনই তিনি সেই অবস্থা লাভ করতেন। সর্বোচ্চ সমাধিঅবস্থা যে 'মহাভাব' আমরা তাঁর সে অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি। তখন তাঁর দেহ মৃত মানুষের মতো অবস্থান করত; তাঁর নাড়ী এবং হৃৎ স্পন্দন সাময়িকভাবে বন্ধ হয়ে যেত এবং তাঁর আত্মা দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে অনন্তের সঙ্গে একত্ব অনুভব করত। এক সময়ে তিনি কলিকার জ্বলন্ত আগুনের উপর পড়ে যান, একটা টিকা তাঁর কাঁধের মাংসের নিচে পড়ে এক ইঞ্চি পরিমাণ গভীর ক্ষত সৃষ্টি করে। তখনও তাঁর দেহবোধ ছিল না এবং তাও তিনি অনুভব করতে পারেননি। এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দেহবোধ থেকে তিনি নিজেকে কত খানি বিচ্ছিন্ন করতে পারতেন।...এটি সংস্কারবদ্ধ বা কোনরকম সম্মোহিত অবস্থাও নয়- এটি সমাধি অবস্থা। যখন তিনি এই অবস্থা লাভ করতেন তখন তাঁর আত্মা দেহ ত্যাগ ক'রে অনন্ত ধামে প্রবেশ করত। কখনো কখনো তিনি অজ্ঞাত ভাষায় কথা বলতেন, যা কারও বোধগম্য হ'ত না। সেই উচ্চ অবস্থা থেকে অবতরণ ক'রে এবং আবার ইন্দ্রিয়চেতনা লাভ ক'রে তিনি আনন্দাতিশয্যে নাচতেন এবং তাঁর অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতেন।"[১৩৯] শ্রীরামকৃষ্ণ অপরিসীম আধ্যাত্মিক শক্তি বলে শিষ্যদের স্পর্শ মাত্র সমাধি অবস্থা লাভ করাতে পারতেন। তিনি সমাধি লাভের পরমানন্দ ও পরম তৃপ্তি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, 'জীবিত

Dhaka University Institutional Repository

মাছ জল থেকে তীরে এসে আবার জলে ফিরলে যে সুখ ও আনন্দ লাভ করে, সেই মাছের সুখাবস্থাটি কি কল্পনা করতে পারো? শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন যে, সমাধি-অবস্থায় আত্মা তার যথার্থ সত্তার সন্ধান পায়,- যেখানে এটি সব রকম বন্ধন থেকে অখণ্ড মুক্তি লাভ করে।'[১৪০]

স্পেনীশ সাধ্বী সেন্ট-টেরেসা সমাধির শেষ স্তরের অনুভূতি সম্পর্কে বলেন, 'ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মবোধ, এবং সেটি আকস্মিকভাবে ও তীব্রবেগে শেষ হয়, এইরকম বেগে শেষ হয় যে, তা প্রতিরোধ করতে আমাদের প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হয়। তখন আত্মসত্তায় ঈশ্বর অবতরণ করেন এবং এই সাধক তাঁর সঙ্গে একীভূত হন।'[১৪১] ভারতবর্ষের ভক্তিবাদীগণ ভক্তি ও প্রেমের পথ অনুসরণ করে ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্মতা লাভের অবস্থাকে 'মহাভাব' বা সমাধির উচ্চতম অবস্থা বলে অভিহিত করেন। 'কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা, লুথারের সমসাময়িক ঈশ্বরাবতার শ্রীচৈতন্য-যিনি সর্বসাধারণে প্রেম প্রচার করেছিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ এই সমাধি-অবস্থা লাভ করেছিলেন।'[১৪২] ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে রাধাকৃষ্ণের প্রেম ও অধ্যাত্ম অনুভূতিগুলি মহাভাবের উদাহরণ স্বরূপ।

যুক্তির মানদণ্ডে সমাধি

বিবেকানন্দ এক বিজ্ঞানমনস্ক মহাপুরুষ। তিনি একজন বিজ্ঞানীর মতোই সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, দর্শন প্রতিটি বিষয়েই যুক্তি ও বিচার-বিশ্লেষণ করে তাঁর মত দাঁড় করেন। তিনি ধর্মের অতীন্দ্রিয় বিষয় সমাধিও যুক্তি-বিচারের মানদণ্ডে যাইচ করে গ্রহণ করেন। সমাধির সত্যতা সম্পর্কে তিনি বলেন, 'অন্য কোন বিজ্ঞান-শিক্ষার সময় আমরা যেরূপ করিয়া থাকি, সমাধি তত্ত্ব শিক্ষার সময় ঠিক সেইরূপ করিতে হইবে। যুক্তির উপরই আমাদের ভিত্তি স্থাপন করিতে হইবে, যুক্তি আমাদিগকে যত দূর লইয়া যায় ততদূর যাইতে হইবে; যুক্তি যখন আর চলিবে না, তখন যুক্তিই সর্বোচ্চ অবস্থা লাভের পথ দেখাইয়া দিবে।'[১৪৩] কেবলমাত্র যুক্তি অপেক্ষা উচ্চতর এক প্রকার বৃত্তি অনন্তকে উপলব্ধি করতে পারে। বিবেকানন্দ প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির সত্যতা যাচাই সম্পর্কে বলেন, "অতএব যখন শুনিবে কেহ বলিতেছে, 'আমি প্রত্যাদিষ্ট', অথচ যুক্তিবিরুদ্ধ কথা বলিতেছে, তাহার কথা শুনিও না। কেন? কারণ এই তিন অবস্থা- সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা অথবা নির্জ্ঞান, সজ্ঞান ও জ্ঞানাতীত অবস্থা একই মনের অবস্থা বিশেষ। একই ব্যক্তির তিনটি মন নাই, কিন্তু মনের একটি অবস্থা অপরগুলিতে পরিণত হয়। সহজাত-জ্ঞান বিচারপূর্বক-জ্ঞানে ও বিচারপূর্বক-জ্ঞান জ্ঞানাতীত অবস্থায় পরিণত হয়; সুতরাং অবস্থাগুলির মধ্যে একটি অপরটির বিরোধী নয়। প্রকৃত প্রেরণা যুক্তিবিরোধী নয়- বরং যুক্তির পূর্ণতা সাধন করে।"[১৪৪] প্রকৃত প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কথা যুক্তি বিরোধী নয়। তাঁর সহজাত জ্ঞান, বিচারপূর্বক জ্ঞান ও জ্ঞানাতীত- এই তিনটি অবস্থার মধ্যে সমন্বয় ও সামঞ্জস্য থাকবে। তিনি জ্ঞানের বিভিন্ন তথ্য-উপাদান সংগ্রহ করে সুশৃঙ্খলভাবে মনে এক মহাজ্ঞানের সিঁড়ি গড়ে তোলেন। এ কারণে জ্ঞানের এক অবস্থার সাথে অন্য অবস্থার সঙ্গতি ও সমন্বয় থাকবে। ফলে কোন প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির কথা জগৎ ও সমাজ জীবনের ক্ষেত্রে তা সত্য বলে প্রমাণিত হবে। তার ভাষ্য বা বাণীগুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করলে সত্য প্রমাণিত হবে। এ সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বলা যায় জগদ্বিখ্যাত ধর্মাবতার মহাপুরুষগণের কথা সত্য হয়েছে। ফলে মানুষ তা সত্য বলে বিশ্বাস করে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছে। অপরদিকে যুক্তি বিরোধী কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি বলেই তা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

শাস্ত্রে প্রধানত দু'প্রকার মুক্তির কথা রয়েছে। যথা- জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি। 'রোগাদি হেতু ব্যতিরেকে স্বভাবতঃ যশঃপুণ্য ঐশ্বর্যাদি ভোগে যাঁহার রুচি না হয়, তিনিই জীবন্মুক্ত।...আপৎকালে অথবা অন্যকালে সুখ দুঃখ প্রাপ্তিতে যিনি হৃষ্ট কিংবা ম্লান না হন, তিনিই মুক্ত বলিয়া কথিত হন।'[১৪৫] আর যিনি দেহ ধারণ করে দেহ বোধ অনুভব করেন না, শুধু আত্মবোধ বা আত্মোপলব্ধি করেন তিনি বিদেহমুক্ত। জনক রাজা ছিলেন বিদেহ মুক্ত। "...'বিদেহ' শব্দের অর্থ 'দেহজ্ঞান শূন্য', যদিও তিনি একজন রাজা ছিলেন, তথাপি তিনি দেহবোধ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তিনি নিজেকে সর্বদা আত্মা বলিয়াই অনুভব করিতেন।"[১৪৬] শাস্ত্রে এছাড়া আরও চার প্রকার মুক্তির কথা বিশেষভাবে প্রচলিত রয়েছে। তাহলো সালোক্য, সামীপ্য, সাযুজ্য ও নির্বাণ।

১. সালোক্য: 'সালোক্য' অর্থ-সহলোক, অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত একলোকে বাস। 'পরমেশ্বর সমুদয় স্থান অধিকার করত সকল লোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এবং পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি ভূলোকে ও দ্যুলোক সমূহ পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। *সাধক যখন এই মহান সত্যটি বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন, এবং এই ভাবটি ক্রমে যখন তাঁহার জীবনগত হইয়া পড়ে, তখনই তিনি পরমেশ্বরের সহিত একলোকে বাস করেন। এই অবস্থায় সাধক মহাসমুদ্র স্থিত

Dhaka University Institutional Repository

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্রের গর্ভে ভূলোক ও দ্যুলোক সমূহকে ভাসমান দেখিতে পান। যদিও বাহিরে পৃথিবীই তাঁহার বাসভূমি থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ অবস্থায় তিনি আর পৃথিবীর লোক থাকেন না। অনন্তকালের জন্য ব্রহ্মে আপনার বাসস্থান নির্দেশ করত নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও পরমানন্দযুক্ত হন।'[১৪৭] এভাবে পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাবটি ক্রমে সাধকের সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করে। তখন সাধকের সালোক্য মুক্তি বা পরমেশ্বরের সাথে একলোকে বাস সিদ্ধ হয়।

২. সামীপ্য: 'সামীপ্য' অর্থ-সমীপস্থ হওয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের সহিত একত্রাবস্থান। সাধকের সালোক্য মুক্তির অবস্থা ক্রমে গভীরতা প্রাপ্ত হলে অন্তশ্চক্ষুর মাধ্যমে উজ্জ্বলতর মূর্তিতে ব্রহ্মদর্শন লাভ করে। 'প্রেমময়ের প্রেমানন যখন তিনি সকল স্থানেই নিঃসংশয়রূপে দেখিতে পান; যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন সেই দিকেই যখন তাঁহার চক্ষু "বিশ্বতশ্চক্ষুর" উজ্জ্বল চক্ষুর উপরে পতিত হইতে থাকে, সেই সময়েই সাধকের প্রভুর সহিত একত্রাবস্থান ঘটে। এবং সেই অবস্থার নামই সামীপ্য মুক্তি।'[১৪৮]

৩. সুজুয্য: 'সাযুজ্য' অর্থ-সহযোগ, অর্থাৎ ঈশ্বরে যুক্ত হইয়া সংস্থিতি। 'যখন সাধকের এইরূপ সামীপ্য মুক্তির অবস্থা ক্রমে আরও গভীর ভাব ধারণ করে; এবং যখন তাঁহার আত্মা জনক পরমাত্মাতে সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করত সুধাপানে নিযুক্ত থাকে, তখনই তাঁহার সেই অবস্থাকে সাযুজ্য মুক্তি কহে।'[১৪৯]

৪. নির্বাণ: 'নির্বাণ' অর্থ-ঈশ্বরেলীন হওয়া অর্থাৎ তাঁর মহান সত্তা-সমুদ্রে একেবারে ডুবিয়া যাওয়া, ডুবিয়া আপনাকে হারিয়ে ফেলা। 'ক্রমে যখন সাধক ব্রহ্মাসত্তা সমুদ্রে মগ্ন হইয়া আপনার নিজ সত্তা পর্য্যন্ত হারাইয়া বসেন, অর্থাৎ ক্রমে যখন তাঁহার বুদ্ধি মন ব্রহ্মধ্যানে একেবারে লয় বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহার সেই অবস্থাকে নির্ব্বাণ বা চূড়ান্ত মুক্তি বলে।'[১৫০] মুক্তি মূলত এক প্রকার। চার প্রকার মুক্তির অর্থ হলো- সাধকের অনুরাগ বা উপাসনায় গভীরতার বিভিন্ন ধাপ। সাধক যত উজ্জ্বলতরভাবে ব্রহ্মদর্শন করে, সকল পার্থিব ভাব থেকে তত আধ্যাত্মিক ভাবে মগ্ন হতে থাকে। সাধক ক্রমে সাধনায় ধাপে ধাপে সালোক্য, সামীপ্য, সাজুয্য ও নির্বাণ বা চূড়ান্ত মুক্তির স্তরে উপনীত হন।

মুক্ত আত্মা

পিঞ্জিরাবদ্ধ পাখি যেমন মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে আকাশে উড়তে পারে, তেমনি সাধকের সমাধি অবস্থায় জীবাত্মারূপ পাখিটি দেহ পিঞ্জর থেকে মুক্ত হয়ে উচ্চতর অধ্যাত্ম আকাশে বিচরণ করে। তখন যে মুক্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করা যায় তাতে অনুভূতির পরিসর অনন্ত বিস্তৃত হয় এবং জীবাত্মা পার্থিব বস্তুর পরিবর্তে অতীন্দ্রিয় পরিবেশ উপলব্ধি করে। সমাধির উচ্চতম অবস্থায় মুক্ত আত্মা সীমার সকল বন্ধন অতিক্রম করে অনন্তধামে প্রবেশ করে। বিবেকানন্দ মুক্ত আত্মা সম্পর্কে বলেন, তখন সমুদয় দুঃখ চলে যাবে, সকল যন্ত্রণা অন্তর্হিত হবে, কর্মবীজ দগ্ধ হয়ে যাবে, আত্মাও অনন্তকালের জন্য মুক্ত হয়ে যাবে'। মুক্ত আত্মার কতকগুলো বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

১. **দুঃখ মুক্তি:** পূর্ণতা বা মুক্তি লাভের সর্বোচ্চ অবস্থায় সর্ব প্রকার কামনা-বাসনার অসংখ্য বন্ধন ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সকল বাসনা বিলীন হয় পরম প্রাপ্তিতে, চিরকালের জন্য বিলুপ্ত হয় সব সংশয় ও সন্দেহ। সেই সঙ্গে মনের সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়, মন সকল কপটতা পরিত্যাগ ক'রে সরল হয় এবং আত্মা সীমার বন্ধন মুক্ত হয়ে পূর্ণস্বাধীনতার আনন্দ এবং চিরন্তন শান্তিতে ঊর্ধ্বলোকে আরেহণ ক'রে মহাশূন্যে সঞ্চরণ করে।'[১৫১] সেই সর্বোচ্চ অবস্থায় কোন দুঃখ নেই, বেদনা নেই এবং জন্মমৃত্যু জনিত কোন কষ্ট নেই, শুধুই আছে অপার জ্ঞান, শান্তি ও আনন্দ।

২. **আত্মস্বরূপে অবস্থান:** "যে সকল ব্যষ্টি-আত্মা বা জীবাত্মা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করে, তারা নির্গুণ-ব্রহ্ম বা পরমাত্মার জ্ঞানপ্রাপ্ত হয়, এবং তাদের ক্ষুদ্র 'আমি' বা 'আমার'– বোধ বিলুপ্ত হয়।"[১৫২] তখন আত্মা স্বরূপে অবস্থান করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, যখন কোন অভিনেতা মঞ্চে 'আমার' 'আমি' ভাব নিয়ে অপর এক চরিত্রের মানুষরূপে অভিনয় করে, কিছুক্ষণ পর অভিনয় শেষ হলে মুখোশ ও পোশাক খুলে অভিনেতা আপন চরিত্রে ফিরে আসে। তখন ব্যক্তির আসল নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। তেমনি জগতের মঞ্চে অভিনয় শেষ হলে জীবাত্মা ঈশ্বরদর্শন লাভ করে স্বরূপে অবস্থান করে।

৩. **অনন্ত ইচ্ছাশক্তি:** 'প্রত্যক্ষ ঈশ্বরানুভূতির সেই অবস্থায় ব্যষ্টি-আত্মা বা জীবাত্মা ঐশ্বরিক ইচ্ছাশক্তির মধ্যে স্বীয় ইচ্ছাবৃত্তির উৎস খুঁজে পায়। তখন সে তাতেই আত্মসমর্পণ করে, ও নিজের ইচ্ছাকে ঈশ্বরের যন্ত্ররূপ মনে করে, তার সাহায্যে ঈশ্বরের ইচ্ছাকেই কার্যকরী হতে দেয়। যে আত্মা পরমসত্যকে লাভ করে, সেই আত্মা স্বতঃই

Dhaka University Institutional Repository

আত্মাসমর্পিত হয়ে যায়, অথচ সেই সমর্পিত অবস্থায় যে কিছুই হারায় না, বরং অনন্ত শান্তি লাভ করে। তখন তার ইচ্ছা শক্তি আগে যেমন ছিল তার চেয়ে অনন্ত গুণ বৃদ্ধি পায়। সত্য-সাক্ষাৎকারের সেই অবস্থায় আত্মার মধ্যে দিব্য প্রেরণার সঞ্চার হয়। জীবনের উচ্চতর সত্যগুলি তখন সে জানতে পারে।'[১৫৩]

৪. **কালহীন অবস্থা:** 'যদি তুমি আত্মার ভূমিতে আরোহণ করো, তবে অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের সীমারেখা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হবে।... সেই সমস্তই তোমার সামনে একই সঙ্গে প্রতিভাত হবে।'[১৫৪]

৫. **পূর্ণ জ্ঞান–** পূর্ণের আবির্ভাব হলে, অংশের জ্ঞান দূর হয়। ঈশ্বর এক পূর্ণসত্তা। অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের সকল বিষয় এক ঈশ্বরের অঙ্গীভূত। ঈশ্বর অস্তিত্বের এক অনন্ত সমুদ্র। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু নিয়ে পূর্ণ হয়ে আছেন। 'যে মুহূর্তে ব্যক্তির মনে এই একের অনুভূতির উদয় হয়, সেই মুহূর্তে সেই ব্যক্তি সকল খণ্ডবোধ বা বহুত্বের ঊর্ধ্বে চলে যায়। তখন বিশ্ব প্রপঞ্চের বাহ্যিক রূপের আবরণ দূর হয় এবং সকল বৈচিত্র্য একের মধ্যে বিলীন হয় এবং তখন সকল পূর্ণতার এক অখণ্ড-সত্তার জ্ঞান লাভ হয়।'[১৫৫]

৬. **জগতের শাসনকর্তা:** "সাংখ্যেরাই ইঁহাদিগকে 'প্রকৃতিলীন' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সিদ্ধিলাভ করিয়া ইঁহারা পরকল্পে কতকগুলি জগতের শাসনকর্তা রূপে আবির্ভূত হন। কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহ কখনই ঈশ্বর তুল্য হইতে পারেন না। তাঁহারা এমন এক অবস্থায় উপনীত হন, যেখানে সৃষ্টি বা স্রষ্টা নাই, যেখানে জ্ঞাতা জ্ঞেয় বা জ্ঞান নাই, যেখানে আমি তুমি বা তিনি নাই, যেখানে প্রমাতা প্রমেয় বা প্রমাণ নাই, 'সেখানে কে কাহাকে দেখে?'– এরূপ ব্যক্তি সব কিছুর বাহিরে গিয়াছেন, 'যেখানে বাক্য অথবা মনও যাইতে পারে না'।"[১৫৬] সাধক ঈশ্বরদর্শন লাভ করে অনন্ত জ্ঞান, ক্ষমতা ও শক্তি অর্জন করতে পারেন। তাঁরা এসব গুণ ও প্রবল ইচ্ছাশক্তি দ্বারা জগৎ পরিবর্তন ও মানবকল্যাণ সাধন করতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, গৌতম বুদ্ধ, যীশু খ্রীষ্ট, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) প্রমুখ ধর্মাবতার মহাপুরুষগণ জগতে মানবকল্যাণ সাধনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বিবেকানন্দ ঈশ্বর লাভের স্বীয় দুর্লভ অভিজ্ঞতা এভাবে কবিতায় তুলে ধরেন–

ঈশ্বরদর্শন

'পাহাড়ে পর্বতে উপত্যকায়
গির্জায়, মন্দিরে, মসজিদে-
বেদ, বাইবেল আর কোরানে
তোমাকে খুঁজেছি আমি ব্যর্থ ক্রন্দনে।
মহারণ্যে পথভ্রান্ত বালকের মতো
কেঁদে কেঁদে ফিরেছি নিঃসঙ্গ,
তুমি কোথায়–কোথায়-আমার প্রাণ, ওগো ভগবান?
নাই, প্রতিধ্বনি শুধু বলে, নাই।...

কত বর্ষ কেটে গেল করুণ আর্তনাদে
মুহূর্ত মনে হয় যুগ যেন,
তখন- একদিন আমার হাহাকারের মধ্যে
কে যেন ডাকল আমাকে আমারই নাম ধরে।...
ঐ ঐ আবার সেই দৈবী স্বর!
ঐ তো শুনছি আমি, আমারি আহ্বান !
আবেগে আনন্দে নিরুদ্ধ হৃদয়
ডুবে গেল পরমা শান্তিতে।

জ্বলে উঠল আত্মা পরম জ্যোতিতে
খুলে গেল হৃদয়ের দ্বার
আনন্দ ! আনন্দ ! এ কি অপরূপ !
প্রিয় মোর, প্রাণ মোর, সর্বস্ব আমার,
তুমি এখানে, এত কাছে, আমারি হৃদয়ে ?
আমারি হৃদয়ে তুমি নিত্যকাল রাজার গৌরবে !...'[১৫৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১। স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চদশ সংস্করণ, ১৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৪, পৃ. ৭৮।

২। অধ্যাপক পংকজ রায়, "সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ" স্বামী শিবাত্মানন্দ সম্পাদিত, *বিবেকাঞ্জলি*, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন সেবা সমিতি, রামকৃষ্ণ মিশন রোড, হবিগঞ্জ-৩৩০০, প্রকাশকাল ঃ জন্মাষ্টমী ১৪১২, পৃ. ১১৮।

৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৪, পৃ. ১০।

৪। ঐ, পৃ. ১১।

৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ত্রয়োবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, পৃ. ১৬।

৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ১১।

৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ঊনবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৪, পৃ. ২৬৬।

৮। আজিজুন্নাহার ইসলাম, 'হিন্দু ধর্মে আত্মার স্বরূপ', এম. আবুল কাসেম সম্পাদিত, *দর্শন ও প্রগতি*, (১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর, ১৯৯৫) গোবিন্দ দেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকাশ কাল ঃ ডিসেম্বর ১৯৯৫, পৃ. ৮০।

৯। ব্রহ্মকুমার অশোক, "আত্মা হচ্ছে সারথী আর দেহ হচ্ছে রথ", শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী সম্পাদিত, *শ্রদ্ধাঞ্জলী*, শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম, ৮৪/১,স্বামীবাগ রোড, ঢাকা-১১০০, প্রকাশকাল ঃ ১৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৪১০, পৃ. ৯৬।

১০। ঐ, পৃ. ৯৭।

১১। ঐ, পৃ. ৯৬।

১২। আজিজুন্নাহার ইসলাম, 'হিন্দু ধর্মে আত্মার স্বরূপ' ঐ, পৃ. ৮১।

১৩। ব্রহ্মকুমার অশোক, "আত্মা হচ্ছে সারথী আর দেহ হচ্ছে রথ", ঐ, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *ব্যক্তিত্বের বিকাশ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৪, পৃ. ২৩-২৪-২৫।

১৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, ঐ, পৃ. ৭৮-৭৯।

১৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৩৫।

১৭। অধ্যাপক পংকজ রায়, "সর্বধর্ম সমন্বয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ", ঐ, পৃ. ১৩৫।

১৮। শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ, *ঈশ্বর দর্শনের উপায়*, স্বামী পরদেবানন্দ সম্পাদিত, অর্ঘ্য, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট- বাংলাদেশ, প্রকাশকাল ঃ ৫ নভেম্বর, ২০০৩, পৃ. ৫।

১৯। Swami Vivekananda, *Bold Message For World Peace*, Sir Ramakrishna Math, Mylapore, Chennai, 2006, Page- 42.

২০। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ২২-২৩।

২১। স্বামী রঘুবরানন্দ সংকলিত, *গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, একত্রিংশৎ পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৪, পৃ. ৪৫।

২২। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৭।

২৩। ঐ, পৃ. ১৭।

২৪। ঐ, পৃ. ১৮।

২৫। স্বামী রঘুবরানন্দ সংকলিত, *গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা*, ঐ, পৃ. ৫-৬।

২৬। ঐ, পৃ. ৬।

২৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৯-২১।

২৮। ঐ, পৃ. ২১।

২৯। ঐ, পৃ. ২৩।

৩০। ঐ, পৃ. ২৫।

৩১। কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, *The Science of Self Realization*, গ্রন্থের অনুবাদ, *আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা*, শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী অনুদিত, মুদ্রণ ঃ বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন, ভক্তি বেদান্ত বুক ট্রাস্ট প্রেস, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, একাদশ সংস্করণ: ২০০৫, পৃ. ৭।

৩২। স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, ঐ, পৃ. ৭৯।

৩৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৬।

৩৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, ঐ, পৃ. ৪।

৩৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৫।

৩৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৭।

৩৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৪।

৩৮। ঐ, পৃ. ১৩৬।

৩৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৬।

৪০। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৩৮।

৪১। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৬।

৪২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, "ঈশ্বর দর্শনের উপায়", স্বামী পরদেবানন্দ সম্পাদিত, *অর্ঘ্য*, ঐ, পৃ. ৫।

৪৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩২।

৪৪। সান্ত্বনা দাশগুপ্ত, "স্বামী বিবেকানন্দের সমাজদর্শনে রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৩৭৬।

Dhaka University Institutional Repository

৪৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৭৪-৭৫।
৪৬। ঐ, পৃ. ৭৫।
৪৭। ঐ, পৃ. ১৩৩-৩৪।
৪৮। এ, পৃ. ১৩৪।
৪৯। ঐ, পৃ. ১৩৫।
৫০। স্বামী অভেদানন্দ, *ঈশ্বরদর্শনের উপায়*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ১৯ এ এবং বি, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৪১১ ফেব্রুয়ারী- ২০০৫, পৃ. ৯২।
৫১। স্বামী অভেদানন্দ, 'মুক্তির উপায়', ঐ, পৃ. ২৯-৩০।
৫২। ঐ, পৃ. ৩১।
৫৩। শ্রীরামকৃষ্ণ ও সরদাদেবী, *শাশ্বত বাণী*, Pelican Press, 2237-0141, Sri Sarada Math Dakshineswar, পৌষ ১৪২৭, পৃ. ৬৩।
৫৪। SWAMI VIVEKANANDA, *SADHANAS or Preparations for higher life*, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Kolkata, Sixteenth Impression, October 2005, Page- 21.
৫৫। op.cit., Page- 17.
৫৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বিবেক-বাণী*, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুল, ৫ নিবেদিতা লেন, কলকাতা, ষষ্ঠবিংশ সংস্করণ, ফাল্গুন, ১৪০৮, পৃ. ৩৪-৩৫।
৫৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ২২১।
৫৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, দিনাজপুর, বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ০৪ অক্টোবর, ২০০৭, পৃ. ৭৩।
৫৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৬৯-৭০।
৬০। ঐ, পৃ. ৭০।
৬১। ঐ, পৃ. ৭০।
৬২। ঐ, পৃ. ৭১।
৬৩। ঐ, পৃ. ৭১।
৬৪। ঐ, পৃ. ৩২।
৬৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, ঐ, পৃ. ৭৪।
৬৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৩।
৬৭। ঐ, পৃ. ৭৬।
৬৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৭।
৬৯। প্রফেসর রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র প্রণীত, *ইচ্ছাশক্তি*, সাধনা কুটির, আলমনগর, পোঃ- রংপুর, ১৩৩৪ সাল, পৃ. ৯০।
৭০। ঐ, পৃ. ৩।
৭১। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধ্যান ও মনের শক্তি*, স্বামী সোমেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪১৪, পৃ. ৪৯।
৭২। স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, ঐ, পৃ. ৫৪।
৭৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ১৪৯।
৭৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *রাজযোগ*, ঐ, পৃ. ৬।
৭৫। ঐ, পৃ. ৭।
৭৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৯৩।
৭৭। স্বামী বিরেশ্বরানন্দ, *ঈশ্বর দর্শনের উপায় জপ ধ্যান*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৫, পৃ. ১২।
৭৮। ঐ, পৃ. ৫।
৭৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ১২১।
৮০। ঐ, পৃ. ১২১।
৮১। স্বামী বীরেশ্বরানন্দ, *ঈশ্বর দর্শনের উপায় জপ ধ্যান*, ঐ, পৃ. ৬-৭।
৮২। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধ্যান ও মনের শক্তি*, ঐ, পৃ. ৩২।
৮৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৭।
৮৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধ্যান ও মনের শক্তি*, ঐ, পৃ. ৪।
৮৫। ঐ, পৃ. ৩২।
৮৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ২১৮-১৯।
৮৭। ঐ, পৃ. ২১৮।
৮৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, দিনাজপুর, ঐ, পৃ. ৭১-৭২।
৮৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধ্যান ও মনের শক্তি*, ঐ, পৃ. ৩৪।
৯০। ঐ, পৃ. ৩৪।
৯১। ঐ, পৃ. ৩৫।

Dhaka University Institutional Repository

৯২। SWAMI VIVEKANANDA, *SADHANAS or preparation for higher life*, op.cit., Page- 9.

৯৩। Swami Vivekananda. *THE COMPLETE WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA*, Mayavati Memorial Edition. Volume VIII. ADVAITA ASHRAMA, 5 DEHI ENTALLY ROAD, CALCUTTA, Sixth Edition, June 1977, Page- 7.

৯৪। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, দ্বিতীয় খণ্ড, ঐ, পৃ. ২৭৬-৭৭।

৯৫। ঐ, পৃ. ২৭৭।

৯৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *উপদেশাবলী*, ঐ, পৃ. ৪৮।

৯৭। স্বামী বিবেকানন্দ, *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা, বিংশ পুনর্মুদ্রণ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, পৃ. ১।

৯৮। ঐ, পৃ. ১।

৯৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ২৬-২৭-২৮।

১০০। ঐ, পৃ. ২৬।

১০১। স্বামী যতীশ্বরানন্দ, *ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন*, ডঃ শশাঙ্ক ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, পৃ. ৪৪৮।

১০২। ঐ, পৃ. ৪৪৮-৪৯।

১০৩। ঐ, পৃ. ৪৪৯-৫০।

১০৪। ঐ, পৃ. ৪৫০।

১০৫। ঐ, পৃ. ৩৯৫-৯৬।

১০৬। ঐ, পৃ. ৩৯৭।

১০৭। স্বামী অভেদানন্দ, *মুক্তির উপায়*, ঐ, পৃ. ৬৬-৬৭।

১০৮। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধ্যান ও মনের শক্তি*, ঐ, পৃ. ৪৬-৪৭।

১০৯। ঐ, পৃ. ৩৬।

১১০। ঐ, পৃ. ৪৬।

১১১। ঐ, পৃ. ৪৭।

১১২। ঐ, পৃ. ৪৮।

১১৩। ঐ, পৃ. ৪৭।

১১৪। স্বামী রঘুবরানন্দ সংকলিত, *গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা*, ঐ, পৃ. ৩।

১১৫। ঐ, পৃ. ২-৩।

১১৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৬৯।

১১৭। ঐ, পৃ. ৭৭।

১১৮। ঐ, পৃ. ৭৬-৭৭।

১১৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *সরল রাজযোগ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, বিংশ পুনর্মুদ্রণ, ফাল্গুন ১৪১৩, পৃ. ৯।

১২০। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধ্যান ও মনের শক্তি*, ঐ, পৃ. ৩৫।

১২১। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ২১৬।

১২২। স্বামী বিবেকানন্দ, *সরল রাজযোগ*, ঐ, পৃ. ৯-১০।

১২৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩০।

১২৪। ঐ, পৃ. ৭-৮।

১২৫। স্বামী বিবেকানন্দ, *বিবেক-বাণী*, ঐ, পৃ. ৪০।

১২৬। স্বামী অভেদানন্দ, *মুক্তির উপায়*, ঐ, পৃ. ৫৬-৫৭।

১২৭। ঐ, পৃ. ৫৭-৫৮।

১২৮। ঐ, পৃ. ৫৯।

১২৯। ঐ, পৃ. ৬০।

১৩০। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, ষষ্ঠ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৪, পৃ. ২৭২-৭৩।

১৩১। স্বামী অভেদানন্দ, *মুক্তির উপায়*, ঐ, পৃ. ৬৪।

১৩২। স্বামী অভেদানন্দ, *ঈশ্বর দর্শনের উপায়*, ঐ, পৃ. ৮৭।

১৩৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ২১২-১৩।

১৩৪। ঐ, পৃ. ২১৩।

১৩৫। ঐ, পৃ. ২১৪।

১৩৬। ঐ, পৃ. ২১৫।

১৩৭। ঐ, পৃ. ২১৬।

১৩৮। স্বামী অভেদাত্মানন্দ, *ঈশ্বর দর্শনের উপায়*, ঐ, পৃ. ৯৪।

১৩৯। ঐ, পৃ. ৯৪-৯৫।

১৪০। ঐ, পৃ. ৯৫।

১৪১। ঐ, পৃ. ৯১।

Dhaka University Institutional Repository

১৪২। ঐ, পৃ. ৯১।
১৪৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, ২১৬।
১৪৪। ঐ, পৃ. ২১৬।
১৪৫। শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষাল সঙ্কলিত, *মুক্তি এবং তাহার সাধনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ মাঘ ১৪১২, পৃ. ৮।
১৪৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, ঐ, পৃ. ৯৩।
১৪৭। শ্রীবিপিন বিহারী ঘোষাল, *মুক্তি এবং তাহার সাধনা*, ঐ, পৃ. ১।
১৪৮। ঐ, পৃ. ২।
১৪৯। ঐ, পৃ. ২।
১৫০। ঐ, পৃ. ২।
১৫১। স্বামী অভেদানন্দ, *মুক্তির উপায়*, ঐ, পৃ. ২৪।
১৫২। ঐ, পৃ. ২৪-২৫।
১৫৩। ঐ, পৃ. ২৬-২৭।
১৫৪। ঐ, পৃ. ২৪।
১৫৫। ঐ, পৃ. ৬৯।
১৫৬। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, ঐ, পৃ. ১২-১৩।
১৫৭। মেরিলুইজ বার্ক, *পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ*, ভাষান্তর শ্রী নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪০১, পৃ. ৫০।

Dhaka University Institutional Repository

দশম অধ্যায়

বিশ্বপ্রেম

স্বামী বিবেকানন্দের প্রেমদর্শনের প্রবল স্রোত দেশ-কাল-পাত্র, জাতি-ধর্ম-বর্ণ প্রভৃতি বাধা অতিক্রম করে উদ্দ্যাম গতিতে ছড়িয়ে পড়ে বিশ্ব সাগরে। তাঁর গভীর প্রেমের পরিচয় প্রস্ফুটিত হয়েছে তাঁর "সখার প্রতি" কবিতায়।

'বহু রূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'[১]

স্বামী বিবেকানন্দ মানবপ্রেমিক, শুধু তাই নয় তিনি সকল জীবকেও ভালবাসেন। তাঁর এ প্রেম ভালবাসা অকৃত্রিম। তিনি জীবের প্রতি প্রেমের এই গভীর তাৎপর্য উপলব্ধি করেন বেদান্ত দর্শন চিন্তা থেকে। নির্বিচারে নয়, বিচার-বিশ্লেষণ ও আত্মোপলব্ধির মাধ্যমে বিবেকানন্দ খুঁজে পেয়েছেন জীবের প্রতি এ প্রেমের দর্শন। জগৎ ও জীবনের রহস্য অনুসন্ধান করে তিনি জীবের মাঝেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব খুঁজে পান। ঈশ্বর বহুরূপী। এ বিশ্ব জগতের প্রতিটি মানুষ, জীব, বৃক্ষ, তরুলতা, পশু-পাখি সব কিছুই ঈশ্বরের মূর্ত প্রতীক। চিন্তাশীল ব্যাক্তিগণ বিশ্বের বহুরূপের মাঝে, বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্য উপলব্ধি করেন। ঈশ্বর বিভিন্ন রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। বিবেকানন্দের মতে, ঈশ্বর দর্শনার্থী মুক্তিকামী সাধকের প্রথম কাজ জীবকে ভালবাসা। কারণ এ ভালবাসার মধ্য দিয়েই মানুষ ঈশ্বরকে লাভ করে, মুক্তি অর্জন করে। তাই বিবেকানন্দ জাতি-ধর্ম-বর্ণ, ছোট-বড়, ধনী-দরিদ্র, নির্বিশেষে সবাইকে ভালবাসেন। তিনি প্রেম ও সেবায় চির অম্লান হয়ে আছেন মানুষের হৃদয়ে। সময় যতই অতিবাহিত হচ্ছে, তাঁর প্রেম, সেবা ও মৈত্রীর বাণী ততই আজকের বিশ্বে সকল সমাজে গ্রহণযোগ্য হচ্ছে। এতে প্রমাণিত হয়, বিবেকানন্দ একজন অন্যতম মহান দূরদর্শী মানবপ্রেমিক। বিবেকানন্দের প্রেম শুধু দেশপ্রেম নয়, তা হলো বিশ্বপ্রেম।

বিবেকানন্দ আমেরিকায় আর্ত-পীড়িতদের সেবা করেন, তাঁর সংগৃহীত অর্থ থেকে দান করেন। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, 'আমি যেমন ভাতের তেমনি বিশ্বের।'[২] কোন সংকীর্ণতা, সীমাবদ্ধতা তাঁকে বেঁধে রাখতে পারেনি। তিনি ছিলেন দুর্বার, উদ্দ্যাম ও ঝঞ্ঝার মত গতিশীল। বিবেকানন্দ মানুষকে অসম্ভব রকমের ভালবাসতেন। মানুষের ব্যথায় তিনি ব্যথিত হতেন। তিনি বলেন ব্রহ্ম নয়, ঈশ্বর নয়-তাঁর দেবতা পাপী নারায়ণ, তাপী নারায়ণ, সর্ব জাতির দরিদ্র নারায়ণ-অজ্ঞরা যাদের ভুল করে 'মানুষ' বলে। একমাত্র এই ভগবানেই তাঁর বিশ্বাস, এঁর পূঁজার জন্য তিনি হাসিমুখে বার বার জন্ম গ্রহণ করতে এবং সহস্র যন্ত্রণা ভোগ করতে প্রস্তুত। মানুষের সেবার মাধ্যমেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন ঈশ্বরকে। তাই বিবেকানন্দ বলেন, 'I have touched the feet of God (আমি ঈশ্বরের চরণ স্পর্শ করেছি)।'[৩] জীবের প্রতি প্রেমই ঈশ্বর দর্শনের উপায়।

ত্যাগ ও সেবা

বিশ্বপ্রেমিক বিবেকানন্দ গভীর মানবপ্রেমের শিক্ষা দিয়েছেন ত্যাগ ও সেবার মাধ্যমে। ১৮৯৮ সনে পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসে তিনি স্বাস্থ্য ভালো করার জন্য দার্জিলিং সময় কাটাচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি সংবাদ পেলেন কলকাতায় প্লেগ ছড়িয়ে পড়েছে এবং তা ভয়ানক আকার ধারণ করতে পারে। এ অবস্থায় বিবেকানন্দের বিশ্রাম বিষাদে পরিণত হয়। তিনি পাহাড় থেকে নেমে এসে শিষ্য ও গুরু ভাইদের নিয়ে সেবার জন্য বড় পরিকল্পনা করেন। এ কাজে টাকার প্রয়োজন। "টাকা আসবে কোথায় থেকে?– এ প্রশ্ন করা হলে বিবেকানন্দ তখন বলেন, 'কেন দরকার হলে নূতন মঠের (বেলুড় মঠ স্থাপনের জন্য নূতন ক্রীত জমি) জমি-জায়গা বিক্রি করে দেব।"[৪] এ সেবা কাজের জন্য মঠের জমি বিক্রি করতে হয়নি। তাঁর এই ত্যাগের কথায় প্রমাণিত হয় তিনি কত বড় মহাপ্রাণ! সুদীর্ঘ বার বছর প্রাণপণ পরিশ্রম করে গড়তে যাচ্ছেন বেলুড় মঠ। আর্তের সেবার জন্য তিনি অম্লান বদনে মঠের জমি বিক্রি করার প্রস্তাব দেন। এ ঘটনায় প্রমাণিত হয় ত্যাগ ও সেবার আদর্শে তিনি পূর্ণমানব। গভীর মানবপ্রেমই ফুটে উঠেছে তাঁর কথা ও কাজে। বিবেকানন্দ মানুষের দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে পারতেন না। আমেরিকা যাওয়ার সময় বিবেকানন্দ মুখে একটা গভীর বিষাদের ছায়া নিয়ে স্বামী তুরীয়ানন্দকে বলেন, 'হরি ভাই, আমি এখনও তোমাদের তথাকথিত ধর্মের কিছুই বুঝি না।...কিন্তু আমার হৃদয় খুব বেড়ে গেছে এবং আমি অপরের ব্যথায় ব্যথা বোধ করতে শিখেছি। বিশ্বাস করো, আমার তীব্র দুঃখবোধ জেগেছে।'[৫] তাঁর কণ্ঠ ভাবাবেগে রুদ্ধ হয়ে যায়, তিনি আর বলতেই পারেননি- চোখের জল পড়ছিল। এভাবে বিবেকানন্দ তাঁর ত্যাগ ও সেবার আদর্শ রেখে গেছেন পৃথিবীর বুকে, যুব সমাজকে উজ্জীবিত করতে, হীন ও

Dhaka University Institutional Repository

পাপাচার মানুষের মনুষ্যত্ব বিকাশে। বিবেকানন্দ বিশ্বপ্রেম ও ধর্মের বাস্তব প্রয়োগ সম্পর্কে বলেন, 'যে ধর্ম বিধবার চোখের জল ঘোচাতে পারে না, পারে না নিরন্ন মানুষের জন্য এক মুঠো আহারের সংস্থান করতে, সেই ধর্মে কাজ নেই।'[৬] মানুষের প্রতি গভীর প্রেম বিবেকানন্দকে বাস্তববাদী করে তোলে ।

বিবেকানন্দের মতে- ধর্মের লক্ষ্য পরলোকে স্বর্গ প্রাপ্তি নয়, ইহলোকের কল্যাণ সাধন। দারিদ্র্য, অনাহার, শোষণ প্রভৃতি তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলে। তাই তিনি ধনী শোষক শ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রামের কথা বলেন। বিবেকানন্দের কথা হলো-প্রথমে মানুষকে অন্ন দিতে হবে, পরে তাকে ধর্ম-দর্শন শোনাতে হবে। ক্ষুধার্ত মানুষকে ধর্ম বা দর্শন শাস্ত্র শেখানো অর্থ- তাকে অপমান করা। শুধু মানুষ নয়, জীবের প্রতি গভীর প্রেম ও দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেন, 'যত দিন এদেশের একটা কুকুরও অভুক্ত থাকবে ততদিন আমার ধর্ম হবে সে কুকুরকে খাওয়ানো।'[৭] স্বামী বিবেকানন্দ প্রেম ও সেবার আদর্শ গ্রহণ করেন গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থেকে। শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন 'মানব প্রেমে আপনহারা পাগলপারা-স্বার্থ সম্বন্ধে কোনও বুদ্ধি নেই, বিতরণের ক্ষেত্রে কোনও হিসাব নেই।'[৮] বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর প্রেমের আদর্শ প্রচার করেন, মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন পৃথিবীর বুকে। বিবেকানন্দের এ মহান প্রেমের দ্বীপ শিখা প্রজ্বলিত থাকবে অনন্ত কাল। কিন্তু তাঁর অনন্ত প্রজ্বলিত প্রেম শিখার উৎস কি? এই জগতে কিভাবে প্রেমের বিচিত্র প্রকাশ ঘটে? আর কোন প্রেমের প্রভাবে তিনি মানবকল্যাণ সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন?– এসব প্রশ্নের উত্তর বিবেকানন্দ নিজেই দিয়েছেন।

প্রেম কি?

দূরদর্শী প্রকৃতি বিজ্ঞানী বিবেকানন্দ মানব-প্রকৃতি ও বিশ্বাত্মার স্বরূপ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রেমের এক গভীর ও সর্বজনীন ব্যাখ্যা দেন। তিনি সীমাহীন দুর্জয় প্রেমের ব্যাখ্যায় বলেন, "কোন্ শক্তি বলে অণু অণুর সহিত, পরমাণু পরমাণুর সহিত মিলিত হইতেছে, গ্রহ উপগ্রহ পরস্পরের দিকে আবর্তিত হইতেছে? কোন্ শক্তি নরকে নারীর প্রতি, নারীকে নরের প্রতি, মানুষকে মানুষের প্রতি, জীব জন্তুদের পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিতেছে– যেন সমুদয় জগৎকে এক কেন্দ্রাভিমুখে আকর্ষণ করিতেছে ? ইহাকেই 'প্রেম' বলে। ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে উচ্চতম প্রাণী পর্যন্ত আব্রহ্মস্তব্ধ এই প্রেমের প্রকাশ– এই প্রেম সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান্। চেতন-অচেতন, ব্যষ্টি-সমষ্টি– সকলের মধ্যেই এই ভগবৎ প্রেম আকর্ষণী শক্তিরূপে বিরাজ করিতেছে। জগতের মধ্যে প্রেমই একমাত্র প্রেরণা-শক্তি। এই প্রেমের প্রেরণাতেই খ্রীষ্ট সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রাণ দিয়েছিলেন, বুদ্ধ একটি ছাগশিশুর জন্যও প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছিলেন; ইহার প্রেরণাতেই মাতা সন্তানের জন্য এবং পতি পত্নীর জন্য প্রাণ বিসর্জন করিতে পারে। এই প্রেমের প্রেরণাতেই মানুষ স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হয়; আর আশ্চর্যের কথা, সেই একই প্রেমের প্রেরণায় পরে চুরি করে, হত্যাকারী হত্যা করে; কারণ এই-সবের মূলেও ঐ প্রেম, যদিও তাহার প্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন। ইহাই জগতে একমাত্র প্রেরণা শক্তি। চোরের প্রেম টাকার উপর– প্রেম তাহার ভিতর রহিয়াছে, কিন্তু উহা বিপথে চালিত হইয়াছে। এইরূপে সর্বপ্রকার পাপকর্ম ও সমুদয় পূণ্য– সব কিছুর পশ্চাতেই সেই অনন্ত শাশ্বত প্রেম বিদ্যমান। মনে করুন, একজন একই ঘরে বসিয়া নিউ ইয়র্কের গরীবদের জন্য হাজার ডলারের একখানি চেক লিখিয়া দিলেন, এবং ঠিক সেই সময়েই আর একজন তাহার বন্ধুর নাম জাল করিল। এক আলোতেই দুই জন লিখিতেছে। কিন্তু যে যেভাবে আলো ব্যবহার করিতেছে, সেই সেজন্য দায়ী হইবে-আলোর কোন দোষ-গুণ নাই। এই প্রেম সর্ববস্তুতে প্রকাশিত অথচ নির্লিপ্ত, ইহাই সমগ্র জগতের প্রেরণা শক্তি- ইহার অভাবে জগৎ মুহূর্ত-মধ্যে নষ্ট হইয়া যাইবে, এবং এই প্রেমই ঈশ্বর। ...এইরূপে আমরা পরা ভক্তিতে উপনীত হই– এই অবস্থায় অনুষ্ঠান ও প্রতীকাদির আর কোন প্রয়োজন থাকে না। যিনি ঐ অবস্থায় পৌঁছিয়াছেন, তিনি আর কোন সম্প্রদায়ভুক্ত হইতে পারেন না, কারণ সকল সম্প্রদায়ই তাঁহার মধ্যে রহিয়াছে। তিনি আর কোন্ সম্প্রদায়ভুক্ত হইবেন? সকল গির্জা-মন্দিরাদি তো তাঁহার ভিতরেই রহিয়াছে। এত বড় গির্জা কোথায় যাহা তাঁহার পক্ষে পর্যাপ্ত হইতে পারে? এরূপ ব্যক্তি নিজেকে কতকগুলি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারেন না। যে অসীম প্রেমের সহিত তিনি এক হইয়া গিয়াছেন, তাহার কি আর সীমা আছে?'[৯] একই প্রেম থেকে সৃষ্টি হয় ভাল ও মন্দ কাজের প্রতি প্রেরণা। ঈশ্বর প্রেমিকগণ মধুমক্ষিকার মত মন্দ পরিহার করে শুধু ঈশ্বর প্রেমের অমৃত সুধা পান করে অমরত্ব লাভ করেন। তাঁরা সংকীর্ণতার গণ্ডী অতিক্রম করে বিশ্বপ্রেমের সাগরে অবগাহন করেন।

বিভিন্ন ধর্মের মহাপুরুষগণ স্বধর্মের প্রেমের আদর্শ বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করেন। এই আসক্তিপূর্ণ জগতে অনন্ত প্রেমের পূর্ণরূপ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "যে-সকল ধর্ম এই প্রেমের আদর্শ গ্রহণ করিয়াছে, সেই-সব ধর্মে প্রেমকে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত করিবার চেষ্টা দেখা যায়। যদিও আমরা জানি এই প্রেম বলিতে কি বুঝায়, যদিও আমরা জানি- এই বিভিন্ন আসক্তিও আকর্ষণ পূর্ণ জগতে সবই সেই অনন্ত প্রেমের আংশিক বা

Dhaka University Institutional Repository

অন্যভাবের প্রকাশমাত্র, তথাপি আমরা সর্বদা উহা কথায় প্রকাশ করিতে পারি না। বিভিন্ন দেশের শুধু সাধুমহাপুরুষগণ উহা ব্যক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা দেখিতে পাই, তাঁহারা ঐ প্রেমের তাৎপর্য এতটুকু প্রকাশ করিবার জন্যও ভাষার ভান্ডারও তন্ন তন্ন করিয়া সন্ধান করিয়াছেন- এমন কি অতিশয় ইন্দ্রিয় ভোগ-বাচক শব্দগুলি পর্যন্ত দিব্যভাবে রূপান্তরিত করিয়া তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন। হিব্রু রাজর্ষি, এবং ভারতীয় মহাপুরুষগণও এইভাবে ঐ প্রেমের বর্ণনা করিয়া গিয়াছেনঃ 'হে প্রিয়তম, তুমি যাহাকে একবার চুম্বন করিয়াছ, তোমার দ্বারা একবার চুম্বিত হইলে তোমার জন্য তাহার পিপাসা ক্রমাগত বাড়িতে থাকে। তখন সকল দুঃখ দূর হয় এবং সে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান সব ভুলিয়া কেবল তোমারই চিন্তা করিতে থাকে।' ইহাই প্রেমিকার উন্মত্ত অবস্থা- এই অবস্থায় সব বাসনা লুপ্ত হইয়া যায়। প্রেমিক বলেন- মুক্তি কে চায়? কে মুক্ত হইতে চায়? এমন-কি, কে পুর্ণত্ব বা নির্বাণ পদের অভিলাষ করে?

'আমি ধন চাই না, আমি স্বাস্থ্যও প্রার্থনা করি না, আমি রূপযৌবনও চাই না, আমি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিও কামনা করি না- এই সংসার সমুদয় অশুভের মধ্যেও আমার পুনঃ পুনঃ জন্ম হউক- আমি তাহাতে কিছুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ করিব না, কিন্তু তোমার প্রতি আমার যেন অহেতুক প্রেম থাকে।'...মানবীয় প্রেমের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের প্রেমই সর্বোচ্চ, স্পষ্টভাবে ব্যক্ত, প্রবলতম ও অতিশয় মনোহর। এই কারণে ভগবৎ প্রেমের বর্ণনায় সাধকেরা এই প্রেমের ভাষাই ব্যবহার করিয়াছেন। এই মানবীয় প্রেমের মত্ততা সাধু-মহাপুরুষগণের উন্মত্ত ঈশ্বরপ্রেমের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনিমাত্র। যথার্থ ভগবৎ প্রেমিকগণ ঈশ্বরের প্রেম মদিরা পান করিয়া উন্মত্ত হইতে চান- 'তাঁহারা ভগবৎ প্রেমে উন্মত্ত' হইতে চান। সকল ধর্মের সাধুমহাপুরুষগণ যে প্রেম-মদিরা প্রস্তুত করিয়াছেন, যাহাতে তাঁহারা নিজেদের হৃদয়শোণিত মিশ্রিত করিয়াছেন, যাহার উপর নিষ্কাম ভক্তগণের সমগ্র মনপ্রাণ নিবদ্ধ, তাঁহারা সেই প্রেমের পেয়ালা পান করিতে চান। তাঁহারা এই প্রেম ছাড়া আর কিছুই চান না- প্রেমই প্রেমের একমাত্র পুরষ্কার, এবং কি অপূর্ব এই পুরষ্কার ! ইহাই একমাত্র বস্তু, যাহা দ্বারা সকল দুঃখ দূরীভূত হয়; ইহাই একমাত্র পান পাত্র, যাহা পান করিলে ভবব্যাধি অন্তর্হিত হয়, তখন মানুষ ঈশ্বর প্রেমে মত্ত হইয়া যায় এবং ভুলিয়া যায় যে, সে মানুষ।"[১০] নর-নারীর প্রেম সীমাবদ্ধ ও ক্ষীণ, কিন্তু ঈশ্বরপ্রেম অসীম ও অখণ্ড। তাই তো ঈশ্বর প্রেমিকগণ যুগ যুগ ধরে স্বয়ং ঈশ্বরদর্শনের অনন্ত প্রেম সাগরে ডুবে থাকতে চান অনন্তকাল।

উচ্চতর প্রেমই ভক্ত ও ভগবানের দ্বৈত সত্তা ঘুচিয়ে একাকার করে, সৃষ্টি করে পূর্ণ মিলন। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, "শেষে আমরা দেখিতে পাই বিভিন্ন সাধন প্রণালী পরিণামে পূর্ণ একত্বরূপ এক কেন্দ্রের অভিমুখী। আমরা চিরকালই দ্বৈতবাদিরূপে সাধন আরম্ভ করি- ঈশ্বর ও আমি সম্পূর্ণ পৃথক্ বস্তু। এই দুয়ের মধ্যে প্রেম আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন মানুষ ভগবানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, ভগবানও যেন মানুষের দিকে আসিতে থাকেন। পিতা-মাতা, সখা, প্রেমিক প্রভৃতির ভাব মানুষ ভগবানের উপর আরোপ করে এবং যখনই সে তাহার উপাস্য বস্তুর সহিত অভিন্ন হইয়া যায়, তখনই চরমাবস্থা লাভ করে। তখন আমিই তুমি ও তুমিই আমি হইয়া যায়! দেখা যায়, তোমাকে উপাসনা করিলে আমারই উপাসনা করা হয়, আর আমাকে উপাসনা করিলে তোমারই উপাসনা করি। সেই অবস্থায় পৌঁছিলেই মানুষ- যে অবস্থা হইতে তাহার জীবন বা উন্নতি আরম্ভ করিয়াছিল, তাহার সর্বোচ্চ পরিণতি দেখিতে পায়। যেখান হইতে মানুষ আরম্ভ করে, সেইখানেই শেষও করিয়া থাকে। প্রথমে ছিল আত্মপ্রেম, কিন্তু আত্মাকে ক্ষুদ্র 'অহং' বলিয়া ভ্রম হওয়াতে ভালবাসাও স্বার্থপর ছিল। পরিণামে যখন আত্মা অনন্ত স্বরূপ হইয়া গেল, তখনই পূর্ণ আলোক প্রকাশ পাইল। যে ঈশ্বকে প্রথমে কোন এক স্থানে অবস্থিত পুরুষ বিশেষ মনে হইত, তিনিই তখন যেন অনন্তপ্রেমে পরিণত হইলেন। সাধক নিজেই তখন সম্পূর্ণ পরিবর্তীত হইয়া যান, ঈশ্বর সামীপ্য লাভ করিতে থাকেন, পূর্বে তাঁহার যে-সব বৃথা বাসনা ছিল, তখন তিনি সেগুলি পরিবর্তীত করিতে থাকেন। বাসনা দূর হইলেই স্বার্থপরতা দূর হয় এবং প্রেমের চরম শিখরে আরোহণ করিয়া সাধক দেখিতে পান- প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাস্পদ- এক ও অভিন্ন।"[১১] প্রকৃত ঈশ্বর প্রেমের আকর্ষণ শক্তি, প্রেরণা শক্তি বৈচিত্র্যময় জগতের প্রতিকূল পরিবেশের সকল বাধা সহস্র দুঃখ-যন্ত্রণা অতিক্রম করে ভক্তকে অবশেষে পরম গুরু ও পরম প্রভুর সাথে অভিন্ন করে তোলে। আর এভাবেই প্রেম মানুষকে তার জীবনের পরম ও চরম লক্ষ্য ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায়।

একই ঈশ্বরের বিচিত্র প্রকাশ

এক ঈশ্বর এবং বিচিত্র মানুষের একই স্বরূপ। কারণ একই ঈশ্বর বিভিন্ন ব্যক্তির প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্নভাবে ব্যক্ত হচ্ছে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন- '...বৈচিত্র্যই জীবনের মূলভিত্তি। আকৃতিবিশিষ্ট জীবরূপে আমরা সৃষ্ট হইলাম কিরূপে? বৈচিত্র্য হইতে। সম্পূর্ণ সাম্যভাব হইলে আমাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। সমভাবে ও সম্পূর্ণরূপে তাপ বিকিরণ করাই উত্তাপের ধর্ম; এখন মনে করুন, এই ঘরের উত্তাপ-রাশি সেইভাবে বিকীর্ণ হইয়া গেল; তাহা হইলে কার্যতঃ

Dhaka University Institutional Repository

সেখানে উত্তাপ বলিয়া পরে কিছু থাকিবে না। এই জগতে গতি সম্ভব হইতেছে কিসের জন্য; সমতাচ্যুতি ইহার কারণ। যখন এই জগৎ ধ্বংস হইবে, তখনই কেবল সাম্যরূপ ঐক্য আসিতে পারে; অন্যথা এরূপ হওয়া অসম্ভব। কেবল তাহাই নয়, এরূপ হওয়া বিপজ্জনক। আমরা সকলেই এক প্রকার চিন্তা করিব, এরূপ ইচ্ছা করা উচিত নয়। তাহা হইলে চিন্তা করিবার কিছুই থাকিবে না। তখন জাদুঘরে অবস্থিত মিশরীয় মামিগুলির (mummies) মতো আমরা সকলেই এক রকমের হইয়া যাইব, এবং পরস্পরের দিকে নীরবে চাহিয়া থাকিব– আমাদের মনে ভাবিবার মতো কথাই উঠিবে না। এই পার্থক্য, এই বৈষম্য, আমাদের পরস্পরের মধ্যে এই সাম্যের অভাবই আমাদের উন্নতির প্রকৃত উৎস, উহাই আমাদের যাবতীয় চিন্তার প্রসূতি ! চিরকাল এইরূপই চলিবে।

...উৎকষ্ট অথবা নিকৃষ্ট দর্শনের মধ্য দিয়াই হউক, সূক্ষ্মতম অথবা স্থূলতম পৌরাণিক আখ্যায়িকার ভিতর দিয়াই হউক, সুসংস্কৃত ক্রিয়াকাণ্ড অথবা জঘন্য ভূতোপাসনাদির মধ্য দিয়াই হউক, প্রত্যেক সম্প্রদায়- প্রত্যেক ব্যক্তি- প্রত্যেক জাতি– প্রত্যেক ধর্ম জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ঊর্ধ্বগামী হইয়া ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করিতেছে। মানুষ সত্যের যত প্রকার অনুভূতি লাভ করুক না কেন, তাহারা প্রত্যেকটি ভগবানেরই দর্শন ছাড়া অপর কিছুই নয়। মনে করুন, আমরা সকলেই পাত্র লইয়া একটি জলাশয় হইতে জল আনিতে গেলাম। কাহারও হাতে বাটি, কাহারও কলসী, কাহারওবা বালতি ইত্যাদি, এবং আমরা নিজ নিজ পাত্রগুলি ভরিয়া লইলাম। তখন বিভিন্ন পাত্রের জল স্বভাবতই আমাদের নিজ নিজ পাত্রের আকার ধারণ করিবে। যে বাটি আনিয়াছে, তাহার জল বাটির মতো; যে কলসী আনিয়াছে, তাহার জল কলসীর মতো আকার ধারণ করিয়াছে; এমনি সকলের পক্ষে। কিন্তু প্রত্যেক পাত্রেই জল ব্যতীত অন্য কিছু নাই। ধর্ম সম্বন্ধেও ঠিক এই কথা। আমাদের মনগুলি এই পাত্রের মতো। আমরা প্রত্যেকেই ভগবান লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছি। যে জল দ্বারা পাত্রগুলি পূর্ণ রহিয়াছে, ভগবান সেই জল স্বরূপ এবং প্রত্যেক পাত্রের পক্ষে ভগবদ্দর্শন সেই সেই আকারে হইয়া থাকে। তথাপি তিনি সর্বত্রই এক। একই ভগবান ঘটে ঘটে বিরাজ করিতেছেন। আমার সার্বভৌম ভাবের এই একমাত্র বাস্তব পরিচয় পাইতে পারি।'[১২] জল যখন যে পাত্রে রাখা হয় তখন সেই পাত্রের আকার ধারণ করে, তেমনি ঈশ্বর বিভিন্ন প্রাণীর মধ্যে অবস্থান করে বিভিন্ন আকার ধারণ করেন। তিনি নিরাকার আবার সাকার। তিনিই সাকারে জগৎ সৃষ্টি করেছেন আবার তিনি নিরাকারে ব্রহ্ম।

পরমাত্মাই প্রেমের উৎস

এক বিশ্বাত্মা থেকে সকল আত্মা নিঃসৃত হয়েছে। এক পরমাত্মা সকলের মধ্যে বিরাজ করে বলেই আমরা সবাইকে ভালবাসি। মানুষ বা কোন প্রাণীকে নয়, আমরা আত্মার জন্যই ভালবাসি। এ বিষয়ে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রী মৈত্রেয়িকে শিক্ষা দেন– 'হে মৈত্রেয়ি, স্ত্রী যে স্বামীকে ভালবাসে তাহা স্বামীর জন্য নয়, কিন্তু আত্মার জন্যই স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসে; কারণ সে আত্মাকে ভালবাসিয়া থাকে। স্ত্রীর জন্যই কেহ স্ত্রীকে ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে। সন্তানগণকে কেহ তাহাদের জন্যই ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতুই সন্তানগণকে ভালবাসিয়া থাকে। অর্থ কেহ অর্থের জন্যই ভালবাসে না, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু অর্থ ভালবাসিয়া থাকে। ...দেবতাগণকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই দেবগণের জন্য নয়, কিন্তু যেহেতু সে আত্মাকে ভালবাসে, সেইহেতু দেবগণও তাহার প্রিয়। অধিক কি, কোন বস্তুকে যে লোকে ভালবাসে, তাহা সেই বস্তুর জন্য নয়, কিন্তু তাহার যে আত্মা বিদ্যমান, তাহার জন্যই সে ঐ বস্তুকে ভালবাসে।

অতএব, এই আত্মা সম্বন্ধে শ্রবণ করিতে হইবে, তারপর মনন অর্থাৎ বিচার করিতে হইবে, তারপর নিদিধ্যাসন অর্থাৎ উহার ধ্যান করিতে হইবে। হে মৈত্রেয়ি, আত্মার শ্রবণ, আত্মার দর্শন, আত্মার সাক্ষাৎকার দ্বারা এই সবই জ্ঞাত হয়।'[১৩] আত্মাই অপর মানুষ, জন্তু এমন কি জড় বস্তুকে ভালবাসে। আত্মদর্শন লাভ হলে প্রেমের রহস্য জানা যায়। 'ব্রাহ্মণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ব্রাহ্মণকে আত্মা হইতে পৃথক দেখেন; ক্ষত্রিয় তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি ক্ষত্রিয়কে আত্মা হইতে পৃথক দেখেন; লোকসমূহ বা জগৎ তাঁহাকে ত্যাগ করে, যিনি জগৎকে আত্মা হইতে পৃথক দেখেনঃ দেবগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি দেবগণকে আত্মা হইতে পৃথক বলিয়া বিশ্বাস করেন।...সকল বস্তুই তাঁহাকে পরিত্যাগ করেন, যিনি তাহাদিগকে আত্মা হইতে পৃথক্‌রূপে দর্শন করেন। এই ব্রাহ্মণ, এই ক্ষত্রিয়, এই লোকসমূহ, এই দেবগণ...এমন কি যাহা কিছু জগতে আছে, সবই আত্মা।'[১৪] সকলের মাঝেই রয়েছে অভিন্ন আত্মা। তাই কাউকে আত্মা হতে পৃথক ভাবলে সে আমাদের ত্যাগ করবে। কারণ আত্মাই আত্মাকে ভালবাসে। একটি আত্মা অপর আত্মাকে ভালবাসার প্রেরণা শক্তি ও আকর্ষণ ক্ষমতা রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

শাশ্বত প্রেমই আনন্দ স্বরূপ

কোন ব্যক্তিকে যদি তার রূপ-যৌবন বা অর্থ-সম্পদ ভোগের জন্য কেউ ভালবাসে তাহলে সে দুঃখ পাবে। আর যদি কাউকে আত্মা রূপে সম্ভোগ করা হয় তাহলে আনন্দ লাভ হবে। এই শাশ্বত প্রেমের ব্যাখ্যায় বিবেকানন্দ যাজ্ঞবল্ক্যের কথা উল্লেখ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, 'যখনই আমরা এই প্রেমকে কোন বিশেষ বস্তুতে সীমাবদ্ধ করি, তখনই যত গোলমাল। মনে করুন, আমি কোন নারীকে ভালবাসি, যদি আমি সেই নারীকে আত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে, বিশেষভাবে দেখি, তবে উহা আর শাশ্বত প্রেম হইল না। উহা স্বার্থপর ভালবাসা হইয়া পড়িল, আর দুঃখই উহার পরিণাম; কিন্তু যখনই আমি সেই নারীকে আত্মারূপে দেখি, তখনই সেই ভালবাসা যথার্থ প্রেম হইল, তাহার কখন বিনাশ নাই। এইরূপ যখনই আপনারা জগতের কোন বস্তুকে সমগ্র জগৎ হইতে বা আত্মা হইতে পৃথক করিয়া তাহাতে আসক্ত হন, তখনই প্রতিক্রিয়া আসিয়া থাকে। আত্মা ব্যতীত যাহা কিছু আমরা ভালবাসি, তাহারই ফল শোক ও দুঃখ। কিন্তু যদি আমরা সমুদয় বস্তুকে আত্মার অন্তর্গত ভাবি ও আত্মারূপে সম্ভোগ করি, তবে তাহা হইতে কোন দুঃখকষ্ট বা প্রতিক্রিয়া আসিবে না। ইহাই পূর্ণ আনন্দ।'[১৫] পরমাত্মাই শাশ্বত প্রেমের উৎস। সাধক আত্মদর্শনে প্রেমের অমৃত সুধা পান করেন।

ব্রহ্ম হতে সৃষ্টি-ব্রহ্মেই লয়

সর্বব্যাপী এক বিশ্ব আত্মা উপলব্ধির উপায় কি? আত্মাকে জানলে অনন্ত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড জানা যায়। জগতের বিশেষ বিশেষ বস্তু থেকে আত্মদৃষ্টি লাভ হয় না। এক পরমাত্মা হতে সবকিছু নিঃসৃত হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্বৃতি উল্লেখ করে বলেন, 'যেমন কেহ ভিজা কাঠ জ্বালাইতে থাকিলে তাহা হইতে নানা প্রকার ধূম ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেরূপ সেই মহান পুরুষ হইতে ঋগ্বেদ, যজর্বেদ, সামবেদ, অথর্বাঙ্গিরস, ইতিহাস, পুরাণ, বিদ্যা, উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র, অনুব্যাখ্যা ও ব্যাখ্যা– এই সমস্ত নিঃশ্বাসের ন্যায় বহির্গত হয়। সমস্তই তাঁহার নিঃশ্বাসস্বরূপ। যেমন সমুদয় জ্ঞানের একমাত্র আশ্রয় হৃদয়, যেমন সমুদয় কর্মের একমাত্র আশ্রয় হস্ত, ...যেমন সমুদ্র-জলের সর্বাংশে লবণ ঘনীভূত রহিয়াছে অথচ উহা চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, সেইরূপ হে মৈত্রেয়ি, এই আত্মাকে চক্ষু দ্বারা দেখা যায় না, কিন্তু তিনি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি সব কিছু, তিন বিজ্ঞান ঘন। সমুদয় জগৎ তাঁহা হইতে উত্থিত হয় এবং পুনরায় তাঁহাতেই ডুবিয়া যায়। কারণ তাঁহার নিকট পৌঁছিলে আমরা জ্ঞানাতীত অবস্থায় চলিয়া যাই।'[১৬] এক ঈশ্বর বা পরমাত্মা হতেই জগতের সকল মানুষ স্ফুলিঙ্গাকারে বের হয়েছে। সেই ঈশ্বরকে জানতে পারলে পুনরায় তাঁর সাথে মিশে এক হওয়া যায়। প্রেমই প্রেমিক-প্রেমিকার দ্বৈতভাব দূর করে একাত্ম করে। 'এই আত্মা অবিনাশী, তিনি স্বরূপতঃ নিত্য। যে অবস্থায় "দুই" থাকে অর্থাৎ যাহা দ্বৈতাবস্থা, তাহা নিম্নতর অবস্থা। যেখানে দ্বৈতভাব থাকে, সেখানে একজন অপরকে ঘ্রাণ করে, একজন অপরকে দর্শন করে, একজন অপরকে শ্রবণ করে, একজন অপরকে অভ্যর্থনা করে, একজন অপরের সম্বন্ধে চিন্তা করে, একজন অপরকে জানে। কিন্তু যখন সবই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহার ঘ্রাণ লইবে, কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহাকে শুনিবে, কে কাহাকে অভ্যর্থনা করিবে, কে কাহাকে জানিবে? ...তিনি অপরিণামী, তাঁহার কখন ক্ষয় হয় না। তিনি অনাসক্ত, কখনই তিনি প্রকৃতির সহিত মিশ্রিত হন না। তিনি পূর্ণ, সুখদুঃখের অতীত। বিজ্ঞাতাকে কে জানিতে পারে? কি উপায়ে তাঁহাকে আমরা জানিতে পারি? কোন উপায়েই নয়। হে মৈত্রেয়ি, ইহাই ঋষিদিগের চরম সিদ্ধান্ত। সমুদয় জ্ঞানের অতীত অবস্থায় যাইলেই তাঁহাকে লাভ করা যায়। তখনই অমৃতত্ব লাভ হয়।'[১৭] শাশ্বত ও গভীর প্রেমই ঈশ্বর লাভের প্রধান উপায়। প্রেমই জ্ঞানাতীত অবস্থায় ঈশ্বরের নিকট লয়ে যায়।

ভাল ও মন্দ– একই পরমাত্মার প্রকাশ

একই ঈশ্বর ভাল ও মন্দ সৃষ্টি করেছেন। আত্মার উৎকর্ষতা লাভের জন্য ভাল ও মন্দ দুটি দিকেরই প্রয়োজন রয়েছে। তাই এই জগৎ মুক্তি লাভের উপযুক্ত ক্ষেত্র। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'এই জগৎ সকল প্রাণীরই কল্যাণকারী এবং প্রত্যেক প্রাণীই জগতের কল্যাণকারী; কারণ উভয়েই পরস্পরের অংশ– একের উন্নতি অপরের উন্নতির সাহায্য করে। কিন্তু স্বপ্রকাশ আত্মার কল্যাণকারী বা সাহায্যকারী কেহ হইতে পারে না, কারণ তিনি পূর্ণ ও অনন্তস্বরূপ। জগতে যত কিছু আনন্দ আছে, এমন-কি খুব নিম্নস্তরের আনন্দ পর্যন্ত, ইঁহারই প্রতিবিম্বমাত্র। যাহা কিছু ভাল, সবই সেই আত্মার প্রতিবিম্বমাত্র, আর ঐ প্রতিবিম্ব যখন অপেক্ষাকৃত অস্পষ্ট হয়, তাহাকেই মন্দ বলা যায়। যখন এই আত্মা কম অভিব্যক্ত, তখন তাহাকে তমঃ বা মন্দ বলে; যখন অধিকতর অভিব্যক্ত, তখন উহাকে প্রকাশ বা ভাল বলে। এইমাত্র প্রভেদ। ভাল-মন্দ কেবল মাত্রার তারতম্য, আত্মার কমবেশি অভিব্যক্তি লইয়া।'[১৮]

Dhaka University Institutional Repository

ছোট বেলা আমরা মন্দ জিনিসকে ভাল এবং ভাল জিনসকে মন্দ বলে মনে করি। কিন্তু বড় হলে সে ধারণার পরিবর্তন হয়। একটা ভাব ক্রমে উচ্চ হতে উচ্চতর হয়। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'এইরূপে ভাল-মন্দ আমাদের মনের বিকাশের উপর নির্ভর করে, বাহিরে উহাদের অস্তিত্ব নাই। প্রভেদ কেবল মাত্রার তারতম্যে। সবই সেই আত্মার প্রকাশ মাত্র। আত্মা সবকিছুতে প্রকাশ পাইতেছেন; কেবল তাঁহার প্রকাশ অল্প হইলে আমরা মন্দ বলি এবং স্পষ্টতর হইলে ভাল বলি। কিন্তু আত্মা স্বয়ং শুভাশুভের অতীত। অতএব জগতে যাহাকিছু আছে, সবকেই প্রথমে ভাল বলিয়া ধ্যান করিতে হইবে, কারণ সবই সেই পূর্ণস্বরূপের অভিব্যক্তি।...এই বস্তু সম্পূর্ণ ভাল, ঐ বস্তু সম্পূর্ণ মন্দ–এরূপ ধারণা কুসংস্কার মাত্র। প্রকৃতপক্ষে এই পর্যন্ত বলা যায় যে, এই জিনিস বেশি ভাল, ঐ জিনিস কম ভাল, আর কম ভালকেই আমরা মন্দ বলি। ভাল-মন্দ সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হইতেই সর্বপ্রকার দ্বৈত ভ্রম প্রসূত হইয়াছে। উহারা সকল যুগের নরনারীর বিভীষিকাপ্রদ ভাবরূপে মানবজাতির হৃদয়ে দৃঢ়নিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে। আমরা যে অপরকে ঘৃণা করি, তাহার কারণ শৈশবকাল হইতে অভ্যস্ত এই-সব মূর্খজনোচিত ধারণা। মানব জাতি সম্বন্ধে আমাদের বিচার একেবারে ভ্রান্তিপূর্ণ হইয়াছে, আমরা এই সুন্দর পৃথিবীকে নরকে পরিণত করিয়াছি, কিন্তু যখনই আমরা ভাল-মন্দের এই ভ্রান্ত ধারণাগুলি ছাড়িয়া দিব, তখনই ইহা স্বর্গে পরিণত হইবে।'[১৯] আত্মজ্ঞানের উদয় হলে অজ্ঞানতা দূর হয়, ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর প্রভৃতির পার্থক্য ঘুচে যায়।

সুখ, শান্তি ও প্রেম– একই ঈশ্বরের প্রকাশ

এ জগতে ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, তিক্ত-মধু বিচিত্র ভাবে অনন্ত প্রেমের বহির্প্রকাশ ঘটেছে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ যাজ্ঞবল্ক্যের শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য তাঁর স্ত্রীকে উপদেশ দিয়ে বলেন– "এই পৃথিবী সকল প্রাণীর পক্ষে মধু অর্থাৎ মিষ্ট বা আনন্দজনক, সকল প্রাণীই আবার এই পৃথিবীর পক্ষে মধু-উভয়েই পরস্পরকে সাহায্য করিয়া থাকে। আর ইহাদের এই মধুরত্ব সেই তেজোময় অমৃতময় আত্মা হইতে আসিতেছে। সেই এক মধু বা মধুরত্ব বিভিন্নভাবে অভিব্যক্ত হইতেছে। যেখানেই মানব জাতির ভিতর কোনরূপ প্রেম বা মধুরত্ব দেখা যায়, সাধুতেই হউক, পাপীতেই হউক, মহাপুরুষেই হউক বা হত্যাকারীতেই হউক, দেহেই হউক, মনেই হউক বা ইন্দ্রিয়েই হউক, সেখানেই তিনি আছেন। সেই এক পুরুষ ব্যতীত উহা আর কি হইতে পারে? অতি নিম্নতম ইন্দ্রিয়সুখ-ও তিনি, আবার উচ্চতম আধ্যাত্মিক আনন্দও তিনি। তিনি ব্যতীত মধুরত্ব থাকিতে পারে না।...যখন আপনি ঐ অবস্থায় উপনীত হইবেন, যখন সকল বস্তু সমদৃষ্টিতে দেখিবেন, যখন মাতালের পানাসক্তি ও সাধুর ধ্যানে সেই এক মধুরত্ব– এক আনন্দের প্রকাশ দেখিবেন, তখনই বুঝিতে হইবে, আপনি সত্য লাভ করিয়াছেন। তখনই কেবল আপনি বুঝিবেন– সুখ কাহাকে বলে, শান্তি কাহাকে বলে, প্রেম কাহাকে বলে। কিন্তু যতদিন পর্যন্ত আপনি এই বৃথা ভেদজ্ঞান রাখিবেন, মূর্খের মতো ছেলেমানুষী কুসংস্কারগুলি রাখিবেন, ততদিন আপনার সর্বপ্রকার দুঃখ আসিবে। সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষই সমগ্র জগতের ভিত্তিরূপে উহার পশ্চাতে রহিয়াছেন– সবই তাঁহার মধুরত্বের অভিব্যক্তি মাত্র। এই দেহটিও যেন ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড স্বরূপ– আর সেই দেহের সমুদয় শক্তির ভিতর দিয়া, মনের সর্বপ্রকার উপভোগের মধ্য দিয়া সেই তেজোময় পুরুষ প্রকাশ পাইতেছেন। দেহের মধ্যে সেই তেজোময় স্বপ্রকাশ পুরুষ রহিয়াছেন; তিনি আত্মা। 'এই জগৎ সকল প্রাণীর পক্ষে এমন মধুময় এবং সকল প্রাণীই উহার নিকট মধুময়', কারণ সেই তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এই সমগ্র জগতের আনন্দস্বরূপ। আমাদের মধ্যেও তিনিই আনন্দস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম।...এই সূর্য সকল প্রাণীর পক্ষে মধুস্বরূপ এবং এই সূর্যের পক্ষেও সকল প্রাণী মধুস্বরূপ, কারণ সেই তেজোময় পুরুষ সূর্যে রহিয়াছেন এবং তাঁহারই প্রতিবিম্ব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যোতিরূপে প্রকাশ পাইতেছে। সমুদয়ই তাঁহার প্রতিবিম্ব ব্যতীত আর কি হইতে পারে? তিনি আমাদের দেহেও রহিয়াছেন এবং তাঁহারই ঐ প্রতিবিম্ব-বলে আমরা অলোকে দর্শনে সমর্থ হইতেছি।"[২০] এক পরমাত্মা হতেই বৈচিত্র্যময় জগতের তিক্ত-মধু, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, ভাল-মন্দ, সবই সৃষ্টি হয়েছে। তাই তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিগণ সবকিছুতে সেই পরমাত্মার প্রকাশ উপলব্ধি করেন, তিনিই সৃষ্টি রহস্য অবগত হন।

বিশ্ব প্রেমিক বিবেকানন্দ অনন্ত স্বর্গীয় প্রেমের সুধা পান করার জন্য পার্থিব ধন-সম্পদ ও সুখের পরিবর্তে প্রভুর নিকট এভাবে প্রার্থনা করেন–'হে প্রভু, ধনী ব্যক্তির স্বর্ণ-রৌপ্যের এবং অন্যান্য সম্পত্তির উপর যেমন প্রীতি, তোমার প্রতি আমার সেইরূপই ভালবাসা যেন জাগে। আমি পৃথিবী বা স্বর্গের সুখ চাই না, রূপ-যৌবন চাই না, বিদ্যা-গৌরব চাই না, মুক্তিও চাইনা। বার বার যদি নরকে যাইতে হয়, তাহাতেও আমার ভয় নাই। কিন্তু আমার কাম্য শুধু একটি বস্তু–

Dhaka University Institutional Repository

তোমাকে ভালবাসা– ভালবাসার জন্যই ভালবাসা– যাহার নিকট স্বর্গ অতি তুচ্ছ।'[২১] প্রার্থনায় ভগবানের কৃপায় ভক্তের হৃদয়ে প্রেম জাগ্রত হয়।

এই বিশ্ব প্রকৃতির উত্থান-পতনের লীলার মাঝে মানুষের মন, বিশ্বাস, ভক্তি ও প্রেমের পরিবর্তন হয়। প্রতিকূল পরিবেশে মানুষ হারিয়ে ফেলে ধৈর্য এবং দীর্ঘ দিনের বিশ্বাস। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'One moment I think that I am spiritual, that I am moral; and the next moment, a blow comes, and I am thrown flat on my back. And why?– I have lost faith in myself, my moral backbone is broken.'[২২] মানুষ দীর্ঘদিনের সাধনায় ক্রমান্বয়ে গড়ে তোলে সততা, নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ। কিন্তু বিধাতার আকস্মিক কোন কঠিন পরীক্ষায় এক মুহূর্তে কি ভেঙ্গে যাবে নৈতিক মেরুদণ্ড? তা কখনও হতে পারে না। প্রেমের অপরিসীম দুর্জয় শক্তি পার্থিব প্রতিকূল পরিবেশের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করে সততা, নৈতিকতা ও মনুষ্যত্ববোধ। 'Love never fails, my son; today or tomorrow or ages after, faith will conquer. Love shall win the victory. Do you love you fellow-men?'[২৩] মানুষকে ভালবাসা হলো ঈশ্বরকে ভালবাসা। এই প্রেম বা ভালবাসা বিশ্ব স্রষ্টার এক অপূর্ব মোহনীয় অপরাজেয় শক্তি। এই প্রেমই পার্থিব উত্থান-পতনের প্রতিকূল পরিবেশ অতিক্রম করে অবশেষে মানুষকে তার লক্ষ্যে পৌঁছায়,– ঈশ্বরের নিকট পৌঁছায়। প্রেমের শক্তিতে মানবাত্মা-বিশ্বাত্মার সাথে মিলনের মাধ্যমে শাশ্বত আনন্দ ও আত্মার মুক্তি লাভ করে।

তথ্যনির্দেশ

১। সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ অনূদিত ও সম্পাদিত, *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, ১১৫ অখিল মিস্ত্রি লেন, কলি-৯, প্রথম কামিনী সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪০১, পৃ. ১৮৫।

২। স্বামী মুমুক্ষানন্দ, "মানবতাবাদ ঃ বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ" স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা (দ্বিতীয় সংস্করণ), ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৬৮৯।

৩। Nivedita, *The Master as I saw Him.* Advaita Ashram. Kolkata, 1988, P. 329.

৪। স্বামী মুমুক্ষানন্দ, "মানবতাবাদ ঃ বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৬৮৬।

৫। ঐ, পৃ. ৬৮৫।

৬। আমিনুল ইসলাম, "স্বামী বিবেকানন্দের জীবনদর্শন ও মানবতাবাদ", স্বামী অক্ষরানন্দ সম্পাদিত, *উদ্দীপন*, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা-বাংলাদেশ, ১৯৮৫, পৃ. ৪৭।

৭। স্বামী মুমুক্ষানন্দ, "মানবতাবাদ ঃ বুদ্ধদেব ও বিবেকানন্দ", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, ঐ, পৃ. ৬৮৭-৮৮।

৮। ঐ, পৃ. ৬৮৮।

৯। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, চতুর্থ খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪১৪, পৃ. ১৩৬-৩৭।

১০। ঐ, পৃ. ১৩৭-৩৮।

১১। ঐ, পৃ. ১৩৮-৩৯।

১২। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, তৃতীয় খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, ভাদ্র ১৪১৪, পৃ. ১১৪-১৫।

১৩। স্বামী বিবেকানন্দ, *ধর্ম বিজ্ঞান*, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৩, পৃ. ৯৭।

১৪। ঐ, পৃ. ৯৯।

১৫। ঐ, পৃ. ৯৯।

১৬। ঐ, পৃ. ১০০।

১৭। ঐ, পৃ. ১০১-১০২।

১৮। ঐ, পৃ. ১০৩।

১৯। ঐ, পৃ. ১০৩-১০৪।

Dhaka University Institutional Repository

২০। ঐ, পৃ. ১০৫-১০৬।

২২। স্বামী বিবেকানন্দ, *বাণী ও রচনা*, দশম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, বাগবাজার, কলকাতা, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৩, পৃ. ৮৪।

২৩। Swami Vivekananda, *THE COMPLETE WORKS OF SWAMI VIVEKANANDA*, Mayavati Memorial Edition, VOLUME IV, ADVAITA ASHRAMA, 5 DEHI ENTALLY ROAD, CALCUTTA, Eleventh Edition, January, 1978, Page- 123.

২৪। Swami Vivekananda, *Thoughts of Power*, Advaita Ashrama, 5 Dehi Entally Road, Kolkata, Twenty-eighth Impression, August 2006, Page- 20.

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

বিবেকানন্দের শিক্ষা ও সমন্বয়ী দর্শন সমগ্র বিশ্বের মানব সমাজের জন্য এক অনন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। তিনি বিশ্ব ভ্রমণ করে, বিশ্বের জ্ঞানী-গুণীদের জ্ঞান ভাণ্ডার হতে এবং সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস মন্থন করে বহুমুখী জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে তাঁর সমন্বয়ী দর্শন রচনা করেন। সকল যুগের, সকল সমাজের মানুষের কল্যাণের জন্য তাঁর দর্শন অপরিহার্য। বিবেকানন্দের দর্শনে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে বিশ্বতত্ত্ব (cosmology), বিজ্ঞান, অর্থনীতি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, রাজনীতি, ধর্ম প্রভৃতি বিষয়। এ সকল বিষয় জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। এ কারণেই বহুমুখী সমস্যার সমাধান করে সার্থক ও সুন্দর জীবন গঠনের জন্য বিবেকানন্দের দর্শন আজ বাংলাদেশ ও বিশ্বের জন্য অপরিহার্য। বিবেকানন্দের জীবনদর্শন আদর্শ মানুষরূপে গড়ে ওঠার শিক্ষা ও প্রেরণা দেয়। আদর্শ মানুষ কিভাবে কল্যাণমূলক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠন করবে– সেসব শিক্ষা রয়েছে তাঁর রাষ্ট্রদর্শনে। ধর্ম দর্শনে রয়েছে, মানুষ কিভাবে সমাজে ধর্মানুশীলন করে মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারবে- সেই শিক্ষা। ব্যবহারিক শিক্ষার সাথে আধ্যাত্মিক শিক্ষার সমন্বয় মানুষকে পরিপূর্ণ করে তোলে।

মানুষ আজ অনাবিল আস্থা ও শুভবুদ্ধি হারিয়ে শক্তিমদমত্ত হয়ে পড়েছে, হিংসা-বিদ্বেষে ক্রমাগত ভুগছে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার এক অসহনীয় অন্তর্জ্বালায়। বিচ্ছিন্নতা ও শূন্যতা বোধ মানুষকে জীবন বিমুখ করে ফেলেছে, সামাজিক ও মানবিক সম্পর্ক দুষিত হয়ে পড়েছে, শূন্যতাবোধের এক সর্বাত্মক অবক্ষয় দেখা দিয়েছে। দ্বন্দ্ব হানাহানি সহিংসতা জীবনকে অস্থির ও বিপর্যস্ত করে ফেলেছে। বানরত্ব ও মানবত্বের সীমারেখা যেন ক্রমেই বিলীয়মান। বিজ্ঞানের দেয়া অমিত শক্তি আজ মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মানুষ দেশ কাল জয় করেছে বটে, কিন্তু নিজেই হয়ে পড়েছে বিচ্ছিন্ন। দুঃখের বিষয় কর্মের সঙ্গে প্রীতির সংযোগ নেই বলেই আজ দিকে দিকে ঘোষিত হচ্ছে হাহাকার, বিত্তের মধ্যে দেখা দিয়েছে চিত্তের এক মহাশূন্যতা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে মানুষের সাফল্য নিঃসন্দেহে বিস্ময়কর। মানুষ আজ প্রবেশ করেছে পারমাণবিক যুগে, সমগ্র পৃথিবী আজ পরিণত হয়েছে এক 'গ্লোবাল ভিলেজ' বা বিশ্বপল্লীতে। কিন্তু তবু শান্তি নেই কোথাও- না পাশ্চাত্যের বিত্তবান দেশসমূহে, না আমাদের এই দূর্ভাগা বাংলাদেশে। গোর্কির ভাষায়- মানুষ পাখির মত আকাশে উড়তে, মাছের মত পানিতে সাঁতার কাটতে শিখেছে, কিন্তু শিখেনি তার আপন নিবাস মাটির পৃথিবীতে সুখ শান্তিতে বসবাস করতে। একুশ বছরের ব্যাবধানে পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হল দু'দুটি মহাযুদ্ধের তান্ডব; দিকে দিকে আজ মারণাস্ত্রের যে সমাবেশ ঘটেছে, দেশে দেশে এমনকি একই দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে যে হিংসা-বিদ্বেষের বহ্নিশিখা জ্বলছে তাতে আশঙ্কা হয় এর মধ্যে হঠাৎ যদি আরেকটি মহাযুদ্ধ বেঁধে যায়, তাহলে গোটা মানবজাতিসহ সমগ্র পৃথিবীটাই কি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে না ? এ আশঙ্কাই ধ্বনিত হয়েছে হালের মানবদরদী অনেক দার্শনিকের কথায়। বস্তুত, শূন্যতা, বিচ্ছিন্নতা ও মনের বিক্ষিপ্ততা মানুষকে আজ করে ফেলেছে দিশেহারা, ব্যক্তির মনে সৃষ্টি করেছে এক প্রাণঘাতী নৈরাশ্যবোধ। তাই জীবনে আজ দেখা দিয়েছে বিশৃঙ্খলা, অপরাধমন্যতা ও ছন্দপাত। কোথাও যেন আনন্দ নেই, নেই ভবিষ্যৎ। সত্যিই মানবতা আজ আটকা পড়েছে এক অন্ধকার গহ্বরে, জিম্মি হয়ে পড়েছে এক নির্মম পাশবিক শক্তির হাতে। এ এমন এক সঙ্কট যার কবল থেকে মুক্তির পথ মানুষের জানা নেই।

এ ভয়ঙ্কর অবস্থা থেকে নিষ্ক্রমনের একমাত্র উপায় যান্ত্রিক ও বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি বিবেকানন্দের দর্শন ও দয়া-মায়া প্রভৃতি মানবিক মূল্যবোধের মনন ও অনুশীলন। মনে রাখা দরকার যে, হিংসা-বিদ্বেষ নয়, দয়া-মায়া-প্রেম দিয়েই মানুষ জয় করতে পারে তার সত্তার লুক্কায়িত হীন পাশবিক প্রবৃত্তিসমূহকে, উপলব্ধি করতে পারে বিবেকানন্দের ঐক্য ও ভগবদ্দর্শন এবং অর্জন করতে পারে যথার্থ মনুষ্যত্বের মর্যাদা।

"বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউণ্ডেশন"– মুক্তির এক অনন্য পথ ও প্রতিষ্ঠান। বিবেকানন্দ পাশ্চাত্য থেকে ফিরে এসেই দেশের কাজে সর্বস্ব বলি দিতে প্রস্তুত এরকম একশ জন তরুণ প্রাণ তাজা যুবক চেয়েছেন। বিবেকানন্দের এ শিক্ষা ও মুক্তির

Dhaka University Institutional Repository

পথ ধরেই বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সারা বাংলাদেশ থেকে বাছাই করা একশ জন নিঃস্বার্থ তরুণ প্রাণ দেশপ্রেমিক যুবক নিয়ে দেশের সেবায় সহজেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হবে। তরুণ সংস্কার কর্মীগণ এই ছোট্ট বাংলাদেশের ঢাকায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের মাধ্যমে এ দেশের প্রতিটি বিভাগ, জেলা, থানা, ইউনিয়ন ও গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে কাজ করবে। তারা বিবেকানন্দের নির্দেশিত ধর্ম-দর্শন ও সেবার পথ অনুসরণ করে দেশ গড়ার কাজে সফল হবে। সেবকগণের প্রবল ইচ্ছাশক্তি, ধৈর্য, অধ্যবসায়, দেশপ্রেম ও ঐশীশক্তিই হবে মূল চালিকা শক্তি। কোন পার্থিব শক্তিই ঐশীশক্তির গতি রোধ করতে পারবে না। সাফল্য তাদের নিশ্চিত। জ্ঞান-প্রেম-কর্মের সমন্বয়ে মানুষের মধ্যে যে অসীম ঈশ্বরের প্রেরণা, সেই প্রেরণাকে নিজের জীবনে, সমাজে, রাষ্ট্রে তথা সমগ্র বিশ্বে প্রয়োগ করেই মানুষ পারে তার মনুষ্যত্ব বিকশিত করতে, সীমার মধ্যে অসীমের প্রত্যক্ষ পরশ পেতে। আর এ জন্যই তো নিদারুণ দুঃখ-দুর্দশা, বহু ত্যাগ-তিতিক্ষার বিনিময়ে মহাজ্ঞানী মহামানবেরা সোৎসাহে এগিয়ে গিয়েছেন তাঁদের সব কর্মকাণ্ডের সঙ্গে প্রীতির সংযোগ ঘটাতে, উদ্যোগী হয়েছেন ব্যাপক ও স্থায়ী মানবকল্যাণ প্রতিষ্ঠার মহান ব্রতে।

বিবেকানন্দ মানব মুক্তির স্বপ্ন দেখেন। মানবিকতাই বিবেকানন্দ-দর্শনের মধ্যমণি। তিনি মানুষের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক জীবনের শৃঙ্খলকে ছিন্ন করেছেন। তিনি শৃঙ্খলমুক্ত 'সামাজিক মানবতা' তথা সোস্যালিজমের আদর্শ উপস্থাপন করেছেন। ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মধ্যে সমন্বয় সাধন করে সমষ্টি-মুক্তি ও ব্যক্তি-মুক্তির মধ্যে সেতুবন্ধন গড়ে তোলা প্রয়োজন। এই মুক্তির জন্য দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, লোকাচার ও কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম প্রয়োজন। ধর্মমোহ, মেকি আধ্যাত্মিকতা, অন্ধ-বিশ্বাস, গোঁড়ামি, শ্রেণী শোষণ- এসবের নিরসন না হলে মানুষের ভাস্বর মূর্তি প্রকাশিত হবে না। বিবেকানন্দ মানুষের তামসিক জীবনের মোহাবরণ উচ্ছেদ করতে চেয়েছেন জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্রের পথে। তিনি পরবশ্যতা ও শোষণের উদ্ভিদী জীবন পরিহার করার আহ্বান জানান।

মানব সমাজের নব-জন্ম কোন পথে হবে? এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, এ নব জন্মের পথ সরল রেখার মতো নয়। এক দিকে আধ্যাত্মিক প্রহেলিকায় পথভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা, অন্যদিকে বস্তুপুঞ্জের দাসত্বের সম্ভাবনা। এই দুই সম্ভাবনার কথা মনে রেখে বাংলাদেশকে পথ তৈরী করতে হবে। আজ নতুন জীবনবোধ একান্তই প্রয়োজন। এই জীবনবোধে অঙ্গীকৃত হবে এই দাবি- 'First bread and then Religion'[১]. এই জীবনবোধে, জাতীয় চেতনায় ইষ্ট হিসেবে গৃহীত হবে জনশিক্ষা, জনস্বাস্থ্য, জনস্বাচ্ছন্দ্য ও জনসমৃদ্ধি। আজ একবিংশ শতাব্দীতেও বিবেকানন্দের মানবকল্যাণ সাধনের লক্ষ্য অপরিহার্য। দেশের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান দিতে হবে। সে জন্যই আজ বিবেকানন্দের সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে।

বিবেকানন্দের সমাজতন্ত্র কোন পথে অগ্রসর হবে? আমরা কি বিজ্ঞানের নামে, পরিকল্পনার নামে এদেশে সমষ্টিতান্ত্রিক রাষ্ট্র গ্রহণ করব? আমরা কি ব্যক্তি স্বরূপের স্বকীয়তা বিসর্জন দেব সমষ্টির যুপকাষ্ঠে? বিবেকানন্দ-দর্শনে ব্যক্তি ও সমষ্টি, বৈচিত্র্য ও ঐক্য, সংগঠন ও স্বাধীনতা, বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি- এ সবের সমন্বয় স্বীকৃত হয়েছে। ঐতিহাসিক বিবেকানন্দ বুঝতে পারেন রেজিমেন্টেড সমাজ সভ্যতার অনুকূল নয়। তাই স্বাধীনতাই তাঁর সমাজতন্ত্রের মূল কথা। নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত জীবসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যই বিবেকানন্দ শ্রেণীহীন, শোষণহীন সামজ ব্যবস্থা চেয়েছেন। স্বনির্ভর গ্রাম কার্যালয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ, আন্তরিকতার সাথে গ্রামবাসীর শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, বাসস্থান, নিরাপত্তা এবং বাঁচার প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা করবেন। তাহলে সহজেই সকল অভাব মুক্ত বিবেকানন্দের দিব্য সমাজ গড়ে উঠবে। যে সমাজ যুগ যুগ ধরে মানুষের কাম্য। আজ অসহায়, নিরাশ্রয় ও জীবন বিচ্ছিন্ন মানুষের জন্য জরুরী প্রয়োজন বিবেকানন্দের "দিব্য সমাজ (Divine Society)"। যে সমাজে মানুষের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে, প্রেম ও জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত পরিবেশে মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভ করতে পারবে। 'নর' তার স্বরূপ 'নারায়ণ' ফিরে পাবে।

বিবেকানন্দের দিব্য সমাজ ও আমেরিকান সমাজের মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে। তবুও তিনি মানুষ্যত্ব বিকাশে আমেরিকান সমাজের শিক্ষা ও প্রভাবের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'কেবল শিক্ষা, শিক্ষা, শিক্ষা ! ইউরোপের বহু নগর

Dhaka University Institutional Repository

পর্যটন করিয়া তাহাদের দারিদ্র্যের, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও বিদ্যা দেখিয়া আমাদের গরীবদের কথা মনে পড়িয়া অশ্রুজল বিসর্জন করিতাম। কেন এ পার্থক্য হইল? শিক্ষা– জবাব পাইলাম। শিক্ষাবলে আত্মপ্রত্যয়, আত্ম প্রত্যয়বলে অন্ত র্নিহিত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিতেছেন; আর আমাদের- ক্রমেই তিনি সঙ্কুচিত হচ্ছেন। নিউইয়র্কে দেখিতাম, Irish colonists (আইরিশ উপনিবেশবাসীরা) আসিতেছে অগ্রবিলম্বিত একটি ছেঁড়া কাপড়ের পুটলি। তার চলন সভয়, তার চাউনি সভয়। ছ-মাস পরে আর এক দৃশ্য- সে সোজা হয়ে চলছে, তার বেশভূষা বদলে গেছে; তার চাউনিতে, তার চলনে আর সে "ভয় ভয়" ভাব নাই। কেন এমন হল? আমার বেদান্ত বলছেন যে, ঐ Irishman-কে তাহার স্বদেশে চারিদিকে ঘৃণার মধ্যে রাখা হয়েছিল– সমস্ত প্রকৃতি এক বাক্যে বলছিল, "প্যাট (pat)" তোর আর আশা নাই, তুই জন্মেছিস গোলাম, থাকবি গোলাম।" আজন্ম শুনিতে শুনিতে pat-এর তা-ই বিশ্বাস হল, নিজেকে pat 'হিপনোটাইজ' করলে যে, সে অতি নীচ, তার ব্রহ্ম সঙ্কুচিত হয়ে গেল। আর আমেরিকায় নামিবামাত্র চারিদিক থেকে ধ্বনি উঠল- "প্যাট, তুইও মানুষ, আমরাও মানুষ, মানুষেই তো সব করেছে, তোর আমার মতো মানুষ সব করতে পারে, বুকে সাহস বাঁধ।" Pat ঘাড় তুললে, দেখলে ঠিক কথাই তো; ভিতরের ব্রহ্ম জেগে উঠলেন, স্বয়ং প্রকৃতি যেন বললেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত"।'[২] এখানে বিবেকানন্দ প্রতিকূল পরিবেশের মারাত্মক অবনতি ও অনুকূল পরিবেশের প্রভাব যে Pat এর জীবনে কত বড় উন্নতি ও পরিবর্তন এনেছে তা ব্যাখ্যা করেন। তাই তিনি মানুষের সঠিক বিকাশ ও আত্মার মুক্তির জন্য রচনা করেন স্বাধীন "দিব্য সমাজ"। বিবেকানন্দ যে ভারতের চিন্ময়মূর্তি ধ্যাননেত্রে দেখেছেন, সে ভারতে জনসাধারণের অবাধ অধিকার থাকবে আর্থিক ব্যবস্থায়, রাজনীতিতে, শিক্ষা-সংস্কৃতিতে। তিনি বলেন, শিল্পকলা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ধনী শ্রেণীর মত দরিদ্র শ্রেণীরও অধিকার রয়েছে।

বিবেকানন্দ যে মানুষকে আরাধ্য দেবতা বলেন সে মানুষ বন্ধনমুক্ত-জ্ঞানে, কর্মে ও হৃদয়বৃত্তিতে, তিনি হবেন মহীয়ান মানুষ। বিবেকানন্দ কামনা করেন, বন্ধনমুক্ত স্বাধীন মানুষের স্বেচ্ছাশ্রমে ও সহযোগিতায় গড়ে উঠবে নতুন সমাজ। মানুষ হবে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ভাস্বর। সাত্ত্বিক ও রাজসিক উপাদানে গঠিত নতুন বাংলাদেশীয় সমাজ-এমন সমাজের অভ্যুদয়ই কামনা করেন বিবেকানন্দ। বেদান্তের আধ্যাত্মিকতা ও ইসলামের শক্তির সমন্বয়ে গড়ে উঠবে তাঁর নতুন বাংলাদেশীয় সমাজ। এ সমাজের জনসাধারণই হবে ইতিহাসের নায়ক। মানুষ এ সমাজের বস্তুবাদী সভ্যতার উপকরণ ও প্রাচুর্যকে পরিহার করবে, সভ্যতাকে সমষ্টি মুক্তির উপায় হিসেবে নিয়োগ করবে। বিবেকানন্দের নতুন সমাজ হবে ব্যক্তিমানসের বিকাশের অসীম সম্ভাবনাময় উৎস। জোর করে আইনের সাহায্যে নয়, মানুষ গড়ে উঠবে তার স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে, নিজস্ব বিবেক বুদ্ধির প্রেরণায়। বিবেকানন্দ বলেন, '...সর্ব বিষয়ে অপরে যাহাকে রক্ষা করে, তাহার আত্মরক্ষা-শক্তির স্ফূরণ কখনও হয় না।'[৩] তাই প্রাথমিক সামান্য কয়েকটি দায়িত্ব পালন করা ছাড়া রাষ্ট্রের কোন কর্তব্য থাকবে না। মানুষ পরিপূর্ণ স্বাধীনতায় নিজেকে গড়ে তুলবে।

গ্রাম প্রতিনিধিদের মাধ্যমে জনগণ নিজেদের উন্নতির পরিকল্পনা নিজেরাই করবে। আর তারা শিখবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শক্তিপুঞ্জ একত্র হয়ে কিভাবে প্রচন্ড বল সংগ্রহ করতে পারে। শাসন কার্যের ভিত্তি গড়ে উঠবে জনগণের মধ্য থেকে। এ সম্পর্কে বিবেকানন্দ বলেন, 'আগ্রহ না থাকলে মানুষ খাটে না; তাই সকলকে দেখানো উচিত যে, প্রত্যেকেরই কাজে ও সম্পত্তিতে অংশ আছে এবং কার্যধারা সম্বন্ধে মত প্রকাশের ক্ষমতা আছে। আমাদের দেশের একটি প্রধান দোষ হচ্ছে যে, আমরা অপরের সঙ্গে কখনও দায়িত্ব ভাগ করতে চাই না, আর আমাদের পরে কি হবে তা কখনও ভাবি না।'[৪] আমাদের ব্যক্তিগত ও জাতীয় উন্নতির জন্য ভবিষ্যতের কথা ভেবে স্থায়ী "বিশ্ব ঐশীদর্শন ফাউন্ডেশন" গড়ে তুলে সকল দায়িত্ব ভাগ করে নিতে হবে। জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে মানুষ গড়ে তুলবে নিজের দেশকে।

নতুন পৃথিবীর মানুষ নিজস্ব সংস্কৃতিতে গড়ে উঠবে। তারা বরণ করবে আন্তর্জাতিকতাকে। বিশ্বের সকল মানুষের মাঝে একই সর্বব্যাপী আত্মা, সকলে একই ঈশ্বরের সন্তান। প্রতিটি জাতির ভাল দিকগুলি আত্মস্থ করে পরিণত হতে হবে বিশ্বমানবে। নতুন পৃথিবীর মানুষ কাজ করবে খাওয়ার জন্য নয়, ভোগের জন্য নয়। তার প্রতিটি কাজই হবে পরের কল্যাণে নিবেদিত। তখন তার নিকট কাজ আর কেবল 'কাজ' নয়। তার কাজ হবে 'উপাসনা' ও চিত্তশুদ্ধির

Dhaka University Institutional Repository

উপায়। তখন মানুষের সমগ্র জীবনই পরিচালিত হবে পরম পুরুষার্থের প্রেরণায়। মুক্তির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হবে তার সমগ্র জীবন ও সাধনা। মানব জীবন তখন দেব জীবনে রূপান্তরিত হবে। স্বত্ত্বগুণের বিকাশে মানুষ যথার্থ 'মানুষ'-এ পরিণত হবে। এই নতুন পৃথিবীর আবাহনেই বিবেকানন্দের জীবন, বাণী ও ত্যাগ। বিবেকানন্দের এই আশা পূর্ণ হবে যখন মানুষ তার কামনা বাসনা নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। তাই তিনি চেয়েছেন ধর্মের উদ্বোধন। ধর্মের পথে, আধ্যাত্মিকতার পথে মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি যখন দেখা দেবে, তখনই গড়ে উঠবে নতুন পৃথিবী। আর এই নতুন পৃথিবীরই সন্ধান দিয়েছেন বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দের নতুন পৃথিবীর স্বপ্ন ও আশার প্রদীপ জ্বেলে রাখবে সত্যসন্ধানী, শান্তিপ্রিয় ও মুক্তিকামী পূণ্যপথের যাত্রীগণ। বাংলাদেশ ও পৃথিবীর বিভিন্ন সমাজে জানা-অজানা অগণিত সেই পূণ্যপথের যাত্রীগণ বিভিন্ন পথে প্রয়াস চালাচ্ছেন বিবেকানন্দের স্বপ্ন ও আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য। তাঁরা সহসাই সমাজ রাষ্ট্র ও প্রতিকূল পরিবেশের সকল বাধ ভেঙ্গে, অশিক্ষা ও অপসংস্কৃতির গণ্ডী অতিক্রম করে গড়ে তুলবে নতুন পৃথিবী। মহৎ চিন্তা ও যুক্তিসিদ্ধ আশা কখনও মরে না। বিবেকানন্দের এ স্বপ্ন কালে বাস্তবায়ন হবেই। পরিশেষে বলতে হয়-

সত্যের প্রদীপ
নিভে না কখনও।
ধিকি ধিকি জ্বলে
– অনন্তকাল ॥

হে মানবতাবাদী, কল্যাণকামী, সমাজতান্ত্রিক গৈরিক সন্ন্যাসী, হে মানব মুক্তির দিশারী, পরম বন্ধু বিবেকানন্দ– তোমাকে নমস্কার।

তথ্যনির্দেশ

১। সতীন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, "স্বামী বিবেকানন্দ ও সোস্যালিজম", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, অষ্টম পুনর্মুদ্রণঃ জুলাই ২০০৪, ঐ, পৃ. ৩২৯।

২। স্বামী সোমেশ্বরানন্দ, "নতুন পৃথিবীর সন্ধানে কাল মার্ক্স ও স্বামী বিবেকানন্দ", স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত, *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৮০৫-৬।

৩। ঐ, পৃ. ৮৩১।

৪। ঐ, পৃ. ৮৩২।

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি
বাংলা গ্রন্থ

আশা দাশ (রচিত) : *শিখ ধর্মের ইতিহাস*, সদেশ, বিবেকানন্দ রোড, কলকাতা, ২০০৬।

আবদুল আহাদ : *গণচীনে চব্বিশ দিন*, আর্ট প্রেস, ফিরিঙ্গী বাজার, চট্টগ্রাম, প্রথম প্রকাশ-১৩৭৩।

উমা দাসগুপ্ত : *শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ-১৪০৪।

এম. আবুল কাশেম (সম্পাদিত) : *দর্শন ও প্রগতি* (১২শ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর), গোবিন্দদেব দর্শন গবেষণা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৯৫।

কাজী নূরুল ইসলাম (সম্পাদিত) : *দর্শন*, বাংলাদেশ দর্শন সমিতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (১৪শ বর্ষ, ১ম-২য় সংখ্যা, জুন-ডিসেম্বর), ১৯৯৬।

ড. আমিনুল ইসলাম : *মুসলিম দর্শন ও সংস্কৃতি*, নওরোজ কিতাবিস্তান, বাংলাবাজার, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ- ১৯৯১।

: *পাশ্চাত্য দর্শন প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, লাকী বুক হাউজ, নীলক্ষেত, ঢাকা, নতুন সংস্করণ- ১৯৯১।

: *জগৎ জীবন দর্শন*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম পুনর্মুদ্রণ- ১৯৯৫।

ডক্টর মোঃ মতিউর রহমান : *বাঙালির দর্শন : মানুষ ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ জুলাই, ২০০০।

: *বাঙলার দার্শনিক মনীষা*, ঢাকা জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮।

: ভারতীয় দর্শন ও সংস্কৃতি, ঢাকা জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ২০০৮।

ড. শশাঙ্ক ভূষণ বন্দোপাধ্যায় (অনুদিত) : *ধ্যান ও আধ্যাত্মিক জীবন*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ-১৪১৫।

ড. বদিউল আলম মজুমদার (সম্পাদিত) : *জাগরণের গল্পগাথা*, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ- ২০০৫।

নির্মাল্য নারায়ণ চক্রবর্তী : *পরিবেশ ও নৈতিকতা*, প্রগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলেজ রোড, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-২০০২।

নীরু কুমার চাকমা : *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ-১৯৮৩।

প্রব্রাজিকা বেদান্তপ্রাণা (সম্পাদিত) : *মহিমা তব উদ্ভাসিত*, শ্রীসারদা মঠ, দক্ষিণেশ্বর, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ-১৯৯৪।

প্রফেসর রাজেন্দ্রনাথ রুদ্র (প্রণীত) : *ইচ্ছাশক্তি*, সাধনা কুটির, আলমনগর, রংপুর, ১৩৩৪ সাল।

প্রসূন বসু ও শচীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত) : *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, কলিকাতা, প্রথম প্রকাশ- ১৯৯২।

প্রবীর ঘোষ (সম্পাদিত) : *বর্ণালী* (৩৬ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর), ঐ, ২০০৮।

: *বর্ণালী* (৩৬ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, এপ্রিল-জুলাই), ঐ, নরেন্দ্রপুর (মন্দির গেট), কলকাতা, ২০০৮।

বার্ট্রান্ড রাসেল : *প্লেটোর ইউটোপিয়া ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, মশিউল আলম অনুদিত, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, সূত্রাপুর, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০২।

ভগিনী নিবেদিতা : *স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি*, স্বামী মাধবানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০০১।

Dhaka University Institutional Repository

ভ. কেল্লে, ম. কোভালসন : *মার্কসীয় সমাজতত্ত্বের রূপরেখা*, বিষ্ণু মুখোপাধ্যায় অনুদিত, প্রগতি প্রকাশন, মস্কো, ১৯৭৫।

মতিউর রহমান (সম্পাদিত) : *দৈনিক প্রথম আলো*, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা, ১২ সেপ্টেম্বর, ২০০৯।

মিত্র কৌটিল্য : *বিবেকানন্দ ও আজকের সমাজ*, টালিগঞ্জ, কলিকাতা, ১৯৮৮।

মেরী লুইজ বার্ক : *পাশ্চাত্যে বিবেকানন্দ*, ভাষান্তর শ্রী নলিনী রঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪০১।

যোগপ্রকাশ ব্রহ্মচারী (প্রণীত) : *গুরুবাক্য বা যৌক্তিকপন্থা*, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ভাগ, অখণ্ড সংস্করণ, ইউনাইটেড পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৪২৫।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : *পল্লীপ্রকৃতি*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ, ১৩৯৩।

: *কালান্তর*, সালাহ উদ্দীন বই ঘর, বাংলা বাজার, ঢাকা, প্রথম প্রকাশ, ২০০০।

রঙ্গনাথানন্দ : *বিজ্ঞান ও ধর্ম*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮।

রোমাঁ রোলাঁ (ঋষিদাস অনুদিত) : *বিবেকানন্দের জীবন*, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-১৪১২।

শঙ্করীপ্রসাদ বসু : *বন্ধু বিবেকানন্দ*, স্বপ্না প্রিন্টিং ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ, রাজা রামমোহন রায় সারণি, কলকাতা, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮।

: *রামকৃষ্ণ মিশনের নীতি ও কর্মরীতি*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩।

শ্রীরামকৃষ্ণ, সারদাদেবী ও স্বামী বিবেকানন্দ : *অমৃতবাণী*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, ২০০৮।

শ্রী নিরঞ্জন অধিকারী (সম্পাদিত) : *শ্রদ্ধাঞ্জলী*, শ্রীশ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী আশ্রম, স্বামীবাগ, ঢাকা, ১৪১০।

শ্রী বিপিন বিহারী ঘোষাল (সঙ্কলিত) : *মুক্তি এবং তাহার সাধনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ১৪১২।

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ দে (প্রধান পৃষ্ঠপোষক) : *সারথী*, ধর্ম রক্ষিণী সভা, বরিশাল, ২০০৮।

শ্রীমদ্ ভক্তিচারু স্বামী (অনুদিত) : *আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা*, মূল রচনা- কৃষ্ণকৃপা শ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, *The science of self realization*, ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট, শ্রীমায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, একাদশ সংস্করণ, ২০০৫।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী : *যোগ বলে রোগ আরোগ*, উমাচল প্রকাশনী, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা, দশম মুদ্রণ, ১৩৭৯।

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য (বিরচিত) : *অপরোক্ষানুভূতি*, স্বামী অলোকানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়,কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৬।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসিবৃন্দ : *ধ্যান শান্তি আনন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার (সম্পাদিত) : *স্বামী বিবেকানন্দ মনীষীদের চোখে*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮।

রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ (সম্পাদিত) : *জীবন গঠনে স্বামীজীর বাণী*, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্কার, ২০০৭।

: *জগতের ধর্মগুরু*, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩।

সান্ত্বনা দাশগুপ্ত : *বিবেকানন্দের সমাজ-দর্শন*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ২০০৫।

সুধাংশুরঞ্জন ঘোষ (সম্পাদিত) : *বিবেকানন্দ রচনা সমগ্র*, প্রথম খণ্ড, কামিনী প্রকাশালয়, অখিল মিস্ত্রি লেন, কলি, প্রথম কামিনী সংস্করণ, ১৯৯৪।

Dhaka University Institutional Repository

: *বিবেকানন্দের রচনা সমগ্র*, দ্বিতীয় খন্ড, ঐ, ১৯৯৪ ।

স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ : *চিরজাগ্রত বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ১৪১২ ।

স্বামী পরদেবানন্দ (সম্পাদিত) : *অর্ঘ্য*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, বাগেরহাট-বাংলাদেশ, ২০০৩ ।

স্বামী রঘুবরানন্দ (সংকলিত) : *গুরুতত্ত্ব ও গুরুগীতা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, একত্রিংশৎ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪ ।

স্বামী শিবাত্মানন্দ (সম্পাদিত) : *বিবেকাঞ্জলি*, রামকৃষ্ণ আশ্রম ও রামকৃষ্ণ মিশন, সেবা সমিতি, হবিগঞ্জ, ১৪১২ ।

: *আমাদের কথা*, রামকৃষ্ণ মিশন, লোকশিক্ষা পরিষদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৮ ।

স্বামী সর্বগানন্দ : *ভাব প্রচার ও সংগঠন*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩ ।

স্বামী অভেদানন্দ : *ঈশ্বর দর্শনের উপায়*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা, ২০০৫ ।

স্বামী অসঙ্গানন্দ (সম্পাদিত) : *সমাজশিক্ষা*, রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭ ।

: *সমাজশিক্ষা* (৪৫ বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা), রামকৃষ্ণ মিশন লোকশিক্ষা পরিষদ, নরেন্দ্রপুর, কলকাতা, ২০০১ ।

স্বামী অক্ষরানন্দ (সম্পাদিত) : *উদ্দীপন*, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা, ১৯৮৫ ।

: *উদ্দীপন*, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন, ঢাকা, ১৯৯৫ ।

স্বামী অমৃতাত্মানন্দ : *শক্তি*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, দিনাজপুর, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭ ।

স্বামী অচ্যুতানন্দ : *দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮ ।

স্বামী অপূর্বানন্দ : *যুগপ্রবর্তক বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৪ ।

স্বামী ঈশাত্মানন্দ (অনুদিত) : *বিজ্ঞানী অথচ অধ্যাত্মবাদী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩ ।

: ইচ্ছাশক্তি ও তার বিকাশ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, বিংশতি পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮ ।

স্বামী গম্ভীরানন্দ : *যুগনায়ক বিবেকানন্দ*, দ্বিতীয় খন্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩৭৬ ।

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : স্বামী বিবেকানন্দের *বাণী ও রচনা*, নবম খন্ড, চতুর্থ সংস্করণ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৩৮৪ ।

স্বামী সৎপ্রকাশানন্দ : *পুনর্জন্ম কেন ও কিভাবে*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭ ।

স্বামী পরমানন্দ : *আত্মপ্রভুত্ব*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, ষষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ- ২০০২ ।

স্বামী লোকেশ্বরানন্দ (সম্পাদিত) : *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্কার, ১৩৯৫ বঙ্গাব্দ ।

: *চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ*, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, অষ্টম মুদ্রণ, ২০০৪ ।

স্বামী গোকুলানন্দ : *স্বামী বিবেকানন্দ-যুব সমাজের আদর্শ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দশম পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪ ।

স্বামী তেজস্বানন্দ : *রামকৃষ্ণ সঙ্ঘ আদর্শ ও ইতিহাস*, রামকৃষ্ণ মিশন সারদা পীঠ, বেলুড় মঠ, হাওড়া, অষ্টম সংস্করণ, ২০০৫ ।

Dhaka University Institutional Repository

স্বামী বিবেকানন্দ

: *স্বামীজীর স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন*, ঐ, ৬ষ্ঠ পুনর্মুদ্রণ- ২০০৬।
: *ভারতীয়দের অধ্যাত্ম জীবন*, ঐ, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ- ২০০৭।
: *অন্তর্বিজ্ঞান ও বহির্বিজ্ঞান*, ঐ, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬।
: *বাণী ও রচনা*, প্রথম খণ্ড, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ত্রয়োবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৫।
: ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড, উনবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: ঐ, তৃতীয় খণ্ড, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: ঐ, চতুর্থ খণ্ড, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: ঐ, পঞ্চম খণ্ড, অষ্টাদশ পুনর্মুদ্রণ ১৪১৪।
: ঐ, ষষ্ঠ খণ্ড, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: ঐ, সপ্তম খণ্ড, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: ঐ, অষ্টম খণ্ড, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: ঐ, নবম খণ্ড, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩।
: ঐ, দশম খণ্ড, চতুর্দশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩।
: *ঈশদূত যীশু খ্রীষ্ট*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬।
: *উপদেশাবলী*, শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম ও মিশন, দিনাজপুর-বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৭।
: *ওঠো জাগো এগিয়ে চলো*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১১।
: *জাগো, যুব শক্তি*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১০।
: *জাতি সংস্কৃতি ও সমাজতন্ত্র*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭।
: *ব্যক্তিত্বের বিকাশ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: *ধর্ম সমীক্ষা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪০৯।
: *ধর্ম বিজ্ঞান*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩।
: *ধ্যান ও মনের শক্তি*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: *নারী জাগরণের পথ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩।
: *পত্রাবলী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৯৯৪।
: *পরিব্রাজক*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টবিংশ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৫।
: *রাজযোগ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা, একত্রিংশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪০৫।
: *সরল রাজযোগ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, বিংশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩।
: বিবেক-বাণী, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন, কলকাতা, ষষ্ঠবিংশ, সংস্করণ, ১৪০৮।
: *বেদান্তের আলোকে*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: *ব্যক্তিত্বের বিকাশ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, নবম পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: *ভারতীয় নারী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ত্রয়োবিংশৎ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: *ভগবান বুদ্ধ ও তাঁর বাণী*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩।
: *শিক্ষাপ্রসঙ্গ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, বিংশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৩।
: *মদীয় আচার্যদেব*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, উনবিংশ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৩।
: *মরণের পরে*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।
: *সন্ন্যাসীর গীতি*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ত্রয়োবিংশতি পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৪।

Dhaka University Institutional Repository

: *হিন্দু ধর্ম*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৫।

স্বামী রঙ্গনাথানন্দ : মানবীয় উৎকর্ষ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭।

স্বামী বুধানন্দ : *মন ও তার নিয়ন্ত্রণ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাবিংশ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৭।

স্বামী বিরেশ্বরানন্দ : *ঈশ্বর দর্শনের উপায় জপ ধ্যান*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, সপ্তদশ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৫।

স্বামী বিশ্বাশ্রয়ানন্দ : *স্বামী বিবেকানন্দ*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, অষ্টাত্রিংশৎ পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৫।

স্বামী বেদানন্দ : *ওঁ ব্রহ্মচর্য্যম্*, ভারত সেবাশ্রম, রাসবিহারী এভিনিউ, কলকাতা, পঞ্চবিংশতি সংস্করণ ১৪১২।

স্বামী মুমুক্ষানন্দ : *ধ্যান ও প্রার্থনা*, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬।

স্বামী সর্বেশ্বরানন্দ (সম্পাদিত) : *দিব্য জ্যোতি*, রামকৃষ্ণ আশ্রম, ১৮২ রামকৃষ্ণ মিশন রোড, ময়মনসিংহ-বাংলাদেশ, ১৯৯৪।

হযরত ইমাম গায্যালী (রঃ) : *সৌভাগ্যের পরশমণি*, আব্দুল খালেক (অনুদিত), ইসলামিক ফাউণ্ডেশন, বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৯।

হার্বার্ট স্পেন্সার : *শিক্ষা*, স্বামী বিবেকানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ষোড়শ পুনর্মুদ্রণ, ২০০৮।

ইংরেজী গ্রন্থ

Advaita Ashrama (ed) : *VIVEKANANDA HIS CALL TO THE NATION*, Advaita Ashrama, Kolkata, 40th Impression, 2009.

Budhananda : *Letters of Swami Vivekananda*, Advaita Ashram Calcutta (Thirty Edition), 1970.

Bhupendranath Datta : *Swami Vivekananda: Patriot-Prophet*, Nababharat Publishers, Calcutta, 1954.

MARIE LOUISE BURKE : *SWAMI VIVEKANANDA IN THE WEST NEW DISCOVERIES HIS PROPHETIC MISSION*, Advaita Ashrama, Calcutta, Third Edition, 1984.

Marie Louise Burke : *SWAMI VIVEKANANDA IN THE WEST NEW DISCOVERIES, A NEW GOSPEL*, (5), Advaita Ashrama, Calcutta, 1987.

Nivedita : *The Master as I Saw Him*, Advaita Ashram, Kolkata, 1988.

Ralph David Abernathy : *Appeal to The Religious People at The World and to all Men of God will, Religion for peace*, Gandhi Peace Foundation, New Delhi, 1973.

Robert Lucker : *Philosophy and Myth Karl Marx*, Cambridge University press, 1961.

Swami Gombhirananda : *History at the Ramakrishna Math and Mission*, Advaita Ashrama Calcutta, 1957.

Swami Prabhananda : *SWAMIJI'S RETURN TO INDIA*, the Ramakrishna Mission Institute of Culture (ed), Kolkata, Fifth Print-2003.

Dhaka University Institutional Repository

Swami Budhananda : *WILL-POWER AND ITS DEVELOPMENT*, Advaita Ashrama, Kolkata, Thirteen Impression- 2009.

Swami Vireswarananda : *Youth of India Arise!*, Sir Ramakrishna Math, Mylapore, Madras, 2007.

: *IN DEFENCE OF HINDUISM*, Advaita Ashrama, Kolkata, Thirteenth Impression, 2002.

: *MY LIFE AND MISSION*, Advaita Ashrama, Kolkata, Nineteenth Impression, 2008.

: *Bold Message For World Peace*, Sir Ramakrishna Math, Mylapore, Chennai, 2006.

Swami Lokeswarananda : *SWAMI VIVEKANANDA AT A GLANCE*, Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, Second print, 2000.

Swami Sarvabhutananda : *The Ramakrishna Movement*, Ramakrishna Mission Institute of Culture (ed), Kolkata, Sixth Print-2008.

: *Great Sayings With Illustration*, The Ramakrishna Mission Institute of Culture, Kolkata, First Published-2009.

Swami Paramananda : *Faith Is Power*, Sir Ramakrishna Math, Mylapore, Madras, 2006.

Swami Vivekananda : *THE COMPLETE WROKS OF SWAMI VIVEKANANDA*, Advaita Ashrama, Mayavati, Himalayas, 1970.

: *SADHANAS or preparations for higher life*, Advaita Ashrama, Kolkata, Sixteenth Impression, 2005.

: *MEDITATION AND ITS METHODS*, Advaita Ashrama, Kolkata, Twenty-Second Impression, 2007.

: *Thoughts of Power*, Advaita Ashrama, Kolkata, Twenty Eighth Impression-2006.

অভিধান ও কোষ গ্রন্থ

আহমদ শরীফ (সম্পাদিত) : *বাংলা একাডেমী সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

জামিল চৌধুরী (সঙ্কলিত ও সম্পাদিত) : *বাংলা একাডেমী বাংলা বানান অভিধান*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৪।

ডঃ আব্দুল মতীন : *শিক্ষা সহায়িকা*, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭।

ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক ও শিবপ্রসন্ন লাহিড়ী (সম্পাদিত) : *বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, দ্বাদশ পুনর্মুদ্রণ, ২০১০।

Dhaka University Institutional Repository

মহফিজ উদ্দীন ও আব্দুল মতিন (সম্পাদিত) : *দর্শন পরিভাষা কোষ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৮৪।

শৈলেন্দ্র বিশ্বাস (সঙ্কলিত) : *সংসদ বাংলা অভিধান*, ৪র্থ সংস্করণ, কলিকাতা, সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪।

সরদার ফজলুল করিম : দর্শন-কোষ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী- ১৯৭১।

Grabe, R. : *Encyclopedia of Religion and Ethics*, Twelve Vds, Edinburgh-1918.

Runes, D.D. : *The Dictionary of Philosophy*, London, Philosophical Library, 1944.

Zillur Rahman Siddique (Editor) : *English-Bengali Dictionary*, Bangla Academy, Dhaka, Seventeenth Print-2000.